গল্প
প্রতিযোগিতার
প্রথম তিন গল্প

শীত ১৪২১
৫১তম সংখ্যা
২৮তম ইন্টারনেট সংখ্যা

# জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

## সহ-সম্পাদকমন্ডলী

উমাদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা

সংহিতা

ভারতের বৈজ্ঞানিক, পুরাণ, ভারতের বনাঞ্চল, জাপানের গল্প, দেশবিদেশের ভূত

মহাশ্বেতা

বইপড়া, লোককথা, সিনেমা হল, ভূতের আড্ডা'র গল্প

## তুলিতে, মাউসে, কি বোর্ডে, ক্যামেরায়

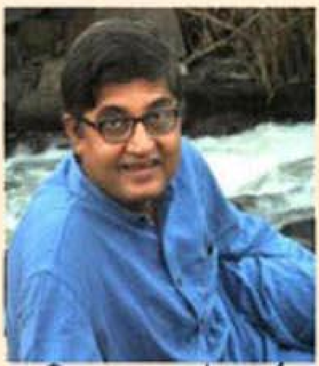

শিবশংকর ভট্টাচার্য

পিয়ালী ব্যানার্জি

মৌসুমী

মহুল

তাপস মৌলিক

অনুপম

অন্তরা

মুকুট

নচিকেতা

শিমুল

হাজারো কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে তোমাদের জন্য কি বোর্ডে, মাউসে, তুলিতে কি ক্যামেরায়, লেখা কম্পোজ করে, ছবি গড়ে জয়ঢাককে সাজিয়ে তুলেছেন এই বন্ধুরা।

শ্রী শাম্ব

শংখ

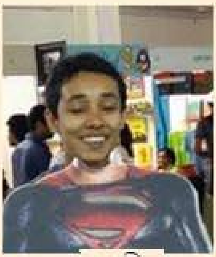

মধুশ্রী

# জয়ঢাক,শীত ২০১৪
# সুচিপত্র


| বিভাগ | লেখা | লেখক | ছবি/গ্রাফিক্স |
|---|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | জয়ঢাকি বোল | মীম নোশিন নওয়াল খান | ইন্দ্রশেখর |
| কমিক্স | হরিহরবাবু এবং ভূতের চিঠি | শ্রী শাম্ব | শ্রী শাম্ব |
| কমিক্স | রাশিয়ান কমিকস- এক কুঁড়ের গল্প | আজারবাইজানের রূপকথা | ইগর ক্রাভচেংকো |
| কমিক্স | ছোট্ট ভূত পিকো | নচিকেতা | নচিকেতা |
| গল্প প্রতিযোগিতা | প্রথম স্থান- পেঁচোর সাত সতেরো | অনিরুদ্ধ সেন | শ্রী শাম্ব |
| গল্প প্রতিযোগিতা | দ্বিতীয় স্থান- পালিয়ে | প্রকল্প ভট্টাচার্য | পিয়ালি ব্যানার্জি |
| গল্প প্রতিযোগিতা | তৃতীয় স্থান(১) ঐরাবত ঐ আসছে তেড়ে | রঞ্জন রায় | শিমুল সরকার |
| গল্প প্রতিযোগিতা | তৃতীয় স্থান(২)- বাউটম্যানের বাংলো | পুষ্পেন মণ্ডল | শংখ করভৌমিক |
| গল্প | ভয়ংকর | শিবশংকর ভট্টাচার্য | শিবশংকর ভট্টাচার্য |
| গল্প | অর্জুন সর্দার | শিশির বিশ্বাস | শিবশংকর ভট্টাচার্য |
| গল্প | শেষ চিঠি | মোঃ শামীম মিঞা | শিবশংকর ভট্টাচার্য |
| গল্প | সেই অদ্ভুত লোকটি | সূর্যনাথ ভট্টাচার্য | শংখ করভৌমিক |
| গল্প | কালো ভূত | তরুণ সরখেল | শিমুল সরকার |
| গল্প | সমু | দীপক দাস | মধুশ্রী বসু |
| গল্প | চিঁড়ে | পাপিয়া গাঙ্গুলি | |
| গল্প | ঝোলাগুড়ের হাঁড়ি | মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ | শিমুল সরকার |
| গল্প | হিটলারী | রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্যান্যাল | সৌভিক আচার্য |
| গল্প | রাজপুত্রের মন খারাপ | রতনতনু ঘাটী | সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় |
| গল্প | একটি দোয়েলের গল্প | এহসান হায়দার | পিয়ালি ব্যানার্জি |
| ভ্রমণ | পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো- জাতোলি | ইন্দ্রনাথ | |
| ভ্রমণ | খাতিন মেমোরিয়াল | জয়শ্রী গোস্বামী | |
| ভ্রমণ | পিন্ডারি গ্লেসিয়ার ট্রেকিং | শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| ভূতের আড্ডা | ভূতের গল্প- গ্যাব্রিয়েল আর্নেস্ট | মহাশ্বেতা | মৌসুমী |
| ভূতের আড্ডা | ভূতের বাড়ি- জামিলা- কামিলা, দিল্লি | ইন্দ্রশেখর | সংগৃহীত |
| ভূতের আড্ডা | দেশবিদেশের ভূত- চোরাচুন্নি , ভ্যানটোস | সংহিতা | সংগৃহীত |
| বিচিত্র দুনিয়া | ভালুকের খপ্পরে | অরিন্দম দেবনাথ | সংগৃহীত |
| ভাষা শেখবার আসর | বোম ফেলেছে জাপানি | দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায় | সংগৃহীত |
| বিদেশী গল্প | এক কোচোয়ানের গল্প-- আর্থার কোনান ডয়েল | অনুবাদ অমিত দেবনাথ | শিমুল সরকার |
| বিদেশী গল্প | জাপান ইয়েডর ওটোকোডেটের গল্প দ্বিতীয় পর্ব | বার্ট্রাম ফ্রিম্যান মিটফোর্ড অনুঃ সংহিতা | সংগৃহীত |
| বিদেশী গল্প | রাশিয়ান | তেরিওশা- আলেক্সেই তলস্তয়। অনুঃ ইন্দ্রশেখর | সংগৃহীত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| বৈজ্ঞানিকের দপ্তর | অংকের বিচিত্র জগত | বৈজ্ঞানিক | সংগৃহীত |
| বৈজ্ঞানিকের দপ্তর | মাথে মে ট্রিকস- | সূর্যনাথ ভট্টাচার্য | সংগৃহীত |
| বৈজ্ঞানিকের দপ্তর | গল্পে বিজ্ঞান-- অবাক চা পান | রবি সোম | |
| বৈজ্ঞানিকের দপ্তর | মহাবিশ্বে মহাকাশে- ধ্রুবতারা ধ্রুব নয় | কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| বৈজ্ঞানিকের দপ্তর | বিজ্ঞানের ছড়া | অমিতাভ প্রামাণিক | ইন্দ্রশেখর |
| বৈজ্ঞানিকের দপ্তর | টেকনো টুকটাক- রেল কাম ঝম ঝম | কিশোর ঘোষাল | সংগৃহীত |
| বৈজ্ঞানিকের দপ্তর | ভারতের বৈজ্ঞানিকঃ অমল কুমার রায়চৌধুরী | সংহিতা | ইন্দ্রশেখর |
| বৈজ্ঞানিকের দপ্তর | বিচিত্র জীবজগত- জলের নীচে তিরন্দাজ | বৈজ্ঞানিক | সংগৃহীত |
| বৈজ্ঞানিকের দপ্তর | প্রতিবেশী গাছ- শিউলি | অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় | সংগৃহীত |
| বনের ডায়েরি | ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প (বিস্ট অ্যান্ড মেন ইন ইন্ডিয়া)- র বঙ্গানুবাদ | পিয়ালী চক্রবর্তী, ( মূল লেখাঃ জন লকউড কিপলিং) | মূল পুস্তক |
| বনের ডায়েরি | কৌখাল | স্বপ্না লাহিড়ী | সংগৃহীত |
| বনের ডায়েরি | ভারতের বনাঞ্চল- মেঘালয় | সংহিতা | সংগৃহীত |
| ছড়ার পাতা | হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে-- | আবু হোসেন | ইন্দ্রশেখর |
| ছড়ার পাতা | চুরমুর | প্রকল্প ভট্টাচার্য | ইন্দ্রশেখর |
| ছড়ার পাতা | চোখের জলে | সঙ্গীতা সামন্ত | ইন্দ্রশেখর |
| ছড়ার পাতা | বোঝো | শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় | সংঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ছড়ার পাতা | মাঠের মাঝে তিনটি খরিশ | তরুণ সরখেল | সংঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ছড়ার পাতা | গিটারওলা ছোকরাটা | অচিন্ত্য সুরাল | শংখ করভৌমিক |
| ছড়ার পাতা | ম্যাজিক রানির বন্ধু হবি? | মধুশ্রী বসু | মধুশ্রী বসু |
| ছড়ার পাতা | প্রজাপতির সকাল | মীম নোশিন নওয়াল খান | অমৃতা বসু |
| ছড়ার পাতা | ব্যাঙাবেঙির কথা | শেখর রায় | সংঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ধাঁধা মজা রহস্য | ধাঁধা | ইন্দ্রশেখর | |
| ধাঁধা মজা রহস্য | কুইজ | ইন্দ্রশেখর | সংগৃহীত |
| ধাঁধা মজা রহস্য | জানো কি | ইন্দ্রশেখর | |
| ধাঁধা মজা রহস্য | ড্রুড্‌ল | ইন্দ্রশেখর | |
| ধাঁধা মজা রহস্য | কীসের ফটো | ইন্দ্রশেখর | |
| ধাঁধা মজা রহস্য | আশ্চর্য উলকি | ইন্দ্রশেখর | |
| ধাঁধা মজা রহস্য | অবিশ্বাস্য | ইন্দ্রশেখর | |
| ধাঁধা মজা রহস্য | গত সংখ্যার উত্তর | ইন্দ্রশেখর | |
| ধারাবাহিক উপন্যাস | অন্তিম অভিযান | পিটার বিশ্বাস | মৌসুমী |
| ধারাবাহিক উপন্যাস | পঞ্চা নামে ভালুকটি | চিত্ত ঘোষাল | মৌসুমী |
| কাতুকুতু | হাবুল কাবুলের কথাবার্তা | রসিকলাল দাস | ইন্দ্রশেখর |
| লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে | আকাশি নৌকো | আদিত্যবিক্রম | |
| **লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে** | অপু দুর্গা | তান | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে | দিগন্ত | ক্ষিতিজ | |
| লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে | ভূতেরাও ভালো হয় | ঋত্বিক | ঋত্বিক |
| পুরাণ কথা | নৈতিক সমস্যা | সংহিতা | ইন্দ্রশেখর |
| জাতক কথা | সেরিবান জাতক | নন্দিনী চট্টোপাধ্যায় | সংগৃহীত |
| পুরাতনী | বীরভদ্র | কুলদারঞ্জন | |
| স্মরণীয় যাঁরা | ভারতবন্ধু বিপ্লবী সাংবাদিক হর্নিম্যান | উমা ভট্টাচার্য | সংগৃহীত |
| সুরঢাক | এসো গান শুনি | প্রদীপ মুখোপাধ্যায় | লেখক |
| টাইম মেশিন | ভারতভ্রমণ | দীন মহম্মদ (অনুঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়) | ইন্দ্রশেখর |
| টাইম মেশিন | সীমান্তের অন্তরালে | সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী | শিবশংকর ভট্টাচার্য |
| টাইম মেশিন | ঠগির আত্মকথা | অলবিরুণী | মৌসুমী |
| বই পড়া | আজব বন সুন্দরবন | সমালোচনাঃ তাপস মৌলিক | মূল প্রচ্ছদ |
| বই পড়া | রাজা মুখোশ রানি মুখোশ | সমালোচনাঃ দেবজ্যোতি | মূল প্রচ্ছদ |
| লোককথা | তুফান ( ইন্যুইট লোককথা) প্রথম পর্ব | মহাশ্বেতা | মৌসুমী |
| বিশ্বের জানালা | পামারস্টোন দ্বীপের কাহিনী | উমা ভট্টাচার্য | সংগৃহীত |
| সেই মেয়েরা | কমলা- পৃথিবীর প্রথম মহিলা ভাষা শহিদ | উমা ভট্টাচার্য | দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য |
| আমার শহর | ফেলে আসা কলকাতা | সুজয় রায় | সংগৃহীত |
| জয়ঢাকের কিচেন | বিতানের কলাকুকি | ইন্দ্রশেখর | লেখক |
| দেশ ও মানুষ | নীলকর বিরোধী দরিদ্রবন্ধু বিশ্বনাথ সর্দার | উমা ভট্টাচার্য | সংগৃহীত |
| সিনেমা হল | সামার ডেজ উইথ কু | মহাশ্বেতা | সংগৃহীত |
| খেলার পাতা | এভারেস্ট | এরিক শিপটন। অনুঃ বাসব চট্টোপাধ্যায় | সংগৃহীত |
| খেলার পাতা | অন্নপূর্ণা | মরিস হারজগ অনুঃ তাপস মৌলিক | লেখক |
| ক্যামেরার পেছনে | ওয়ান টু থ্রি ক্লিক | শম্পা গুহমজুমদার | লেখক |
| পুতুলখেলা | পুতুলনাচের সাতকাহন | শুভ জোয়ারদার | শুভ জোয়ারদার |

# জয়ঢাকি বোল

বাংলা আমার বন্ধু প্রাণের, সকল কথার সই,
বাংলা ঠোঁটে আঁকড়ে ধরে সদাই বেঁচে রই।
বাংলা ভাষায় হাসতে শিখি, বাংলা ভাষায় কাঁদি,
এই ভাষাতেই দু'চোখ জুড়ে রঙিন স্বপ্ন বাঁধি।

কিন্তু সেদিন পাকিস্তানি দৈত্য এল ঘরে,
এসেছিল বাংলাকে মোর ছিনিয়ে নেওয়ার তরে।
বাংলা ফেলে দেবে নাকি উর্দু উপহার,
এটাই নাকি অধিক ভালো বলছে বারংবার।

ভালো- মন্দ বুঝি না ভাই, মোদের বাংলা চাই,
বাংলা চেয়ে রাজপথে তাই নেমেছিলাম ভাই।
বাংলার তরে শেকল ছিঁড়েছি, মুষ্ঠি করেছি শক্ত,
বাংলা মায়ের জন্য আমরা দিলাম বুকের রক্ত।

পাকিস্তানের দৈত্যগুলোর পেতেই হল ভয়,
এই বাংলার বুকে শেষে ঘটল মোদের জয়।
বাংলা আজও লেগে আছে মোদের ঠোঁটে- মুখে,
বাংলা মাকে বুকে চেপেই আমরা আছি সুখে।

আসছে একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১৪। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত এই দিনটিতে বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন, বিশ্বের বৃহত্তম বাংলাভাষী রাষ্ট্র বাংলাদেশের অনেক মানুষ। তাঁদের সেই যুদ্ধকে স্মরণ করে এই সংখ্যার জয়ঢাকি বোল। লিখে পাঠিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে তোমাদের বন্ধু **মীম নোশিন নাওয়াল খান**। ভালো থেকো শীতের দিনগুলো। আনন্দ করো সবাই মিলে। নিজের মাতৃভাষাকে ভুলো না।

ভালোবাসায় ,
তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা।

# হরিহরবাবু এবং ভূতের চিঠি

লেখায় রেখায় শ্রী শাম্ব

# হরিহর বাবু এবং ভূতের চিঠি

ভূতের চিঠি !
তখন মাঝরাত ...
zzz
সব চুপ
তখনই...
ঠক্
এরপর...
উফ্!
ঢিলে মোড়া একখানা চিঠি !!!

কী লেখা ?
?#
বলছি...
হুমকি
সাবধান!
এই জীবনে অনেক পাপ করেছিস। বাঁচতে চাইলে ডমরুঘুটু'র জঙ্গলে রোজ...
রাতে খাবার রেখে আসবি। - ইতি ভূত

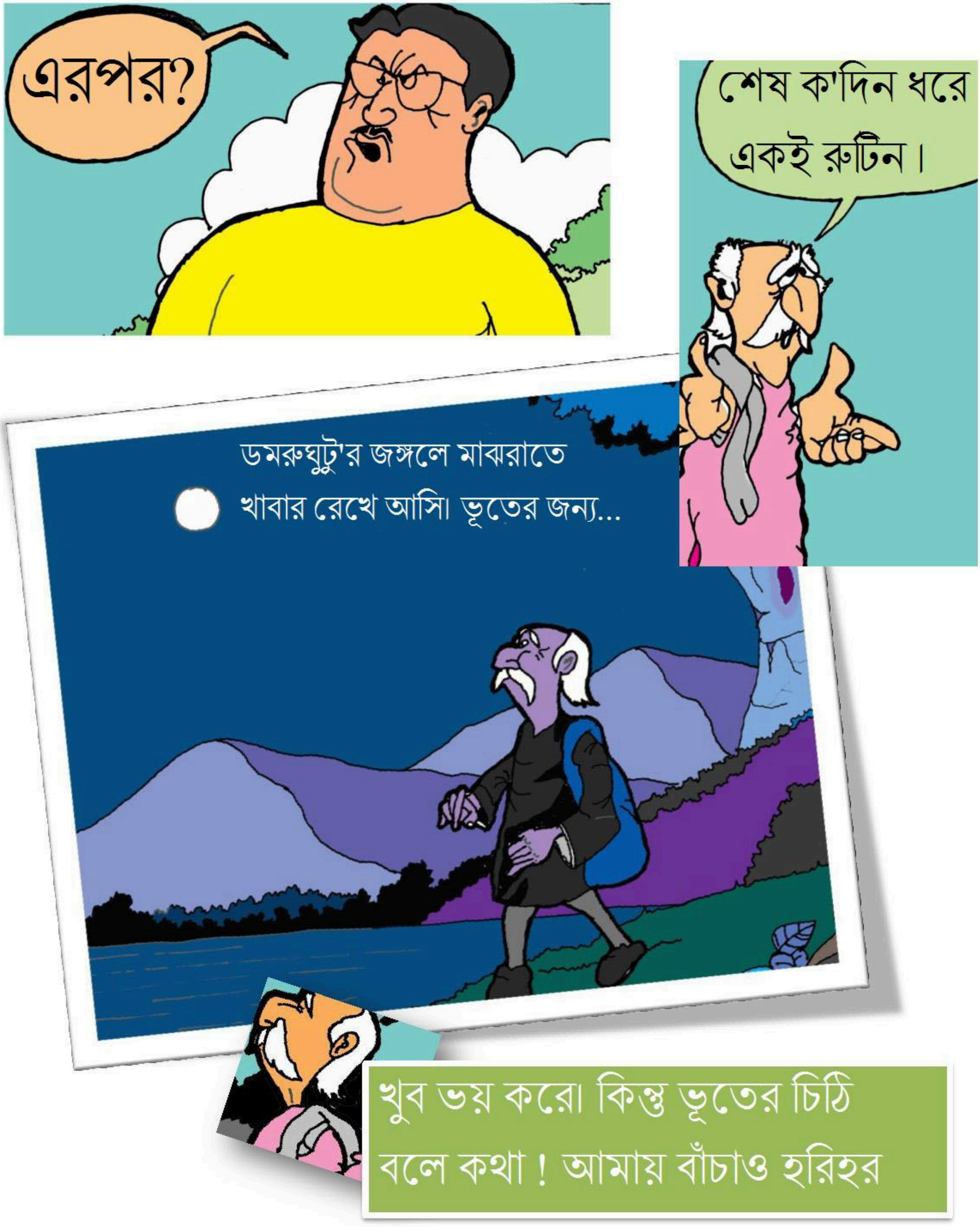
এরপর?
শেষ ক'দিন ধরে একই রুটিন।
ডমরুঘুটু'র জঙ্গলে মাঝরাতে খাবার রেখে আসি। ভূতের জন্য...
খুব ভয় করে। কিন্তু ভূতের চিঠি বলে কথা ! আমায় বাঁচাও হরিহর

নির্দিষ্ট জায়গায় খাবার রেখে ...
... আমি লুকিয়ে থাকি
কেউ আসে না !
শেষে একটা রাস্তার কুকুর ...
রোজ একই ঘটনা
কী ?
আজ রাতে আপনাকে যেতে হবে না।
ডাল মে কুছ কালা হ্যাঁ

রাতে... হরিহর
অবিকল একই ঘটনা !!!
আচ্ছা
কুকুরটাকে ফলো করা দরকার ...

ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক। নইলে...
...নইলে পুলিস ডাকবেন না! প্লিজ !!!
আমি কোন দোষ করিনি। আসলে... একটা সংস্থা খুলেছি, 'সারমেয় সংরক্ষণ সংস্থা'
রাস্তার কুকুরেরা যেন একটু ভালভাবে বাঁচতে পারে। ওরাও তো মানুষ।
এসবের জন্য একটু...
.. ফাণ্ড দরকার

বাড়িতে টাকা চাইতে গেলে বকাঝকা করে। তাই ভাবলাম অন্যকিছু করা দরকার।
নকুলবাবু'র বাড়ি...
নকুলবাবু লোকটা বড্ড কিপটে। তাই ভাবলাম, এই লোকটাকে বাজিয়ে দেখা যাক। অতএব...
তখনই ভূতের চিঠির আইডিয়াটা মাথায় আসে...
ঠিক আছে। এখন থেকে চিঠি দেওয়া বন্ধ করবি।
...আর আমার থেকে রোজ রাতে খাবার নিয়ে যাস। ... তোর কুকুরের জন্য।
স মা প্ত

# এক কুঁড়ের গল্প

এ হচ্ছে একটি আজারবাইজানী রূপকথা। আমাদের ছোট ছোট পাঠকদের জন্য তাতে ছবি এঁকেছেন শিল্পী ইগর ক্রাভচেঙ্কো। ...অনেক অনেক কাল আগে দুনিয়ায় একটি লোক বাস করত। সে ছিল ভীষণ কুঁড়ে আর নিষ্কর্মা। সারা দিন কেবল শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিত।

আর সে সব সময় কী ভাবত জান? ভাবত, কীভাবে ধনী হওয়া যায়, যাতে কাজ না ক'রে নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারে। ব্যস, একদিন সে ঠিক করল গুণীর কাছে যাবে পরামর্শের জন্য: কীভাবে ধনী হওয়া যায়? অবশ্য এর জন্য তাকে কষ্ট ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয় এবং রওয়ানা দিতে হয় দূরের পথে।

তিন দিন তিন রাত চলল সে। পথে দেখা হল অস্থিচর্মসার এক নেকড়ের সঙ্গে। 'কোথায় যাচ্ছ ভাল মানুষের পো?' জিজ্ঞেস করল নেকড়ে। 'এই একটু গুণীর কাছে যাচ্ছি, পরামর্শের জন্যে — কীভাবে ধনী হওয়া যায়।

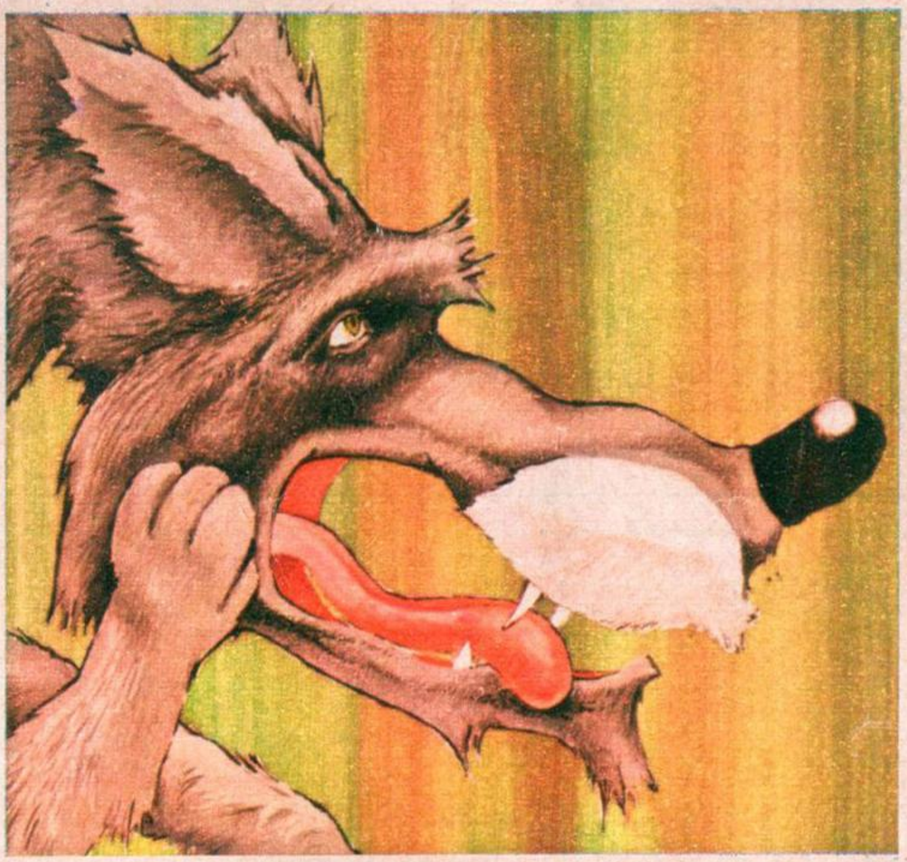

নেকড়ে শুনে বলে, 'আমায় সাহায্য কোরো। তিন বছর আমি ভীষণ পেটের ব্যথায় ভুগছি, দিনরাত একটুও শান্তি নেই। গুণীকে জিজ্ঞেস কোরো, কীভাবে এই ব্যথা সারানো যায়।'

চলতে লাগল কুঁড়ে। দেখল এক আপেল গাছ। 'কি ভায়া, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' শুধাল আপেল গাছ। 'যাচ্ছি গুণীর কাছে পরামর্শের জন্যে — কীভাবে না খেটে বাঁচা যায়।'

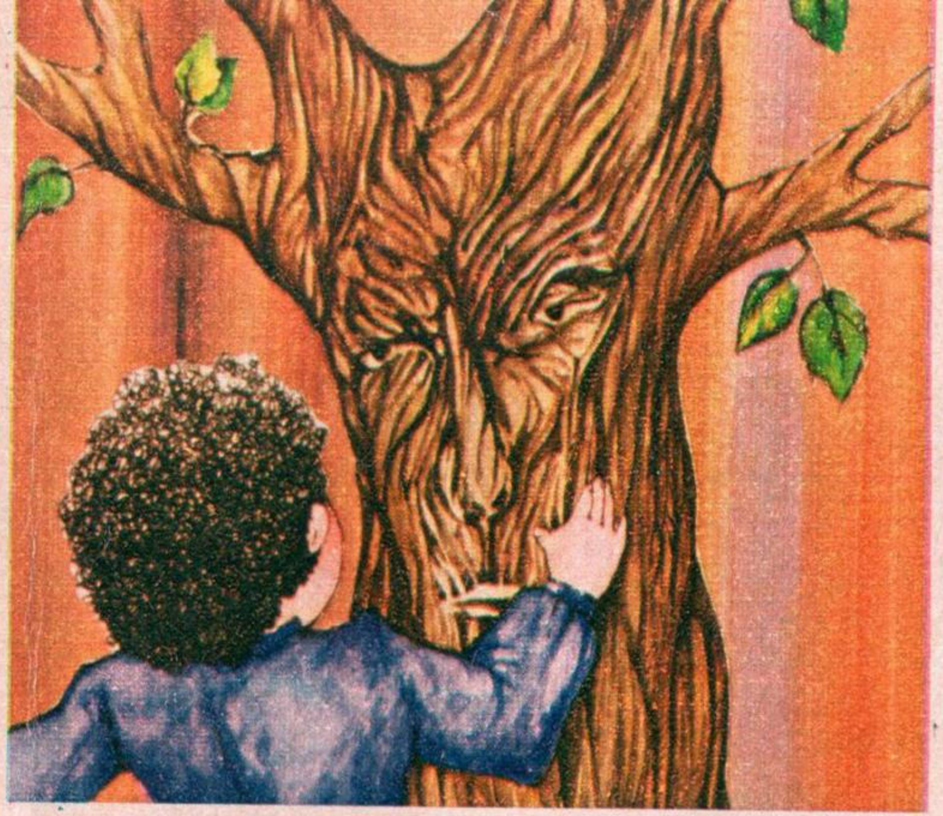

'ভাল কথা, গুণীকে আমার হয়েও একটা কথা জিজ্ঞেস কোরো,' বলে আপেল গাছ। 'প্রতি বছর বসন্তে আমার প্রচুর কুঁড়ি ধরে, কিন্তু যেই আমার ফুল ফুটে অমনি সব ফুল একসঙ্গে ঝরে পড়ে। গুণী যেন বলে, আমায় কী করতে হবে।'

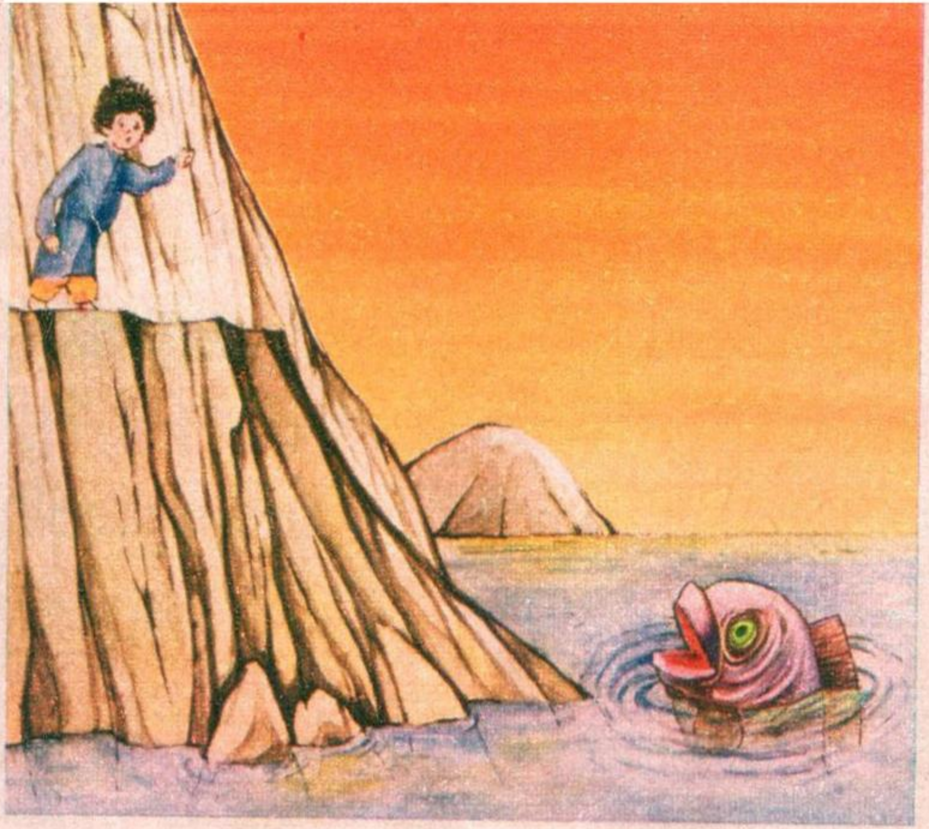

ফের রওয়ানা দিল কুঁড়ে। পেঁছল গিয়ে গভীর এক হ্রদের তীরে। বড় একটি মাছ জল থেকে মাথা বার ক'রে জিজ্ঞেস করে, 'বলি কোথায় যাচ্ছ ভাল মানুষের পো?' 'যাচ্ছি গুণীর কাছে — এই একটু পরামর্শ আর সাহায্যের জন্যে।'

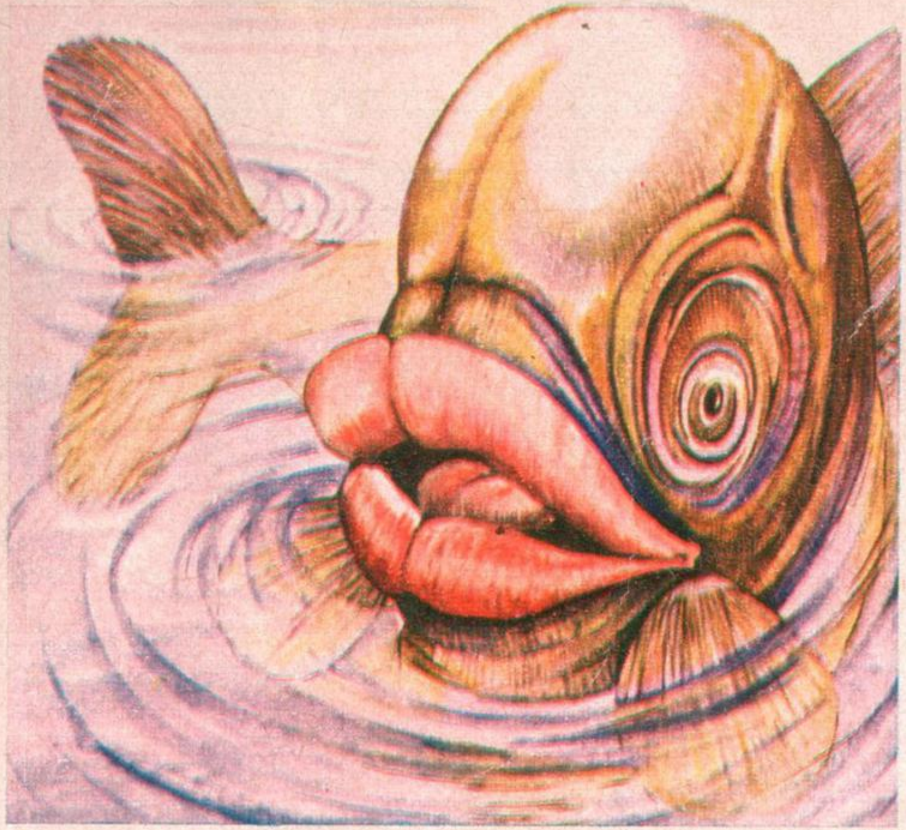

'বেশ তো, গুণীকে আমারও একটি অনুরোধের কথা বলো। সাত বছর হল গলায় কী একটা আটকে আছে। বড্ড ব্যথা করে। গুণী যেন বলে দেয়, আমি কীভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারি।'

শেষ পর্যন্ত সে এক বনের কাছে গিয়ে পৌঁছল। দেখে, ঝোপের নিচে বসে আছে লম্বা আর শাদা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো। বুড়ো চোখ তুলে নিষ্কর্মার দিকে, তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, তোর কী চাই?'

‘তুমিই কি সেই গুণী যার কাছে আমি পরামর্শের জন্যে যাচ্ছি?’ ‘হ্যাঁ,’ জবাব দেয় বুড়ো। ‘বল্ তোর কী দরকার, তাড়াতাড়ি বলে ফেল্!’ কুঁড়ে সব কথা বলল; নেকড়ে, আপেল গাছ আর মাছের অনুরোধের কথাও জানাল।

‘মাছের গলায়,’ বলে গুণী, ‘আটকে আছে মহামূল্যবান এক পাথর। তা বার করলেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে। আপেল গাছের শিকড়ের কাছে মাটিতে পোঁতা আছে এক কলস রুপো। তা খুঁড়ে তুললেই আপেল গাছ শুকিয়ে যাবে না। আর নেকড়েকে ব্যথার জ্বালা থেকে রক্ষা পেতে হলে যে-কুঁড়েকে সে প্রথম দেখবে তাকেই গিলে খেতে হবে।’

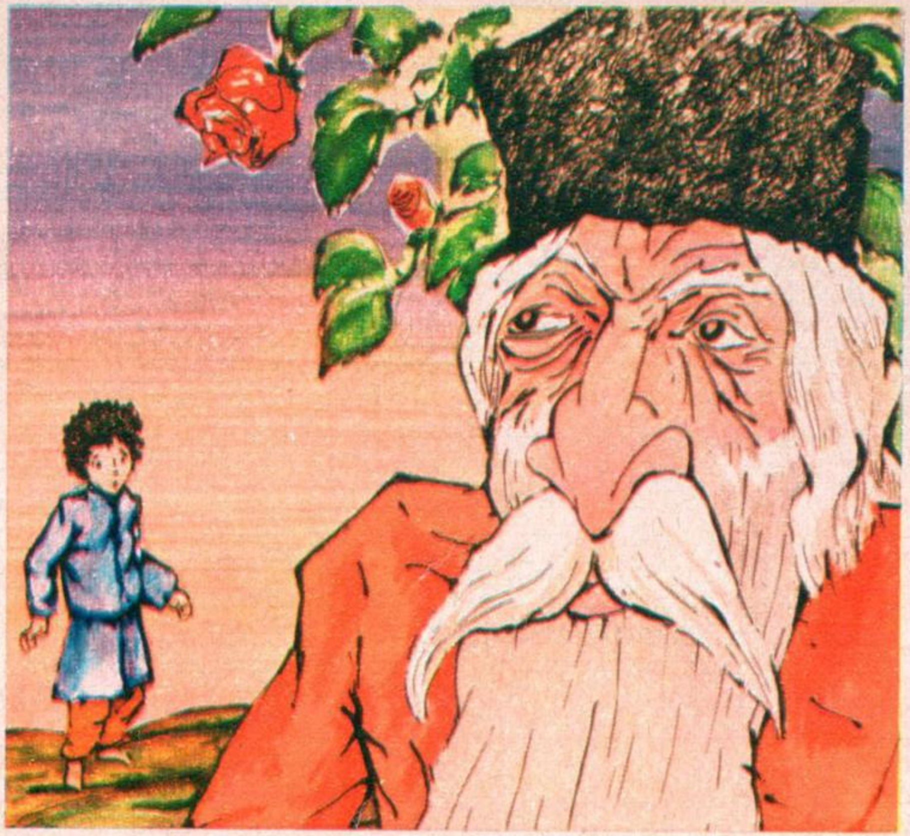

'আর আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে?' জিজ্ঞেস করে কুঁড়ে। 'আমি তো সবকথা বলেই দিয়েছি। এবার যা!' কুঁড়ে খুব খুশি। সে আর কোন প্রশ্ন করল না। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি পথ ধরল।

'তোর গলা থেকে মহামূল্যবান পাথর বার করলেই তুই সেরে উঠবি,' বলল সে মাছকে। 'তা তুমিই আমার গলার পাথরটি বের করে দাও! তাতে আমারও উপকার হবে, তুমিও ধনী হবে!' 'আরে না,' বলে কুঁড়ে, 'খেটে লাভ কী? ধনদৌলত নিজেই আমার কাছে আসবে?' এবং সে চলতে লাগল।

আপেল গাছকে সে বলল রুপোভরা কলসের কথা। আপেল গাছের পাতাগুলো দুলে উঠল। সে কুঁড়েকে বলল, ‘আমার শিকড় থেকে তুমিই কলসটি বের করে ফেল। তাতে তোমারই লাভ — সঙ্গে সঙ্গে রাজা হয়ে যাবে!’ ‘না, আমি খাটতে চাই না। গুণী বলেছে, মেহনত ছাড়াই আমি সবকিছু পাব!’ এবং সে চলতে লাগল আপন পথে।

কুঁড়েকে দেখতে পেল নেকড়ে। অধীর হয়ে ছুটল সে তার দিকে, ‘তা গুণী আমায় কী করতে বলেছে?’ ‘যে-কুঁড়েকে প্রথম দেখবি, তাকেই গিলে খাবি — সঙ্গে সঙ্গেই সেরে উঠবি,’ বলল কুঁড়ে। নেকড়ে কৃতজ্ঞ জানাল এবং জিজ্ঞেস করল, কুঁড়ে পথে কী কী দেখেছে।

কুঁড়ে বলল আপেল গাছ আর মাছের কথা, মহামূল্যবান পাথর আর রূপোভরা কলসের কথা। ‘তবে আমি ওই সব জিনিস বার করি নি। আমি তা ছাড়াই ধনী হতে পারব।’ ‘পৃথিবীতে তোর চেয়ে বেশি বোকা ও কুঁড়ে আর কেউ নেই। দেখছি আমায় কুঁড়ে না খুঁজলেই চলবে!’ এবং সে কুঁড়েকে গিলে নিল।

এই ভাবেই মরল সেই কুঁড়ের বাদশা।

আকাশ থেকে পড়ল তিনটি আপেল: একটি — তাদের জন্য যারা শুনেছে, অন্যটি — তাদের জন্য যারা বলেছে, তৃতীয়টি — বাকি সবার জন্য।

Nachiketa Mahata
যা করার কুইক করতে হবে, মনে থাকে যেন
আরে দোস্ত, পুরোটা আমার উপর ছেড়ে দে, নো চিন্তা
আমি একাই সব সামলে নেব
দেখবি প্ল্যানটা যেন ভেস্তে না যায়, অনেক টাকার খেল,
গুরু, খেল শুরুর পর দেখা যাবে,
দোস্ত, তারপর সোজা বিদেশ চলে যাব, এখানে না থাকাই ভালো,
প্রথমে অপারেশন করেই জঙ্গলে নিয়ে যাবে,
দোস্ত পিচ্চিটা আসছে।

একেবারে ঝ্যাঁক করে চেপে ধরতে হবে।
!?
খোকা দাঁড়িয়ে পড়ো
!
পিকো লোক দুটোকে দেখতে পেয়েছে...
আরে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে, কুইক কিছু একটা করতে হবে।
পিকো বাচ্চাটাকে রক্ষা করতে চাইল....
!!

এ কি রে ল্যাবেন তুই হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?
ভূত... বন্দুকটা তুলতেই কেড়ে নিল, কাউকেই দেখতে পেলুম না, নির্ঘাত ভূত।
হতভাগা ভর দুপুরে ভুতের গপ্পো শোনাতে এসেছিস, পিচ্চিটা পালাল, কেসটা তো ভেস্তে দিলি !!
কি-ক্কি-স্তু...
হতভাগা দুটোকে আটকাতে হবে।
ছুটে পালাই বাবা, ... বাড়ি গিয়ে জানাতে হবে, ...
পাচার-কারীদের খবর পেয়েছি
!?
দোস্ত আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না!!
চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, নড়লেই খুলি উড়ে যাবে।

ব-বন-দুকটা হঠাৎ আমাদের দিকে এল.. কেন রে?
!
এ কি রে ল্যাটকা, লাফাচ্ছিস কেন?
!!
ওরে বাবা আমার হাতটা আবার কে...
বাচ্চাটার কথামতো ধরতেই হবে ওদের
কি হল রে ল্যাটকা, উঠতে পারছি না যে, কে যেন হাত চেপে রেখেছে,
আমারও রে প্যাটকা
ক-ক্ক-কী হবে এখন?!
আরিব্বাস এ দুটো ধরা দেবার জন্য বসে আছে কেন?!
হিঁ-ক! পু-পু...
ক্ক-কী ঘটলো বলতো ল্যাটকা?
বুঝলাম নারে প্যাটকা!!
ব্যাটারা হঠাৎ বসে পড়ল...আর ধরা দিল. ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না..!!
কি বন্ধুরা তোমরা কিছু বুঝলে?
শেষ !!

*জয়ঢাক গল্প প্রতিযোগিতা ২০১৪*
***প্রথম সেরা***

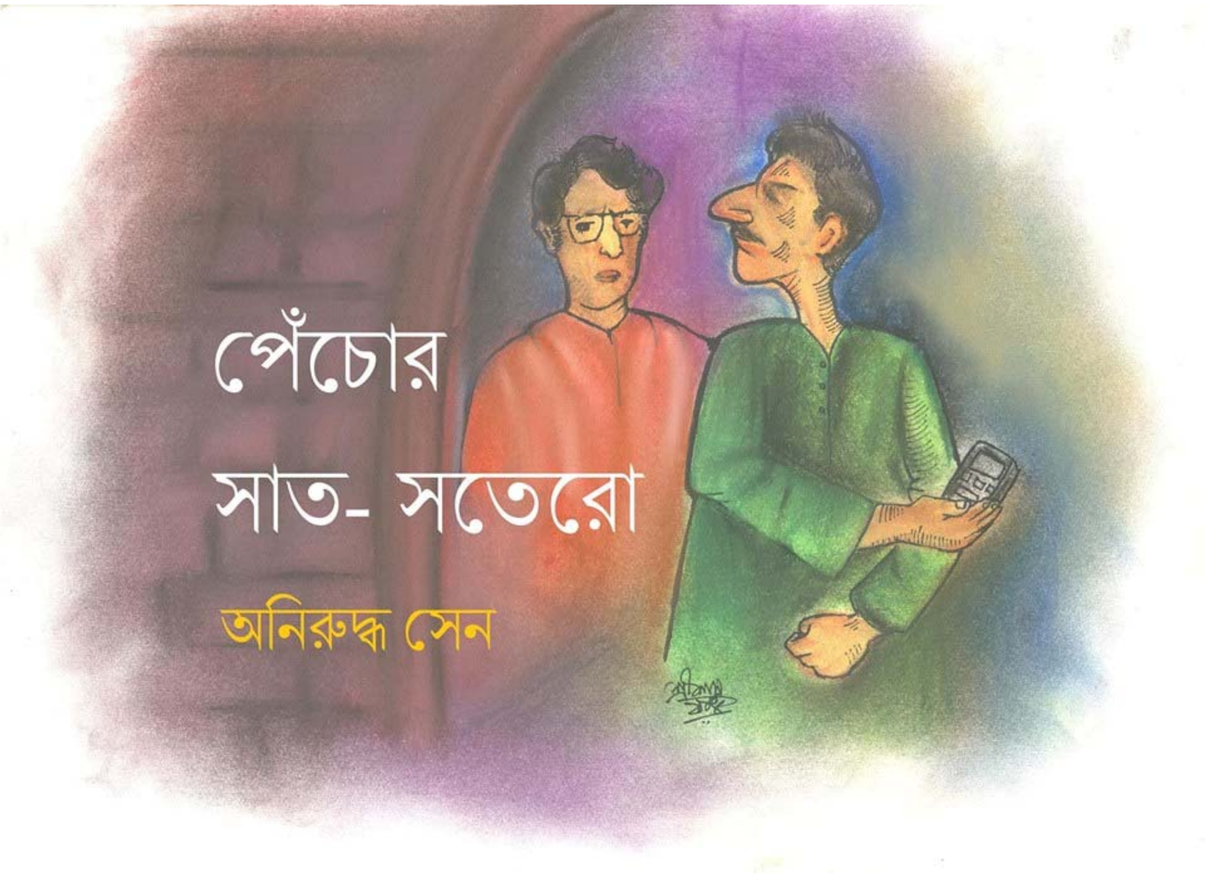


এসো, ডিটেকটিভ পেঁচোর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। সাথে সাথে তার যোগ্য সহকারী, মানে – হেঁহেঁ – এই অধমের সঙ্গেও।

আচ্ছা, ডাকসাইটে গোয়েন্দাদের কীর্তিকলাপ পড়তে পড়তে কি কখনও তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগেনি যে যাঁরা রহস্যভেদে অমন চৌকশ তাঁদের কলম ধরতে অত কীসের অনীহা? কেন তাঁরা লেখালিখির কাজটা বরাবরই সহকারীদের হাতে ছেড়ে দেন? এতে কি মনে এই সন্দেহ হয় না যে সোজাসুজি নিজেদের গুণকীর্তনের লজ্জাটা এড়াতেই তাঁরা খামোকা ঐ কাল্পনিক সহকারীর বকলম সৃষ্টি করেন?

সত্যি বলতে কী, আমিও এযাবৎ তেমনটাই ভাবতাম। কিন্তু কপাল দ্যাখো – শেষ অব্দি আমিই বসলাম পেঁচোর কেচ্ছাকীর্তির বিবরণ লিখতে!

পেঁচো আমার স্কুলবেলার বন্ধু। লিকলিকে শরীর। তার ওপরে বসানো অ্যাত্তো বড়ো একটা মাথা, ঠিক যেন খ্যাংড়াকাঠিতে গাঁথা আলুর দম। আর সরু সরু হাত-পা চার্লি চ্যাপলিনের ঢঙে ছুঁড়তে ছুঁড়তে এমনভাবে পথ চলে যেন কোন পেঁচোয় পাওয়া রোগী ধড়ফড় করছে। এইজন্যেই বোধহয় ওর স্কুলে 'পেঁচো' খেতাবটা জুটে গিয়েছিল। তারপর কলেজ-ইউনিভার্সিটি ছাড়িয়েও নামটা ফেভিকলের মতো গায়ে লেপ্টে রইল। সম্প্রতি ও স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট থেকে ভয়ঙ্কর সব অঙ্ক কষে পি এইচ ডি হয়েছে। আর জ্যোতির্ময় বলে ওর একটা বাহারে নামও রয়েছে। তবু এখনও সবাই চিঠিপত্রে ওকে 'ডক্টর পি চক্রবর্তী'

বলেই সম্বোধন করে। হতাশ হয়ে পেঁচো বলে, "তোরা এভাবে আমার ক্যারিয়ারটারই বারোটা বাজিয়ে দিলি!" হয়তো তাই। পেঁচোর যা জ্ঞানবুদ্ধি, তাতে সম্ভবতঃ ও একদিন অঙ্কের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'ফিল্ড অ্যাওয়ার্ড'- এর জন্যও লড়ে যেতে পারত। কিন্তু ওই নাম নিয়ে?

বুঝতেই পারছো, স্কুলে থাকতে পেঁচো অঙ্ক- টঙ্ক কষে স্যারেদের পোষা ছিল। অমন ছেলেকে ছুতোয়- নাতায় একটু- আধটু রগড়ে দেবার জন্যে কার না হাত নিশপিশ করে! কিন্তু দু- একবার চেষ্টার পর আমরা বুঝে গিয়েছিলাম, এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। ঐ খ্যাংড়াকাঠি একা একটা ব্যাটেলিয়ানের মহড়া নিতে পারে। জুডো- ক্যারাটে- কুংফু কিস্যু নয়। স্রেফ ব্যাঙের মতো হাত- পা ছুঁড়ে, পায়ের ফাঁক গলে, আঁচড়ে- কামড়ে, কাতুকুতু দিয়ে, ঢুঁসিয়ে, ঘাড় বেয়ে উঠে যেন তেন প্রকারেণ প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করাই হচ্ছে ওর নমনীয় রণকৌশল। অমন পান্তোভূতের মতো ফিগারেই বোধহয় এসব জিমন্যাস্টিকস সম্ভব। আমরা স্নেহ করে নাম দিয়েছিলাম – পেঁচোর পাঁচন।

শেষে একদিন শয়তানি করে ইন্টার ক্লাস ফুটবল ম্যাচে পেঁচোর নাম ঢুকিয়ে দিলাম। এদিকের স্ট্রাইকার আনকোরা পেঁচো আর ওদিকের ডিফেন্সে ক্লাস নাইনের 'খুনে' ভূপাল। ভেবেছিলাম বাছাধন এবার জব্দ হবে। কিন্তু কোথায় কী – উলটে দেখি মক্কেল বগের মতো ঠ্যাং ফেলে, কোলাব্যাঙের মতো লাফিয়ে দৃষ্টিকটু ভঙ্গীতে প্রতিপক্ষের ডিফেন্স তছনছ করে চলেছে। লাজলজ্জা ছেড়ে শেষে ভূপাল ওর শিন বোন লক্ষ করে হাঁকড়াল এক রামলাথি। আর তারপর অবাক কাণ্ড – দেখি ভূপালই উল্টে পা চেপে বসে পড়েছে! "ব্যাটার ঠ্যাঙে যেন দধীচীর হাড়, গাঁটে গাঁটে ইন্দ্রের বজ্র!" কাতরোক্তি করতে করতে দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে মাঠ ছাড়ল ছোঁড়া। এরপর আর পেঁচোকে পায় কে! অনায়াসে হ্যাটট্রিক করে জনতার কাঁধে চেপে সে ঘরে ফিরল।

উৎসাহ পেয়ে পেঁচো এরপর প্রায়ই খেলতে আসত। কিন্তু আরও দু- তিনজন চার্জ করতে গিয়ে জখম হবার পর কোন ডিফেণ্ডার আর ওর ধারেকাছে ঘেঁষে না। বেগতিক দেখে ক্যাপ্টেন মহিম শেষে ওকে ঢপ দিল যে অমন ফ্লেক্সিবল শরীর নিয়ে ও একদিন পিটার শিলটন বা ডিনো জফের মতো গোলি হতে পারবে। সরল বিশ্বাসে পেঁচোও পরদিন থেকে গোলে খেলতে শুরু করল।

দু- একদিন যেমন- তেমন, স্রেফ হাত- পা ছুঁড়েই বল আটকাবার চেষ্টা। ধীরে ধীরে কিন্তু গোলেও পেঁচো অজেয় হয়ে দাঁড়াল। কোন প্রথা- প্রকরণ তার ধাতে নেই। কিন্তু বল আঁচড়ে, খামচে, চড়চাপটা মেরে যে করে হোক গোল সে রুখে দেবেই। প্রায়ই বলে, কাদায়, পেঁচোয় মিলে এক কদাকার পিণ্ডের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই পিণ্ডের থেকে বল আলগা করে কার বাবার সাধ্যি!

শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে 'নরেন্দ্র স্মৃতি টুর্নামেন্ট'- এর জন্য স্কুল টিম বাছতে গিয়ে গেম টিচার সুধীরবাবুর মুখে আর বাক্যি সরে না।

"তাহলে গোলে, কী বলে, ঐ প্- প্- পঞ্চুই –" অনেক কষ্টে পেঁচোর নামটা কিছুটা গৌরবান্বিত করার চেষ্টায় তোতলাতে থাকেন ভদ্রলোক।

পেঁচো নিজেই সেদিন আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল। "না না স্যার, তা বলে এক দঙ্গল বাইরের লোকজনের সামনে –" বলে লজ্জায় ঘামতে ঘামতে সরে দাঁড়িয়ে

সেদিন ও সবাইকে এক উটকো অস্বস্তির থেকে রেহাই দিয়েছিল। কিন্তু আজ ভাবি – কে জানে, সেদিন যদি আমরা ওকে জোর করে ধরে রাখতাম তবে তোমরা হয়তো একদিন এশিয়া কাপ ফুটবলের লাইভ টেলিকাস্টিংয়ে ভারতের তেকাঠির নীচে পেঁচোকেই বল আঁচড়াতে দেখতে।

ধান ভানতে শিবের গীত অনেক হল, এবার আসল ব্যাপারে ফিরে আসি। বলা বাহুল্য, ছেলেবেলার সেসব ঈর্ষা- বিবাদ বহুদিন আগেই কেটে গেছে। স্কুলের পর একসাথে কলেজেও পড়ার সূত্রে আমি আর পেঁচো এখন হরিহরাত্মা। এই বন্ধুত্বকে আরো গভীর করে তুলেছে আমাদের দুজনের শখের গোয়েন্দাগিরির প্রতি ঝোঁক। আর স্বাভাবিকভাবেই, বুদ্ধির জাহাজ পেঁচো রহস্য বিশ্লেষণেও 'গুরুদেব' আর আমি তার বিশ্বস্ত চেলা – পেঁচো স্নেহ করে ডাকে 'গবু'।

যদ্দূর মনে পড়ে উত্তরবঙ্গের এক শহরেই আমাদের সত্যিকারের গোয়েন্দাগিরির প্রথম হাতেখড়ি। নিরাপত্তার কারণে শহরটার নাম বলা যাবে না। ওখানে আমি এক দূর সম্পর্কের দিদির আমন্ত্রণে বেড়াতে গিয়েছিলাম। শহর তখনও ছোটোখাটো, ধীরে ধীরে বাড়ছে। কিন্তু সেই বৃদ্ধি মূলত নেপাল আর বাংলাদেশ থেকে চোরাচালানের গুণে। চোর থাকলে পুলিশও থাকবে। এমনকি জামাইবাবুও তাদেরই একজন। তবে তিনি যে অমন উঁচু ডালের লোক তা আগে জানা ছিল না।

প্রথম দিনদুয়েক বেশ কেটেছিল। দিদি আর ভাগ্নে- ভাগ্নীদের সাথে শহর আর আশেপাশের পাহাড়- জঙ্গল দেখে কলকাতার একঘেয়েমির মুখে ভালোই লাগছিল। জরুরি কাজে ব্যস্ত জামাইবাবু তেমন সময় দিতে পারেননি। তবে বাজার করার ব্যাপারে তিনি একটি শিল্পীবিশেষ। তার সাথে দিদির রন্ধনশৈলী মিলে – আঃ, জিভে যেন অমৃতের স্বাদ এনে দিত।

দিব্যি ছিলাম, ছন্দপতন হ'ল তৃতীয় দিন কাকভোরে। ক্যাঁচ করে এক ভগ্নদূত জিপ দরজায় এসে দাঁড়াল, কঁ করে বেল বাজল আর গম্ভীরমুখে ধরাচুড়ো পরে বেরিয়ে গেলেন জামাইবাবু। সারাদিন আমাদের উৎকণ্ঠায় রেখে সন্ধেবেলা আবার ঝোড়ো কাকের মূর্তিতে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

"সরি, একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় –" জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললেন জামাইবাবু।

"বিষয়টা কি খুবই গোপনীয়?" পেঁচো জিজ্ঞেস করল।

কিছুক্ষণ তাকে পর্যবেক্ষণ করার পর জামাইবাবু বললেন, "গোপনীয় তো বটেই। তবে তোমাদের যখন গোয়েন্দাগিরির ন্যাক আছে, নাহয় রেখেঢেকে কিছুটা বলা যাবে। তবে দেখো, এসব যেন পাঁচকান না হয়।

"জানো নিশ্চয়ই, এই শহরটা স্মাগলারে স্মাগলারে ছেয়ে গেছে। তাছাড়াও একটা বিদেশি গুপ্তচর চক্র ইদানীং এখানে সক্রিয় হয়েছে। তাদের মোকাবিলায় সরকার আমাদের একটা বাছাই দলকে এখানে পাঠিয়েছে। খেটেখুটে ওদের অনেক হাঁড়ির খবরই আমরা জোগাড় করেছিলাম। বিশেষ করে আমাদের সবচেয়ে উৎসাহী কর্মী বিমান সরকার দু-একদিনের মধ্যে এক গোপন আড্ডার সন্ধান পাবে বলে আশা করছিল। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে। কাল মাঝরাতে একটা থ্রি- নট- থ্রি বুলেট এসে বিমানের ফুসফুস ফুটো করে দিয়েছে।"

"শেষ?" রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করলাম।

বিষণ্ণ জামাইবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তবে সাথে সাথে নয়। গুলির আওয়াজ আর বিমানের আর্তনাদে পড়শিরা ছুটে এসেছিল। তখনও বিমান জীবিত। লোকজন দেখে সে কী যেন বলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শুধু "মল্লিক, মল্লিক –" বা ওরকম একটা কিছু বলার পর চিরনিদ্রায় লুটিয়ে পড়েছিল। আশেপাশে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে ছিল একরাশ কাগজপত্র। রাত জেগে কীসব যেন জটিল হিসেবপত্র করছিল বিমান।"

"মল্লিক বলে কাউকে চেনেন নাকি?" পেঁচো নড়েচড়ে বসল।

একটু দ্বিধার পর জামাইবাবু বললেন, "আমাদের সুজিত মল্লিক ঐ গলিতেই থাকে। শেষ সময়ে হয়তো কিছু বলার জন্য তাকে খুঁজছিল।"

পেঁচো ভেবেচিন্তে জিজ্ঞেস করল, "খুনী কোন চিহ্ন রেখে গেছে?"

"নাঃ!" জামাইবাবু হতাশ ভঙ্গীতে বললেন, "খোলা জানালা দিয়ে গুলি এসেছিল। বোধহয় বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে থেকেই কেউ টেলিস্কোপিক রাইফেল দিয়ে ফায়ার করেছে। তবে ব্যালিস্টিক রিপোর্ট পেলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।"

"বাড়িটা কদ্দুর? একবার যাওয়া যাবে?"

"দূর বেশি নয়, কয়েকটা গলি ছাড়িয়ে সিক্সটিনথ রোডে। তবে সেখানে তো এখন যেতে পারবে না – পুলিশি নিষেধ আছে।"

পেঁচো একটু মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বলল, "যেতে পারলে হয়তো দু- একটা ক্লু খুঁজে বের করা যেত। যাক, অন্য কোন সাহায্যের দরকার হলে বলবেন।"

ওর পিঠ চাপড়ে জামাইবাবু বললেন, "দ্যাখো, গল্পের পুলিশদের মতো অতটা হাবাগোবা আমরা নই। আর বিমান চলে গিয়েও একেবারে হীনবল হইনি। তবে চাও তো একটা ছোট্ট উপকার করতে পারো। অবশ্য যদি নজর রাখার কাজে তোমাদের আপত্তি না থাকে। একটা লোক, মুখটা প্রায় হরতনের সাহেবের মতো চৌকো। গোঁফ সাধারণত রাখে না। হাইট ছ'ফুটের কাছাকাছি, রঙ মাঝারি ফর্সা। এসবই খুব সাদামাটা বর্ণনা, ছদ্মবেশে হেরফের করা যায়। তবে ওর কানটা একটু অদ্ভুত, গোল না হয়ে চৌকো ধাঁচের। এটা সহজেই নজরে পড়ে। রাস্তাঘাটে কখনও যদি দ্যাখো –"

"লোকটা কে?" পেঁচো জিজ্ঞেস করল।

"ওদের 'কুরিয়ার', যোগাযোগ রাখার লোক। ওকে চিনে ফেলার পরও আমরা ধরছি না, পেছু নিয়ে যদি অন্যদেরও হদিশ পাই সেই আশায়। তবে লোকটাও সেয়ানা, আমাদের 'ওয়াচ'দের চিনে ফেলেছে। সময় বুঝে তাই সরে পড়ে। তোমাদের ও চেনে না, চোখে পড়লে গতিবিধি লক্ষ করতে পারো। তবে স্রেফ দেখে যাবে আর পরে এসে জানাবে। পাবলিক বুথ থেকে ফোন করার চেষ্টা কোরো না, কে শুনে ফেলবে। আর খবরদার – নিজেরা চালাকি করে কিছু করতে যেও না, বিপদে পড়বে। মনে রেখ, ওরা পেশাদার খুনি।"

এ গপ্পো যখনকার, তখন পকেটে- পকেটে অমন মোবাইল ঘুরত না।

এরপর জামাইবাবু লোকটার দূর থেকে তোলা একটা ফটো দেখালেন। নানা মেক- আপে তাকে কেমন দেখতে হতে পারে, এমন কয়েকটি ছবিও আর্টিস্টকে দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে। সব মিলিয়ে বেশ একটা উত্তেজনার ভাব এসে গেল। তবে পেঁচো চুপিচুপি বলল,

“কোন ফল হবার আশা কম। অ্যাদ্দিনে বোধহয় গোটা শহরই আমাদের মোহন দাশগুপ্তের শালা বলে জেনে গেছে।”

পরদিন সকালে অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম। সবচেয়ে জমজমাট এলাকা নতুন বাজার, সেদিকেই প্রথম হানা দিলাম।

সূচনাটা অবিশ্যি সুবিধের হ’ল না। প্রথমেই একতাল গোবরের ওপর চার হাত- পা তুলে আছাড় খেল পেঁচো। তাই দেখে পাশের তেলেভাজাওয়ালা নিতাইয়ের সে কী ভুঁড়ি দুলিয়ে খ্যাঁকশেয়ালের মতো হাসি! পেঁচো মর্মাহত হয়ে বিড়বিড় করে, “হাসো – তোমাদের তো আর লেখাপড়া, চাকরি- বাকরি, পুলিশ, স্মাগলার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না!” ওকে আবার কিছুটা ভদ্রস্থ করে তুলতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়।

এবার আমরা দূরপাল্লার বাস টার্মিনাসের দিকে এগোলাম। হঠাৎ আমার চোখ ট্যারা হয়ে গেল। দেখি, ঠিক চৌকোমাথা ছ’ফুট লম্বা একটা লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। মাথায় মাফলার পেঁচিয়ে রেখেছে বলে কানটা ঠিক দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই মোলায়েম আবহাওয়ায় মাফলার জড়ানটাই কি সন্দেহজনক নয়? লোকটার হাতে একটা সাধারণ ফোলিও ব্যাগ। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পায়চারি করছে। এমন সময় একই রকমের ব্যাগ হাতে এক হিন্দুস্থানি সেখান দিয়ে যেতে যেতে লোকটার গায়ে ধাক্কা খেল। ধাক্কার চোটে দু’জনের হাতের ব্যাগই মাটিতে পড়ে গেল। চৌকোমাথা রেগে গাল দিয়ে উঠল, নীচু হয়ে ব্যাগটা তুলে নিল। কিন্তু আমার নজর এড়ায়নি – এই ফাঁকে ব্যাগদুটো বদল হয়ে গেল!

জলের মতো স্পষ্ট কেস! স্পাই, স্মাগলাররা যে এভাবে জিনিস হাতবদল করে তা তো কত গল্পে পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি। কিন্তু হতচ্ছাড়া পেঁচোর কি সেদিকে নজর আছে! সে ন্যালাক্যাবলার মতো কখনও শো কেসের পুতুল, কখনও রাস্তার পাশের গাছপালা, আবার কখনও বা বিস্কুটের বয়ামের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। আমার গোটাকতক কনুয়ের গুঁতো বেকার যায়। শেষ অবধি ও একমনে মিষ্টির দোকানে গরম জিলিপি ভাজা দেখতে থাকে।

ওর হ্যাংলামো দেখে গা জ্বলে গেল। বলেই ফেললাম, “কী হাভাতের মতো চেয়ে আছিস, ওদিকে ঐ বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে –”

“আরে চুপ, চুপ, কে শুনে ফেলবে!” পেঁচো ত্রস্ত হয়ে আমায় থামিয়ে দিয়ে বলল, “দেখেছিস তাহলে! কিন্তু তালেগোলে এক থার্ড পার্টি যে পাচার হওয়া ব্যাগটা ব্লেড মেরে ফাঁক করে দিব্যি সরে পড়ল, তা বোধহয় তোর চোখে পড়েনি। ঐ যে গুঁফোটা, দোকানে বসে প্রেমসে জিলিপি খাচ্ছে।”

বুঝুন! এই পেঁচোর কাছে কিনা ঘ্যাম দেখাতে গিয়েছিলাম! লজ্জায় আর ওর মুখের দিকে চাইতে পারি না। ইতিমধ্যে গুঁফো পকেটমারটার খাওয়া হয়েছে। পয়সা চুকিয়ে, ঢেঁকুর তুলে ধীরেসুস্থে সে বেরিয়ে এল। একটা নিরালা জায়গা বেছে পেঁচো তার মুখোমুখি হ’ল।

“তারপর দাদা, কাকাবাবুর ব্যাগটা ফাঁক করে কি কাজটা ভালো করলেন?”

গুঁফো চমকে উঠল। পেঁচো গম্ভীরমুখে বলে চলল, “দেখলাম, শুধু পাঁচজনের সামনে লজ্জা পাবেন ভেবে তখন কিছু বললাম না। চুরি বিদ্যা বড়োবিদ্যা – তবে কিনা, যদি ধরা না

পড়ে! যাক, জানাজানি হবার আগে এখনও বোধহয় একটা রফা করতে পারেন। যা হাতালেন তার থেকে টাকাকড়িগুলো নয় আপনিই রাখুন – কিন্তু অন্য জিনিসগুলো আমার চাই!”

লোকটা এতক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে পেঁচোর জ্ঞান শুনছিল। হঠাৎ সে পকেট থেকে একটা পেটমোটা ওয়ালেট বের করে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর পেঁচোর কাছে এসে হিসহিসিয়ে বলল “পাকা ছেলে!” আর গোদা গোদা হাতে আচ্ছাসে ওর কান মলে দিয়ে গটমটিয়ে চলে গেল।

গুঁফোর পেছনে ছুটতে যাচ্ছিলাম, পেঁচো বাধা দিল। একটু করুণস্বরে বলল, “ছেড়ে দে, এও নয় একরকম রফাই হল! আমারও থাকল, ওরও। চল এখন বাড়ি গিয়ে দেখি, ব্যাগে কী আছে।”

ভাবছিলাম, যদি কোন গোপন চিঠি- ফিঠি পাওয়া যায়। কিন্তু সে গুড়ে বালি! কিছু খুচরো টাকাপয়সা, দু- একটা পুরোনো বাস টিকিট, খানিক তামাকের গুঁড়ো। ওয়ালেটের বাকি জায়গা জুড়ে রয়েছে একটা ‘কিউট’ বিদেশি ক্যালকুলেটর।

“তাহলে বলতে চাস, এই ক্যালকুলেটরটা হাতবদল করার জন্যেই এত কাণ্ড!” একটু হতাশ হয়ে বলল পেঁচো।

বললাম, “নাও হতে পারে। হয়তো আসলি চিজ ফোলিওর কোনো ভাঁজে রয়ে গেছে।”

“হবে।” দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেঁচো ক্যালকুলেটরটা তুলে নিল। ধীরে ধীরে তার মুখের রেখাগুলি নরম হয়ে এল। বলল, “দারুণ তো!”

আমি ঝুঁকে পড়লাম। দেখি, একটা ঝিনচাক সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর। সারি সারি ফাংশন- কি, তার অর্ধেকও আমার জানা নয়। ইতিমধ্যে পেঁচো ক্যালকুলেটরটা ‘অন’ করে দিয়েছে। এল- সি- ডি ডিসপ্লেতে কালো অক্ষরের মালায় ফুটে উঠেছে এক সারি সংখ্যা। সেদিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম, এই ক্যালকুলেটরটা বারো অঙ্কের সংখ্যা অবধি হিসেব- নিকেশ করতে পারে। ভালো করে দেখে বললাম “একটু অদ্ভুত জিনিস, বাজারে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।”

পেঁচোও মন দিয়ে যন্ত্রটা দেখছে। শেষে বলল, “তবে তার চেয়েও অদ্ভুত কী জানিস – ডিসপ্লের ঐ সংখ্যাটা।”

ওর কথা শুনে ডিসপ্লের সংখ্যাটা পড়ে ফেললাম – ৩৮৩৮৯১৫৫৯৩৫৩। একটু ভেবে বললাম, “হ্যাঁ, সুইচ অন করলে ডিসপ্লেতে জিরো আসা উচিত।”

“সে কোন কোন ক্যালকুলেটরে আসে না, তখন যাহোক একটা কিছু সংখ্যা, মানে ‘র‍্যানডম নাম্বার’ ফুটে ওঠে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এই র‍্যানডম নাম্বারটার আমি কোন সহজ উৎপাদক, মানে ফ্যাক্টর পাচ্ছি না! দুই, তিন, পাঁচ, সাত, এগারো, তেরো – কোনটা দিয়েই ভাগ যাচ্ছে না।”

কাম সারছে! ‘নাম্বার থিওরি’ হচ্ছে অঙ্ক গুলে খাওয়া পেঁচোর প্রিয় বিষয় ও বাতিক। একবার মনোমত একটা সংখ্যা পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার পিণ্ডি চটকে তবে ছাড়বে। ভয়ে ভয়ে বললাম, “ছাড় না – না হয় না- ই পেলি ফ্যাক্টর। সংখ্যাটা তো মৌলিকও হতে পারে।”

“বললেই তো হবে না যাদু, প্রমাণ করো। আর বারো অঙ্কের একটা র‍্যানডম নাম্বার – সেটা হঠাৎ মৌলিক হলে ব্যাপারটা কি অস্বাভাবিক নয়?” পেঁচো রহস্যময় হাসি হেসে বলল।

হ'ল – এবার মাথায় উঠল নাওয়া- খাওয়া, গোয়েন্দাগিরি। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে বললাম, "ঠিক আছে, পরে দেখিস 'খন। এখন হাতে কত কাজ –"

"এই পাঁচ মিনিট।" লাজুক হেসে বলল পেঁচো, তারপর কাগজ- পেন্সিল নিয়ে বসে পড়ল। স্পাই- ফাই চুলোয় গেল। চারপাশে জড়ো হতে লাগল যোগ- বিয়োগ- গুণ- ভাগে ভরা খণ্ড কাগজের স্তূপ।

সন্ধেবেলা জামাইবাবু ফিরলে তাঁকে আমাদের অভিযানের বৃত্তান্ত জানালাম। শুনতে শুনতে তিনি উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠলেন। বললেন, "ইস, বোধহয় একটুর জন্য পিছলে গেল! আমরা জানতে পেরেছি যে এই শহরে খুব শিগগিরই ঐ গুপ্তচরদের একটা 'টপ লেভেল' মিটিং হতে চলেছে। যদি কুরিয়ারের ব্যাগে সে ব্যাপারে কোন হদিস মিলত –"

"আর একবার চেষ্টা করে দেখলে হ'ত।" একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম, "কিন্তু এদিকে তিনি তো আবার এক জম্পেশ অঙ্কের ধাঁধা নিয়ে বসে পড়েছেন।"

"তাই নাকি!" কৌতুহলী জামাইবাবু এবার পেঁচোর কাছে গিয়ে বললেন, "তারপর মিঃ শার্লক – ব্যাপারটা বেশ হাই- ফাই মনে হচ্ছে?"

"ন্- না, তেমন কিছু নয়।" পেঁচো আমতা আমতা করে বলল, "স্রেফ একটা সংখ্যাকে ফ্যাক্টর করার চেষ্টা করছিলাম। আর মানে, একবার রোখ চেপে গেলে –"

"ফ্যাক্টর – এতক্ষণ ধরে?"

চিন্তিত পেঁচো বলল, "সেটাই তো ঝামেলা – কিছুতেই হচ্ছে না! সংখ্যাটা অবশ্য বড়ো, আর বড্ড বেয়াড়া!"

মৃদু হেসে জামাইবাবু বললেন, "তোমায় দেখে আমার হঠাৎ বিমানের কথা মনে পড়ছে। শেষ সময়ে সেও এরকম –"

আচমকা তিনি থেমে গেলেন। ঘরে হঠাৎ কেমন থমথমে আবহাওয়া, কারও মুখে কথা নেই, শুধু আমি আড়চোখে পাশের খোলা জানালাটার দিকে তাকাচ্ছি। শেষে জামাইবাবু একটু লজ্জিত স্বরে বললেন, "দুর ছাই, কথাটা কীভাবে বললাম! কাজের চাপে মাথারই ঠিক নেই।"

"মোহনদা!" লক্ষ করিনি পেঁচো কখন উঠে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজনায় তার গোঁফের রোঁয়াগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে। ফিসফিসিয়ে বলল, "সেদিন কি বিমানদার কাগজপত্তরের মধ্যে এমন একটা ক্যালকুলেটর পাওয়া গিয়েছিল?"

যন্ত্রটা ভালো করে দেখে জামাইবাবু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। কেন হে?"

"কে জানে, তাহলে হয়তো আমার এই অঙ্কের খেলাটা শুধু খেলাই নয়।" পেঁচো স্বগতোক্তির মতো করে বলে তারপর আবার গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেল।

আমি ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম কী বলা যায়। জামাইবাবুর মুখে ইতিমধ্যে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। বললেন, "থাক, ওকে এখন বিরক্ত কোরো না।"

সেদিন অনেক রাত অবধি পেঁচো আঁকজোক কষে গেল। আলো নিভিয়ে শোবার পর শুনি সে বিড়বিড় ক'রে আওড়াচ্ছে বিমান সরকারের সেই শেষ উক্তি, "মল্লিক, মল্লিক –"

পেঁচোর ধ্যান ভাঙল পরদিন সকাল আটটা নাগাদ। জামাইবাবু তখন বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। হঠাৎ খাতা- পেন্সিল ছেড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পেঁচো বলল, “পাঁচ মিনিট সময় হবে, মোহনদা?”

আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জামাইবাবু সস্নেহে বললেন, “সমাধানটা পেয়ে গেলে বুঝি?”

“সমাধান নয়, সমাধানের পদ্ধতিটা।” উত্তেজিত পেঁচো বলল, “কী বোকা আমি, এতক্ষণ মাথায় আসেনি। আচ্ছা, ধারেকাছে কোন ডেটা প্রসেসিং সেন্টার হবে?’

মনে করিয়ে দিচ্ছি – এ গল্প যখনকার, তখন ঘরে ঘরে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ আর মোড়ে মোড়ে সাইবার কাফে ছিল না। কোন মফস্বল শহরে তো সে প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং কম্পিউটার ব্যবহার করতে হলে পাবলিকের পক্ষে একমাত্র ভরসা ঐ ডেটা প্রসেসিং সেন্টার।

জামাইবাবু তাই একটু ভেবে বললেন, “এহ্, যদি কাল রাতেও বলতে! বিমানের পর আমাদের টিমে কম্পিউটার এক্সপার্ট হচ্ছে সুজিত মল্লিক। সে- ই তোমার কী দরকার, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু ও আজ একটু শহরের বাইরে গেছে। তবে নতুন বাজারের কাছে ‘জয় মা তারা ই- ডি- পি সেন্টার’ আছে, চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু কেসটা কী, বল তো? তোমার ঐ ফ্যাক্টরটা করতে কম্পিউটার লাগবে নাকি?”

“এগজ্যাকটলি! আমার এক দিনের গাধা খাটনির বেশি কাজ কম্পিউটার কয়েক মিনিটে নামিয়ে দেবে। একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম লাগবে, সে আমি নিজেই লিখে নেব। কিন্তু স্পাইদের ক্যালকুলেটরে এমন একটা সংখ্যা, যা ফ্যাক্টর করতে কম্পিউটার লাগে – মোহনদা, দাল মে জরুর কুছ কালা হ্যায়!”

“বেস্ট অফ লাক! তবে দেরি করতে পারছি না, জরুরি মিটিং আছে। এসে দেখব’খন”, বলে মোহনদা বেরিয়ে গেলেন।

‘জয় মা তারা’র ম্যানেজার অবশ্য বেশ একটু বেগ দিলেন। বললেন, “সরি, আমাদের এমন কোন ব্যবস্থা নেই। স্রেফ একটা প্রোগ্রাম রান করানোর জন্য আমরা কম্পিউটার ভাড়া দিই না। আপনাকে হাজার টাকা ডিপোজিট আর একমাসের ডিস্ক স্পেসের অ্যাডভান্স পাঁচশো দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। তারপর প্রাণ ভরে প্রোগ্রাম চালান না কেন!”

“বুঝলাম স্যার, তবে সব তো আপনারই হাতে। এই, বেড়াতে এসে একটা উটকো সমস্যায় ফেঁসে গেছি। যদি একটু মেহেরবানি করেন –” পেঁচো হাত কচলায়।

ম্যানেজার কী যেন ভেবে তারপর বলেন, “আপনার কোবল প্রোগ্রামিং আসে?’

“গুলে খেয়েছি মশাই। চান তো শিখিয়েও দিতে পারি”, বিপদে পড়ে পেঁচো একটু বাড়াবাড়ি হম্বিতম্বি শুরু করল।

ম্যানেজার চোখ পিটপিট করে বললেন, “ভেতরে আসুন। আমাদের প্রোগ্রামারের আজ সকাল থেকে দশবার দাস্ত হয়েছে। অথচ কতগুলো খুচরো কাজ পড়ে আছে। দেখুন, যদি চটপট সেরে ফেলতে পারেন তো আপনাকে একটা ফ্রি গেস্ট অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া যাবে।”

ব্যাজার মুখে পেঁচো ভেতরে গেল। ম্যানেজারের ‘খুচরো’ কাজ সারা হতে হতে অবিশ্যি বিকেল গড়াল। তারপর গলদঘর্ম পেঁচো চটজলদি একটা প্রোগ্রাম লিখে কম্পিউটারে চাপাল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কম্পিউটার রেজাল্ট দিল। গর্বিত মোরগের ভঙ্গীতে পেঁচো একটা

প্রিন্ট- আউট নিয়ে বেরিয়ে এল – ঝকঝকে অক্ষরে টাইপ করা দুটি সংখ্যা ৫৩৬২৬৭ আর ৭১৫৮৫৯।

"অর্থাৎ ৫৩৬২৬৭ ইন্টু ৭১৫৮৫৯ হচ্ছে ঐ বিখ্যাত সংখ্যা ৩৮৩৮৯১৫৫৮৩৫৩। অমন ছ'অঙ্কের দুটো কেঁদো কেঁদো মৌলিক ফ্যাক্টর কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়া হাতে কষে বের করা কি চাট্টিখানি কথা!" নিঃশ্বাস ফেলে বলল পেঁচো।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "সে নয় হ'ল – কিন্তু অত করে ফল হ'ল কোন কাঁচকলা?"

পেঁচো গম্ভীরমুখে বলল, "সে দেখা যাবে 'খন। এখন বাড়ি তো চল।"

বাড়ি ফিরে পেঁচোর আর তর সইছে না। ধাঁ করে ড্রয়ার থেকে ক্যালকুলেটরটা বের করে 'অন' করল।

"দাঁড়া, গুণটা আগে মিলিয়ে নিই", বলে খটাখট ক্যালকুলেটরে ৫৩৬২৬৭, তারপর গুণচিহ্ন, তারপর ৭১৫৮৫৯ টিপল পেঁচো। তারপর যেই না 'ইকোয়াল টু' চাবি টিপেছে, অমনি এক অবাক কাণ্ড। টুং টুং করে কতগুলো ঘণ্টা বেজে উঠল যন্ত্রটার ভেতর থেকে। আর গুণফলের বদলে ডিসপ্লেতে ফুটে উঠল একসারি ইংরেজি অক্ষর। ধীরে ধীরে ডান থেকে বাঁয়ে সরে, অর্থাৎ 'স্ক্রল' করে দেখা দিল চক্ষু চড়কগাছ করা এক বার্তা। বাংলা করলে তা দাঁড়ায়, "গোলবাড়ি বাসস্টপ থেকে পশ্চিমে গুনতে গুনতে এগিয়ে যাও। বাঁদিকের সাত নম্বর গলির তেতলা বাড়িতে ১৫ই অক্টোবর বিকেল ছ'টায় জরুরি মিটিং।"

"এ সেই স্পাইদের মিটিংটা নাকি?" চোখ বড়োবড়ো করে বললাম।

“তাছাড়া আবার কী! উঃ, খবর পাঠাবার কী অভিনব কৌশল!” পেঁচো যেন উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠেছে।

অসহায় মুখ করে বললাম, “ঢুকল না, একটু গুছিয়ে বুঝিয়ে দিবি?”

পেঁচো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “পরে গবুচন্দ্র, পরে! এবার ক্যালেন্ডারে দ্যাখ, আজ পনেরো তারিখ। আর ঘড়িতে দ্যাখ –”

“ছ’টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি!” বলেই আমিও তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। তারপর হুড়মুড়িয়ে দু’জন রাস্তায় নেমে এলাম।

“দেরি হয়ে গেলে চিড়িয়া উড়ে যাবে।” পেঁচো ছটফট করতে করতে বলল, “এক কাজ করা যাক। আমাদের মধ্যে একজন গিয়ে ঐ বাড়িটার ওপর নজর রাখি, আরেকজন মোহনদাদের খবর দিয়ে ফোর্স ডেকে আনি। ফোনে- টোনে চলবে না – কে ঘরশত্রু বিভীষণ আছে কে জানে! নিজে যেতে হবে।”

“তবে তুই- ই যা, গুছিয়ে সব বলতে পারবি। পট করে একটা রিকশা ধরে নে। আমি ততক্ষণে ধীরেসুস্থে ঐ তেতলা বাড়িটার সন্ধানে এগোই। হাঁটাপথেই পড়বে নিশ্চয়ই। কদ্দুর আর – ঐ তো গোলবাড়ি বাসস্টপ। ওখান থেকে গুণে গুণে সাতটা গলি পেরোলেই –”

“গোনারই বা দরকার কী!” পেঁচো মুচকি হেসে বলল, “এই শহরে গলির নম্বর সব পরপর। ঐ দ্যাখ নাইনথ রোড। তার সাথে সাত যোগ করলেই –”

বুঝেছি – সিক্সটিনথ রোড। আমি মনে মনে আরও একবার পেঁচোর অঙ্কের মাথার তারিফ করে হনহনিয়ে হাঁটা দিলাম। পেছন থেকে শুনি ও উদ্বিগ্ন জ্যাঠামশাইয়ের ভঙ্গীতে বলছে, “সাবধানে যাস। বাড়িটার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে আলগোছে পায়চারি করে বেড়াস।” তারপরই দেখি রিকশা- টিকশার পরোয়া না করে নিজের পা- গাড়িকে টপ গিয়ারে তুলে মিলখা সিংয়ের মতো উড়তে শুরু করেছে।

সিক্সটিনথ রোডে পৌঁছোতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগে না। ছোট্ট রাস্তা, একটাই তেতলা বাড়ি, সেদিকেই জোরকদমে এগিয়ে চলি। কাছাকাছি এলে নেমপ্লেটের নামটা চোখে পড়ে – ‘এস মল্লিক।’ হঠাৎ আমার হৃৎস্পন্দন যেন এক লহমার জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

এস মল্লিক – মানে জামাইবাবুদের কম্পিউটার এক্সপার্ট সুজিত মল্লিক না? তাঁর বাড়িতে গুপ্তচরদের মিটিং – কিছু ভুল করছি নাকি? তারপর আমার মনে পড়ল – এই সিক্সটিনথ রোডেই খুন হয়েছেন বিমান সরকার, গুলি এসেছে আশেপাশের কোন বাড়ি থেকে। এবার মনে পড়ল নিহতের অন্তিম উক্তি – মল্লিক, মল্লিক! হঠাৎ যেন সব খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। ঐ অভিনব ক্যালকুলেটরের পেছনের ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রেনটিকে যেন এবার চিনতে পারছি।

হায় রে, শেষে সর্ষের মধ্যেই ভূত! কে জানে জামাইবাবুর অফিসে গিয়ে পেঁচো এবার কার খপ্পরে পড়বে! আমার হাতপায়ের বল যেন চলে গেল। একটু চিন্তা করবার জন্য উল্টোদিকের একটা পানবিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে একটা মিঠে পানের অর্ডার দিলাম।

এমন সময় দেখি, উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে হনহনিয়ে চলেছে এক হিন্দুস্থানি। হুম, এর সাথেই না সেদিন চৌকো- কান ফোলিও বদল করল? তাহলে নিশ্চয়ই মিটিংয়ে এসেছে। কিন্তু ও মল্লিক- বাড়িতে তো ঢুকল না? তবে কি অন্য কোন কাজে এসেছে? এখন আমি

কোনদিকে নজর রাখি? একটু ভেবে ঠিক করলাম – এ বাড়িটা যখন আমাদের চেনাই হয়ে গেছে, তখন এখানে পড়ে না থেকে বরং মহাপ্রভুর পিছু নিয়ে দেখি আর কোন ঠেক বের করতে পারি কিনা। সুতরাং মুখে যথাসাধ্য নির্লিপ্তির ভাব ফুটিয়ে হিন্দুস্থানির দিকে আড়চোখে চেয়ে পান চিবুতে চিবুতে হাঁটা দিলাম।

ইতিউতি চাইছে লোকটা, ইচ্ছে করেই এঁকেবেঁকে চলেছে। কখনও দু'বাড়ির ফাঁক দিয়ে, কখনও পাঁচিলের ফোকর গলে শেষ অবধি সে পাশের রাস্তার একটা তেতলা বাড়ির পেছনে হাজির হ'ল। তারপর অক্লেশে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ল। বাড়িতে কেউ থাকে বলে মনে হয় না। এরা বোধহয় সেই সুযোগে ভেতরে ঢুকে নরক গুলজার করছে।

সে যাক, এখন করি কী? এগোই, না ফিরে যাই? শেষ অবধি কৌতুহলই জয়ী হলো। অতিকষ্টে হাঁচড়ে- পাঁচড়ে পাঁচিল ডিঙোলাম। সাথে সাথে সেই হিন্দুস্থানি "কোলে আয়, সোনার চাঁদ" বলে আমাকে জাপটে ধরল। দেখতে না দেখতে আরও গণ্ডাখানেক ষণ্ডা কোত্থেকে এসে চড়াও হ'ল। চ্যাঁচানোরও ফুরসত না দিয়ে তারা পাঁজাকোলা করে আমাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে ফেলল।

"ছুঁচোটা অনেকক্ষণ ধরে আমার পেছু নিয়েছিল।" বিজয়গর্বে আমাকে সভাস্থলে পেশ করে বলল হিন্দুস্থানি।

এতক্ষণে আমি সামনে তাকানোর সুযোগ পেলাম। এক মস্ত হলঘর। মিটমিটে আলো জ্বলছে। একটা বড়ো টেবিল ঘিরে বসে গোটা দশেক ভীষণদর্শন জোয়ান। তাদের মধ্যমণি এক জমকালো মুখোশধারী।

তাহলে কি এই ওদের টপ- লেভেল মিটিং? এমন তো কথা ছিল না। বাড়িটা তেতলাই বটে, তবে রাস্তাটা তো সিক্সটিনথ রোড নয়!

"মোহন খোঁচড়ের শালা না তুমি?" আমার দিকে ফিরে বলল মুখোশধারী।

পিঠে দুটো ঠাণ্ডা নল ঠেকানো, তাই ব্যঙ্গোক্তিটা হজম করে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম।

"জানেন বস, এই মক্কেলই কাল একটা খেঁকুড়ে- মার্কা ছোকরার সাথে বাসস্ট্যাণ্ডে ঘুরঘুর করছিল। মনে হয় এরাই আমার ব্যাগ ফাঁক করেছে।" হিন্দুস্থানি বলল।

"ছিঃ, ভদ্রলোকের ছেলে!" বস এক লহমায় আমাকে মেপে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের ক্যালকুলেটরটা তাহলে তোমরাই গেঁড়িয়েছ?"

থতমত খেয়ে বলে ফেলি, "ইয়ে, ঠিক তা নয় – মানে, ঐ গাঁটকাটার কাছ থেকে –"

মুখোশধারীকে চিন্তিত দেখায়। বলে, "রাজেন, মিচকেটা আমাদের গোপন সঙ্কেত উদ্ধার করেই এখানে এসে হাজির হয়নি তো?"

রাজেন অর্থাৎ হিন্দুস্থানি বলল, "না না, ঘটে অত বুদ্ধি থাকলে সোজাই এখানে আসত। এ ছোঁড়া তো সিক্সটিনথ রোডে দাঁড়িয়েছিল। দৈবাৎ আমায় দেখে পেছন পেছন এসে পড়েছে।"

"তাই নাকি?" বস হঠাৎ নিরীহ ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করল, "বল তো খোকা, নাইনথ রোডের সাতটা গলি পরে কোন রাস্তা?"

"কেন, সিক্সটিনথ রোড।" আমি বিনা দ্বিধায় বলে দিলাম। আর আচমকা সারা শরীর কাঁপিয়ে হাহা করে হেসে উঠল মুখোশধারী। সঙ্গে সঙ্গে আরো ডজনখানেক দানো হিহি, হোহো, হুহুতে ঘর কাঁপিয়ে তুলল।

"অমন খাটাশের মতো হাসার কী হল? ঠিকই তো বলেছি।" ভুরু কুঁচকে বললাম। আর মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম – অমন ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসতে যেন কোথায়, কাকে দেখেছি?

বস আমার পিঠে হাত রেখে মিষ্টি হেসে বলল, "না বাছা, একটা ছোট্ট ভুল করে বসেছ। ক্যালকুলেটরের কোড-ফোড ভাঙা অবধি সব ঠিকই ছিল। কিন্তু তারপর তাড়াহুড়োয় তোমরা বোধহয় খেয়াল করোনি যে তেরো সংখ্যাটা অপয়া দেখে এ শহরে কোন তেরো নম্বর রাস্তা নেই। সুতরাং নাইনথ রোডের সাতটা গলি পর সিক্সটিনথ নয়, সেভেনটিনথ রোড। ভালো ভালো, এই ভুলটার জন্যে তাহলে তুমি পাশের রাস্তায় আড়ি পেতেছিলে আর পুলিশকেও আশা করি ওখানে যেতে বলে এসেছ।"

ওরে সর্বনাশ – কেলোটা তবে এই! হঠাৎ বেজায় রাগ ধরে পেঁচোর ওপর। ওর পেঁচোমির জন্যেই কূলে এসে তরী ডুবল। কী দরকার ছিল ওই নয় আর সাত যোগের শর্টকাট করার! সাতটা গলি কি আর গুণে গুণে আসা যেত না! এখন ও নিজেও নিশ্চয়ই পুলিশ নিয়ে পাশের গলিতে সুজিতবাবুর বাড়ি হাজির হবে। ওদিকে ভদ্রলোক অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়বেন আর এদিকে এই দুর্বৃত্তের দল পিছলে বেরিয়ে যাবে। এদের হাতে পড়ে আমারই বা কী দশা হবে কে জানে!

ভাবছি, এমন সময় মুখোশধারী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বন্ধুগণ, বুঝতে পারছো কেস কেরোসিন। শুধু এই ছোঁড়ার সামান্য ওপর- চালাকির জন্য হাতে এখনও বালা পরতে বাকি আছে। তবে এবার মানে মানে মিটিং মুলতুবি রেখে কেটে পড়াই ভালো। অবশ্য যাবার আগে একটা জরুরি কাজ সারতে হবে। এই শালাবাবু আমাদের সম্বন্ধে বড্ড বেশি জেনে ফেলেছে, এর একটু ওষুধ- পথ্যির ব্যবস্থা করতে হবে। ওর স্যাঙাতটার প্রেসক্রিপশন নয় কাল লেখা যাবে।"

বলিষ্ঠ হাতে আমার দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে বস বলল, "আগুন নিয়ে খেলা করার ফল ভালো হয় না। আমাদের পেছনে যারা লাগে, তারা কেউ আর থাকে না। বিমান নেই, তুমি থাকবে না, তোমার জামাইবাবুর দলবলের ব্যবস্থাও দু- একদিনের মধ্যে হচ্ছে। তবে তোমার একটা ছোট্ট 'চয়েস' আছে। এমন হাতের চিড়িয়াদের শেষ বর্গইঞ্চি অবধি চামড়াও আমরা জ্যান্ত অবস্থায় ছাড়িয়ে নিয়ে থাকি। কিন্তু কথা দিচ্ছি, তোমার শেষটা তুমি টেরও পাবে না – শুধু যদি আমার একটা ছোট্ট কৌতুহল মেটাও।"

আমার রক্তশূন্য মুখের দিকে চেয়ে বস বলে চলল, "কোন কাজে লাগবে না, শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতুহল মেটাবার জন্যই জিজ্ঞেস করছি – কীভাবে আমার ক্যালকুলেটরের কোড ভেঙে তোমরা মেসেজ উদ্ধার করলে? কী হ'ল, বল – উত্তর দাও!"

"বলছি, একগ্লাস জল।" দু'হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললাম। বসের ইশারায় এক চেলা দৌড়ে ভেতরের ঘরে গেল। আর এভাবে পাওয়া বাড়তি মিনিটটাকে যথাসাধ্য উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টায় আমি মনে মনে আশার ফানুস ওড়াতে লাগলাম।

আচ্ছা, যদি জামাইবাবু পেঁচোর ভুল শুধরে দেন? অথবা যদি দৈবাৎ টহল দিতে দিতে ওরা এদিকে এসে পড়ে? এইসব রঙিন কল্পনা করতে করতে আমি বাইরে তাকানোর চেষ্টা করলাম। সব জানালা বন্ধ, শুধু একটার শার্সি ভাঙা। তার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, একটা ঝাঁকড়া গাছ রাস্তার ওপর থেকে বাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আর তার পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে একটা অদ্ভুত আকৃতির বাঁদর।

অন্ধকারে ভুল দেখছি না তো? ভালো করে তাকালাম, তারপর আমার অন্তরাত্মা পুলকে তাথৈ তাথৈ নেচে উঠল, এ যে পেঁচো! খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠলাম, "ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়!"

"কী বিচ্ছিরি চিৎকার, কী জঘন্য লাস্ট উইশ!" মুখোশধারী রেগেমেগে বলল। কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই চারদিক কাঁপিয়ে জেগে উঠল পেঁচোর হুইসলের মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, "ঘাবড়াস না গবু, আমি এসে গেছি- ই- ই- ই- ই!" দেখতে না দেখতে সে রকেটের মতো শাঁ করে উড়ে এসে ভাঙা জানালা দিয়ে ঘরে সেঁধিয়ে গেল। তারপর আর কী – সেই আদি এবং অকৃত্রিম পেঁচোর পাঁচন! কারো বগলের ফাঁক গলে, কারো চুল টেনে, আঁচড়- কামড়- কাতুকুতু- রদ্দার বন্যা বইয়ে দিয়ে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে পলকে প্রলয় ঘটিয়ে দিল।

সাথে সাথেই বাইরে ভারি আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ। কাজের কাজ পেঁচোই একরকম গুছিয়ে এনেছিল। মিনিটখানেকের মধ্যে পুলিশ নিয়ে এসে হাতকড়া- টড়া লাগানোর বাকি ফর্মালিটিগুলি জামাইবাবু সারলেন।

"শুধু পালের গোদাটা তালেগোলে সটকেছে।" জামাইবাবু বললেন।

এতক্ষণে আমার মনে পড়ে যায়। চেঁচিয়ে বললাম, "পালাতে দিও না, জামাইবাবু। ও হচ্ছে নতুন বাজারের তেলেভাজাওয়ালা নিতাই। অমন ভুঁড়ি দুলিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক পেটেন্ট হাসি দেখেই ওকে চিনেছি। মনে আছে পেঁচো, সেই যখন তুই গোবরে আছাড় খেলি?"

এভাবে বুক হাল্কা করে দিয়ে বুঝতে পারি, আমার শরীর- মন আর নিতে পারছে না। ধীরে ধীরে সব ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যায়। তার আগে মনে পড়ে, জামাইবাবু অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ছেন আর পেঁচো হাত- পা ছুঁড়ে তাঁকে কী যেন বোঝাচ্ছে।

"থ্রি চিয়ার্স ফর পেঁচো- গবু –" কে যেন চেঁচিয়ে বলল।

"হিপ- হিপ- হুররে!" অনেকগুলি ফুর্তিবাজ গলার আওয়াজে ঘর থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। জামাইবাবুর দলবল। আজকের তাক লাগানো কাণ্ডকারখানার পর গোটা ইউনিটটাই আমাদের অভিনন্দন জানাতে চলে এসেছে।

একটু আগে আমার জ্ঞান ফিরেছে, তবে এখনও যেন চোখে ঝাপসা দেখছি। গায়ে ব্যথা, দাঁত কনকন, মাথা টনটন, কান ভোঁভোঁ। অথচ দক্ষযজ্ঞের হোতা পেঁচো নিজে কীভাবে যেন পদ্মপত্রে জলের মতো নিটোল বেরিয়ে এসেছে। দিব্যি হেসে হেসে সবার সঙ্গে কথা বলছে।

"সব ধরা পড়েছে?" ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

"স- ব। হিন্দুস্থানি রাজেন্দ্র চৌবে, চৌকোকান দীপক চতুর্বেদী, এমনকি তোমার 'তেলেভাজাওয়ালা' নিতাইও এখন হাজতে গোড়ালি ঠাণ্ডা করছে। লোকটা আসলে বিদেশি ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়ার, আদত নাম হীরেন সামন্ত। ও- ই ছিলো চক্রের 'ব্রেন'। জানো, ওরা আমাদের অফিসটা আর- ডি- এক্স দিয়ে উড়িয়ে দেবার ফন্দি এঁটেছিল আর তার অ্যাকশন প্ল্যানের জন্যই এই মিটিং", জামাইবাবু বললেন।

"কিন্তু এই অঙ্ক- বিশারদ গোয়েন্দার অসামান্য কৃতিত্বে আমরা আপাতত বেঁচে গেলাম।" একটা থাবার মতো বিশাল হাত পেঁচোর পিঠের ওপর নেমে এল। সুজিত মল্লিক, জামাইবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

পেঁচো মিউমিউ করে বলল, "ন্- না, তেমন কিছু নয়, কতকটা ঘটনাচক্রেই –"

"নাও নাও, বৈষ্ণব বিনয় ছাড়ো।" ধমকে উঠলেন প্রৌঢ় শচীনবাবু, "তোমার ঐ ক্যালকুলেটর রহস্যভেদের বৃত্তান্ত শুনবো বলে কখন থেকে বসে আছি। এবার ঝেড়ে কাশো।"

সত্যিই গলাটলা ঝেড়ে নিয়ে পেঁচো শুরু করল, "নিতান্তই ছাড়বেন না যখন তবে বলছি। দুটো বড়ো মৌলিক সংখ্যাকে গুণ করা সোজা, কিন্তু গুণফলের উৎপাদক করে সংখ্যা দুটো আবার উদ্ধার করা সহজ নয়। আজকাল এই তত্ত্ব গুপ্তলিপিবিদ্যা বা ক্রিপ্টোগ্রাফিতে খুব ব্যবহার করা হচ্ছে – বিশেষত কম্পিউটার- ইন্টারনেটে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক- ব্যবসায়িক তথ্য লেনদেনের গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে।

ব্যাপারটা একটু সহজ করে বলছি। ধরুন, আপনি একটা মেসেজ আমাকে পাঠাবেন। মেসেজটা সুরক্ষিত করতে প্রথমেই তাকে একটা সফটওয়্যার সুরক্ষার 'বাক্সে' ভরতে হবে। এই বাক্সের 'চাবি' হবে দুটো বিশাল, ধরুন চৌষট্টি অঙ্কের মৌলিক সংখ্যার গুণফল। সংখ্যাদুটো আমার নিজস্ব, শুধু আমার কম্পিউটারই জানবে। কিন্তু তার গুণফলের 'চাবি'টা একটা পাবলিক ডাইরেক্টরিতে থাকবে, যা থেকে সেটা নিয়ে যে কেউ আমাকে সুরক্ষিত মেসেজ পাঠাতে পারবেন। এবার মেসেজ আমার কাছে এলে 'সুরক্ষা'র বাক্স খুলে তা উদ্ধার করার পালা। তার জন্য যে চাবি লাগবে, তা হচ্ছে আলাদা আলাদা ঐ দুটো মৌলিক সংখ্যা, যা একমাত্র আমার কাছেই আছে। গুণফলটা ভেঙে দুটো বিশাল মৌলিক উৎপাদক উদ্ধার

করতে আধুনিক কম্পিউটারেরও বছর ঘুরে যাবে। তাই আমার মেসেজ আমি ছাড়া অন্য কেউ পড়তে পারবে না।”

“বললে যে সহজ করে বলছ, কিন্তু –”

“ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল?” শচীনবাবুর অস্বস্তি দেখে সুজিত মল্লিক মুচকি হেসে বললেন, “যা বোঝার আমি বুঝেছি। আপনারা শুধু শর্টে বুঝে রাখুন, ও ছোঁড়া অঙ্কের জাহাজ। নাও, এবার তুমি ক্যালকুলেটর প্রসঙ্গে এস।”

পেঁচো আবার শুরু করল, “কম্পিউটার গুপ্তলিপির এই পদ্ধতিটাকেই একটু ছোটো স্কেলে কাজে লাগিয়েছে ওই বিদেশি ডিগ্রিধারী হীরেন সামন্ত। আমার হাতের এই ছোট্ট যন্ত্রটা প্রচলিত ক্যালকুলেটর নয়, একটু আলাদা। একে বলে ‘প্রোগ্রামেব্‌ল ক্যালকুলেটর’, খুদে কম্পিউটার বললেও বিশেষ ভুল হয় না। হীরেন এই যন্ত্রকে কাজে লাগিয়েছে গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য। ছোট্ট মেসেজটা এর ‘মেমরি’তে ভরা থাকে আর ক্যালকুলেটরটা এমনভাবে প্রোগ্রাম করা যে ‘সুইচ অন’ করলে দুটো ছয় অঙ্কের মৌলিক সংখ্যার গুণফল ডিসপ্লেতে দেখা যাবে। সেটাকে ‘ফ্যাক্টর’ করে ক্যালকুলেটরে গুণফল বের করার চেষ্টা করলেই মেসেজটা আপ্‌সে বেরিয়ে আসবে। তবে বাইরের কোন লোক গুণফলকে ফ্যাক্টর করে সংখ্যাদুটো বের করতে পারবে বলে হীরেন কল্পনাই করেনি। তাই সে নিশ্চিত ছিল যে দৈবাৎ কোন যন্ত্র বেহাত হলেও গোপন কথাটি গোপনই থাকবে।”

“ওরা তো আর ডিটেকটিভ পেঁচোকে চিনত না!” হাসিমুখে সুজিত মল্লিক বললেন, “কিন্তু ওরাই বা ফ্যাক্টর দুটো বের করত কী করে? সবার নিশ্চয়ই কম্পিউটার নেই?”

“বোধহয় ছ’অঙ্কের কতগুলো মৌলিক সংখ্যার একটা লিস্ট বানিয়ে হীরেন ওদের দিয়ে রেখেছিল, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তার থেকেই উৎপাদক দুটো নেওয়া হ’ত। লিস্টটা হাতে থাকলে ক্যালকুলেটরে বড়োজোর কুড়ি-তিরিশটা ভাগ করে কোনটা লাগে দেখে নিলেই কাজ হাসিল।”

“কিন্তু তুমি কখন অনুমান করলে যে ক্যালকুলেটরের ঐ সংখ্যাটার মধ্যে এতসব মারপ্যাঁচ লুকিয়ে আছে?” জামাইবাবু প্রশ্ন করলেন।

“সংখ্যাটাকে ফ্যাক্টর করতে না পেরে প্রথম থেকেই আমার একটু কেমন-কেমন লাগছিল। তারপর যখন আপনি বললেন যে বিমানদার কাছেও ওরকম একটা ক্যালকুলেটর ছিল, আমি বুঝতে পারলাম যে স্রেফ বুনো হাঁসের পেছনে ছুটছি না। নিশ্চয়ই উনি অমন একটা যন্ত্র হাতে পেয়ে আমারই মতো হিসেব-নিকেশে বসেছিলেন। ওঁর শেষ উক্তির তাৎপর্যও তখন জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো।”

“শেষ উক্তি – মানে, ঐ ‘মল্লিক, মল্লিক’?” একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

“মল্লিক নয় রে, মৌলিক – অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা! এই ইঙ্গিত দিয়েই ভদ্রলোক নীরব হয়ে গিয়েছিলেন।”

“আমি কিন্তু এক সময় ভেবেছিলাম ঐ কথার মানে হচ্ছে –” আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

"যে এই মল্লিক ব্যাটাই হচ্ছে আসল কালপ্রিট, ঘরশত্রু বিভীষণ?" হাহা করে হেসে উঠলেন সুজিতবাবু। সাথে সাথে জামাইবাবুর অন্যান্য কলিগরাও গলা মেলালেন। এভাবে সেদিনের আসর ভাঙলো।

"আমারই অন্যায় হয়েছিল, গবু। তোকে ওভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি।" কাঁচুমাচু ভঙ্গীতে বলল পেঁচো।

গরম দুধে চুমুক দিতে দিতে মুখে বীরত্ব ও মহানুভবতার হাসি ফুটিয়ে তুলে বললাম, "যাক গে, শেষরক্ষা যে করতে পেরেছিস –"

"তোকে তেতলা বাড়িটার সামনে দেখতে না পেয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে হ'ল – নিশ্চয়ই ফাঁদে পড়েছিস, আগে তোর খোঁজ করা দরকার। তাই জামাইবাবুকে একটু অপেক্ষা করতে বলে অনেক কষ্টে ওদের চোখ এড়িয়ে গাছে চড়লাম। হলঘরে কমজোরের আলো জ্বলছিল। তাই সেখানে তুই আছিস কিনা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।"

খুশি হয়ে বলি, "তারপর আমার গান শুনেই ধরে ফেললি, তাই না?"

একটু ইতস্ততঃ করে পেঁচো বলল, "ইয়ে – হ্যাঁ। মানে মাত্র একটা লাইন, তার মধ্যে এতগুলি সুর আর তালের ভুল করা কি যারতার কম্মো! তক্ষুণি বুঝে নিলাম, নির্ঘাৎ এ আমাদের গবু!"

ওর স্বরে এমন একটা আন্তরিকতার ছোঁয়া ছিল যে প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেলাম। বললাম, "তবু ভালো যে আমার মতো ভুল করে তোরা পাশের গলিতে সুজিত মল্লিকের বাড়ি হাজির হোসনি।"

"ভুল – কীসের ভুলের কথা বলছিস?"

পেঁচোর চোখ পিটপিটানি দেখে হঠাৎ আমার একটা গভীর সন্দেহ হ'ল। বললাম, "তা, একটা রাস্তা ছেড়ে সেভেনটিনথ রোডে কি তুমি চাঁদু যোগবলে হাজির হয়েছিলে?"

"যোগবল কেন!" পেঁচো অবাক হয়ে বলল, "নাইনথ রোডের পর সাতটা গলি – নয় আর সাতে সতেরো – এ তো সোজা হিসেব!"

হায় অঙ্কের জাহাজ পেঁচো – নয় আর সাতে সতেরো এই তোমার যোগ-বল আর তাতেই শেষ অবধি আমার প্রাণরক্ষা! হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল, গা পাক দিয়ে উঠল – আবার মুচ্ছো গেলাম।

ছবিঃ শ্রী শাম্ব

*জয়ঢাক গল্প প্রতিযোগিতা ২০১৪*
*দ্বিতীয় সেরা*

# পালিয়ে

প্রকল্প ভট্টাচার্য

১

আমার আজ মনটা খুব খারাপ। একটু আধটু মন খারাপ আমার আগেও হয়েছে ঠিকই, তবে আজকেরটা ভীষণ বেশি। এতটাই বেশি, যে টিফিনে মায়ের বানিয়ে দেওয়া ডিম পাঁউরুটিটাও আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

বেশি মনখারাপ হলে সাধারণত আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিজেকে মুখ ভ্যাঙাই। কিন্তু ইশকুলে তো সেটা করা যায় না, তাই ভাবলাম রাহুলের সঙ্গে একটু ঝগড়া করা যাক। কিন্তু এমনই কপাল, দেখলাম রাহুলের মন আজই বিচ্ছিরিরকমের ভালো।

"এই রাহুল, এরকম গরুর মতো মুখ করে বসে আছিস কেন রে?"

জবাবে রাহুল শুধু হাসল।

"রাহুল, দে তো তোর পেন্সিলটা?" ও মা, এক কথায় দিয়েও দিল।

ধুত্তেরি, এভাবে ঝগড়া করা যায়! মেজাজটা আরো খারাপ হয়ে গেল। টিফিন পিরিয়ড শেষ হলেই পূজা মিস- এর ক্লাশ, তিনি আবার শক্ত শক্ত প্রশ্ন করেন, না পারলে কানমলা আর নিল ডাউন। সর্বনাশ!

তখনই ঠিক করলাম যে পালিয়েই যাই।

পালানো ব্যাপারটা শুনতে যতোটা শক্ত, দেখলাম আসলে ততোটা নয়। এইতো, কেমন বেচারা বেচারা মুখ করে গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম, দারোয়ানদাদা খেয়ালই করল না! কিন্তু অসুবিধে হল তার পরে। পালিয়ে নাহয় গেলাম, কিন্ত পালিয়ে লোকে যায় কোথায়!

২

রাস্তা পেরোনো খুব সহজ। অতো লাল সবুজ সিগন্যালও দেখতে হয় না, জেব্রা জিরাফ ক্রসিং- এরও দরকার পড়েনা। একটা গরু খুঁজে বার করতে হয়, তারপর তার পাশে পাশে আরামে রাস্তা পেরোনো যায়। যদি কোনওদিন না পালাতাম, তাহলে কি এই সহজ উপায়টা আমি জানতে পারতাম? কক্ষণো না! এইসব কারণেই সকলেরই এক আধবার পালানো উচিত।

রাস্তা পেরিয়ে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে দেখি বেশ অচেনা অচেনা লাগছে সবকিছু। তার মানে ঠিকমতো পালানো হচ্ছে। কিন্তু হেঁটে আর কতদূরই বা যাওয়া যায়! আর খিদেও পাচ্ছে। নাঃ, ডিম পাঁউরুটিটা খেয়ে বেরোলেই হত!

আরও কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম একটা পার্ক। ভাবলাম, একটু বসে জিরিয়ে নেওয়া যাক। একটা বেঞ্চ- এর একদিকে বসলাম। শেষ রোদ্দুরে বেশ গরমাগরম কাঠ। প্রাণপণে এদিক ওদিক, গাছ, কুকুর দেখে খিদেটা ভোলবার চেষ্টা করছি, তখনই লোকটা তার ঝুলি নিয়ে এসে বেঞ্চটার অন্য পাশটায় বসল।

ওইরকম ঝুলিকাঁধে লোকেরা সাধারণত ছেলেধরা না হয়ে যায় না। বুঝলাম যে আমাকে একা দেখে এসেছে ধরতে। তা আমি তো পালিয়েই যাচ্ছি, কেউ যদি ধরে নিয়ে যায় তাহলে সুবিধেই হয়! এইসব ভেবেচিন্তে লোকটাকে বললাম, "দাদা শুনছো?"

লোকটা একবার তাকালো, কেমন উদাস উদাস দৃষ্টি, তারপর যেন আপনমনেই বললো, "কী যে বলি, আজ মনটা এত খারাপ..."

এই কথা শুনেই আমার ছেলেধরাদা- র ওপর কেমন যেন মায়া হল। বললাম, "মনখারাপ কেন গো তোমার? কী হয়েছে?"

পা দুটো বেঞ্চির ওপর তুলে, ঝোলাটা কোলের ওপর ফেলে বলল, "বলছি সব। তার আগে এসো কিছু খেয়ে নিই। খিদে পেলে আবার আমার কথাবার্তা গুলিয়ে যায়।"

তারপর তার ঝোলার ভেতর থেকে ফ্লুরির কেক বেরোল, আপেল বেরোল, একটা ডেয়ারি মিল্ক চকলেটের বারও বেরোল। বেঞ্চির ওপর সেগুলো সাজিয়ে একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে ছেলেধরাদা বলল, "আজ আমার এক বন্ধুর জন্মদিন ছিল, তাই এগুলো পেয়েছি। রোজ কি আর জোটে? মাঝে মাঝে তো কিছুই থাকে না খাবার!"

শুনে একটু কষ্টই হল। আহারে, খিদে পায়, কিন্তু খেতে পায় না!

ভাগাভাগি করে দুজনে খেয়ে, পাশের কলের জলে হাত মুখ ধুলাম। একটু চাঙ্গা হতেই দেখি ছেলেধরাদার মুখে হাসি ফুটেছে। আমাকে বলল, "তো তুমি তো পালাচ্ছ। পালিয়ে কোনদিকে যাবে কিছু ঠিক করেছ?"

এই রে, এবার বোধহয় আমাকে ধরিয়ে দেবে! কিন্তু আর এড়িয়ে যাই বা কী করে! না ঘাবড়ে বললাম, "নাঃ, তেমন কিছু ভাবিনি।"

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে ছেলেধরাদা বলল, "হুঁ, সেটাও ভাল। আমিও প্রথমবার পালাবার সময় তেমন কিছু না ভেবেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।" তারপর কেমন উদাস স্বরে বলল, "কিন্তু সেইবার যে মজাটা পেয়েছিলাম, তেমনটি আর কোনওবারেই পেলামনা।"

বেশ টের পেলাম যে আমার চোখদুটো গোল গোল হয়ে উঠেছে। "তুমি বুঝি অনেকবার পালিয়েছ?"

"অ- নে- ক বার! পালাতে আমি এতই ভালবাসি, যে কিছুদিন অন্তর না পালিয়ে থাকতেই পারি না! আরে আমি তো শুধু এইজন্যেই ফিরে আসি যাতে আবার পালাতে পারি!"

এতক্ষণে দেখলাম আমার মনখারাপ ভাবটা কাটতে আরম্ভ করেছে। "তা তোমার মনটা যে বললে খারাপ, তা কেন?"

"একটা বাচ্চা মেয়ের খুব অসুখ করেছে, খায় না দায় না, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারে বলেছে, কেবলমাত্র হাউইপাখির ডিম খাওয়ালেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে। কী যে করি!"

"হাউই পাখি! অমন পাখি আবার আছে নাকি!"

"আছে, আছে! বাদ্যিপাহাড়ের পিছনের বনেই তাদের বাসা। কিন্তু একটা অসুবিধে আছে, আর মনখারাপটা সেইজন্যেই।"

"কী অসুবিধে, রাস্ত চেনো না বুঝি?"

এই কথাটা শুনে ছেলেধরা খুব একচোট হাসল। প্রথমে দু' হাতে পেট চেপে ধরে হো- হো করে, তারপর মুখ বন্ধ করে ফোঁ- ফোঁ করে, তারপর চোখ বুজে গোঁ- গোঁ করে। শেষে তার চোখে জলই এসে গেল। উঠে গিয়ে কলের জলে মুখ ধুয়ে, নাক ঝেড়ে এসে সে বলল, "আমি চিনব না রাস্তা! নীলগিরি থেকে নৈনিতাল, কানপুর থেকে কাটমাণ্ডু সব ঘুরে এলাম, আর বাদ্যিপাহাড়ের রাস্তা চিনব না! না হে, অসুবিধেটা হল অন্য জায়গায়। সেই বনে প্রচুর

সাপখোপ, আর আমি যে সাপে ভীষণ ভয় পাই!”

আমি আবার সাপের থেকেও বেশি ভয় পাই টিকটিকিতে। কিন্তু সেটা বললে আবার যদি ছেলেধরাদা ঐ বিকট হাসিটা হাসতে আরম্ভ করে! তাছাড়া দেখলাম আবার ছেলেধরাদার চোখমুখ কেমন উদাস উদাস হয়ে উঠেছে। তাই তাড়াতাড়ি বলে দিলুম, “আচ্ছা, আমাকে নিয়ে যেতে পারবে? আমি নিয়ে আসব তোমার হাউই পাখির ডিম!”

এই কথা শুনে ছেলেধরাদার মুখটা সেই যে হাঁ হলো, এখনও বোধহয় সেটা পুরোপুরি বন্ধ হয় নি!

৩

আমি অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছি, কখনো বাসে, কখনো ট্রেনে। গাড়ি চড়েও গেছি। যেভাবেই যাই না কেন,  জানালার ধারে না বসলে আমার ভাল লাগে না। কান ঘেঁসে হু- হু করে হাওয়া বইবে, জানলায় নাক ঠেকিয়ে, মানে যতোটা মাথা বার করলে অন্যরা বকাবকি চেঁচামেচি শুরু করবে না, ততোটাই বাইরে ঝুঁকে কতো কীই দেখতে দেখতে যাওয়া যায়! সেইজন্যেই ছেলেধরাদার সঙ্গে বাসে উঠে আমি জানলার ধারেই বসলাম। ছেলেধরাদা বসলো পাশের সিটে।

“আমরা কখন পৌঁছবো?”

“তা বলতে পারিনা। কালও হতে পারে, পরশুও হতে পারে। নির্ভর করছে ড্রাইভার কেমন চালায়, তার ওপর।”

“এ বাবা, এই বাসটা তো নড়বড়ো করছে, মাঝপথে ভেঙে পড়বে না তো?”

আমার এই কথাটা একটু জোরে বলা হয়ে গেছিল বোধহয়। বাসভর্তি লোক গুনগুন করে কথা বলছিল, হঠাৎ সবাই চুপ করে গেল। আর বুড়োমত যে লোকটা টিকিট কাটছিল, ভীষণ রেগেমেগে বলে উঠল “কে, কে বলল কথাটা? কার এত সাহস দেখি?”

ছেলেধরাদা আমাকে ইশারা করে বলল ঘুমোবার অভিনয় করতে। মাথা নীচু করে বললাম, “কী গো, আমাদের নামিয়ে দেবে না তো?”

“বুঝতে পারলে নামিয়ে দিতেও পারে। বুড়ো খুব বদমেজাজি। তবে একটাই রক্ষে, চোখে ও একেবারেই দেখে না।”

“সেকি! চোখে না দেখলে টিকিট দিচ্ছে কী করে?”

“টিকিট আর দিচ্ছে কোথায়! এগুলো তো ফুরিয়ে যাওয়া ট্যাবলেটের পাতা! এগুলোই আমরা ওর কাছে পাস বলে চালিয়ে আসছি গত দশ বছর ধরে। নাও, আর কথা নয়, ঘুমোও তো চুপচাপ। কাল যদি বাসটা পৌঁছে যায় তাহলে অনেক খাটাখাটনি হবে।”

কী মুশকিল! এখন তো সবে সন্ধে। এখনই কি ঘুমোনো যায়! তবু ছেলেধরাদার কথামতো চুপ করে বসে রইলাম। সারা বাসের সব লোক দেখলাম ঝিমোচ্ছে, ছেলেধরাদার তো দিব্যি ফুরফুর করে নাকও ডাকছে। জানালার বাইরে অন্ধকার নেমে আসছে। কেবল বুড়ো কন্ডাক্টরটা শুনলাম তখনো গজগজ করে চলেছে, “ কী সাহস, অ্যাঁ! বলে কিনা বাস নড়বড়ো করছে! ভেঙে যাবে! অ্যাঁ, অ্যাত্তবছর ধরে বাদ্যিপাহাড়ের বাস চালাচ্ছি, বলি একদিনও ভেঙেছে, যে আজ ভাঙবে? অতো নড়বড়ের ভয় তো বাসে চড়া কেন বাপু?”

এইসব শুনতে শুনতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেও জানিনা। স্বপ্ন দেখছিলাম যে পূজা মিস বাসে ঘুরে ঘুরে সকলের হোমওয়ার্ক চেক করছে। আমাদের সিটের কাছে এসে বলল, “একদম পড়শোনা করো না, ডিসগাস্টিং! হাউই পাখির স্পেলিং জানো? সাপ হাউ মেনি টাইপস জানো?”

আরো কী কী সব যেন জানতে চাইছিল, তার আগেই ছেলেধরাদার ঝাঁকানিতে ঘুম ভেঙে গেল। “নামো, নামো শিগগির, পৌঁছে গেছি!”

## ৪

“গাংফড়িং- এর রাজ্যে রে ভাই গান ধরেছি আজ যে!
খাই দাই আর বগল বাজাই, নেই তো কোনো কাজ যে!
খাবার দাবার অঢেল পেলে
দিন তো ভালই যাচ্ছে চলে
দিন ফুরোলে নাকের ডাকে তাই তো সানাই বাজছে!!”

অনেকক্ষণ বুঝতে পারিনি যে গানটা ছেলেধরাদা- ই গাইছে! বাদ্যিপাহাড়ে নেমেই দেখছিলাম তার দিব্যি ফুরফুরে মেজাজ, এখন আবার গুনগুন করে সুরও ভাঁজছে! শুনতে ভালোই লাগছিল, কিন্তু ওই অঢেল খাবারদাবারের কথাটা শুনে হঠাত কেমন খিদে খিদে পেয়ে গেল।

“ও দাদা, কোথায় তোমার হাউই পাখির বাসা?”

“আরে, তাদের বাসা কোথায় তা আমিই কি ছাই জানি! বনের মধ্যে খুঁজতে হবে।”

“সেকি গো, এ তো বিরাট জঙ্গল! এর কোথায় পাখির বাসা খুঁজব আমরা! আর আমার যে এখনই খিদে পাচ্ছে!”

খিদের কথায় ছেলেধরাদা যেন হুঁশে ফিরল। “তাই তো, খিদে তো আমারও পেয়েছে! চলো, দেখি কী ফল- টল পাওয়া যায়!”

ফল জিনিসটাই আমার দু চক্ষের বিষ। সে আপেলই হোক বা কলা, মোটেই পছন্দ হয় না আমার। কিন্তু এমন বেখাপ্পা জায়গা এটা, এখানে না দেখছি কোনও দোকানবাজার না কোনও বাড়িঘর। কি মুশকিল, একটা লোক ও নেই যে ধারেকাছে, যে জিগ্যেস করব! আরে ওই তো! শুঁটকো মতো কে যেন একটা এইদিকেই আসছে না? যাক, একটা কিছু হদিশ তো দিতেই পারবে।

ডাকলাম, “ও শুঁটকোদাদা, শুনছো?”

লোকটার বোধহয় আমার দেওয়া নামটা পছন্দ হলো না। কেমন একটা মুখ করে তাকালো আমাদের দিকে,তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় বলল “কী? চাই টা কী শুনি?”

“আমরা হাউই পাখির বাসা খুঁজতে এসেছি, কিন্তু খিদে পেয়েছে খুব। এখানে কোথাও কিছু খাবারদাবার পাওয়া যাবে?”

এদিকে ছেলেধরাদা ফিসফিস করে বলছে, “কেন ডাকলে? লোকটাকে তো ঠিক সুবিধের মনে হচ্ছে না!”

“রাখো তো তোমার সুবিধে অসুবিধে! এদিকে পাখির বাসা খোঁজবার নাম করে এমন জায়গায় নিয়ে এলে যেখানে জনমনিষ্যি নেই...”

এত পর্যন্ত আমি ফিসফিস করতে করতেই শুঁটকো লোকটা আমাদের কাছে চলে এল। “খাবার তো এখানে কিছুই পাবে না। তা হঠাত হাউই পাখির বাসা কী হবে?”

“খাবার পাব না? গাছের ফল টল ও নয়?” আমার বুক শুকিয়ে আসছিল।

“এই জঙ্গলে সব গাছের ফলই বিষাক্ত, খেলেই মাথা ঘুরে যাবে, ভুলভাল স্বপ্ন দেখবে, নাচতে ইচ্ছে করবে, মনে হবে উড়ছো। খবর্দার খেও না! কিন্তু হাউই পাখির বাসা কেন?”

এতক্ষণ ছেলেধরাদা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ কেমন খেঁকিয়ে উঠে বলল, “সে জেনে আপনার কী মশাই? খাবার কিছু পাব না বললেন, ব্যাস চুকে গেল। এখন আপনি যান তো নিজের কাজে!”

এরকম ধমক খেয়ে শুঁটকোদাদা একটু হকচকিয়ে গেল। “না, মানে, হাউই পাখি তো বাদ্যিপাহাড়ের একদম ওপরে বাসা বাঁধে, ওঠা খুব শক্ত। জঙ্গলের ভিতর অবশ্য দু- একটা পেলেও পেতে পারো। কিন্তু এই জঙ্গলে প্রচুর সাপ, জানো তো? যাই তাহলে, শুনতে আর

চাইছনা যখন...” ও মা, সত্যি চলেও গেল!

কোথায় আমি হুতোশ করব, তার আগেই ছেলেধরাদা আমাকে বলল, “এই রে, তাহলে এখন কী হবে!”

গতকাল ইশকুল থেকে বেরিয়ে আসার পর এই প্রথম আমার খুব মনে পড়তে লাগল বাড়ির কথা, মায়ের জন্যে মনটা কেমন করে উঠল।

ও মা গো, তাহলে এখন কী হবে!

৫

সবাই বলে খালিপেটে ঘুমোতে নেই, ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখতে হয়। একদম ভুল কথা। দিব্যি ঘুম হল, আর স্বপ্নে দেখলাম মা কতো কী রান্না করেছে আমার জন্যে! সত্যি বলতে কী, জেগে উঠে মনটা একটু খারাপ লাগছিল, কিন্তু খিদেটা বেশ কম টের পাচ্ছিলাম। পাশে দেখলাম ছেলেধরাদা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, একটা মাছি বার বার ওর মুখে ঢোকার চেষ্টা করছে আর নাকের ডাকে ভয় পেয়ে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

নাঃ, ভেবেচিন্তে দেখলাম যে এই ছেলেধরাদাটা কোনো কম্মের নয়। যদি কিছু হদিস দিতে পারে তো ওই শুঁটকোদাদাই পারবে। যাই শুঁটকোদাদার খোঁজ করি গে। জয় মা বলে জঙ্গলে ঢুকলাম। গাছপালাগুলো সব যেন কেমন কেমন, যতো ভেতরে ঢুকছি, ততো ঘন হয়ে আমাকে ঘিরে ফেলছে মনে হচ্ছে! এখন তো সকাল, কিন্তু সূর্যের আলো এত কম ঢুকছে, যে মনে হচ্ছে সন্ধ্যে নামলো বলে!

আর সেই সঙ্গে চারদিকে কী সব ফিসফিস শব্দ! ওরেবাবা, ওগুলো কী রে! সাপ! এতক্ষণ খেয়ালই করিনি, এখন দেখছি গাছের ডালে ডালে জড়িয়ে কতো রকম সাপ, যেগুলো ঝুরি ভাবছিলাম সেগুলোও লকলক করে জিভ বার করছে, শিকড়গুলোও মাঝে মাঝে ফনা তুলছে, আর...

...আর সবক'টা একমনে আমাকেই দেখছে আর হিস হিস করে নিজেদের মধ্যে কী সব যেন বলাবলি করছে!!

আমার পা দুটো যেন আটকে গেছে... বুকের ভিতর এত জোরে ঢিপ ঢিপ করছে যে স্পষ্ট নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছি... ও বাবা, ও মা, ও পূজা মিস, কেউ এসে আমাকে বাঁচাও গো!! দুচ্ছাই, ওদের কারো মুখটাই ভাল করে মনে পড়ছেনা তো নাম... তাছাড়া ওরা এখানে আসবেই বা কী করে... হ্যাঁ আসতে পারে একমাত্র শুঁটকোদাদা! দাদা গো! ডাকলাম কি? না, ডাকিনি, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছেনা যে... এবার কী হবে!!

কতক্ষণ এইভাবে কাটলো জানিনা। হঠাত মনে হল অনেক দূর থেকে কেউ যেন কিছু বলছে আমায়। হ্যাঁ, ওই তো শুঁটকোদাদা, বেশ কিছুটা দূরে, বলছে, "সাবধানে এগিয়ে চলে এস, ওরা কিছু বলবেনা তোমায়!"

যাক, কিছুটা ভরসা পেলাম, কিন্তু সাবধানে এগোব কী করে! ভুত তাড়াতে শুনেছি রাম নাম জপ করতে হয়, সাপ তাড়াতে কার নাম জপ করব? গরুড়? তো তাই হোক, গরুড় গরুড় বলতে বলতে এগোতে থাকলাম শুঁটকোদাদার দিকে। ও মা, সাপগুলো যেন সরে সরে আমাকে জায়গা করে দিতে লাগলো। একটু একটু করে আমার ভয়টা কেটে যেতে থাকলো। এইভাবে পৌঁছেও গেলাম শুঁটকোদাদার কাছে, মনে হল যেন ধড়ে প্রাণ এল!

"সাপকে অতো ভয় পাও কেন? জানো, ওদের মতো ভীতু প্রাণী খুব কম আছে? ওরাই আমাদের ভয়ে লুকিয়ে থাকে, আর ভীষণ ভয় পেলেই তখনই কামড়ায়। আরো মজা হল, এখানে যতগুলো সাপ দেখছ, ওদের একটারও বিষ নেই। কামড়ালে কিছুই হবে না তোমার!"

শুঁটকোদাদা বলে কি! ঐ ভয়ঙ্কর সাপগুলো নাকি ভীতু, আর বিষও নেই! আমি তো হাঁ! আর তখনই মনে পড়লো ছেলেধরাদা বোধহয় এতক্ষণে হাঁ বন্ধ করে জেগে উঠে আমাকে খুঁজছে, তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলতে হবে।

"ও শুঁটকোদাদা, বলো না, হাউই পাখির ডিম নিয়ে ফিরবো কেমন করে? ওই ডিম খাওয়ালে তবেই তো বাচ্চা মেয়েটা সারবে!"

"তোমার বোন বুঝি?"

"বোনের ই মতো। আমি তাকে চিনিনা যদিও, দেখি নি কোনওদিন, তবে ছেলেধরাদা বলেছে তার কথা, তাই এসেছি।"

"তোমার সঙ্গে ওই লোকটা ছেলেধরা?"

"হবে হয়তো। সেইরকমই তো দেখতে। তবে নিজেই তো কিছু জানেনা, ছেলে ধরবে কী! বাচ্চা মেয়েটা ওর বন্ধু, তাহলে আমারও বোন ই তো হলো। তাকে সারিয়ে তুলতে হবে না?"

"ওহো, ওইজন্যেই বুঝি হাউই পাখির বাসা খুঁজছিলে! তা ডিম দরকার আমাকে বললেই পারতে!"

"তোমার কাছে আছে? দেবে তুমি?"

"আছে বৈকি! কতো রকমের ডিম চাও, সব আছে! আমি তো সাপের ডিম, পাখির ডিম এই সবই খুঁজে খুঁজে বিক্রি করি!"

"সাপের ডিম? সে আবার কেমন?"

আমার কথা শুনে শুঁটকোদা ওইখানেই বসে তার কোমরের ঝুড়িটা খুলল। উরিব্বাস, কত্তো রকম ডিম রয়েছে পাতায় মোড়া মোড়া! আকাশী, গোলাপী, চকরাবকরা কাটা...

"এই আকাশী গুলো সাপের। দেখেছ কী সুন্দর! আর এইগুলো..."

"হাউই পাখির বুঝি?"

"না, হাউই পাখির ডিম সোনালী রঙের, এই যে।"

দেখলাম। কী অদ্ভুত সুন্দর দেখতে, যে কী বলব! এই কম আলোতেও মনে হচ্ছে যেন জ্বলজ্বল করছে !

"দাদা, তুমি এই ডিম পেলে কোথা থেকে?"

"বাদ্যিপাহাড়ে চড়ে, অনেক খুঁজেপেতে এনেছি! হুঁ হুঁ বাবা, এই জন্যেই তো অনেক দাম!"

আমার মাথায় বাজ। দাম দেব কী করে, কিছুই তো নেই পয়সাকড়ি! তাহলে কি...

আমার মুখ শুকিয়ে গেল দেখে বোধহয় শুঁটকোদাদার দয়া হল, "না না, তোমাকে দাম দিতে হবে না। তুমি ছেলে ভাল, কার না কার অসুখ সারাবার জন্যে অচেনা একটা লোকের সঙ্গে এই জঙ্গলে চলে এসেছ, আমি তোমায় এই চারটে ডিম উপহার দিলাম। এবার চলো, তোমাকে ঐ ছেলেধরার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"তুমি রাস্তা চিনতে পারবে?"

জবাবে শুঁটকোদাদা শুধু হাসল, তারপর আমার হাতটা ধরে এগোতে লাগল।

৬

"বাদ্যিপাহাড় বাদ্যি বাজায়, হাউই পাখি নাচে,
সাপখোপেরা কামড়ে দেবে আসিস  নে কেউ কাছে!
বদমাশটা সাতসকালে
ডিম পেড়েছে গাছের ডালে,
এখন যাব পাড়তে সেটা, তোর কি সময় আছে?"

ওমা, কোথায় ভাবছিলাম ছেলেধরাদা আমাকে খুঁজে না পেয়ে চিন্তাটিন্তা করবে, তা দেখি দিব্যি গান বানিয়ে নাচছে! আমার হাসিই পাচ্ছিল, কিন্তু শুঁটকোদাদা বলল, "বেচারা নির্ঘাত কোনো গাছের ফল খেয়েছে তাই এই অবস্থা!"

"এই রে, তাহলে কী হবে?"

"কিছুই না, সেরে যাবে কালকের মধ্যে। তুমি ওকে নিয়ে ফিরে যাও, জল ছাড়া কিচ্ছু খেতে দিও না যাতে সব বিষ বেরিয়ে যায়।"

"কিন্তু আমিই বা যাব কেমন করে?" এখন আমার সত্যি সত্যি কান্না পেতে লাগল।

"আমি তোমাদের বাসে তুলে দিচ্ছি। জায়গামতো নামতে পারবে না?"

"তা বোধহয় পারব।"

"ব্যাস, তাহলে অসুবিধে নেই। নাহয় আমি অন্ধ কন্ডাক্টরকেও বলে রাখছি..."

খিদে তেষ্টার কথা তখন মাথায় উঠেছে। হাউই পাখির ডিম চারটে সাবধানে পাতায় মুড়ে পকেটে পুরে, একহাতে ছেলেধরাদার হাত অন্য হাতে শুঁটকোদাদার হাত ধরে চললাম বাস রাস্তার দিকে। কখন যে বাস আসবে, আবার সেই বদরাগী কন্ডাক্টর, ছেলেধরাদা কাল সেরে গেলে হাউই পাখির ডিম নিয়ে যাবে মেয়েটার কাছে, তবে সে সারবে। আর আমাকে আবার সেই স্কুল, বাড়ি...

বিশ্বাস করো, আমার কিন্তু ততক্ষণে সেই মনখারাপটা একেবারে সেরে গেছে, পূজা মিসের ওপর রাগটাও কমে গেছে। আর মা'র জন্যে মন কেমন করতে শুরু করেছে, ভীষণ, ভীষণ!!

ছবিঃ পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়ঢাক গল্প প্রতিযোগিতা’২০১৪
তৃতীয় সেরা (১)

রঞ্জন রায়

ঘন জঙ্গলের মাঝে তিরতির করে বইছে নাম না জানা নদীটি; কিন্তু ওর পুবপারের গ্রামের নামটি আমারা জানি; মুকুন্দপুর। গ্রামটি ঝাড়খন্ডের লাগোয়া ছত্তিশগড়ের সরগুজা জেলায়।

শরতের সকাল। সুরুজ তিরকির বাড়ির দাওয়ায় একটা চটের টুকরো পাতা, তাতে চিৎ-উপুড় হচ্ছে ওর ছোটো বাচ্চাটি। এখনো নামটাম হয় নি। ওর বড়ো ভাই সাতবছুরে দদুইয়া ছোট্ট ভাইটির দেখাশুনো করছে। মা নদীর থেকে কলসি ভরে জল আনবে বলে ওকে বসিয়ে গেছে। মা যে কী করে! ওর মন চাইছে একছুটে বিরাম কিস্‌কুর বাড়ি চলে যেতে।

বিরাম ওর থেকে দু’বছরের বড়ো, কিন্তু ভালো বন্ধু। বিরামের বাবা মনোহর কিস্‌কু মুকুন্দপুর গাঁয়ের ‘মোকরদম’ বা সেনাপতি গোছের। ওদের বাড়ি গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, প্রায় জঙ্গলের গা ঘেঁষে। আর লখনদের বাড়িটা গাঁয়ের মাঝখানে, সরকারি পাতকো’র পাশে।ওর বাবা সুরজ তিরকি হল গে এ গাঁয়ের ‘সিয়ান’ বা মোড়ল।

কিন্তু কাল রাতে বিরামদের বাড়িতে কিছু একটা হয়েছে। ঘুমের মধ্যে টের পাচ্ছিল পটকা ফাটার শব্দ। বাড়িতে বেশ কিছু লোকজনের উত্তেজিত কথা, বাবার দৌড়ে বেরিয়ে যাওয়া। আর তারপর মা ও দাদুর মুখে বারবার মনোহর কিস্‌কুর নাম। ওকে কাঁথা সরিয়ে মাথা বের করতে দেখে মা চোখ পাকিয়ে ঘুমুতে বলল।

এখন সকালে আস্তে আস্তে সব মনে পড়ছে। বাবা বাড়িতে নেই। মা মুখ ঝামটা দিয়ে ছোট্ট ভাইকে দেখতে বলে নদী চলে গেল। ভাইটাও কোন কম্মের নয়। কোথায় চটপট ঘুমিয়ে পড়বে, তা না, এর মধ্যে দু'দুবার কানি ভিজিয়েছে।

আচ্ছা,দাদু তো আছে। দাদুকে ধরলে কেমন হয়?

"দাদু,ও দাদু?"

"কা বাত হ্যায় নাতি? ভুখ লাগিস্‌ কা?"

"নাহি দাদাজি, দাই মোলা বাসী খিলা কে গঈস্‌।"

না গো দাদু, মা আমাকে পান্তাভাত খাইয়ে তবে গেছে।)

"তব কা হোইস? কা বাত?"

"একটু লোরি- টোরি শুনিয়ে বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও না! ও আমার কথা শোনে না।"

দাদু স্মিত হেসে শুরু করেন।

"হাতি! হাতি! হাতি!
তুমি কোন পাহাড়ের নাতি?
আমি? গণেশদাদার ভাই,
কলাবউকে পড়ল মনে
কলাবনকে যাই।"

এ বছর বেশ বৃষ্টি হয়েছে। তাই ক্ষেতগুলো সব সবুজ। আশ্বিনের শেষ, ধানের 'বালি' বা শীষ পুরুষ্টু হয়েছে। এইবার শরতের রোদে পেকে সোনার রং ধরবে। দরকার আর এক পশলা বৃষ্টির,ব্যাস্‌। তারপর রাত্তিরে হেমন্তের হিম আর দিনে পাকা ধান কাটার মরশুম।গত সোমবারে দশহরার দিন রাবণবধ হয়ে উৎসব শেষ, এবার ক্ষেতের ফসল ঘরে তোলার পালা। তবে কাল রাতে কিসের চেঁচামেচি হচ্ছিল?

ঘুমিয়ে পড়ল ছোট্ট ভাই।

"কাল রাতে?হাতি এসেছিল যে!"

"হাতি এসেছিল? তুমি দেখেছ দদ্দা? কেমন দেখতে, সেই পাহাড়ের মত উঁচু? কুলোর মত কান, মুলোর মত দাঁত? আমিও দেখব।"

"হাতির সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল দাদুভাই। তোমার বাবা কাল দৌড়ে গেল না? একটা নয়, একটা গোটা হাতির পাল! কাল দু'দুবার গাঁয়ে ঢুকেছিল। ক্ষেত মাড়িয়ে গোলার ধান নষ্ট করে তবে গেছে। আর বেশ ক'টা বাড়ির চাল, মানে ওই টালি- খাপড়ার ছাদ ভেঙেচুরে একসা।"

"ও! তা ওরা কি নিজের থেকে চলে গেল?"

"তা কি যায়? টিন বাজিয়ে পটকা ফাটিয়ে তবে ওদের তাড়ানো গেল।"

"কাল রাত্তিরে বাবা কি পটকা ফাটাতে গেছল? আর কিস্‌কু কাকা? টিন বাজাতে?"

"টিন বাজাবে কি, সবচেয়ে বেশি লোকসান তো ওদেরই হয়েছে। ধানের মরাই গুঁড়িয়ে দিয়েছে, শাকসবজির বাগান তছনছ,আর একটা দাঁতাল হাতি তো মাতাল হয়ে- - "

"হাতি কী করে মাতাল হয়? ওরা কি বাবা আর মনোহর কাকার মত গেলাসে করে হাঁড়িয়া খায়?"

"সেই কথাই তো বলছি। কিস্‌কুদের গোয়াল ঘরের পাশে খড়ের গাদার নিচে এক কলসি মহুয়া রাখা ছিল,চারমাসের পুরনো। একটা হাতি এমন রসিয়া যে গন্ধে গন্ধে এসে খুঁজে পেতে ঠিক বের করে ফেলল।"

"তারপর দাদু?

"তারপর ব্যাটা বজ্জাত শুঁড় ডুবিয়ে চোঁ চোঁ কলসি খালি করে দিল। এরপর ওরা কলসি খোঁজে, শোঁকে আর আসল জিনিস না পেয়ে যত মাটির হাঁড়ি সমানে ভাঙে। শেষে অনেক হাঙ্গামা করে দলটাকে তাড়ানো গেল।"

"অ্যাই দদুয়া, তোর অত কথায় দরকার কী, আর আপনিও বাবুজি, ওইসব গল্প করার আর লোক পেলেন না!"

নদী থেকে ফিরে এসেছে মা; মাথা থেকে নামিয়েছে পেতলের কলসি দুটো। এসেই দদুয়াকে ফ্যাঁশ করে উঠেছে। আর দাদুও বহুজি বা ছেলেবৌয়ের এই অভাবিত খিঁচিয়ে ওঠায় কেমন যেন মিইয়ে গেছে।

দদুয়া অবাক হয়ে মাকে দেখতে থাকে। মা সকাল সকাল নদী থেকে একবারে চানটান সেরে কাপড় ধুয়ে এসেছে। কলসি ভরে এনেছে খাবার জল। ঘরের সামনের সরকারি পাতকো'র জল বড্ড খারা; ওতে খালি বাসন ধোয়া, ঘর সাফ করা- এইসব হয়। মার গালে ভিজে চুল লেপটে রয়েছে, এখনও চুলে চিরুনি পড়ে নি, কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে।

কিন্তু দাদু অমন চুপ মেরে গেল কেন?

"মা, একটু বিরামদের বাড়ি যাই?"

মা কি না বলতে একটু সময় নিল?

"বেশি দেরি করব না, একটু খেলেই ঘরে এসে যাব।"

"না বলেছি তো!"

"কেন মা ? কাল ওদের বাড়িতে হাতি এসেছিল, অনেকগুলো।"

মা একদিকে ঘাড় কাত করলো।

"তাহলে যাই? ওকে একটু দেখে আসি?"

মা দু'দিকে ঘাড় নাড়ল।

"কাল তো ওদের ধানের মরাই, তরিতরকারির বাগান সব তহস- নহস হয়ে গেছে। দাদু বলেছে।"

মা আর দাদু কি চোখে চোখে কিছু বলল? এবার মা রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

"বাবা কখন আসবে, দাদু?"

"বাবা গেছে বনবিভাগের অফিসে, ফিরতে দেরি হবে।"

"কেন গেছে?"

"বনের হাতি এসে ঘর ভাঙলে, ফসল তহস- নহস করলে, মানুষ মারলে আমাদের লোকসান হয়। তখন নালিশ করলে সরকার বাহাদুর আমাদের টাকা দেয়, তাই।"

"হাতিগুলো খুব খারাপ, মিছিমিছি কেন লোকসান করে? কেন বোঝে না যে অমন করতে নেই?"

"ওরা রেগে আছে। রাগলে তো কারো হুঁশ থাকে না;হাতির কী দোষ!"

"কেন রেগে আছে?"

"তাহলে একটা গল্প শোন, খেয়াল রেখে, ভাই না উঠে পড়ে!"

দদুয়া একনজর ভাইয়ের দিকে তাকায়। ছোট্ট ভাইটা কেমন ঘুমুচ্ছে। বুকটা ধীরে ধীরে উঠছে নামছে। হাঁ- মুখের পাশে গালে নাল শুকিয়ে রয়েছে। একটা মাছি উড়ে উড়ে বসছে। দদুয়ার মনটা ছোট্ট অবোধ বোকা ভাইটার জন্যে কেমন ভিজে যায়। ও মাছিটাকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর গল্পের কথা মনে পড়তেই দাদুর দিকে তাকায়। দাদুও মুখে এক চুটকি খৈনি ঠুসে শুরু করে।

“সে অনেক কাল আগের কথা। তখন এই এলাকা জুড়ে ছিল শুধু বন, বন আর বন। না ছিল লোকের বসতি, না মানুষজনের আনাগোণা। এখানে ছিল হরিণের পাল, হাতির দল আর পাখি। আর এই বনে ছিলেন এক দেবী, এদের সবার দেবী। বনদেবী।

“পরমাসুন্দরী সেই দেবীকে কেউ দেখেনি, মানে কোন মানুষ। কিন্তু বনের পশুপাখিরা সবাই জানে তিনি খুব সুন্দর। তাঁর কথা ছড়িয়ে পরে বন থেকে বনের বাইরে, লোকালয়ে, জনপদে। সেই খবর ধীরে ধীরে পৌঁছে গেল রাজদরবারে। রাজা উতলা। অমন পরমাসুন্দরী নারী কেন বনে থাকবেন? তাঁর উপযুক্ত স্থান হল রাজপ্রাসাদ। সেখানে তৈরি হল এক মন্দির,সোনার পাতে মোড়া। দেবীর আবাস, দেবী থাকবেন তাই।

“কিন্তু দেবী কোথায়?

“রাজার তরফ থেকে একদল গেল বনে ফল- ফল-  পাদ্য- অর্ঘ্য নিয়ে। তারা বনদেবীর থানে পুজো দিল। প্রার্থনা করল—মাতঃ! আপনি বন ছেড়ে রাজপ্রাসাদে চলুন। রাজা ডেকেছেন। সেখানে আপনি খুব যতনে থাকবেন, খুব আরামে।

“কিন্তু কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। গাছের পাতা নড়ল না। ফুল টুপ করে খসে পড়ল না। দেবী কোথায়?

“দলটা ফিরে গিয়ে জানাল যে দেবী রাজার পুজো গ্রহণ করেন নি।

“রাজা রেগে গেলেন। পরমাসুন্দরী নারীর এত অহংকার! রাজা হলেন ভগবান, তাঁর আদেশ অমান্য করা! বন্দি করে নিয়ে আয় ওই জঙ্গলের রানিকে।

“এবার ধেয়ে এল এক দল সেনা। তারা খুঁজতে লাগল জঙ্গলের আনাচকানাচ। তলোয়ারের কোপে উড়িয়ে দিল গাছের ডাল, লতাপাতা। খুঁড়ে ফেলল দেবীর থান, কোথায় লুকোবেন তিনি?

“কিন্তু দেবী উধাও। রাজার সেনা খোঁজ পেল না।

“তা বললে হবে? ফিরে গিয়ে   রাজাকে কী বলবে? তাই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিণের পালের ওপর, হত্যা করল পাখির ঝাঁক। কেন বলছে না ওরা দেবী কোথায়? এইবার খেপে উঠল হাতিরা।দলে দলে শুঁড় তুলে ডাক দিল ভাই বেরাদরদের।শাঁখের আওয়াজের মত সেই ডাক ছড়িয়ে পড়ল বন থেকে বনান্তরে। আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে ধেয়ে এল হাতি। তাদের পায়ের চাপে পিষে গেল রাজার সৈন্য। তাতেও থামল না ওরা। হামলা করল রাজধানীতে, রাজার খোঁজে।

“এমন আজব লড়াইয়ের জন্যে তৈরি ছিল না রাজার ফৌজ। একটু পরেই ওরা রণে ভঙ্গ দিল।রাজা নিজে পালিয়ে বাঁচলেন। মন্ত্রী- পাত্র- মিত্র- অমাত্যর কথা নাই বললাম।কিন্তু হাতিরা খুনে নয়। ওরা শুধু রাজাকে চায়। ওরা জেনে গেছে যে রাজার জন্যেই দেবী এখন অদৃশ্য হয়েছেন। রাজা সরে গেলে ঠিক দেখা দেবেন।

“তাই ওরা আজও রাজাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেজন্যে মাঝে মাঝে লোকালয়ে হানা দেয়। ঘর ভেঙ্গে ধানের মরাই পিষে দেখতে চায় “-  কোথায় লুকিয়ে আছে সেই দুষ্টু রাজা!”

“- দদ্দা! কিস্‌কুচাচার বাড়িতে হাতিরা কেন হামলা করল? ওরাও কি রাজাকে লুকিয়ে রেখেছিল?”

দাদু উত্তর দেবার আগে খড়খড়- ঝরঝর করতে করতে একটা জিপগাড়ি এসে ওদের বাড়ির সামনে থামল।তার থেকে নামল একজন টুপি মাথায় কোটপ্যান্ট পরা গম্ভীর মত লোক। সঙ্গে বন্দুকধারী দুজন বনরক্ষী। শুধু তাই নয়, জিপগাড়ির পেছনদিক থেকে নামছে বাবা আর কিস্‌কুচাচা। বারবার ধুতির খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছছে চাচা।

কোটপ্যান্ট পরা লোকটাকে সবাই সাহেব- সাহেব করছে। উনি খাটিয়ায় বসে গম্ভীর মুখে কিছু কাগজপত্তর বের করে সামনে রাখলেন।

"হাতির হামলায় আহত বাচ্চাটির নাম?"

"বিরাম কিস্‌কু সাহেব।"

"বাপের নাম? সাকিন?"

"বাপ মনোহর কিস্‌কু। সাকিন- মুকুন্দপুর। জেলা"সরগুজা। রাজ্য- ছত্তিশগড়।"

প্রথমে কিস্‌কুচাচা তারপর বাবা তাতে বুড়ো আঙুলের টিপছাপ দিল।উনি বললেন, "যা হবার তা হয়ে গেছে। ছেলেটা প্রাণে বেঁচেছে এই যথেষ্ট। হাতির পায়ের নিচে না পড়লেও ঘরচাপা পড়ে কম লোকই বাঁচে। তোমার ছেলেটা বেঁচে তো গেছে। সাতদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। বনদেবীর কৃপা! সোমবার আমার অফিসে এসে টাকাটা নিয়ে যেও। আর

ফরেস্ট গার্ড দু'জন এক সপ্তাহ তোমাদের বাড়ি থাকবে। মানে হাতির দলটা চলে না যাওয়া অবধি। আর আজ এলে একটু দূর থেকে পটকা ফাটাবে টিন বাজাবে।"

দদুয়া চমকে ওঠে। বিরাম কিস্‌কু! ওর বন্ধু? হাসপাতালে! তাই আজ খেলতে আসেনি? মা লুকিয়েছে! দদুয়াকেও ওদের বাড়ি যেতে দেয় নি।

সাহেবের জিপ চলে যেতেই হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে কিস্‌কুচাচা। বাবা ওর পিঠে হাত বুলোয়, "কিছু ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। সাতদিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। বিরাম ঘরে ফিরে আসবে। ইয়ে হাতি শাঁলো কো অগলেবার নেহি ছোড়েঙ্গে।"

মনোহর কিস্‌কু হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে, ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক টানে।তারপর লাঠি হাতে উঠোন পেরিয়ে যেতে যেতে বলতে থাকে, "মিছে গাল দিচ্ছিস, ওদের কোন দোষ নেই রে! সব দোষ আমাদের। তুই আর আমি সেবার ঠিকেদারের দালালকে তিন গাড়ি কাঠ বেচে দিইনি? আমরাই তো জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছি। হাতিদের ঠেক ভেঙে দিয়েছি, তো ওরা যাবে কোথায়! তুই আমার ঘর ভাঙলে আমি তোকে ছেড়ে দেব? ভেবে দ্যাখ।"

**ছবি- শিমুল**

জয়ঢাক গল্প প্রতিযোগিতা’২০১৪
তৃতীয় সেরা (২)

# বাউটম্যানের বাংলো

পুষ্পেন মন্ডল

(এক)

ঠক্ ঠক্ ..... ঠক্ ঠক্ ..... ঠক্ ঠক্ .....

অরিন্দমের ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে মনে বলল, “উফ এই আবার শুরু হল!” গত তিনদিন ধরে এটা চলছে। প্রত্যেকদিন রাত্রে ছাদের উপরে অদ্ভুত একটা আওয়াজ, কেউ যেন হাতুড়ি ঠুকছে। প্রথমদিন ভেবেছিল বাংলোর কেয়ারটেকার বংশী বুঝি কোন কারণে ছাদের ঘরে গিয়ে কিছু ঠোকাঠুকি করছে। কিন্তু নাঃ। একটা হাঁক দিতেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। পরেরদিন সকালে বংশীকে বলতে সে আকাশ থেকে পড়ল। বলে, “আমি বাবু নটার মধ্যে শুয়ে পড়ি, ভোর হলে তবে ঘুম ভাঙে। আমি কেন রাতবিরোতে ঐ ঘরে যাব। তাছাড়া ও ঘরতো কোন দিন খোলা হয়না।”

পরের দিন রাতে আবার একই আওয়াজ। অরিন্দম বিছানা থেকে উঠে পড়ল। টর্চ নিয়ে চুপিসারে সিঁড়ি দিয়ে উপরে গেল। আওয়াজটা ঘরের ভিতর থেকেই আসছে। কিন্তু বাইরে থেকে তালা দেওয়া। পুরানদিনের বেশ বড়ো তালা। মরচে পড়ে গেছে। দেখলেই বোঝা যায় অনেকদিন খোলা হয়নি। তাহলে কি অন্য কোন রাস্তা আছে এই ঘরে ঢোকার? একেবারেই অসম্ভব নয়। কারণ এই ইংরেজ আমলের বাংলোটার এমনই যে একই ঘরে ঢোকার দু-তিনটে

রাস্তা আছে। বাড়ির ভিতর দিয়েই সব ঘর থেকে সব ঘরে যাওয়া যায়। নিচের তলায় মোট চারটে বড়ো শোয়ার ঘর, প্রত্যেকটির বাইরের দিকে একটি করে প্রধান দরজা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে কেয়ারটেকার থাকার আলাদা ঘর। কোন ইংরেজ সাহেব নাকি এই বাংলোটা তৈরি করিয়েছিলেন। শিকারের জন্য। দামি দামি মেহগনি আর আবলুস কাঠের আসবাবের পাশাপাশি বড়ো বড়ো বাঘ, চিতা, বাইসনের স্টাফ্ও জায়গা করে নিয়েছে সব কটা ঘরেই। পিছনেই ঘন জঙ্গল। বাংলোর নিচে আবার চোরকুঠুরিও আছে। বহুকাল সে দরজা তালাবন্ধ।

অরিন্দম দরজায় দুম্ দুম্ করে দুবার ধাক্কা দিতেই ভিতরের আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল।,

"ভিতরে কে? কে?" দুবার চিৎকার করল। কোন শব্দ পাওয়া গেল না। ছাদে একটাই বড়ো ঘর। বাকি ছাদটা পুরো ফাঁকা। টর্চ ঘুরিয়ে পুরো ছাদটা দেখে নিল সে। কার্নিশের ধারে গিয়ে বাংলোর পিছনে আলো ফেলল। জঙ্গলের মধ্যে সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। বেশ কিছুক্ষণ দেখে নিচে এসে ঘরে শুয়ে পড়ল।

পরেরদিন সকালে বংশীকে ডেকে অরিন্দম বলল, "কাল রাতে কোন শব্দ শুনেছিলে?"

"না বাবু।"

"আবার সেই আওয়াজ হচ্ছিল উপরের ঘরে। কী আছে ও ঘরে?"

"কিছু নেই বাবু। কাঠের আসবাব আছে কটা। চুহা আওয়াজ করতে পারে।"

"ইঁদুর অত জোরে কী করে আওয়াজ করবে ? ঘরটা একবার খোলা যাবে?"

"না বাবু, ওঘরের চাবি তো আমার কাছে নেই। বড়োবাবুর কাছে থাকে।"

"মানে গুপ্তাবাবুর কাছে?"

"আজ্ঞে হাঁ বাবু।"

"তুমি কত বছর আছ এই বাংলোতে?"

"তা প্রায় দশ বছর। গ্রামের লোক বলে এ বাংলোতে নাকি ভূত আছে। আমি গরিব আদমি। পেটের দায়ে কাজ করি। তবে এতদিনে কোন ভয়ের কিছু দেখিনি। আমার আগে যে লছমন্ নামে বুড়া আদমি থাকত সে দেশে চলে যাওয়ার সময়ে বলেছিল, 'ঐ উপরের ঘর কোন দিন খুলবিনা।' "

অরিন্দম ভাবলো, বড়োবাবুর সাথে তাঁর সম্পর্ক তো খুবই ভালো। অফিস থেকে ফেরার সময়ে চাবিটা চেয়ে নিয়ে আসবে। এক সপ্তাহ হল সে এই বাংলোতে উঠেছে। ছোট্ট একটা টিলার মাথায়, জঙ্গলে ঘেরা। দারুণ পরিবেশ। সে আর বংশী ছাড়া এতো বড়ো বাংলোতে কেউ থাকেনা। প্রায় একশ বছরের পুরানো বাড়ি। সরকারি অফিসার আর ইনজিনিয়াররা মাঝে মাঝে এসে থাকেন বলে সংস্কারটা হয়। দু কিলোমিটার দুরে একটা ব্যারেজ আছে সেচদপ্তরের। ঘুমসিপাহাড়। সেটা মেরামতির কাজ চলছে। তাই মাসছয়েকের জন্য এখানেই থাকতে হবে তাকে। বড়োবাবু অবশ্য রোজ এখানে আসেন না। এ জায়গাটা ছোটনাগপুর মালভূমির মধ্যে পড়ছে। পুরোটাই জঙ্গলে মোড়া। উঁচুনিচু পাহাড়ের সারি। একেবারেই নির্জন। জনবসতি খুব দুরে দুরে। জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসীরাও কিছু থাকে।

ব্যারেজসংলগ্ন অফিসে গিয়ে জানতে পারল বড়োবাবু আজ আসবেন না। কেরাণি প্রসাদ বলল, "পুরানো বাংলোর সব চাবি বড়োবাবুর দেরাজের মধ্যে থাকে। দেরাজের চাবি বড়োবাবুর কাছে। কেন স্যার কিছু হয়েছে?"

"গত দুদিন ধরে মাঝরাত্রে আমার উপরের ঘর থেকে কিছু আওয়াজ হচ্ছে। তাই ভাবছিলাম ঐ ঘরটা একবার খুলে দেখব।"

"কোন চুহা বিল্লি নয় তো ? কোলকাত্তার বাঙালিরা আবার একটু বেশিই ডরপোক হয়। হাঃ হাঃ হাঃ"

"না না, তা নয়। বেশ জোর আওয়াজ। হাতুড়ি দিয়ে যেন কেউ মেঝেতে ঠুকছে ....... ঠক্ ঠক্ করে।"

"সে কী ! স্বপ্ন দেখেননি তো ? আমরা এতদিন কাজ করছি এখানে কোনদিন শুনিনি কিছু। কত বাবুরা ওখানে থেকে গেছেন। কেউ কিচ্ছু বলেননি।"

অরিন্দম আর কথা না বাড়িয়ে ওয়ার্ক সাইটে চলে গেল। বাংলোয় ফিরতে ফিরতে বিকাল গড়িয়ে সাড়ে পাঁচটা ছটা বাজল। হেঁটেই যাতায়াত করে ও। সারাদিনের কাজের মধ্যে কথাটা মনেই ছিল না।

রাত্রে আবার এক ব্যাপার। শুরু হল সেই আওয়াজ। রাত্রি দুটো থেকে তিনটের মধ্যে শব্দটা হচ্ছে প্রতিদিন। এখন ঘড়িতে দুটো পনের। কী থেকে এরকম আওয়াজ হতে পারে? মানুষ ছাড়া কোন প্রাণীর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন চোর ডাকাতের কাজও এটা নয়। তারা চুরি করার সময় আওয়াজ করে লোক ডাকবে কেন? ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক।

অরিন্দম উঠে পড়ল। টর্চ আর একটা লোহার রড নিয়ে ঘর থেকে বের হল। আজকে বংশীকে আগে ডাকতে হবে। দরজায় দুবার দুম দুম করে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল সে, "বাবু, আজকে আমি জেগেই ছিলাম। আওয়াজটা শুনেই উঠে পড়েছি। চলুনতো দেখি কী ব্যাপার।"

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ঘরের দরজায় কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। ভিতর থেকে একটা ধাতব শব্দ আসছে। কোন হাতুড়ি বা ছেনি দিয়ে লোহার উপরে আঘাত করলে যেমন শব্দ হয়। পুরানো কাঠের দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে কিছু দেখা যায় কিনা চেষ্টা করল। ভিতরটা গাঢ় অন্ধকার। জানালাগুলিও ভিতর থেকে বন্ধ। অরিন্দম লক্ষ করল পাশের দিকে একটা জানালার উপরের কাচ ভাঙা। বংশীকে চাপা গলায় বলল, "আমাকে একটু চাগিয়ে ধরতে পারবে? ঐ ভাঙা জানালা দিয়ে একবার আলো ফেলে দেখি।"

তাকে চাগিয়ে ধরতে টর্চসমেত ডানহাতটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। আলো পড়তে দেখা গেল চারিদিকে অপরিষ্কার নোংরা ঝুলে ভর্তি। কোনের দিকে একটা খাট, তোষক গদি নেই, দুটো চেয়ার, একটা বড়ো দেয়াল আলমারি, একটা বুকসেলফ, বড়ো একটা কাঠের টেবিল আর একটা বেশ বড়ো লম্বাটে বাক্স ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা রয়েছে। আওয়াজটা তখনও হচ্ছে। সম্ভবত ঐ বাক্সটা থেকেই। কিসের বাক্স ওটা? কাঠের না ধাতুর? অনেকটা বিদেশি কফিনের মত। হলিউডের ছবিতে অরিন্দম এরকম কারুকার্য করা কফিন দেখেছে। কী আছে ওটার ভিতরে ? আওয়াজটা কীভাবে হচ্ছে ? বাক্সটা মনে হচ্ছে হাল্কা নড়ছে।

হঠাৎ 'বাবাগো' বলে বংশী বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অরিন্দমও পড়ে গেল দড়াম করে। ভাঙা কাচে লেগে হাতটাও কেটে গেল। আর টর্চটা সশব্দে পড়েছে ঘরের ভিতরে। পড়েই নিভে গেছে। আর সেই মুহুর্তে আওয়াজটাও থেমে গেল। বংশী শুয়ে পড়ে পাটা চেপে ধরে মুখটা বিকৃত করে, "উরে বাবারে ! মরে গেলাম রে!" বলে চিৎকার করতে লাগল।

"কী হল?"

"বি...বিছে .....!"

"কোথায়?" বলতেবলতেই অরিন্দমও ছিটকে উঠে পড়ল। আবছা অন্ধকারে ভালো করে খেয়াল করে দেখল দেয়ালের গায়ে বড়ো বড়ো ফাটল। এগুলি নিশ্চয় বিছেদের অনেক পুরানো দুর্গ। বংশীকে ধরে ধরে নিচে নামিয়ে আনল। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে। ঘরে পান খাওয়ার চুন ভিজানো ছিল মাটির খুরিতে, অনেকটা চুন ক্ষতস্থানে দিয়ে বেঁধে দিল। সকাল হলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

একটু ধাতস্থ হতে অরিন্দম নিজের ঘরে এল। ব্যাপারটা এখনও মাথাতেই ঢুকছেনা।

## (দুই)

বুবুন চেঁচিয়ে উঠল, "ইয়ে............. ইয়ে........... আবার একটা ..........."

"চুপ.. চুপ.. অতো জোরে চেঁচালে ওটা উড়ে যাবে। ওটা গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিল,"রুদ্র বলল, "সাবধানে আয়,সামনে কাঁটা গাছ।"

পাখিটা বেশ বড়ো এবং রঙচঙে। মাথার উপরে যেন হলুদ রঙের জলদস্যুদের মত লম্বাটে টুপি। ঠোঁটটাও বেশ লম্বা। গায়ের রঙ সাদাকালো মেশানো। ঠোক্ .....ঠোক্ .....ঠোক্ .......করে ডাকছে মাঝে মাঝে।

রুদ্রর হাতে একটা বড়ো টেলি লেন্স লাগানো ক্যামেরা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছবি তুলল পাখিটার। জঙ্গলে ঘোরা ওর এখন নেশা হয়ে গেছে। এবারে বুবুনের স্কুল ছুটি, তাই জোর করেই রুদ্রর সাথে এসেছে। বুবুন ক্লাস সিক্সে পড়ে। এদিকে জঙ্গলের মধ্যে একটা বড়ো ঝিল আছে। বেশ কিছু পরিযায়ী পাখি এসময়ে এখানে ঘাঁটি গাড়ে। তার সঙ্গে এদেশীয় পাখিরাও থাকে।

ভালো কিছু ছবি তুলতে পারলে একটি পত্রিকায় ছাপবে। আগেও বেশ কয়েকবার ছেপেছে। ম্যাপ দেখে দেখে এগোচ্ছে ওরা। জঙ্গলটা বেশ ঘন আর পাথুরে। রাস্তা বলতে তেমন কিছুই নেই। দেখে মনে হয় সাধারণ মানুষের পা এদিকে খুব একটা পড়ে না। কখনও চড়াই কখনও উৎরাই। মাঝে মাঝে দু-একটা টিলাও পড়ছে। পথে একটা ছোট্ট পাহাড়ি ঝর্ণা ছিল। শ্যাওলায় মোড়া পাথর, তার পাশে নাম না জানা হরেক রঙের থোকা থোকা ফুল। কী দারুণ! ঠিক যেন বিভূতিভূষণের আরণ্যক-এর লবটুলিয়া বৈহারের সরস্বতী কুন্ডী। জঙ্গলের মধ্যে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন পাখির অচেনা ডাক। একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ।

মাঝে ওরা একবার একটু জিরিয়ে নিল। রুদ্র পাথরের উপর পিঠ দিয়ে শুয়ে ভাবছিল, কত যুগ কেটে গেছে এইখানে, এই পাথর, এই প্রাচীন বৃক্ষ, এই ঝর্ণা, একই রকম রয়ে গেছে।

মানুষ এক সময়ে পৃথিবীতে এসেছে, জঙ্গল কেটে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহর বানিয়েছে। সভ্যতা এগিয়েছে হু হু করে। এক সময়ে ধরণী ছিল যাদের দখলে তারা এখন বিপন্ন, মানুষের কাছে হার মেনে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে শহর থেকে বহু দূরে নিজেদের লক্ষ কোটি বছরের ইতিহাসকে জড়িয়ে।

পুকুরুক্.... পুকুরুক্.... পুকুরুক্..... করে একটা ডাক শোনা যাচ্ছিল কিছুক্ষণ ধরে। একটা বড়ো বট গাছের পাতার আড়ালে। বুবুনকে বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখতে বলল রুদ্র। বুবুন ভালো করে লক্ষ করল প্রায় ময়নার আকারের পাখিটির মাথার উপরের রঙ লাল, চোখের উপরে কালো, গলা ও মাথার পাশটা নীল আর শরীর সবুজ। "ভালো করে দেখ," রুদ্র বলছিল, "এর নাম নীলকণ্ঠ বসন্তবৌরি, ইংরাজীতে ব্লু থ্রোটেড বারবেট। এদের প্রিয় খাদ্য বটফল।"

আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। আরো কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ একটা বিশাল খিরিশ গাছের পাশ থেকে একজন রোগা কালো লোক বেরিয়ে চিৎকার করে উঠল, "ভাগো...... ভাগো........ উধার মত যাও।"

ওরা চমকে উঠে পিছিয়ে এল। বেঁটেখাটো মাঝবয়সি লোকটার হাড়ের উপর শুধু চামড়াটা লেগে আছে। কোটরে ঢোকা চোখ। পরণে একটা ময়লা শতছিন্ন কাপড়।

"কে তুমি?" রুদ্র চেঁচিয়ে উঠল, "আমাদের রাস্তা ছাড়ো।"

"ওদিকে যেও না। মরবে.....সবাই মরবে।" বলেই গাছের আড়ালে চলে গেল সে। বুকসমান ঝোপের মধ্যে দিয়ে সরীসৃপের মত উধাও হল ।

"কী ব্যাপার বলো তো রুদ্রদা? লোকটা কে?"

"দেখেই বোঝা যায় পাগল। ও নিয়ে মাথা ঘামাস না। চল এগোই।"

"রাস্তা চিনে ফিরতে পারবে? এ জঙ্গলে আগে এসেছ কখনও?"

"না। এই প্রথম। তবে চিন্তা করিসনা। ম্যাপ আর কম্পাস ঠিক থাকলে কোন অসুবিধা হবে না।"

আরো এক ঘন্টা চলার পর রুদ্র বলল, "কী ব্যাপার বল তো? এতক্ষণে তো ঝিলটার দেখা পেয়ে যাবার কথা। হাতিবাড়ির বনবাংলো থেকে সোজা উত্তর-পশ্চিম কোন বরাবর হাঁটাপথে দু-ঘন্টা বলেছিল। এখন প্রায় সাড়ে-তিন ঘন্টা হতে চলল। ঝিলটা তো দেখা যাচ্ছেনা!"

"রাস্তা তাহলে ভুল হয়েছে?"

"কম্পাস ধরে ধরে উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবরই হাঁটছি আমরা। ভুল হবে কেন?"

"এখন উপায় ?"

"একটা খুব উঁচু গাছের মাথায় উঠে দেখতে হবে ঝিলটা কাছাকাছি আছে কিনা। না হলে ফেরার রাস্তা ধরব। বিকেলের আলো থাকতে থাকতে বনবাংলোয় পৌঁছে যাব। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

"কোন গাছে উঠবে?"

"বেশ উঁচু অথচ নীচের দিকে ডালপালা আছে এরকম গাছে ওঠাই সুবিধাজনক। চল দেখি সামনে।"

একটু এগোতেই একটা লম্বা গাছ চোখে পড়ল। রুদ্র বলল, "মোহনচূড়া, এতে উঠতে খুব একটা অসুবিধা হবেনা, অনেক ডাল-পালা রয়েছে। তুই নিচেই দাঁড়া। বলে পিঠের রুকস্যাকটা খুলেরেখে দুরবিনটা গলায় ঝুলিয়ে ডালপালা খামচে ধরে ধীরে ধীরে উঠে গেল।

বুবুন পাশেই একটা বড়ো পাথরের উপরে বসল। সকাল থেকে অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে। একটু বসতে পেরে ভালোই লাগলো। এই জঙ্গলকে ভালো লাগার নেশাটা ক্রমে ওকেও গ্রাস করছে। লক্ষ করল পাথরের উপর দিয়েই বড়ো বড়ো লাল পিঁপড়ের সারি চলেছে। অসাবধানে পায়ের নিচে বেশ কয়েকটা পিঁপড়ে চাপা পড়ল। এগুলোর নিশ্চয়ই খুব বিষ। চারপাশেই ছোট বড়ো গাছের ছাওয়ায় ঝুপসি অন্ধকার হয়ে আছে। কোথা থেকে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে নাকে।

হঠাৎ পিছনে সরসর করে একটা আওয়াজ হতেই চমকে উঠে পিছনে ঘুরে দেখল প্রায় নিঃশব্দে জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটি অদ্ভুত প্রাণী। দেখতে অনেকটা পিঁপড়েই মত। কিন্তু আকারে অনেক বড়ো। মাটি থেকে উচ্চতা প্রায় চার-ফুট। চার পায়ে হাঁটছে। পায়ের আঙুলগুলি অনেকটা মানুষের মত। মুন্ডুটা গোল আর বেশ বড়ো। দুটো শুঁড় আছে। পিঠের উপর একটা কচ্ছপের মত ঢাল। রঙ সাদা। জীবনে এরকম প্রাণী কোনদিন দেখেনি বুবুন। এমনকি টিভিতেও নয়।

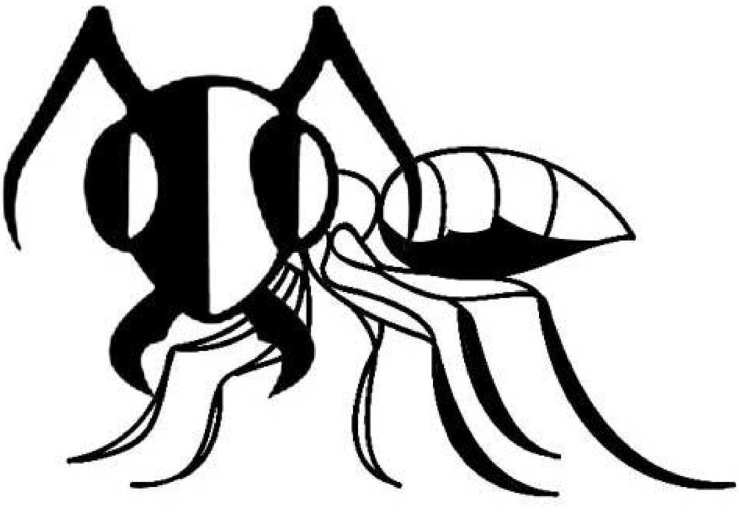

কাছে এসেই হঠাৎ তারা পিছনের দু-পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তারপর শিসের মত একটা শব্দ করল। আর বুবুন পাথর থেকে ঝুপ করে গড়িয়ে পড়ে গেল।

## (তিন)

অরিন্দম পরের দিন অফিস থেকে ফেরার সময়ে একজন স্থানীয় বয়স্ক কামারকে ডেকে নিয়ে এল। বড়োবাবু সেদিনও আসেননি। অতএব তালার চাবি পাওয়া যায়নি। কামার তালাটা ভাঙল অনেক কষ্ট করে।

বলে, "বাবু ইয়ে তালা তো বহুত পুরানা হ্যায়।"

"কতনা পুরানা?"

"করিবন সও-দেড়সও সাল পুরানা।"

বিকালের আলো তখন কমে এসেছে। ঘরের ভিতরটা একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ। ছাদের কড়িকাঠ থেকে তিনটে বাদুড় ঝুলছে। গোটা ঘরটা ঝুল আর নোংরায় ভর্তি। আরশোলা, ইঁদুর, বিছে .... এদেরই রাজত্ব।

"বংশী, আগে জানালাগুলো খুলে দাও," অরিন্দম বলল।

বাইরের হাওয়া ঢুকতে ভ্যাপসা গন্ধটা একটু কাটল। অরিন্দম এগিয়ে গেল মাঝের কফিনটার দিকে। কালো ধাতব পাতে মোড়া বেশ বড়োসড়ো কফিন। খৃষ্টানরা সমাধি দেওয়ার সময়ে এ'ধরণের কফিন ব্যবহার করত অনেক কাল আগে। এর গায়েও একটা জাঁদরেল তালা লাগানো রয়েছে। সে আরও লক্ষ করল কফিনের গায়ে কিছু আঁকিবুঁকি কাটা আছে। এটা আবার কোন ভাষা?

"এটা ভাঙো," অরিন্দম লোকটাকে বলল।

"না বাবুজি। আমি এ তালা ভাঙব না," মাথা নাড়ল লোকটা।

"কেন?"

"আমার ঠাকুরদা বলত এ বাংলোতে বাউটম্যানের ভূত আছে। এই কফিনের কথা আমরা ছোটবেলা থেকে জানি।"

"ভূত বলে কিছু হয় নাকি ? কী শুনেছ ছোটবেলায়?"

"আমার জন্মের অনেক আগের কথা। বাউটম্যান নামে এক সাহেব ছিল। খুব শয়তান। বহু লোককে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। এই বাংলোটা ওরই তৈরি। সাহেব প্রায় আসত এখানে শিকারের জন্য। একদিন এই পিছনের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে বিপ্লবীদের গুলিতে মারা যায়। তারপরে জঙ্গলে মড়ক লাগে। জন্তু জানোয়ার, গ্রামের পর গ্রাম মহামারীতে উজাড় হয়ে যায়।

"শেষে হিমালয়ের এক সাধু এসে নাকি মন্ত্রবলে সেই ভূতকে এই কফিনের মধ্যে বন্দি করে দিয়েছিলেন। কফিনের তালা ভাঙলেই সর্বনাশ। বাউটম্যানের ভূত কাউকে ছাড়বেনা।"

"এই দুহাজার বারো সালে এসে ভূতের গল্প শুনতে ভালোই লাগছে। কিন্তু বিশ্বাস হয়না। যাই হোক তালাটা ভাঙো। রোজ রাতে বিদঘুটে আওয়াজ আমার ঘুম ভাঙাচ্ছে। এর ভিতরে কী আছে দেখতেই হবে।"

"না বাবুজি। আমি পারব না। আপনি শহরের আদমি আছেন। আপনি বিশ্বাস করতে না পারেন, আমরা জানি এ শয়তান ভূত।

"তাহলে হাতুড়িটা আমাকে দাও। আমিই ভাঙছি।" বলে অরিন্দম জোর করে বড়ো হাতুড়িটা কেড়ে নিয়ে দড়াম দড়াম করে তালাটায় আঘাত করল। বংশী আর কামার দুজনেই অনেক করে মানা করল, কিন্তু অরিন্দম কোন কথাই কানে নিল না।

বারদশেক আঘাত করতে তালাটা ভেঙে গেল। হাতুড়িটা নামিয়ে রেখে কফিনের ঢাকনার হ্যান্ডেল ধরে সজোরে একটা টান দিল অরিন্দম। কিছুই হল না। বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সম্ভবত মরচে পড়ে জ্যাম হয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও লাভ হল না। ঘেমে গেছে অরিন্দম। একটা শাবল নিয়ে এসে ঢুকিয়ে খুব জোরে চাপ দিল। তাও খুলল না। একার পক্ষে এটা খোলা সম্ভব নয়। বাকি

দুজন তো ভয়েই আধমরা হয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে রামনাম জপ করছে। তারা কিছুতেই হাত লাগাবেনা।

অগত্যা চেষ্টা ছাড়তে হল। অরিন্দম মনে মনে বলল, কালকে ব্যারেজের কাছ থেকে সাঁওতালি মুন্ডাদের ডেকে নিয়ে আসতে হবে। ওরা পয়সা পেলে শয়তানকেও ভয় পায়না।

কথাটা মনে মনে ঠিক করে নিয়ে সে বিরক্ত হয়ে ঘরের বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

## (চার)

রুদ্র মোহনচূড়া গাছটার মাথায় যতদূর সম্ভব উপরে উঠল। তারপর দুরবিন চোখে লাগিয়ে দেখল কোথাও কোন জলাশয় বা ঝিল কিছুই নেই। তাহলে নিশ্চয়ই রাস্তা ভুল হয়েছে। তাহলে কি ম্যাপটাই ভুল না কম্পাস কাজ করছে না? ম্যাপ ভুল নয়, কারণ হাতিবাড়ির বনবাংলোর কেয়ারটেকার এই রাস্তার কথাই বলেছিল। অবশ্য সঙ্গে এও বলেছিল যে এ রাস্তায় কেউ যায় না। কেন যায় না সেটা অবশ্য বলেনি। আর সেই পাগলটা ......... যে জঙ্গলের মধ্যে চেঁচাচ্ছিল ....... ভাগ যাও .....ভাগ যাও .....

ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে লাগছে। কম্পাস যদি কাজ না করে তাহলে ফিরবে কী করে ? এখানে মোবাইলেরও টাওয়ার নেই। ভাবতে ভাবতে গাছ থেকে নেমে এলো রুদ্র।

কিন্তু নিচে বুবুন নেই। লাগেজ দুটো পড়ে আছে। কোথায় গেল সে?

অনেকক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বুবুনকে ডাকল সে। চেঁচিয়ে গলা ধরে গেল। কিন্তু কোন সাড়া নেই। আশ্চর্য! মাথা ঝিমঝিম করছিল রুদ্রর। সে এখন কী করবে? এতবড়ো জঙ্গলের মধ্যে কোথায় খুঁজে পাবে বুবুনকে? তাকে না নিয়ে কী করে বাড়ি ফিরবে?

নাঃ। আর ভাবতে পারছে না রুদ্র।

"বুবুন............ বুবুন..........."

পাখিরা আওয়াজ শুনে কিচিরমিচির করে উড়ে পালাচ্ছে। উদভ্রান্তের মত জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে বেড়োাচ্ছে রুদ্র। দিকবিদিক জ্ঞান নেই।

হঠাৎ একটা গুল্মলতায় পা জড়িয়ে টাল সামলাতে না পেরে সে ছিটকে পড়ল দড়াম করে। মাথাটা গিয়ে লাগল একটা পাথরের উপর। অন্ধকার নেমে এল চোখের সামনে। ঝরা পাতার মধ্যে হড়কে একটা বড়ো গর্তের মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে পড়তে লাগল সে।

******

অরিন্দমের ঘুমটা আপনা থেকেই ভেঙে গেল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে। বালিশের পাশেই টর্চ রাখা থাকে। সেটাও নেই।

ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল সে। মশারি থেকে বেরিয়ে জলের জগের দিকে হাত বাড়াল। আশ্চর্য! সেটাও নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দরদর করে ঘামছে তখন অরিন্দম।

হঠাৎ দরজাটা আপনা থেকে খুলে গেল। একটা নীল আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল অরিন্দমের।

হঠাৎ খোলা দরজাটা দিয়ে একজন কোটপ্যান্ট পরা লম্বা সাহেব ঢুকল। কাটাকাটা বৃটিশ উচ্চারণে বলল, “অ্যাম জন বাউটম্যান..........। হু আর ইউ ?”

অরিন্দমের গায়ে লোম সব খাড়া হয়ে গেছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছেনা।

“ইউ ভালগার নেটিভ, হাউ ডেয়ার ইউ স্টে হিয়ার? আই শ্যাল কিল ইউ,” বলতেবলতেই সাহেব কোমরের হোলস্টার থেকে রিভালবার বের করে গুলি চালিয়েছে। গুডুম্ করে কান ফাটা আওয়াজ।

সঙ্গেসঙ্গেই প্রায়, ঘুমটা ভেঙে গেল অরিন্দমের। টর্চটা বালিশের পাশেই আছে। তুলে নিয়ে জ্বালল। রাত তখন আড়াইটে। বিছানা থেকে বেরিয়ে ঘট ঘট করে জল খেল সে খানিক। উঃ! কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন ! সারা শরীর ঘেমে গেছে। তাকিয়ে দেখে, মাথার ওপর পাখাটা ঘুরছে না। ইলেকট্রিসিটি নেই মনে হয়। এখানে প্রায়ই লোডশেডিং হয়।

হঠাৎ কান খাড়া করে অরিন্দম শুনল উপরের ঘরে একটা আওয়াজ হচ্ছে। আগের দিনের মত জোরে জোরে নয়। চাপা গুম্ গুম্ করে। অন্য কেউ ঢুকেছে উপরের ঘরে?

একটু বাদেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বাদে আবার শুরু হল। এখন কোন মানুষের হেঁটে বেড়োনোর শব্দ হচ্ছে। অরিন্দম চুপিসাড়ে টর্চ আর লোহার ডান্ডাটা নিয়ে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল ধীর পায়ে।

উপরের ঘরের দরজা খোলা। ভিতরে আলো ফেলল সে। কেউ নেই। ঘর ফাঁকা। কফিনের ঢাকনা খোলা। এগিয়ে গিয়ে কফিনের মধ্যে উঁকি দিল অরিন্দম। ভিতরে কিছুই নেই।

হঠাৎ পিছনে একটা আওয়াজ হতে সে ঘুরে দেখে, একজন লোক। টর্চের আলোয়

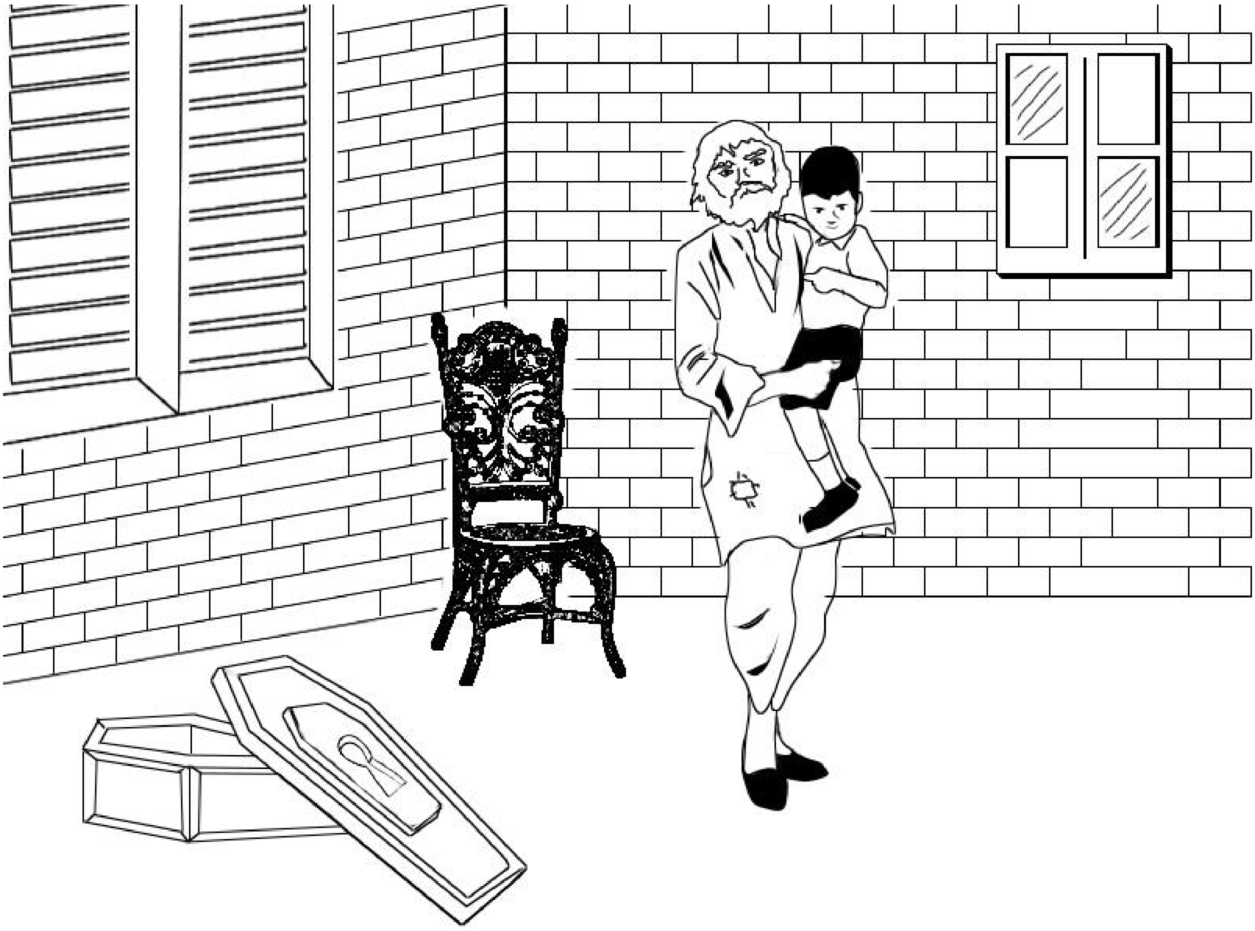

লক্ষ করল, লোকটি খুব লম্বা, শ্যামলা গায়ের রঙ, বড়ো বড়ো সাদাপাকা শণের মত চুল-দাড়ি। পরণে সাদা ধুতি আর আলোয়ান। টর্চের জোরালো আলো চোখে পড়ায় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তার কোলে একটি এগারো বারো বছরের ছেলে।

খানিক বাদে ঘোর কাটিয়ে লোকটা ইংরিজিতে বলল, "পুট ডাউন দ্য লাইট।"

অরিন্দম আলোটা নীচে নামালো।

"হু আর ইউ?" জিজ্ঞাসা করল লোকটা।

"অরিন্দম ভট্টাচার্য।"

এবারে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন, "ভট্টাচার্য ....... বাঙালি?"

"কে আপনি ? এখানে কিভাবে এলেন ? বাচ্চাটি কে ? ও কি মারা গেছে?"

"না .....না মারা যায়নি, অজ্ঞান হয়ে আছে। একটু জল দিতে পারবে?"

"হ্যাঁ। আসুন আমার সঙ্গে। বলে অরিন্দম তাদের নিজের ঘরে নিয়ে এল। জলের জগটা এগিয়ে দিল।

ছেলেটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিতেই ধীরে ধীরে চোখ খুলে চাইল। তারপর চারদিকে দেখে নিয়ে বলল, "আমি কোথায় ? দাদা কোথায় ?"

ভদ্রলোক তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "আসছে আসছে। সে-ও আসছে। সুড়ঙ্গে ঢুকেছে খানিক আগে। আমি ঠিক টের পেয়ে গেছি। চিন্তা কোরোনা।"

বলতে বলতেই হন্তদন্ত হয়ে রুদ্র এসে ঘরে ঢুকলো। তার সারা গায়ে কাদা মাটি মাখা। এসে এদিকওদিক তাকিয়ে বুবুনের দিকে চোখ পড়তে তাকে সে জড়িয়ে ধরল।

*******

খানিক বাদে সবাই একটু ধাতস্থ হতে অরিন্দম ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার বলুন তো ? কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না। এই ছেলে দুটি কে ? আর আপনি এখানে কী করে এলেন? আর উপরের ঘরের কফিনটাও ফাঁকা। জন বাউটম্যানের লাশটা কোথায় গেল?

"কী বললে? জন বাউটম্যান? হা.... হা...... হা...... সেই জেনারেল। সে তো একশ বছর আগেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"

"তাহলে কফিনে কী ছিল ?

"ওর ভিতরে একটা হুরুকু ছিল।"

"হুরুকু ! সেটা কী?"

"পৃথিবী থেকে প্রায় চার আলোকবর্ষ দুরে একটি গ্রহের নাম হুরু। অবশ্য ওখানকার বাসিন্দাদের ভাষায় ওর উচ্চারণটা অন্যরকম, আমাদের পক্ষে সেটা বলা সম্ভব নয়। সেই গ্রহের লোকজন হল হুরুকু। দেখতে অনেকটা বড়ো আকারের পিঁপড়ের মত।

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি," হঠাৎ বলে উঠল ছোট ছেলেটি।

"আমার মাথার মধ্যে কিছুই ঢুকছে না। আপনি কি আমার সাথে মশকরা করছেন? কে আপনি?" অরিন্দম জিজ্ঞাসা করল।

"বলছি। সে অনেককাল আগের কথা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বেশ কিছু বছর আগে। গৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে বরিশালের এক আঠারো বছরের ডানপিটে ছেলে বিপ্লবী দলে নাম লেখাল। জঙ্গলের মধ্যে গোপন ডেরায় শুরু হল বন্দুক ছোঁড়বার তালিম। তার কয়েকবছর পরেই নেতাজি যখন সিঙ্গাপুরে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করলেন তখন সেখানে গিয়ে সে যোগ দিল। শুরু হল ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ। তারপর পঁয়তাল্লিশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপান আত্মসমর্পণ করার পর বিদেশ থেকে সমস্ত রসদ আসা বন্ধ হয়ে গেল। মণিপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মঘাতী বাহিনীর শেষ লড়াইয়ে অনেকে মারা গেল। বেশ কয়েকজন ধরাও পড়ল। তার মধ্যে সেই ছেলেটিও ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যে জেনারেল বাউটম্যানের এক কুখ্যাত কারাগার ছিল, এখনও হয়ত তার ভগ্নাবশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে। এ বাড়ি তারই একটা অংশ। ছেলেটি সহ মোট পঁচিশজন যুদ্ধবন্দিকে এখানে এনে রাখা হয়।

"জঘন্যতম অত্যাচার করে বিপ্লবীদের মুখ থেকে কথা বার করা হত এখানে। অকথ্য অত্যাচারে তারা একে একে সবাই মারা গেল। কিন্তু সেই বাঙালি ছেলেটি আর দুজন পাঞ্জাবী সঙ্গী এই জেলখানা থেকে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে পালিয়ে গিয়েছিল।"

এতটা বলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু চুপ করে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

“আচ্ছা, সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এর মধ্যে এই হুক্কুরু .... না কী- সেটা এল কী করে? আর ঐ কফিনটা ?”

“হুক্কুরু নয়, উচ্চারণটা অনেকটা হুরুকু। এরা পৃথিবীর অধিবাসী নয়, এরা এমনিতে খুবই শান্তিপ্রিয় প্রাণী, কিন্তু এদের যদি কেউ আক্রমণ করে তাহলে এরা তাকে পুড়িয়ে নিমেষে ছাই করে দিতে পারে। ওরা যান্ত্রিক বিজ্ঞানে আমাদের থেকে হাজার বছর এগিয়ে। কিন্তু প্রায় পাঁচশ বছর আগে ওই গ্রহের বেশির ভাগ গাছপালাই মরে যেতে বেঁচে থাকার তাগিদে ওরা সেই সময়ে বিশেষ মহাকাশযানে করে পৃথিবীতে এসেছিল উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে। বাউটম্যানের জেলখানা থেকে বিপ্লবীরা পালাবার পরপরই ঘটনাচক্রে এই জঙ্গলে এসে নেমেছিল ওরা। বিপ্লবীদের খুঁজতে ইংরেজ সৈন্য তখন জঙ্গলে রাতদিন তল্লাশি করছে। শেষ মূহূর্তে ধরেও ফেলেছিল তাদের।

“কিন্তু হুরুকুরা জেনারেল বাউটম্যানের সামনে পড়ে যাওয়ায় বাউটম্যান ওদের এক সঙ্গীকে গুলি করে। আত্মরক্ষা করার জন্য ওরাও পাল্টা অস্ত্র ব্যবহার করতে বাউটম্যান সমেত পুরো ইংরেজ সৈন্যদল ছাই হয়ে যায়।

“হুরুকুরা ভেবেছিল ওদের সঙ্গীটি মারা গেছে। কফিনে ভরে ওরা তাকে মাটিতে পুঁতে দেয়। ওদের পরে হয়তো ইংরেজরা ঐ কফিনটা খুঁজে পেয়ে থাকবে, কিন্তু খুলতে না পেরে এখানে রেখে দিয়েছিল।”

“কিন্তু- - আপনি এসব জানলেন কী করে? আর রোজ রাতে ঐ আওয়াজটা কফিনের ভিতর থেকে কিভাবে আসতো ?

“আরে ওইজন্যই তো ওরা আমাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। এই হুরুকুদের জীবন আমাদের থেকে অনেক বেশি লম্বা। ওরা ভেবেছিল যে ওদের সঙ্গী মারা গেছে, কিন্তু আসলে সে এতদিন অজ্ঞান হয়েছিল ঐ কফিনের ভিতরে। জ্ঞান ফিরেছে পৃথিবীর হিসাবে প্রায় কুড়ি বছর আগে, তখন থেকেই ও টেলিপ্যাথির মাধ্যমে হুরু গ্রহে খবর পাঠাচ্ছে। ওরা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল আর ওদের সঙ্গীকে নিয়ে গেল।”

“মানে ? আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল মানে?”

“মানে, আমিই ছিলাম সত্তর বছর আগের সেই বাঙালী বিপ্লবী। ওরা প্রাণী হিসাবে খুবই ভালো। দয়ামায়া আছে। আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ওদের সাথে ভাব হয়ে গেল। ওরা যন্ত্রের মাধ্যমে সব ভাষাতেই কথা বলতে পারে। আমাদের তিন জনের মধ্যে আমার বয়েস ছিল সব থেকে কম। তাই আমাকে ওরা বলেছিল ওদের সাথে যেতে। আমার কোন পিছুটান এমনিতেই ছিল না। তার ওপর এডভেঞ্চারের নেশা। চড়ে বসলাম মহাকাশযানে। যেতেই সময় লাগলো প্রায় আট বছর। ওখানে বসে রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীর সব খবরই পেতাম।”

“শুনলে মনে হয় গল্প কথা। কিন্তু এই বাউটম্যানের ঘটনাটা তো বহু বছর আগের। আর আপনার বয়স তো পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বেশি মনে হয় না,” বলল অরিন্দম।

“না.... না..... আমার বয়স এখন প্রায় একশ বছর। ওরা বিশেষ পদ্ধতিতে আমার বয়স বাড়তে দেয়নি।”

এই বলে মাথা নাড়তে নাড়তে দুঃখী গলায় ভদ্রলোক বললেন, “এতদিন পরে পৃথিবীতে এসে ভালোই লাগছে, কিন্তু ভাবছি কোথায় যাব? দেশ ভাগের পর বাড়িঘর তো আর নেই।”

“দাদু তুমি আমার সাথে চলো। তুমি আমার বাড়ি থাকবে। আমি তোমার কাছ থেকে হুরু গ্রহের সব গল্প শুনব।” বলে বুবুন জড়িয়ে ধরল তার নতুন দাদুকে।

**ছবিঃ শংখ করভৌমিক**

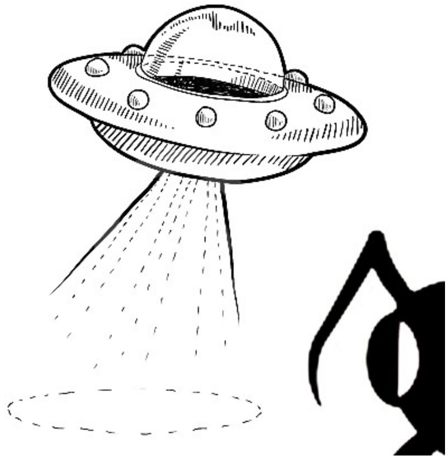

শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

# ভয়ংকর

বাঁদরছানারা গুছিয়ে বসেছে বটগাছের মগডালে। তাদের থুত্থুরি বুড়ি ঠাকুমা সবার মাঝখানটিতে বসে একটা একটা করে ছানাদের টেনে আনছে আর পটাপট তাদের গা থেকে উকুন বেছে মুখে চালান করছে। এই ছানা ক'টাকে দেখেশুনে রাখার কাজ তার। দলের বাকিরা গেছে চড়ায়। মানে বন জঙ্গলে, এ বাগান সে বাগান আর অসাবধান গেরস্তবাড়ির ওপর চড়াও হয়ে খাবার নিয়ে আসতে। ফিরবে সারাদিনের পর সেই সন্ধেবেলায়। একেবারে দুধখেকো, গোলাপীমুখো কচি ছানাগুলো গেছে মা বাপের সঙ্গে বুকের লোম আঁকড়ে ঝুলতে ঝুলতে। একটু বেড়ে ওঠা দুধ ছাড়া ছানাগুলো জঙ্গলের বাসায় থেকে গেছে বুড়ির জিম্মায়। এগুলোকে দেখে শুনে রাখা বড়ো সহজ কাজ নয়! বুড়ির পরাণ ওষ্ঠাগত। ফোকলা দাঁতে খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে আর পারা যায় না! বাঁদরছানা বলে কথা।

একটা আবার এরই মধ্যে কোন গেরস্ত বাড়ি থেকে হাতসাফাই করে আনা ছোট্ট পেন্টুল ভুল জায়গায় পরতে গিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে বসেছিল। কোনও মতে তাকে উদ্ধার করে দুই থাপ্পর কষিয়ে বুড়ি হাঁপাচ্ছিল।সেই ফাঁকে তিনটে ছানা মিলে ঠাকমাকে ধরে নতুন বিদ্যে উকুন বাছা মক্‌শো করতে গিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে থাকবে, চমকে উঠে বুড়ি বিষমটিষম খেয়ে পড়ে যায় আর কি! উঃ। কি দুষ্টু কি দুষ্টু! গুছিয়ে বসে কাছে ডাকল ওগুলোকে, 'আয় তোদের ভয়ংকরের গল্প শোনাই।'

গুটি গুটি ঠাক্‌মার কাছ ঘেঁসে এসে বসল সবাই। ছানারা গুণতিতে ঠিকঠাক আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে চোখ পিট পিট করে খানদুয়েক লম্বা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে দোষ কাটিয়ে নিল বুড়ি, তারপর বলতে শুরু করল।

'বন জোনাকের' নামেই মালুম হয় থানটি কেমন! বন তো বন, ঘোর জঙ্গল যাকে বলে। বড়ো বড়ো গাছেরা ঠেসাঠেসি করে দাঁড়িয়ে হাজার ডালপালা বাড়িয়ে আকাশ ঢেকেছে তো বটেই, তাদের পায়ের কাছে গজিয়ে ওঠা ছোটখাটো গাছেরাও পাতার কড়ে আঙুল বাড়িয়ে আড়ি করেছে সুয্যিমামার সাথে। ফলে দিনের আলো আর মাটি ছোঁয় না। দিনের বেলাতেই ঘন আন্ধার, রেতে তো কথাই নেই। রাত্তিরে দিনে অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। বনের এখেনে ওখানে বন্‌জোনাকের বুনোঠাকুর ক্ষুদে ক্ষুদে হাজার- লাখো- কোটি আলেয়ার লন্ঠন জ্বালান পাহারাদারির কারণে। সেই আলেয়ার দল ছুটে বেড়ায়, এই জ্বলে, এই নেভে জোনাকের মতো। বনের বাইরে ঘর বেঁধে থাকা জনমনিষ্যি সে আলো দেখলে ডরায়। দিনে রাতে নিজেরাও বনের দিকে আসে না, অন্য কারোকে ঘেঁষতেও দেয় না এদিকে। নানান রকম

উদ্‌ভুট্টি গপ্পো তোয়ের করে বুনোঠাকুরের নামে, পুজোটুজোও দেয়। বনের খাস্ পাহারাদার শেয়ালদের কাছ থেকে এসব খবর পেয়ে খুশি থাকে কেউ কেউ। তারা বন্‌জোনাকের বাসিন্দে। আকাশ পাতালজোড়া গাছপালা লতাপাতা শেকড়-বাকড়ের ঘনবুনুনির মধ্যে হাজারো জন্তু-জানোয়ারের ঠেক।

'কারা থাকে এখানে?' আরও গা ঘেঁষে বসল ছানাগুলো।

পোকামাকড়, সাপখোপ, পশুপাখি, ইঁদুর বাঁদর,বনবেড়াল, বনকুত্তা, বনরুই, খ্যাঁকশেয়ালেরা বন্‌সো পরম্পরায় বনজোনাকের বাসিন্দে।

'আমরাও কেন থাকি না গো?' সবচাইতে কচি বাঁদরটা দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলল। সায় দিয়ে মাথা নাড়ল আরও ক'জন।

'আরে শোন্ না চুপ করে! তো সেই বনজোনাকের মধ্যিখানে কয়েকখান লাজুক রকমের গুলবাঘাও থাকেন ছানাপোনা ইত্যাদি নিয়ে সপরিবারে। দেখাটেখা কম দেন তাঁরা। তেনাদের বাঘ বলে ডাকলে বনবেড়ালের বাচ্চারাও চোখ টেপাটিপি করে হাসাহাসি করে। কবে নাকি হায়নার তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়েছিল এ বনের মধ্যে। আর আছে গোটাকতক সাপখোপ, সজারু, মেছোবেড়াল, গন্ধগোকুল, বাদুড় ইত্যাদি। লোক হিসেবে বেজায় ভালো সবাই। রাগারাগি নেই, কাউকে কিচ্ছু বলে না তারা। তা বাঘাই হোক আর ইয়েই হোক সবাই এখানে এক জলার মাছ খেয়েই মানুষ। খেয়োখেয়ি নেই নিজেদের ভেতর বিলকুল।

কেবল একজন ছিল সবার থেকে আলাদা। যেমন পাহাড়ের মত চেহারা তেমনি বদমেজাজ। মস্তো বড়ো বড়ো কলাগাছের মতো দাঁত। রক্তের মতো টুকটুকে লাল চোখদুটো। শালগাছের গুঁড়ির মতো মোটা চারখানা পা। এক ধাক্কায় গাছ উপড়ে ফেলতে পারে এমন শক্তি। ওর এলাকায় পা রাখার হুকুম ছিল না কারও।'

'ইস্! আমাদের ঠাকুরদাদার চাইতে বেশি গায়ের জোর! বিশ্বাস হয় না যে!' লাফিয়ে উঠল বাঁদরছানাগুলো। অবিশ্বাসে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ওদের।

বাঁদর ঠাকুমা মুখ বেঁকাল, 'আরে দু- উ- উ- র। তোদের ঠাকুদ্দা। ঢক্ ঢক্ করছে বুড়ো, মাথায় টাক্! ওর কাছে তোদের ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দাও নস্যি! ওর শুঁড়ের এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে! আরে বাপু ওর নাম ভয়ংকর। দেখা দূরে থাক নাম শুনলেই প্রাণ ঠান্ডা'।

'হাতি হাতি! খুব বুঝেছি শুঁড় শুনেই।' লাফালাফি শুরু হয়ে গেল সবকটার। বটগাছ উশকো- খুশকো হয়ে উঠল নিমেষের মধ্যে।

'শোন রে মুখপোড়ার দল আরও বলি ওর কথা। সেই একটা বুনো শুয়োর ছিল। যেমন মোটাসোটা চেহারা তেমনই বাঁকা দাঁতের বাহার, তেমনই দেমাক! ওর চিৎকার শুনলে দাঁতে দাঁতে কটকটি লাগে, লেজ কাঁপতে থাকে সবার। কথায় কথায় একে মারে ,তাকে মারে। গুলবাঘাদের কর্তারা তো মার- গুঁতো খেয়ে খেয়ে কাঁদুনে হয়ে উঠল। ভয় পেত তাকে সবাই। গেল একদিন ভয়ংকরের এলাকায়। পড়বি তো পড় একেবারে মুখোমুখি। এক লাথিতে ডিগবাজি খেতে খেতে বনের বাইরে। এখন ছাপোষা সংসারী হয়ে গেরস্ত বাড়িতে ফাইফরমাশ খাটে, আর এমুখো হয়নি।

'তারপর?তারপর?'

'একদিন বনে আগুন লাগল। সেবারে বোশেখ- জষ্টি মাসে বন্‌জোনাক শুকিয়ে খট্‌খট্ করছে। জলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। হঠাৎ রাতের বেলা হুলুস্থুল! ঝোড়ো হাওয়ায় গাছে গাছে ঘষা লেগে আগুন ধরে গেছে। বড়ো বড়ো গাছের মাথা ছাড়িয়ে আগুন আকাশ ছুঁয়েছে। দাবানল!দাবানল! কালো ধোঁয়ায় দম আটকে আসে। বনের ভেতর থেকে ছুটে আসা আগুনের হুংকার শুনে শরীর ঠান্ডা মেরে যায়। দলে দলে বন্‌জোনাকের বাসিন্দেরা ছানাপোনা কোলে করে ছুটে চলল বনের বাইরে। ভয়ে সবাই দিশেহারা। খোলা মাঠে এসে বসল যে যার ছানাদের হিসেব কত্তে। গুনতি করে দেখা গেল সব আছে ঠিকঠাক, কেবল বাঁদরদের সবচাইতে ছোট আর বেজায় দুষ্টু মেয়ে বাচ্চাটা কি করে থেকে গেছে বনের মধ্যে। আর একজনের কথা কেউ জানে না , সে হল ভয়ংকর।

কান্নাকাটি হুলুস্থুল পড়ে গেল সবার মধ্যে! ভেবে দ্যাখ্। বাঁদর মায়ের দুঃখে কেঁদে ভাসাচ্ছে বনকুত্তো। তাকে সান্ত্বনা দিতে এসে ভির্মি খাচ্ছে গুলবাঘা। শেয়ালছানার ছেঁকা খাওয়া ঘা চেটে পরিষ্কার করে দিচ্ছে ময়াল সাপ। হায়নাকে কেউ আটকে রাখতে পারছে না, সে যাবেই যাবে আগুনের মধ্যে থেকে সেই কচি বাঁদরীটাকে উদ্ধার করে আনতে। কান্নাকাটি কিচিরমিচির হৈ হট্টগোলে সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। পুরো বনজোনাক তখন জ্বলছে দাউ দাউ করে।'

বুড়ি ঠাকুমা দম নিচ্ছে। চোখ বুজে আছে। মুখে কথা নেই। যেন মনে মনে দেখে নিচ্ছে একবার সেদিনকার ব্যাপারটা। ছানারা তাকে থামতে দেবে কেন! ওমনি ঝটাপটি লাফালাফি শুরু হয়ে গেল।

'ও ঠাকুমা তারপর কি হল বলো বলো। কচি বাঁদরমনির কী হল গো?'

ঠাক্মা চোখ মেলে চাইল। তার ঘোলা চোখের কোনায় জল। ফিস্ ফিস্ করে বলল,"বাঁদরীর কথা বলছি রে। সেই দুষ্টু হাতিটার কথা কেউ শুনতে চাস না?"

‘না না সে ব্যাটা আগুনে পুড়ে মরুক। বেশ হয় তাহলে। কচি বাঁদরীর কী হল বলো?’ ফোকলা দাঁত বার করে খেঁকিয়ে উঠল বাঁদরদের বুড়ি ঠাকুমা, ‘বন জোনাকের বাসিন্দেরা মোটেই অমন ছিল না। তারা সবার কথাই ভাবতো শুধু নিজেরটুকু নয়। তোরাও অমন হ। ওমা! শুধু নিজের জাতটাই সব নাকি? আর কেউ বুঝি মানুষ নয়!’

ল্যাজট্যাজ গুটিয়ে ভদ্র হয়ে বসল আবার সবাই। গোলাপী চোখের পাতা পিট্ পিট্ করছে, মাথায় সোনালী লোম খাড়া খাড়া। চেয়ে আছে ঠাকুমার মুখের দিকে। বুড়ি শুরু করল, ‘হঠাৎ বনের মধ্যে মড়মড় আওয়াজ। ভূমিকম্প মতো মাটি কাঁপিয়ে কী যেন একটা ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে বনের মধ্যে। মট্মট্ করে ডাল ভাঙছে উপড়ে পড়ছে গাছ। তার সাথে কানে তালা লাগানো চিৎকার! গোলগোল চোখ করে তারপর সবাই কি দেখল জানিস?’

‘কী, কী গো ঠাকুমা? কী দেখল সবাই?’

‘বুড়ো দুষ্টু হাতি ভয়ংকর বনের আগুন নিভিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসছে। তার মাথার ওপর লতাপাতায় জড়ানো ছোট্ট সেই দুষ্টু ছানাটা। বাঁদরদের কাছে এসে শুঁড় দিয়ে যত্ন করে মায়ের ছানা মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে কোথায় যে চলে গেল কে জানে! বনের বাসিন্দেরা জল ভেজা চোখে উবু হয়ে নমো করল সবাই। ভয়ংকরকে সকলে দুষ্টু বলে জানত, তার ভেতর তো ভালোও ছিল। ভেতরকার ভালোগুলো বিপদের দিনে বাইরে বেরিয়ে আসে।’

‘তারপর সেই ছানা বাঁচল?’

‘বাঁচল বৈকি! বাঁচল, বড়ো হল, বুড়ো হল। এখন তোদের কাছে গল্প বলছে।’

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

# অর্জুন সর্দার

শিশির বিশ্বাস

রোদে পোড়া হালকা- পাতলা ছেলেটার সঙ্গে প্রথম দেখা সাতজেলিয়ার দত্তর ঘাটে। গোড়ায় শুরুটা করেছিল নেপালদা। সুযোগ পেলেই কাউকে নিয়ে একটু মশকরা করা ওর স্বভাব। তার উপর মেজাজ মোটেই ভাল নেই তখন। সুন্দরবনে বেড়াতে এসে নৌকোয় ঘোরা হয়ে গেছে দিন দুয়েক। অথচ যে জন্য আসা তার কিছুই হয়নি। নেপালদার মেজাজ তাই তখন একটু চড়েই রয়েছে। আসলে পুজোর পরে সেবার সুন্দরবনে বেড়াবার এই আয়োজনের উদ্যোক্তা গৌর হলেও নেপালদার আগ্রহটাও কম ছিল না। কারণও ছিল। ওর পরিচিত কে নাকি সুন্দরবনে বেড়াতে এসে একসাথে জোড়া বাঘ দেখে গেছে। সেই থেকে ব্যাপারটা ঢুকে রয়েছে তার মাথায়। কাজের মানুষ গৌর কিন্তু অনেক খোঁজ- খবর করেই আয়োজন করেছিল। সুন্দরবন ঘোরবার সেরা সময় পুজোর পরে এই অক্টোবর। চমৎকার শান্ত নদী। রাতে ভয়ানক হিম বা ভোরের কুয়াশা থাকে না। রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আলোয় ম- ম করে চারপাশ। এসবের খানিকটা আঁচ পেয়ে গিয়েছিলাম সেই প্রথম দিনই। গোসাবা হয়ে সরু এক খাল দুর্গাদোয়ানি ধরে ভটভটি গোমদি নদীতে এসে পড়তেই দেখি সামনে বিস্তীর্ণ নীল জলরাশি। একদিন বাদেই কোজাগরী পূর্ণিমা, বিকেলের মরা আলোয় দিগন্তের কাছে পুব আকাশে থালার মতো বড়ো একটা চাঁদ। ওপারে সেই আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরবনের জঙ্গল। বাইন, গরান, গর্জন প্রভৃতি রকমারি গাছের ঘন অরণ্য। শুধু সবুজ আর সবুজ। খানিক বাদে ভটভটি যখন ওপারে জঙ্গলের ধার ঘেঁষে চলতে শুরু করল, দেখি ছোট এক হরিণের পাল। শিংওয়ালা বড়ো একটা হরিণ দিব্যি দু”পায়ে ভর দিয়ে গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। তারপর দু”দিন পার হয়ে

গেছে, ঘোরা হয়ে গেছে সুন্দরবনের অনেক গলিঘুঁজি। সরু খাল, নদী, কিন্তু আসল ব্যাপারটা সিদ্ধ হয়নি। অর্থাৎ বাঘের দেখা। সুতরাং নেপালদার মেজাজও আর ভাল হয়নি। এই সময়ই দেখা সেই ছেলেটার সঙ্গে। আমাদের ভটভটি তখন একটু বেলার দিকে এসে ভিড়েছে দত্তর ঘাটে। সামনে বিশাল দত্তর গাঙ। তিনটে নদী এসে মিলেছে এখানে। সেদিকে তাকালে যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। বড়ো- বড়ো ঢেউ আছড়ে এসে পড়ছে গরাণ কাঠের নড়বড়ে জেটির গায়ে। সামান্য হাটবাজার সারতে উপরে গ্রামের দিকে গেছে কয়েকজন। বাকিদের গুলতানি চলছে নৌকোয়। ঘাটের একধারে বসা ছেলেটার দিকে নজর পড়ল সবার। বয়স বড়োজোর তের। একমাথা উসকোখুসকো চুলে তেল পড়েনি অনেক দিন। রোগা খড়িওঠা শরীর। খানিক আগে কাজের তাগিদে নদীর কাদায় নামতে হয়েছিল হয়তো। হাঁটু পর্যন্ত সেই পুরু কাদা শুকিয়ে সাদা হয়ে রয়েছে। একটু মজা করতেই নেপালদা ছেলেটাকে লক্ষ্য করে বলল, “দারুণ মোজা পরেছিস তো!”

আনমনে বসে ছিল ছেলেটা। মুহূর্তে খরখরে হয়ে উঠল চোখ দুটো। একটু আগের শুকনো মুখ শক্ত হয়ে উঠল ক্রমশ। ধারালো গলায় বলল , “বাদাবনের কতটুকু জানেন বাবু ?”

খোঁচাটা যে এমন হুল হয়ে ফিরবে ভাবতেই পারেনি কেউ। চাঁই নেপালদা অবশ্য দমবার পাত্র নয়। তড়িৎ গতিতে উত্তর ছুঁড়ে দিল, “তুই জানিস বুঝি? তা বাঘ দেখাতে পারবি আমাদের?”

“শুধু বাঘই দেখবেন বাবু? আর কিছু নয়?” একটুও না দমে বলল ছেলেটা।

“আর কিছু নয় বলছিস কী রে? বাঘ, কুমির, কামট এসব দেখতেই তো এসেছি।”

“পারবি দেখাতে?”

“পারব না কেন বাবু? তবে ব্যাপারটা কী জানেন, আপনারা আসেন বাঘ দেখতে। আর এখানে গাঁয়ের মানুষ বনে যায় ওই প্রাণীটির সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সেই প্রার্থনা নিয়ে। বনবিবি কখনও শোনেন , কখনও শোনেন না। মানুষগুলোর কপাল পোড়ে তখন।”

“বাঃ ! বেশ কথা শিখেছিস দেখছি! কোন ক্লাসে পড়িস?” একটু চমৎকৃত হয়েই বলল নেপালদা।

“বললাম না, বাদার কিছুই জানেন না।” মৃদু হাসল ছেলেটা। “পূর্ণিমার গোন চলছে। কদিন মাছের মরসুম এখন। ক্লাসে যাওয়ার সময় কোথায় বাবু?”

পূর্ণিমার ভরা জোয়ারে বাদার নদীতে মাছের মরসুম। সন্দেহ নেই, ছেলেটা শেষ রাত থেকে লেগে ছিল সেই কাজে। পায়ের শুকনো কাদা সেই সময়ের। কিন্তু ছেলেটার মুখের ওই বাঁকা হাসি তখন নেপালদার মাথায় বোধ হয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বলল, “তা তো বুঝলাম। কিন্তু একটু আগের কথা ভুলে যাসনি তো?”

"ভুলব কেন বাবু?" ছেলেটা দমল না একটুও। "কিন্তু তাহলে যে একটু দেরি করতে হবে আপনাদের। সেই শেষ রাতে বেরিয়েছি, বাড়ি যেতে হবে একবার।"

ছেলেটার নাম অর্জুন সর্দার। নেপালদা সম্মতি দিতে এরপর ও চলে গিয়েছিল বাড়ির দিকে। অনেকেই অবশ্য ভাবেনি, শেষ পর্যন্ত ফিরে আসবে সে। এমনকী, নেপালদাও।আর সত্যিই তাই। ক্রমশ সময় গড়িয়ে চলেছে, অথচ দেখা নেই ছেলেটার। কতক্ষণ আর সময় নষ্ট করা যায়। তবে ব্যতিক্রম গৌর। ও আগেও এদিকে এসেছে। অনেক কিছুই চেনাজানা। ঘটনার সময় কেনাকাটা করতে গ্রামের দিকে গিয়েছিল। সব শুনে খোঁজ নিয়ে বলল, " ছেলেটার বাড়ি কাছে নয়। মাইল তিনেক দূরে। উচিত ছিল ভ্যান রিকশার ভাড়াটা দিয়ে দেওয়া। তা যখন হয়নি, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে।"

নেপালদা নিজেই আপত্তি তুলছিল এরপর কিন্তু নেপালদার অনেক কিছু মেনে নিলেও এই ব্যাপারটায় সায় দেয়নি গৌর। শুধু বলেছে , "ছোট ছেলে। অত দূর থেকে এসে দেখবে আমরা নেই, সেটা ঠিক হবে না নেপালদা।"

গৌর দেখেনি ছেলেটাকে। কীসের জোরে একথা বলেছিল, তা সে-ই জানে। তবে সেটা যে নেপালদার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে ভাবতে পারিনি। কিন্তু সে তো পরের কথা। বরং আগের কথাই বলি এখন।

প্রায় ঘন্টা দুই পরে অর্জুন কিন্তু সত্যি এসে হাজির হল ঘাটে। প্রায় ছুটতে- ছুটতে। হাতে একটা ছোট পুঁটুলিতে দু" একটা জামাকাপড়। ততক্ষণে কমবেশি সবার মধ্যে প্রায় বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে। ছেলেটাকে দেখেই প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল নেপালদা, " তোর এত দেরি হবে বলিসনি তো ছোঁড়া! দিনটা নষ্ট করে দিলি।"

অর্জুন অবশ্য দমল না। একগাল হেসে হাঁপাতে- হাঁপাতে বলল, "সে কথা তো তখন শুধাননি বাবু। আমি কিন্তু বাড়িতে গিয়ে দেরি করিনি। ছুটে গেছি আর এসেছি।"

ছেলেটা যে বিশেষ বাড়িয়ে বলেনি সেটা বোঝা যাচ্ছিল বেশ। সারা গা জবজব করছে ঘামে। হাঁপাচ্ছে রীতিমতো। মোক্ষম জবাব পেয়ে নেপালদা তাই আর কথা বাড়াল না। আপন মনে গজগজ করতে লাগল। ভটভটি ছেড়ে দিল।

একটা দিন কেটে গেছে তারপর। ঘোরা হয়ে গেছে আরও অনেকটাই। অর্জুনের কথায় ভটভটি ঢোকান হয়েছে কয়েকটা সরু খালে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

নেপালদা তো বটেই, ইতিমধ্যে অনেকেই টিপ্পনী কাটতে শুরু করেছে ওকে। তবে দরকারে ফাইফরমাশটা ভালই খাটছে ছেলেটা। এরই মধ্যে দারুণ একটা কাজ করে ফেলল ও। ভাটা শুরু হয়েছে। কয়েক জনের ইচ্ছেয় মাঝি নৌকো ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা খালে দু”দিকে ঘন জঙ্গল। বড়ো- বড়ো গাছে ছেয়ে রয়েছে আকাশ। এই দুপুরেও ছমছমে অন্ধকার। খানিক ঢুকতেই অর্জুন হঠাৎ জলের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, “জলের যা টান, এ মজা শিস্- খাল বাবু। এই ভাটায় আরও ভিতরে গেলে বিপদ হয়ে যাবে। নৌকো ফেরান।”

শুনে হেসে উঠল সবাই। সবচেয়ে বেশি নেপালদা। ধমক দিয়ে বলল, “থাম ছোঁড়া। বাঘ দেখাবি বলে নিয়ে এসে ভয় পেয়ে গেলি এর মধ্যেই!”

এই প্রথম দমে গিয়েছিল অর্জুন। কথা বাড়ায়নি আর। পরিণামটা টের পাওয়া গিয়েছিল অচিরেই। খালটা সরু হয়ে আসছিল ক্রমেই। খানিক বাদে মাঝি নিজেই ব্যাপারটা আঁচ করে বলল, “ এ মজা শিস্- খালই বাবু। আরও ভিতরে গেলে বিপদে পড়তে হবে।”

কিন্তু বিপদের তখন যে আর বাকি নেই, বুঝতেও পারেনি কেউ। ফেরবার জন্য তাড়াতাড়ি ভটভটি ঘোরাতে গিয়ে হঠাৎ তার তলা মাটিতে আটকে গেল। শুধু তাই নয় ভটভটির পিছনের দিকের খানিকটা ঢুকে গেল পাড়ে ঘন এক হেঁতালঝাড়ের ভিতর। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মাঝি সরাতে পারল না।

ব্যাপারটা যে কতখানি ভয়ানক তখন বুঝতে আর বাকি নেই কারও। নদীর মাঝে নিরাপদে নৌকোয় বসে জঙ্গল দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু সেই জঙ্গলে যখন নৌকোর গলুই আটকে যায়, তখন আর মজা নয়, শুরু হয় অন্য জিনিস। তার উপর , খানিক আগে খালের ধারে এক গাছের ডালে বাঁধা ছেঁড়া একটা গামছা দেখে এসেছি। দিন কয়েক আগেই নাকি ওখানে বাঘে মানুষ মেরেছে। এই জঙ্গলে যে বাঘ আছে সেটা অন্যদের জানিয়ে দেওয়ার জন্যই ওই নিশান।ব্যাপার দেখে কারও মুখে কোনও কথা নেই। ব্যতিক্রম নয় নেপালদাও। এদিকে ভাটায় দ্রুত জল নেমে চলেছে তখন। যত দেরি হবে, নৌকো আরও বসে যাবে। ফের পুরো জোয়ার না আসা পর্যন্ত এই ভয়ানক জঙ্গলের মধ্যে নৌকোয় পড়ে থাকতে হবে সবাইকে।

এই অবস্থায় আর সময় নষ্ট না করে তাগাদা দিয়ে মাঝিদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে অর্জুন নেমে পড়ল সেই হেঁতালঝাড়ের ভিতর। ঠেলে বের করে দিল নৌকো। প্রায় ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল সবার।

বয়সে ছোট হলেও ছেলেটা যে বাদার অনেক কিছুই জানে এরপর মানতে বাধ্য হয়েছিল সবাই। জিজ্ঞাসা করতে ব্যাপারটা সাফ করেও দিয়েছিল ও। মজা শিস্- খাল, অর্থাৎ যে খালের অন্য মুখ জঙ্গলের ভিতর ক্রমশ সরু হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে, সেই খালে ভাটার জল নামে দ্রুত। স্রোতের টান তাই খুব বেশি। আর ফোড়ন- খাল, অর্থাৎ যে খালের দুটো মাথাই জঙ্গল ফুঁড়ে দুই দিকে কোনও বড়ো নদীতে মিশেছে,সেই খালে ভাটার জল নামে দুই মুখ দিয়েই। তাই স্রোতের টান তেমন বেশি হয় না। এমনকী অনেক সময় দেখা যায়, খালের দুই বিপরীতমুখী স্রোত চলেছে দুই দিকে।

ব্যাপারটা জলের মতোই সহজ হয়তো। কিন্তু জলের টান দেখে সেটা বোঝা যে মোটেই সহজ কাজ নয় তা বলাই বাহুল্য। অর্জুনের খাতির তাই এরপর বেড়েছিল খানিকটা। অবশ্য বাঘ দেখাতে পারেনি বলে ও নিজেই দমে গিয়েছিল একটু। নেপালদাও খোঁচাচ্ছিল মাঝেমধ্যে। এর খানিক বাদেই ঘটল সেই ব্যাপারটা।

অর্জুনের নির্দেশে ভটভটি তখন একটা ফোড়ন খালে ঢুকেছে। বেশ চওড়া খাল। ভাটা হলেও যথেষ্টই জল রয়েছে। দু”দিকেই নিবিড় ঘন জঙ্গল। বড়ো- বড়ো গাছ। এই দুপুরেও মরা আলোয় ঝিমঝিম করছে চারপাশ। সেই খালের ভিতর খানিক এগিয়ে একটা শাখা বেরিয়েছে বাঁ দিকে। সেই বাঁকের কাছে ভটভটি পৌঁছোতে হাত দেখিয়ে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল অর্জুন, “ ওই দেখুন বাবু কুমির।”

একসাথে সব কয়টা চোখ মুহূর্তে গিয়ে পড়ল অর্জুনের হাত লক্ষ্য করে। বাঁদিকের খালটা খানিক গিয়ে বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে উঁচু পাড়ের উপর দিবানিদ্রা সারছে মস্ত এক কুমির। তাড়াতাড়ি নৌকো ঘোরান হল সেই খালের ভিতর। অত বড়ো কুমির দেখে ততক্ষণে রীতিমতো হইচই পড়ে গেছে। গোড়ায় দূর থেকেই প্রাণীটিকে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু সাহস বাড়তে ধীরে- ধীরে খানিক কাছে নেওয়া হল নৌকো। নোনা জলের অত বড়ো কুমির আগে দেখেনি কেউ। নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত প্রায় ফুট কুড়ি লম্বা। হাঁ করে তাকিয়ে আছি সবাই। ভটভটির ইঞ্জিন থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেছে। বিশাল প্রাণীটার কিন্তু সাড়াশব্দ নেই। চোখ বন্ধ। প্রায় মড়ার মতই পড়ে রয়েছে নদীর উঁচু পাড়ের উপর।

দেখে কে যেন বলল, “এটা মরা কুমির নয়তো?”

নেপালদা তৈরি হয়েই ছিল বোধ হয়। সায় দিয়ে বলল , “ তাই তো মনে হচ্ছে রে। একটু নড়েও তো না। কী রে অর্জুন, বাঘ দেখাবি কথা দিয়ে শেষে এক মরা কুমিরের কাছে নিয়ে এলি!”

উত্তরে অর্জুন নীরবে একটু তাকাল নেপালদার দিকে। ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখ দুটো। বলল , “ তা হবেও বা। নৌকো আরও কাছে নেবেন নাকি বাবু?”

সাহস পেয়ে নেপালদা এবার মাঝিদের নৌকো আরও কাছে নিতে বলল। আদেশ পেয়ে ফের চালু হল ইঞ্জিন। চলতে শুরু করল ভটভটি। কিন্তু সামলাতে পারা গেল না। মাঝি গতি কমাবার আগেই নৌকো এগিয়ে গেল অনেকটা। প্রায় পাড়ের কাছে। তারপরেই ঘটল এক ভয়ানক ব্যাপার। উপরে কুমিরটা সজাগ হয়ে উঠল মুহূর্তে। নড়ে উঠল লেজ। তারপর সড়াৎ করে ঢাল বেয়ে নেমে এল নীচের দিকে। ততক্ষণে ভটভটি গতি সামাল দিতে না পেরে আরও সামনে এসে পড়েছে। ফলে যা হবার তাই ঘটল। অত বড়ো কুমিরটা হুড়মুড় করে এসে পড়ল একেবারে নৌকোর উপর। কাত হয়ে গেল নৌকো। সামনে ছিল খাওয়ার বড়ো ড্রামটা। লেজের ধাক্কায় উলটে গেল সেটা। ভাগ্যিস, নীচে কেউ সেই মুহূর্তে ছিল না। সবাই ছাদের উপর।তাই বড়ো বিপদ হল না। কিন্তু যা হল, তাও কম নয়। ছোট ভটভটি নৌকো। অত বড়ো কুমিরটা ওই ভাবে তার উপর এসে পড়তে মুহূর্তে কাত হয়ে গেল একদিকে। ততক্ষণে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে সবার মধ্যে, চিৎকার চ্যাঁচামেচি। ওদিকে কুমিরটাও তখন বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে প্রায় দাপাদাপি জুড়ে দিয়েছে নৌকোয়। বিপজ্জনক ভাবে দুলতে শুরু করেছে ভটভটি। দাপাদাপিতে পাটাতন ভেঙে কুমিরটা একবার নৌকোর খোলের ভিতর ঢুকে গেলে আর দেখতে হত না। কিন্তু তার আগেই প্রাণীটা খানিক সামলে ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীর জলে। দেখা গেল না আর। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে দেড়- দুই সেকেন্ডের বেশি লাগেনি। কিন্তু তাতেই দারুণ আতঙ্কে প্রায় কাঠ হয়ে গেছে সবাই। তার মধ্যেই হঠাৎ খেয়াল হল, টাল

সামলাতে না পেরে খোদ নেপালদা কখন পড়ে গেছে জলে। সাঁতার না জানায় হাবুডুবু খেতে খেতে স্রোতের টানে ভেসেও গেছে খানিকটা। আমাদের মধ্যে সাঁতার জানে অনেকেই। কিন্তু একটু আগে অত বড়ো কুমির দেখার পরে কে নামবে জলে! সবাই হায় হায় করে উঠলেও তাই জলে নামতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। ইতস্তত করছে মাঝিরাও। সেই সময় অর্জুন একাই লাফিয়ে পড়ল জলে। তিরবেগে গিয়ে পড়ল নেপালদার কাছে। কিন্তু বিপদ আরও বাড়ল তাতে। ও কাছে যেতেই হাবুডুবু খেতে- খেতে নেপালদা দু”হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। অত বড়ো চেহারার মানুষটা ওই ভাবে জাপটে ধরতে সামলাতে পারল না অর্জুন। জড়াজড়ি করে একসাথে ডুবে গেল দু”জনেই।

ব্যাপার দেখে তখন বাক্‌রোধ হয়ে গেছে সবার। দুজনের কারোরই আর বাঁচার আশা নেই, যখন ভাবতে শুরু করছে সবাই, সেই সময় ফের ভেসে উঠল দু”জন। নেপালদা মড়ার মতো নেতিয়ে পড়েছে তখন। সাড় নেই শরীরে। অর্জুন ওই অবস্থায় তাকে দ্রুত টেনে আনল নৌকোর কাছে। ধরাধরি করে তোলা হল উপরে। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ব্যাপার কী, যখন ভাবছে সবাই, তখন অর্জুনই খোলসা করল সেটা। ততক্ষণে সে- ও লাফিয়ে উঠে পড়েছে নৌকোয়। “ভাববেন না বাবু। উনি তখন এমন জড়িয়ে ধরেছিলেন যে, গোটা কয়েক ঢুঁসো আর ঘুসি মারতেই হল। নইলে ডুবে মরতাম দু”জনেই।”

নেপালদার জ্ঞান ফিরতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি। তবে সে- দিনটা আর কারও পেটে কিছু পড়েনি। খাওয়ার জল নেই এক ফোঁটা। রান্নাও বন্ধ। কাছাকাছি গ্রামের ঘাটে ফিরতে রাত প্রায় এগারোটা। সারা সময়টা নেপালদা প্রায় গুম হয়ে রইল। এমনকী কলকাতায় ফিরেও কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। বলতে গেলে এক রকম ছাড়াছাড়িই হয়ে গেছে।

ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

# শেষ চিঠি

মোঃ শামীম মিয়া

গ্রাম আমদির পাড়া। চারদিক সবুজে ঘেরা, আমাদের পাড়া। মাঠে, মাঠে, রাখালের বাঁশি বাজানো সুর, চলে যায় গ্রাম পেরিয়ে বহুদুর। গাছে, গাছে হরেক রকম ফুল, ফল,পাখির ডাক। রাতে জোনাকি পোকার মিটমিট আলো,আহা খুব সুন্দর লাগে দেখতে ভাল।

এই গ্রামকে কেন্দ্র করে আছে একটা বটগাছ। বটগাছটার বয়স প্রায়, একশত বছর হবে। এই বটগাছটার চারদিক দিয়ে গড়ে উঠেছে জনপদ। বটগাছের দক্ষিণে যমুনা নদী, এবং পশ্চিমে বাঙ্গালী নদী। বটগাছের আশে পাশে বেশ ক'টা দোকান আছে। দক্ষিণে জুমারবাড়ি বাজার, উত্তরে সাঘাটা থানা, কয়েক কিলোমিটার দুরে গাইবান্ধা জেলা। বটগাছের নিচে বসে অনেক শ্রমজীবি লোকজন বিশ্রাম নেয়। বটগাছটা থাকার কারণে ভ্যানচালক ভাইয়েরা ও গ্রামের লোকেরা এর নাম দিয়েছে বটতলী। বটতলী নামেই এই জায়গাটা বর্তমানে পরিচিত। এই বটগাছের ইতিহাস বলি।

১৯৭১ সালের কথা বলেছেন আমাকে আমার দাদা। এই বটগাছ থেকে প্রায় দুইশত গজ পশ্চিমে থাকত সাদিকরা। তার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। মা-বাবার আদরের একমাত্র সন্তান ছিল সাদিক। সাদিক পড়তো পঞ্চম শ্রেণীতে।

বটগাছের নিচে ছিল পাকিস্তানীদের মূল আস্থানা। তারা এখানে বসেই ঠিক করত কোথায় আক্রমণ করবে। সাদিকরা ছিল গরিব। তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা হলেও ছিল একজন

কৃষক। পড়াশোনা কিছুই জানত না সাদিকের বাবা সাদেক আলী। ঢাকা থেকে কোন চিঠি এলে বাবা সাদেক আসতো সাদিকের কাছে।

সাদেক প্রায় দেড় মাস ধরে রাতে বাড়িতে আসে না দিনেও আসে না। যদি পাকিস্তানীরা তাকে দেখে তাহলে তার প্রাণ হারাতে হবে। সাদিক বাবার কাছে গিয়ে মাঝে মধ্যে টাকা নিয়ে এসে বাজারে গিয়ে আনাজ আনে। মা ছেলে রান্না বান্না করে খায়। যেদিন বাবা টাকা দেয়, সেই দিন খাবার জোটে তাদের। আবার কোন কোন দিন খেতে পায় না। বাবার কাছে তো সব সময় টাকা থাকে না! বাবা আবার সব সময় থাকেও না।

সেদিন সাদিক আসছে তার বাবার কাছ থেকে। সামনে পড়ল পাকিস্তানী বাহিনী। সাদিককে তারা জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল?" সাদিক বলল, "আমি আমার বাবার কাছে গিয়েছিলাম টাকা নিয়ে আসব বলে। ঘরে তো চাল নেই। আগামীকাল যাওয়ার কথা ছিল বাবার কাছে। আমি আজই গিয়েছিলাম কিন্তু বাবাকে তো পেলাম না। চাল কেনা বুঝি আজ আর হল না। আজও মনে হয় না খেয়ে থাকতে হবে।"

এক পাকিস্তানী বলল, "তোমার বাবা কী মুক্তিযোদ্ধা ?"

পাকিস্তানিদের সঙ্গে থাকা এখানকার ছেলে হারুণ পেছন থেকে মাথা নেড়ে ইশারা করল, "বলিস না।" সাদিক বুঝে চুপ করে থাকল। এদিকে অন্য গ্রামের গুলির আওয়াজ শুনতে পেল পাকিস্তানীরা। সাদিকের উত্তর না নিয়ে তারা ছুটল সেখানে। হারুণ, আর একজন পাকিস্তানী রয়ে গেল সেখানে। সাদিক বলল, "আমি তাহলে আসি?" পাকিস্তানী বলল, "না, তুমি যেতে পারবে না।"

এই কথা হারুন শুনে বুঝলো, ওরা যুদ্ধ করতে গেল ফিরে এসেই সাদিককে গুলি করবে। সে পাকিস্তানীকে বলল, "ভাই একে ছেড়ে দেন।"

পাকিস্তানী বলল, "না একে ছাড়া যাবে না। নিয়ে এসো আমাদের আস্তানায়। এ নিশ্চয় মুক্তিযোদ্ধার ছেলে। আমাদের খবর নিয়ে যাওয়া আসা করে।

হারুন মনে মনে ভাবল সাদিককে এইখান থেকে বিদায় দিতেই হবে। তা না হলে ওরা মেরে ফেলবে সাদিককে। পাকিস্তানিদের আস্তানায় গিয়ে হারুন দেখল সেখানেও কেউ নেই। পাকিস্তানী হারুনকে বলল, "আমি পাশের রুমে আছি। তুমি বন্দুকটা পরিষ্কার কর।"

হারুন বলল, " ঠিক আছে।"

পাকিস্তানী রুমে যেতে হারুন সাদিককে ওখান থেকে পালিয়ে যেতে বলল। সাদিক পালালো। তার বুকটা কাঁপছে। সে দৌড়ে গেল বাড়িতে। মা মা বলে ডাকছে সাদিক। মা নামাজে। কোন কথা বলতে পারছে না। সাদিক মনে করল তার মাকে হয়তো পাকিস্তানীরা নিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সে ঘরে ঢুকল। এ ঘরে ও ঘরে কোথাও নাই। তারপর দেখে মা রান্না ঘরে নামাজ পড়ছে। সাদিকের ধড়ে যেন প্রাণ এলো। জল ছলছল চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। মা বলল, "বাবা সাদিক, কী হয়েছে তোর? আমাকে বল।" সাদিক বলল, "মা আমি আজ পাকিস্তানীদের হাতে ধরা পড়েছিলাম।" মায়ের বুকটা কেঁপে উঠল। বলল, "কীভাবে? আর পালিয়ে এলিই বা কী করে?" সাদিক তার মাকে সব খুলে বলল।

এদিকে হারুন পড়েছে বিপদে। কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানীটা ফিরে এসে দেখে সাদিক নেই। হারুনকে জিজ্ঞাসা করল, "ওই ছেলেটি কোথায়?"

হারুন বলল, "আমি ছেড়ে দিয়েছি।" শুনে পাকিস্তানী হারুনকে মারতে চাইলো কিন্তু সেই সুযোগ হারুন দিল না। সঙ্গেসঙ্গেই পাকিস্তানীকে তার বন্দুক দিয়ে গুলি করল। সেখানে

পাকিস্তানীদের কয়েকটা বন্দুক ছিল। হারুন সেগুলো নিয়ে ওই আস্তানায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল বাঙ্গালী নদীর পাশে মুক্তিবাহিনীর আস্তানায়। বন্দুক দিয়ে সাদেককে বলল তার ছেলে সাদিকের কথা। কমান্ডার রফিক বলল, "হারুন তুমি যে সাদিককে বাঁচিয়ে এক পাকিস্তানীকে হত্যা করে তাদের আস্তানা পুড়িয়ে দিয়েছো, যদি ওরা জানতে পারে তাহলে?"

হারুন বলল, "রফিক ভাই আপনি একটা বুদ্ধি দেন, যাতে ওরা বুঝতে না পারে।"

এক মুক্তিযোদ্ধা বলল, "তুমি আর যেও না ওখানে। এখানেই থাকো। আমাদের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করো।"

রফিক বলল, "না। আমাকে ভাবতে দাও কী করা যায়।"

সাদেক বলল,"রফিক ভাই হারুন ওখানেই থাক, কারণ হারুণের দ্বারাই আমরা জানতে পারি পাকিস্তানীরা কোথায় আক্রমণ করবে। তুমি যাবে হারুন,তবে যদি দেখে তোমার গায়ে আঘাতের কোন দাগ নাই তাহলে তুমি মুশকিলে পড়বে। তাই তুমি তোমার গায়ে আঘাত করে যাবে। ওখানে বলবে মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে মেরে এই অবস্থা করেছে। "

শাহজাহানও নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা বলল,"তা কী করে হয়? নিজের গায়ে নিজে আঘাত করবে কীভাবে?"

রফিক বলল,"শাহজাহান আমরা শপথ নিয়েছি। আমাদের মাতৃভুমির জন্য জীবন দেব। হারুন বলল, "হ্যাঁ ভাই আমি রাজি।"

সবাই খুশি হয়ে বলল,"ঠিক আছে। তাহলে তুমি এসো। আর খবর দিও পাকিস্তানীরা কোথায় কখন আক্রমণ করবে।"

পাকিস্তানী আস্তানায় ফিরে হারুন দেখল, তিনশত গজ দূরে পাকিস্তানীরা আসছে। হারুন নিজে গায়ের অনেক জায়গায় আঘাত করল নিজেই। এবং বুদ্ধি করে শরীরে কাদা মেখে বটগাছের নিচে একটা জমিতে শুয়ে পড়ল।

পাকিস্তানীরা দূর থেকে দেখতে পেল তাদের আস্তানায় আগুন লেগেছে। তারা মনে করল মুক্তিবাহিনী এসেছে। তাই ওখান থেকে প্রস্তুতি নিল যুদ্ধ করার জন্য। দু'একটা গুলি ছুঁড়ল আকাশের দিকে। তারপর কাছে ভয়ে ভয়ে এসে দেখল মুক্তিযোদ্ধা নেই। তাদের বন্দিও নেই। হারুন পড়ে কাতরাচ্ছে। তারা সবাই এলো হারুণের কাছে। হারুন তাকে শেখানো কথাগুলো বলল। সাদিকের কথা আর জিজ্ঞাসা করল না পাকিস্তানীরা।

******

পাঁচ দিন পর গোলাগুলি আবার শুরু হল। বটতলায় যুদ্ধে শহিদ হলেন কমান্ডার রফিক ও আরো দুইজন মুক্তিযোদ্ধা। তাদের সম্মানের সাথে কবর দেওয়া হল। তারপর ঠিক করা হল সাদেক হবে কমান্ডার। তাই হল। তারপরের দিন সাদেক এলো বাড়িতে। এসে দেখল তার স্ত্রী ও ছেলে ক্ষুধার জ্বালায় ঠিকভাবে কথা বলতে পারছে না।

সাদেক চোখের পানি ফেলে বলল,"সাদিক বাবা কেমন আছিস? সাদিকের মা তুমি কেমন আছো? "

সাদিক আর সাদিকের মা বলল,"ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?"

সাদিকের বাবা সাদিককে কিছু টাকা দিয়ে বললেন,"যাও বাবা। বাজার থেকে চাল-ডাল কিনে আনো।"

এদিকে,সাদেকের বাড়ির পাশে থাকত আনোয়ার নামের এক মধ্যবয়সি লোক। সে ছিল একটা রাজাকার। তার ধন-সম্পদ অনেক। পাকিস্তানীদের আস্তানা পুড়ে যাওয়ার পর থেকে

পাকিস্তানীরা আনোয়ারের বাড়িতে থাকে। আনোয়ার যাচ্ছিল সাদেকের বাড়ির পাশ দিয়ে। তখন সে সাদেকের কন্ঠ শুনতে পেল। সাদেকের সাথে তার আগে থেকেই শত্রুতা ছিল জমি নিয়ে। আনোয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর দিল পাকিস্তানীদের যে সাদেক বাড়িতে এসেছে। হারুন পাকিস্তানীদের পাশের ঘরেই ছিল। সে সব শুনতে পেলো। পাকিস্তানীরা ঠিক দশ মিনিট পর সাদেকের বাড়িতে হামলা করতে যাবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

খবরটা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছোবার প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানীদের ফাঁকি দিয়ে হারুন পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে এলো। পাকিস্তানীরা এর মধ্যে সাদেকের বাড়িতে রওনা দিল। ওদিকে হারুন নিজে দৌড়ে খবর নিয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে। সঙ্গেসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারাও এলো সাদেকের বাড়ি। এসে দেখল পাকিস্তানীরা সাদেকের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। সাদেক তখন চিন্তা করছে তার স্ত্রীর কথা, ছেলের কথা।

শুরু হল গোলাগুলি। এসে গেছে মুক্তিযোদ্ধারাও। সাদেকের মনে একটু সাহস এলো। সাদেকও গুলি করতে লাগলো। এরই মধ্যে বাজার থেকে ফিরে এলো সাদিক। এসে অবস্থা দেখে বাড়ির সামনের মসজিদের আড়ালে লুকিয়ে থাকল।

গোলাগুলির মধ্যে সাদেক তার স্ত্রীকে নিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে যেতেই গুলি লাগলো সাদিকের মায়ের পায়ে। তারপর তার বাবার হাতে। মা-বাবার চিৎকার শুনে সাদিক আর থাকতে পারলো না লুকিয়ে। ছুটতে লাগলো মা-বাবার কাছে। ঠিক তখন, তার সামনে এসে দাঁovj হারুন। হারুণের হাতে অস্ত্র। বলল,"বাবা সাদিক, খালি হাতে নয়, এই বন্দুকটা নিয়ে এগিয়ে যাও।"

সাদিক একবার বন্দুকের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর একটু ইতস্তত করে হাতে তুলে নিল অস্ত্র। ছুটল গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে মা-বাবার দিকে। ধ্বংস করে দিল পাকিস্তানীদের আমদির পাড়া গ্রাম থেকে।

এই যুদ্ধে শহিদ হল সাদিকের মা সহ পাঁচজন। সাদিক মায়ের সাথে কোন কথা বলতে পারলো না। বাবার যায় যায় অবস্থা। বাবাকে সে বয়ে নিয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে।

সাদিকের মনের মধ্যে তখন অনেক কষ্ট। মাকে হারিয়ে সে একা হয়ে গেছে। মা ছিল সাদিকের সবচেয়ে আপন মানুষ।

তার কাছে এসে শাহজাহান বলল,"বাবা সাদিক, আমি জানি তোমার মনের অবস্থা। তারপরও বলছি বাবা তুমি কেঁদোনা। বরং তুমি বাংলাদেশের জন্য কিছু করো।" সাদিক বলল,"আমি ছোট্ট ছেলে। আমি কীভাবে যুদ্ধ করব?" সাদেক অসুস্থ হওয়াতে শাহজাহান এখন কমান্ডার। বলল,"বাবা সাদিক তুমি যুদ্ধ করতে পারবে না তা ঠিক কিন্তু তুমি খোঁজখবর আনা নেওয়া করবে।"

সাদিক বলল,"না না, তা কেমন করে হয়? "

শাহজাহান বললএই বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হোক তা কি তুমি চাও না? তুমি কি চাওনা যারা তোমার মাকে হত্যা করেছে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে? "

সাদিক ভাবছিলো। তারপর হঠাৎ সে বলে উঠল,"হ্যাঁ আমি রাজি।"

তখন তার বাবা পাশের ঘর থেকে ডাকল,"শাহজাহান, সাদিককে নিয়ে এসো আমার কাছে।"

শাহজাহান আর সাদিক আসতে সে বলল,"আমি দেশের জন্য প্রাণ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রাণ গেল না। আমাকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হল। হয়তো আমি আর ভালো হতে পারবো না।

তবুও আমি আমার মাতৃভুমির পতাকা মাটিতে লুটাতে দেবো না। এক হাত গেছে তো কী হয়েছে? আরেকটা হাত আছে আমার। এই হাত দিয়ে আমি যুদ্ধ করে যাবো।"

বাবার চোখে পানি ছলছল করছে। শাহজাহানের চোখে পানি আর সাদিক তো কাঁদছে আর কাঁদছে। সাদেক ফের বলল, "হয়তো সাদিকের মায়ের নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে না তবে শহিদের খাতায় সংখ্যা হিসেবে থাকবে সাদিকের মাও।"

সাদিক তখন চিৎকার দিয়ে উঠল মা ও মা বলে। চিৎকার শুনে ক্যাম্পে থাকা ৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছুটে এলো সাদেকের রুমে। তারা মনে করল হয়তো কমান্ডারের কিছু হয়েছে। সাদেক সবাইকে লক্ষ করে বলল, "তোমরা সবাই এসেছো খুব ভালো হয়েছে। তাহলে শোনো। আমার সাদিক আজ থেকে হবে তোমাদের মতো একজন মুক্তিযোদ্ধা। সে যুদ্ধ করবে না। সাদিক আমাদেরকে অন্যান্য খবর এনে দিবে। কোন বাড়ি থেকে কাকে ধরলো? কোন মাকে ধরে নিয়ে গেল পাকিস্তানীরা? কোথায় নিয়ে যাবে তাদের? এইসব খবর রাখাই সাদিকের প্রথম কাজ।"

একজন মুক্তিযোদ্ধা বলল, "ভাই, হারুন তো আছে এর জন্য।"

সাদেক বলল, "হারুন অনেক সময় আমাদেরকে খবর দিতে পারে না। তাই হারুন আর সাদিক মিলে এই কাজ করবে। আর একটা বাড়তি কাজ করবে সাদিক। আমাদের মুক্তিবাহিনীর মধ্যে থেকে কেউ পাকিস্তানীদের সাহায্য করছে না কি এই তথ্য সাদিক নেবে। সেগুলো কাউকে না বলে সাদিক একটা কাগজে লিখে কমান্ডারকে জমা দিয়ে যাবে। কমান্ডার তার বিচার করবে।"

শুনে শাহজাহান বলল, "বাবা সাদিক তুমি রাজি তো?"

সাদিক বলল, "চাচা, রাজি কেন হবো না? আমার মা জীবন দিয়েছে দেশের জন্য। বাবাও মৃত্যুশয্যায়। এখন আমি যদি দেশের জন্য কিছু না করি তাহলে কি চলে, বলুন? আমি একা সাদিকের প্রাণ গেলে যদি লক্ষ লক্ষ সাদিক বাঁচে তাহলেই আমার জীবন সার্থক।"

বাবা সাদিকের কথা শুনে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বলল, "আয় বাবা আমার বুকে আয়।" বুকে জড়িয়ে আদর করল সাদিককে ওর বাবা। হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল। শাহজাহান মুক্তিযোদ্ধাদের তৈরি হতে বলল। অপারেশনে যেতে হবে। তারা সবাই বাইরে এসে দেখল শব্দ আসছে যমুনা নদীর ওপার থেকে। এ পাড়ে বিপদ নেই তখন। তারা সবাই ঠিক করল ঘুমাবে। রাত তখন বারোটা। ১০ জন জেগে থাকবে দুই ঘন্টা। আর ৩০ জন ঘুমাবে দুই ঘন্টা পর। আবারো ১০ জন পাহারা দেবে ১০ জন ঘুমাবে। এইভাবে রাত কাটিয়ে দিল তারা।

*******

পরের দিন সকালে সাদিক বের হল তার কাজে। কাছাকাছি অন্য একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছে দেখল এক বাড়িতে কান্না শোনা যাচ্ছে। গিয়ে দেখে একটা মেয়ের লাশ। সাদিক বলল, "কে মেরেছে? এই মেয়ে কার কে হয়?"

জবাবে এক বৃদ্ধ বলল, "এ আমার মেয়ে। আমি আমার মেয়েকে রক্ষা করতে পারলাম না বাবা।"

সাদিক বলল, "চাচা পাকিস্তানীদের আস্তানা কোথায়?"

বৃদ্ধ বলল, "ওই যে প্রাইমারি স্কুলের পাশে এক বাঁশঝাড়ের মধ্যে। তুমি কে বাবা?"

"চাচা, আমি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সাদেকের ছেলে। গ্রাম আমদির পাড়া। আপনাদের গ্রামে এসেছি গতকাল।"

শুনে বৃদ্ধ বলল,“বাবা আমিও যুদ্ধ করতে চাই। রুখে দাঁড়াতে চাই ঐ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সব অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে।”

সাদিক বলল,“ঠিক আছে। আপনি আমার সাথে আসুন আমার বাবার ক্যাম্পে।” বৃদ্ধ তৈরি হল যুদ্ধে যাওয়ার জন্য।

হঠাৎ পেছনের বাড়ির এক মহিলা এসে বৃদ্ধকে বলে,“বাবা আমাদের বাঁচান।”

“কেন মা কী হয়েছে?” বৃদ্ধ প্রশ্ন করল।

মহিলা বলল,“বাবা আমার মেয়ে মরিয়মের বয়স ১৭ বছর। তাকে নাকি আজ রাতে পাকিস্তানী হানাদার শয়তান বাহিনী বন্দি করে নিয়ে যাবে।”

বৃদ্ধ মাথা নিচু করে থাকল কারণ গতকাল তার মেয়েকেও পাকিস্তানীরা হত্যা করেছে। কিন্তু সে কিছু বলার আগে সাদিক বলল,“মা আপনি বাড়ি যান। আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না।”

মা বলল,“তুমি কে বাবা?”

সাদিক বলল,“আমি সাদিক। আমার বাবার নাম কমান্ডার সাদেক।”

মহিলা বলল,“ বাবা, সাদেক ভাই খুব ভালো মানুষ। তিনি এখন কোথায়?”

“বাবা এখন অসুস্থ। তবে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। আপনি যান। আপনাদের দায়িত্ব এখন মুক্তিযোদ্ধারা নিয়েছে। আপনার স্বামী অর্থাৎ মরিয়মের বাবা কি বেঁচে নেই?”

মা বলল,“না বাবা।মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কয়েকদিন পর মরিয়মের বাবা শহিদ হন।”

সাদিক বলল,“ঠিক আছে। আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা আসি।”

কিছু দূর গিয়ে সাদিক মাঠে বসলো এবং চিঠি লিখলো তার বাবার কাছে-

*এই বৃদ্ধকে আমাদের সঙ্গী করে নেবেন।আর আজ রাতে এখানকার এক বাড়িতে পাকিস্তানীরা হানা দেবে। আপনারা যদি পারেন একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। সে বাড়ির মেয়ের নাম মরিয়ম। তার বাবাও একজন মুক্তিযোদ্ধা তবে শহিদ হয়েছেন। আজ এই পর্যন্ত। আল্লাহ্ হাফেজ।*

তারপর সে চিঠি সঙ্গে দিয়ে বৃদ্ধকে সাদেকের কাছে পাঠালো। বৃদ্ধ তাদের ক্যাম্পে এসে সাদেককে এই চিঠিটা দিল। সাদেক অন্য একজনকে দিয়ে চিঠিটা পড়ে নিল। তারপর বৃদ্ধকেও তাদের সঙ্গী করে নিয়ে দুপুর দুটোর দিকে সেই গ্রামে পৌঁছে যুদ্ধ করে রক্ষা করল মরিয়মকে। যুদ্ধে দুইজন পাকিস্তানী সৈন্য মারা গেল।

এইভাবে কেটে গেল প্রায় দুই মাস। এই দুই মাসে সাদিকের দেয়া খোঁজে মুক্তিবাহিনী ১১টিরও বেশি গ্রাম রক্ষা করে তারপর এসে পৌঁছোল কচুয়া গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাঠে। সেখানে ছিল পাকিস্তানীর ২৫০ জনের বড়োসড়ো দল। উল্টোদিকে মুক্তিবাহিনীর বাঙালি মাত্র ৩৭ জন।

সাদেক তখন চোট থেকে সেরে উঠেছে। এক হাত দিয়েই সে যুদ্ধ করে এখন। কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করে শাহজাহান। পাকিস্তানীরা এখনো জানে না মুক্তিযোদ্ধারা এখানে। মুক্তিবাহিনীর পৌঁছোবার পরের দিন সাদিক এলো কচুয়া। এসে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করল। বাবা সাদেকের সাথে দেখা করে চলে যাবে, এমন সময় শাহজাহান এসে বলল,“বাবা সাদিক, আজ একবার জুমারবাড়িতে আমাদের বাড়ি যেও। আমার মেয়ে চাঁদনীর কথা আমার খুব মনে পড়ছে।” শাহজাহানের চোখটা ভরে গেল যেন পানি দিয়ে। সাদিক বলল,“কোন দিক দিয়ে যাবো বলেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো তারা কেমন আছে।”

শাহজাহান তার বাড়ি কোন দিক দিয়ে যেতে হবে বলে দিল। সেইমত সাদিক এলো শাহজাহানের বাড়িতে। এসে এদিকওদিক ভালো করে দেখছে,এমনসময় এক বৃদ্ধ মা চোখে পানি নিয়ে এসে বলল,“বাবা তুমি কে? ”

সাদিক বলল,“দাদী আমি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সাদেকের ছেলে।”

বৃদ্ধ মা তখন বলল,“বাবা আমার খোকা শাহজাহান কেমন আছে? ও কোথায়? ”

সাদিক বলল,“আপনার খোকা ভালো আছে।”

মা বলল,“আমি জানি আমার খোকারা বাংলাদেশ স্বাধীন না করে কোথাও যাবে না।”

সাদিক প্রশ্ন করলো,“শাহজাহান চাচার মেয়ে ও স্ত্রী কোথায়?”

বৃদ্ধ মা বলল,“আছে ঐ ঘরে।”

সাদিক ঘরের দরজায় গিয়ে দেখল মা মেয়ে দুই জনে মিলে চাচার ছবি নিয়ে মাটিতে বসে কাঁদছে। সাদিক অবাক হয়ে গেল। এতো ভালোবাসে তারা শাহজাহান চাচাকে। আর তিনি তাদের ছেড়ে যুদ্ধ করছেন এই দেশের জন্য। আমাকে জানতে হবে কে পাঠিয়েছে শাহজাহান চাচাকে যুদ্ধ করতে। সে ডাকলো,“চাচি।”

চমকে উঠে ফিরে তাকালো মা ও মেয়ে। সাদিক বলল,“আমি আমদির পাড়া গ্রামের সাদেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের ছেলে। আমার নাম সাদিক। আমি এসেছি আপনাদের খোঁজখবর নিতে। আপনারা কেমন আছেন?”

শাহজাহানের স্ত্রী বলল,“বাবা দেখছোই তো আমরা কেমন আছি।” তার চোখে পানি ছলছল করছে। সাদিক বলল,“বুঝলাম। তবে আপনি বলেন তো শাহজাহান চাচাকে আপনাদের ছেড়ে যুদ্ধে কে পাঠিয়েছে?”

জবাবে শাহজাহান চাচার স্ত্রী চাচার মায়ের ছবি এনে দেখিয়ে বলল,“এই মর্দিলা।”

সাদিক বলল,“ইনি তো চাচার মা।”

চাচি বলল,“হ্যাঁ বাবা। তার আদরের শাহজাহানকে তার মা-ই যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছে। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে। এই দেশ থেকে শয়তান পাকিস্তানীদের তাড়িয়ে দিতে। আজও আমার শাশুড়ি বারান্দায় বসে থাকে বিজয়ের পতাকা নিয়ে, কখন তার খোকা আসবে ফিরে।

হঠাৎ পেছনের দিকে একটা আওয়াজ পেয়ে সাদিক তাকিয়ে দেখল শাহজাহান চাচার মা নতুন একটা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। বলল,“ শাহজাহানকে বলবে আমরা ভালো আছি। আমাদের মনটা তাকে দেখার জন্য ব্যকুল। কিন্তু খালি হাতে নয়, বিজয়ের পতাকা হাতে। আমি আমার সন্তানকে দেখতে চাই বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে।”

সাদিক চোখের পানি মুছে কাঁপা গলায় বলল,“ঠিক আছে আমি বলব। তবে শাহজাহান চাচা চাঁদনীকে নিয়ে যেতে বলেছে।” শুনে চাচি চাঁদনীকে বলল,“মা চাঁদনী, তোর বাবা তোকে যেতে বলেছে। তুই যাবি? গেলে যা।”

******

রওনা দিল চাঁদনী আর সাদিক। রাস্তার মধ্যে চাঁদনী সাদিককে বলল,"জানো

আমার মা আর দাদীর রাতে ঘুম আসে না এক মিনিটের জন্য। তারা বারান্দায় বসে থাকে কবে আসবে কখন আসবে বাবা। লাল সবুজ রঙের সেই পতাকা নিয়ে। দাদী নামাজে বসে রোজ বাবার জন্য দোয়া করে। বাবারা যেন যুদ্ধ করে ছিনিয়ে আনে হানাদারদের হাত থেকে আমাদের সোনার বাংলাদেশ।"

সাদিক বলল,"জানো, তোমার মা-বাবার তুলনা হয় না।"

এইভাবে কথা বলতেবলতেই কচুয়া প্রাইমারি স্কুলের সামনে এসে গেল তারা। চাঁদনী খুশি হয়ে দৌড়ে গেল তার বাবার কাছে। শাহজাহান চাঁদনীকে দেখে বলল,"মা রে তুই কেমন আছিস?"

চাঁদনী বলল,"আমরা ভালো আছি।"

সাদিক এবারে সবকিছু শাহজাহানকে বলল। সব শুনে শাহজাহানের দু চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। শাহজাহানের পাশে থাকা ৩৭ জন মুক্তিযোদ্ধা শুনছে শাহজাহানের মায়ের, স্ত্রীর বলা কথাগুলো। সবার চোখে পানি ভরে যায়।

হঠাৎ শাহজাহান বলল,"কোন তোমরা, আজ আর আমরা কাঁদবো না। এবার শুরু হবে সেই যুদ্ধ। মুক্তির যুদ্ধ। তোমরা কী বলো?"

সবাই বলল,"হ্যাঁ। তাই হবে।" শাহজাহান খুশি হয়ে সাদিককে বলল চাঁদনীকে বাড়ি পৌছে দিতে। তাই করল সাদিক।

*****

শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। কৃষক, মজুর, ছাত্র, শিক্ষক, তরুণ, প্রবীণ, গৃহিণী, কর্মচারী সকলেই রাস্তায় নেমে পড়ল স্লোগান নিয়ে। জয় বাংলা বাংলার জয় সর্বত্র বাতাসে মিশ্রিত হল। এক সত্য এককথা সবাই বলছে চাই বাংলার স্বাধীনতা। আমাদের মহামানব মহান নেতা, জাতির পিতা স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। বলেছেন- তোমাদের যা কিছু আছে নাও হাতে তুলে, তা দিয়েই শত্রু মোকাবেলা করতে হবে। হারাতে হবে পাকিস্তানী বাহিনীদের।

বাংলার যুবক যেন হয়ে উঠল দামাল। কেউ নিল ঝাড়ু, কেউ নিল লাঠি, কেউ নিল কোদাল। বলছে তারা আমরা বাংলার যুবক দামাল, হানাদাররা থাকবে না আর আগামীকাল।

সারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা জেগে উঠল। আজকের যুদ্ধ হবে শেষ যুদ্ধ। সাদিক আজ গিয়েছে মধুপুর ক্যাম্পে। সেখানে পৌঁছতে তার রাত হয়ে গেল। চারদিক থেকে গুলি ছুটছে। সাদিক ভয়ের মধ্যে পড়ে যায়। ক্যাম্পের কমান্ডার মুনতাজ মুক্তিযোদ্ধাদের বলল,"তোমরা জীবনের আশা করো না। আজ রক্ষা নয় প্রাণ, রক্ষা করব দেশটাকে।"

গোলাগুলি করে অবশেষে মুনতাজের বাহিনী জয় করল মধুপুর এলাকা। সাদিক মুনতাজের কাছ থেকে এই খবর লেখা চিঠি নিয়ে কচুয়া রওনা হল। রাত তখন বাজে ঠিক বারোটা। সাদিক আস্তে আস্তে আসছে। ভয়ে ভয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানায় এসে গেল। সেখানে কারো সাথে তার দেখা হল না। তারা সবাই যুদ্ধ করছে। সাদিক বাইরে বের হতে পারছে না। চারদিকে শুধু গুলির শব্দ। সাদিক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল কে যেন। বাম দিকে কুদ্দুসদের বাড়ি থেকে চিৎকার উঠছে। কুদ্দুস শহিদ হয়েছে।

ডান পাশে কুদ্দুসের চাচার বাড়ি। ঐখান থেকে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাঁদছিল কদ্দুসের দাদি। কারণ তার ছেলে খয়বর ছিল একজন রাজাকার। দেশের প্রতি ছিল না তার একটুও ভালোবাসা। দাদি বলছে,"তুই দেশের সঙ্গে তোর মাতৃভুমির সঙ্গে বেঈমানি করেছিস। আমি তোর মা হয়ে বলেছিলাম যা তুই দেশের জন্য লড়াই কর, রক্ষা কর তোর মাতৃভুমি। আর তুই হলি রাজাকার।"

এই কথাগুলো শুনছে সাদিক আর ভাবছে তার মায়ের কথা। মা যদি বেঁচে থাকত তাহলে তাকেও বলত, যা বাবা সাদিক তোর মাতৃভুমি রক্ষা কর। চোখ দিয়ে ঝর্ণার মতো পানি ঝরছে সাদিকের। আজ কেন যেন মনে পড়ছে তার মায়ের কথা। কুদ্দুসের দাদি সবশেষে বলল,"তোর এই অপবিত্র গায়ে আমি স্পর্শ করব না। আমি হাত দেবই না। তোকে খাবে বাংলার কুত্তা-শকুনেরা।"

এদিকে ৩৭ জন নিয়ে যুদ্ধ করছে সাদেক আর শাহজাহান ২৫০জন পাকিস্তানীদের সাথে। এর মধ্যে মারা গেল পাকিস্তানীর ১৫০ জন আর শহিদ হল মুক্তিযোদ্ধাদের মাত্র ৫ জন। সাদেক এক হাত দিয়েই যুদ্ধ করছে। শাহজাহানের মনে একটু ভয় হল। পাকিস্তানীরা আরো একশত জনের মতো আছে। আর তারা মাত্র ৩২ জন।

অবস্থা দেখে হারুন কাউকে কিছু না বলে গেল মুনতাজের কাছে মধুপুর। গিয়ে বলল তাদের সাহায্যের প্রয়োজন এই ক্যাম্পে। মুনতাজ তার বাহিনীদের নিয়ে ছুটল কচুয়া। তারা সবাই যুদ্ধ শুরু করল হারুন সহ। এক সময় শহিদ হল হারুন আরো কয়েকজন। পাকিস্তানীদের আরো মারা গেল ৫০ জন। তখনো পাকিস্তানীরা যুদ্ধ বন্ধ করেনি। কচুয়া স্কুল মাঠ হয়েছে রক্তের নদী। সাদিক জানালা দিয়ে দেখছে কাউকে চেনা যাচ্ছে না। সাদিকের মনে হল হঠাৎ চাঁদনীর কথা।

অন্ধকার রাত। চারদিক ধূ ধূ করছে। মায়ের কান্না, বাবার কান্না আর গুলির শব্দ ছাড়া চারদিকে আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। শাহজাহান সাদিকের সামনে থেকে যুদ্ধ করছে। শাহজাহানের পাশেই ছিল সাদেক। তাকেও চেনা যাচ্ছে না।

অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনী হার মানল। পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাপ্টেন আত্মসমর্পণ করবে। হঠাৎ সাদিকের চোখে পড়ল তার সহযোগী পাকিস্তানী গুলি করতে যাচ্ছে সাদেককে।

আকাশের ঝলকানির আলোয় তাই দেখল সাদিক। আর দৌড়ে এসে ধাক্কা দিয়ে বাবাকে সরিয়ে দিয়ে বুকটা পেতে দিল বন্দুকের সামনে।

পাকিস্তানী সাদিকের উপর গুলি চালাল। তিনবার গুলি করল। এবারে ফের রুখে দাঁড়াল শাহজাহান, সাদেক বাহিনী আর মুনতাজের বাহিনী। ধ্বংস করে দিল পাকিস্তানীদের। তারপর তাদের মুক্তিবাহিনী দল ছুটে এলো সাদিকের কাছে। হারুণের মৃতদেহের পাশে। সাদিক মৃত্যুশয্যায়। চোখ দুটো মেলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। শুনছে বিজয়ের বাজনা। সাদেক চোখের পানি ঝরাচ্ছে। পানির ফোঁটা সাদিকের গায়ে পড়ছে। সাদিক রক্তমাখা মুখে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল,"বাবা তুমি কাঁদো কেন? আজ তো কাঁদার দিন নয়। আজ আনন্দের দিন। বাবা তুমি আর কান্না করো না। আমি তো দেশের জন্য প্রাণ দিলাম।"

বাবা কাঁদে আর বলে,"সাদিক তুই আমাকে কেন বাঁচালি? আমিই মরে যেতাম দেশের জন্য।"

সাদিক বলল,"বাবা তোমার নাম তো আছে মুক্তিযোদ্ধার কমান্ডারের খাতায়। আমার নাম নাই কোথাও। আমি প্রাণ দিয়ে শহিদের খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার নাম লেখাতে চাই।"

এই প্রথম বারো বছরের একটা শিশু দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। শাহজাহান, সাদেক, মুনতাজ এবং তাদের সহপাঠীরা কাঁদছে আর চোখের পানি পড়ছে কচুয়া প্রাইমারি স্কুল মাঠে। দূর থেকে সুমধুর কন্ঠে মিছিল আসছে শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। এই মিছিলে আছে শাহজাহানের মেয়ে চাঁদনী, স্ত্রী, তার মা অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের আপনজনেরা। তারা সবাই স্লোগান দিচ্ছে জয় বাংলা, বাংলার জয়। মিছিল এলো স্কুল মাঠে। এসে দেখল এখানে কোন আনন্দ ফুর্তি হচ্ছে না। প্রাইমারি স্কুল মাঠে এসে থেমে গেল তারা। সাদিকের কাছে এলো সবাই।

শাহজাহানের মা এসে বলল,"সাদিক বাবা তুমি এমন করছো কেন?"

সাদিক বলল,"দাদিগো ও বাবা গো আমাকে একটু তুলে বসাও। আমি দেখতে চাই বাংলার মানুষদের তারা কেমন করে জয়ের আনন্দ করছে।"

সাদিককে তুলে বসানো হল। সে দেখল চাঁদনীও কাঁদছে। সে তার পকেট থেকে নিজের হাতে আঁকা লাল সবুজ রঙের পতাকা বের করে চাঁদনীকে দিল। দিয়ে বলল পতাকাটা তোমার কাছে রেখো সবসময়। শেষে পকেট থেকে সাদিক একটা চিঠি বের করল। সবাই তাকিয়ে আছে চিঠির দিকে।

সাদিক বলল,"বাবা এটাই আমার শেষ চিঠি। এতে লেখা আছে এতদিন ধরে আমার জোগাড় করা আমার দেশের বেঈমান রাজাকারদের নাম।"

বাবা চিঠি হাতে নিয়ে কাঁদছে। সাদিক বলল,"বাবা তুমি আর কেঁদো না। আমি তোমার একা সন্তান না। সারা দেশের দামালরা এবং শিশু যারা তারা সবাই তোমার সন্তান। আমি তোমাদের লক্ষ লক্ষ বার সালাম করি। সালাম জানাই জাতীয় পতাকাকে।"

তখন হাজার হাজার মিছিলের লোক একসাথে সাদিককে সালাম দিল। সাদিক চলে গেল এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে। সাদিকের লাশটা শ্রদ্ধার সাথে দাফন করা হল ঐ স্কুল মাঠেই।

এখনো আমরা সবাই বিশ্বাস করি সাদিকের মতো দেশপ্রেমিক আছে সোনার বাংলাদেশে। ও আমাদের দেশ সোনার বাংলাদেশ তোমাকে জানাই হাজার হাজার বার সালাম। তোমাকে নিয়ে লেখা কেউ করতে পারবে না শেষ। ও আমার সোনার বাংলাদেশ।

**ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য**

# সেই অদ্ভুত লোকটি

সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

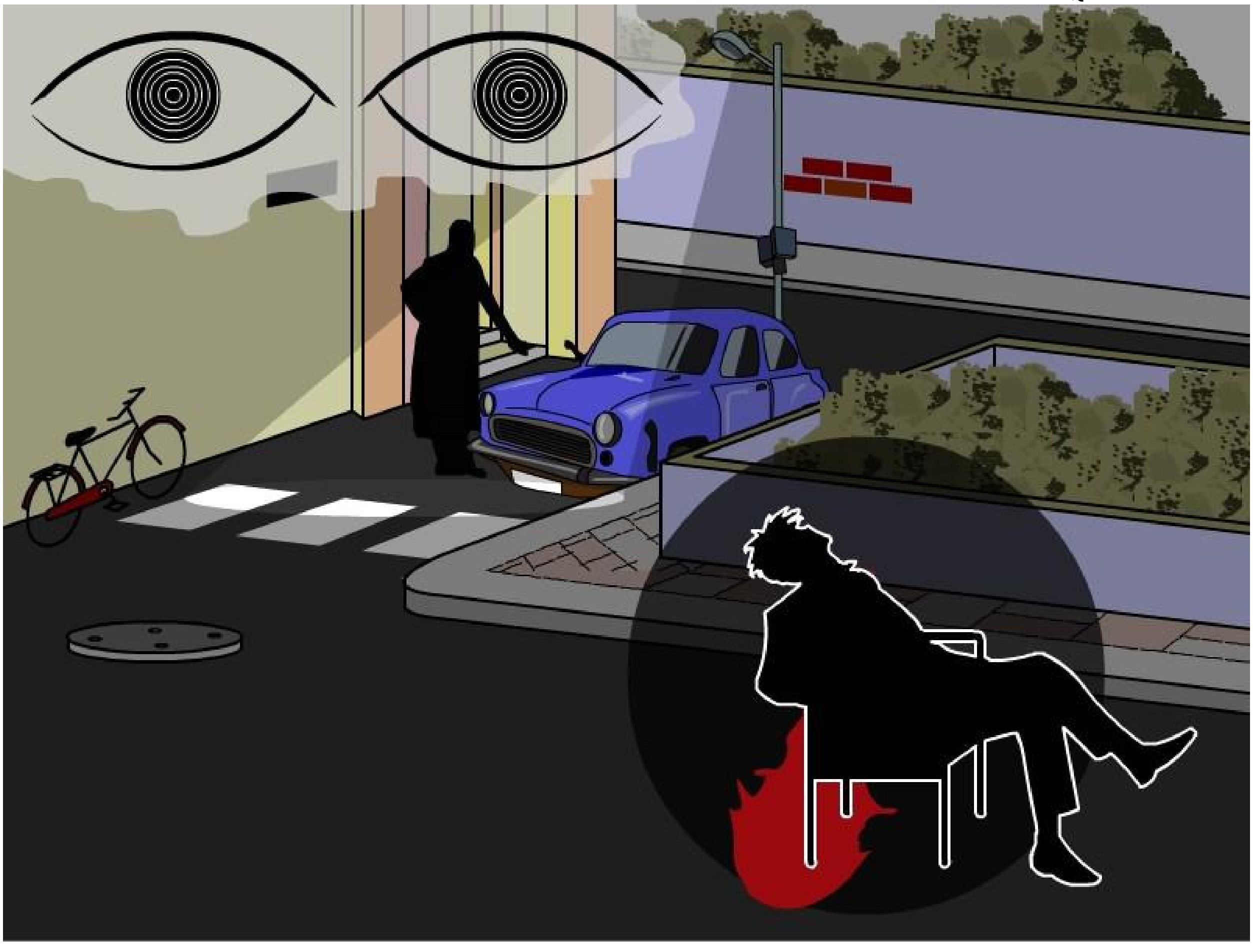

সন্ধের ঠিক মুখটাতে এসে অনুজ আবিষ্কার করল সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। গাড়িটার স্পিড কমিয়ে এদিক- ওদিক চাইতে লাগল, কাউকে দেখা যায় কিনা। কাউকে না পেয়ে অবশেষে সে গাড়ি থামাল। এই শহরে নতুন এসেছে অনুজ। পুরনো কলেজের বন্ধু চারু এই শহরেই থাকে। পুলিশ অফিসার। তার সঙ্গে দেখা করতেই আসা। ফোনে কথা হয়েছে, চারুর ঠিকানা অনুজের কাছে আছে। এই এলাকাতেই এমারেল্ড এনক্লেভ বলে কোন এক সোসাইটিতে চারুর ফ্ল্যাট। শহরের একটু বাইরে নতুন গড়ে ওঠা অত্যাধুনিক আবাসন প্রকল্প। সারি সারি এক ধাঁচের একতলা দোতলা ছিমছাম বাড়ি ও বাংলো। খোলামেলা বাগানঘেরা বাড়িগুলো দেখলেই বোঝা যায় সেগুলো মহার্ঘ। একটু দূরে অনেকগুলো বহুতল টাওয়ারও দেখা যাচ্ছে। চারুর ফ্ল্যাট পাঁচতলায়, সুতরাং ঐ টাওয়ারগুলোরই কোনটায় হবে নিশ্চয়। এমন জায়গায় অনুজ সহজেই ঠিকানা খুঁজে নিতে পারবে ভেবেছিল। কিন্তু জায়গাটা যে এতটা জনহীন হবে বুঝতে পারে নি।

আসন্ন সন্ধের আলোআঁধারিতে খানিক ঘুরপাক খেয়ে অনুজ দেখল সে ঐ বহুতল বাড়িগুলোতে কিছুতেই পৌঁছোতে পারছে না। একইরকম দেখতে চওড়া রাস্তাগুলোতে মনে রাখার মত কোন চিহ্ন নেই। এই অঞ্চল থেকে বেরোবার রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। কোন বাড়িতে ঢুকে রাস্তা মালুম করাটা ঠিক সমীচীন বোধ করল না অনুজ। তাছাড়া বেশির ভাগ বাড়িতে এখনও কেউ আসে নি। দু'একখানা গাড়ি হুশ করে বেরিয়ে যেতে দেখেছে বটে, কিন্তু এতক্ষণে পথচারী একজনও দেখা যায় নি।

গাড়ি থামিয়ে চারুকে ফোন লাগাল অনুজ। চারু থানায় ছিল। বলল, "আরে, তুই কোথায়?"

অনুজ যে কোথায় তা কী করে বলবে? আশেপাশের কিছু বাড়িঘরের বর্ণনা দিতে চারু বললে, "মনে হচ্ছে বি- ব্লকের ওইদিকটায় চলে গেছিস। এদিকে আমি আবার একটু ফেঁসে গেছি। আমার ডিউটি শেষ, কিন্তু এক উড়ো ফোনে এইমাত্র কেউ জানালো এফ- ডি টাওয়ারে–আমার বাড়ি থেকে খানিকটা আগে– একটা মার্ডার না সুইসাইড কি হয়েছে। সেইটারই কেস নোট করে, আর একজনকে চার্জ বুঝিয়ে আসতে একটু টাইম লাগবে। তুই যেখানে আছিস সেখানেই ওয়েট কর। আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তোকে ঠিক খুঁজে নেব।"

এক ঘণ্টা! অনুজ ঘড়ি দেখল, সাতটা দশ। তার মানে চারুর আসতে আটটা- সাড়ে আটটা বাজবে। একটু হতাশভাবেই সিটের পেছনে মাথাটা এলিয়ে দিয়েছে অনুজ, এমন সময়ে দেখল উস্কো- খুস্কো চুল এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক হনহন করে তার দিকেই আসছে। সোজা টানটান হয়ে বসতেই লোকটা তার গাড়ির কাছে এসে গেল। অনুজ তাড়াতাড়ি আওয়াজ দিল, "এই যে স্যার, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন? এক ঘন্টা আগে এক বন্ধুর সাথে দেখা করার কথা ছিল আমার, কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলায় আমি বুঝতে পারছি না কোথায় এসেছি।"

লোকটার লম্বা একহারা চেহারা। ঝাঁকড়া চুলের জন্যে মাথাটা শরীরের তুলনায় বেশ বড়ো। পরনে হাঁটুপর্যন্ত একটা আলখাল্লা মত পাঞ্জাবী, আর কালো প্যান্ট। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য তার চোখদুটো। চোখের মণিটা তার হাল্কা সবুজ, এই সময়ে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় প্রায় সাদাই দেখাচ্ছে। মণির মাঝখানে একটা করে কালো বিন্দু। কটা চোখের মানুষ অনেক দেখেছে অনুজ, কিন্তু এমনটা ঠিক কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। লোকটা এক দৃষ্টিতে চাইতেই অনুজের গা'টা যেন শিরশির করে উঠল।

লোকটি খসখসে গলায় জবাব দিল, "তুমি রয়েছ এক মহার্ঘ চতুর্চক্রযানে যা ইচ্ছেমত ঘন্টায় ১২০ মাইল গতিতে দৌড়োতে পারে কিন্তু দরকার পড়লে বন্ধুর ঠিকানায় পৌঁছতে পারে না। তোমার পশ্চাদ্দেশ জমি থেকে ২৫ ইঞ্চি উঁচুতে। তোমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত, মাত্র ২৮ ওয়াট ক্ষমতায় কাজ করছে। তুমি উদ্বিগ্ন, তোমার হৃদযন্ত্র প্রতি সেকেন্ডে গড়ে ৮৮ বার স্পন্দিত হচ্ছে।"

"আমি কোথায় এসেছি বলতে পারেন কি?"

"নিশ্চয়। তোমার অবস্থান এখন ৪৫ থেকে ৫০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭০ ও ৭৫ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মধ্যে।"

অনুজ বেশ হতভম্ব হয়ে গেল। লোকটা কি পাগল? ঠিক সেরকম তো মনে হচ্ছে না। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "এসব আপনি কী করে বলছেন?"

এবার লোকটা যে মুখভঙ্গি করল তা নিশ্চয় হাসির। কিন্তু সে হাসি নিঃশব্দ। তারপর বলল, "আমি তো আরও অনেক কিছু বলতে পারি। কিন্তু তাতে কার কী লাভ?"

"আপনি কি ম্যাথমেটিশিয়ান?" অনুজ জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, তা বলতে পার। তবে আমি এমন অনেক কিছু জানি যা তোমার কোন ম্যাথমেটিসিয়ানই বলতে পারবে না।"

অনুজ বুঝে গেছে, পাগলের পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু লেখাপড়া জানা পাগল। নবারুণদার মতো। নবারুণদা ছিল এমএসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, অঙ্কপাগল। ফুলশয্যার

রাতে বৌদিকেও মাল্টিপল ইন্টিগ্রেশন নিয়ে লেকচার দিয়েছিল। কিন্তু নবারুণদা এমনিতে বেশ হাসিখুশি।

এই লোকটা একটু অন্যরকম। অনুজ তাকে একটু উশকে দেবার জন্যেই প্রশ্ন করল, "যেমন?"

"এই যেমন ধর, ঐ গাছটার নীচ থেকে পাঁচ নম্বর ডালটায় কটা পাতা আছে কিংবা এখান থেকে পনেরো স্টেরেডিয়ান সলিড অ্যাঙ্গেলের মধ্যে মহাকাশে কত নক্ষত্র আছে, অথবা..."

"আপনার এইসব জানা আছে?" অনুজ ইচ্ছে করেই ব্যঙ্গের স্বরটা চাপবার চেষ্টা করল না।

"তা আছে। কিন্তু বলব না। কেননা তোমার এসব জানা নেই। কাজেই ভেরিফাই করতে পারবে না। এবং আমি যাই বলব, ভাববে গুল মারছে।"

"হুঁ বুঝেছি," অনুজ পাগলকে আর বেশি না ঘাঁটিয়ে জবাব দেয়, "আপনি দেখছি অনেক কিছু জানেন। কিন্তু আমি প্রথমে আপনার কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম, তার জবাব তো পেলাম না। আপনার উত্তর হয়ত ম্যাথমেটিকালি কারেক্ট, কিন্তু এসব তথ্য আমার কী কাজে লাগবে তাতো বুঝলাম না। আমি এখনও আগের মতো পথ হারিয়েই আছি। কীভাবে বন্ধুর বাড়ি পৌঁছব, এখনও জানিনা। সোজা কথায় এখনো পর্যন্ত আপনি আমার কোন উপকারেই এলেন না।"

পথিক একটু থেমে তার কটা চোখে অনুজের দিকে কটমট করে চাইল। চাউনিতে বোঝা গেল সে চটেছে, কিন্তু ঠাণ্ডা গলাতেই বলল, "তুমি নিশ্চয়ই কোনো কোম্পানির ম্যানেজার, এমবিএ?"

"হ্যাঁ," এবার অনুজের অবাক হবার পালা, "কিন্তু আপনি কীভাবে বুঝলেন?"

লোকটি উত্তর দিল, "খুব সহজ। তুমি জান না তুমি কোথায় রয়েছ বা কোথায় যাচ্ছ। বন্ধুর কাছে তুমি এমন প্রতিজ্ঞা করেছ যা রক্ষা করার উপায়ও তোমার জানা নেই, কিন্তু আশা করছ তোমার সমস্যা তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি সমাধান করে দেব। ভাল করে ভেবে দেখ আমার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তুমি যেখানে ছিলে, সেখানেই আছ, আমি তোমার কোনো অতিরিক্ত অনিষ্ট করিনি। কিন্তু তুমি যে কোনভাবেই হোক আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে দিলে। ওয়াহঃ...এক্সেলেন্ট কোয়ালিটিজ অফ আ গুড ম্যানেজার, টেন অউট অফ টেন।"

এই বলেই লোকটা হনহনিয়ে পেছন দিকে চলে গেল। অনুজ দেখল, পাগল হোক ছাগল হোক, এই আঁধারে তার একমাত্র ভরসা চলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে মুখটা বাড়িয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে একটু গলা তুলে বলল, "ও মশাই, শুনছেন? এমারেল্ড এনক্লেভটা কোনদিকে হবে জানেন কি?"

লোকটা পিছন না ফিরেই ডানহাতটা মাথার পাশে নেড়ে রাগতস্বরে "জানিনা" বলে একইভাবে চলতে লাগল। অনুজ হতাশ হয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে আবার সিটে গা এলিয়ে দিল। এখন চারুর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। চারু কতক্ষণে আসবে ভাবতে ভাবতে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাতটা বাড়িয়েছে, হঠাৎ দেখে জানলায় একটা মুখ! সেই ঝাঁকড়া চুল, সেই সাদা চোখ! অনুজ আঁতকে উঠেছিল। লোকটা তার দিকে চেয়ে চাপাস্বরে বলল, "দ্যাখো ছোকরা, আমি জানি, কিন্তু বলব না।" বলেই যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেই দিকে চলে গেল।

অনুজের হৃদযন্ত্র আকস্মিক চমকে বেশ ধড়ফড় করছিল, স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারল, লোকটার বোধহয় রাগ একটু পড়েছে। তাড়াতাড়ি গাড়ি

থেকে নেমে অনুজ দেখল লোকটা বেশ খানিকটা চলে গেছে। ক্ষিপ্রগতিতে তার কাছে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "শুনুন না মশাই, কিছু মনে করবেন না। একটু এমারেল্ড এনক্লেভের রাস্তাটা বলে দিন না।"

লোকটা একবার অনুজের আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কতো নম্বর?"

"ডি- ৫৩।"

লোকটা শান্তস্বরেই বলল, "আমিও ওইদিকেই যাচ্ছি। আমাকে সঙ্গে নিতে চাইলে তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি।"

অনুজের একবার মনে হল, এ মন্দ নয়। তারপরেই ভাবল, লোকটার মতিগতি ভালো তো? গাড়িতে দামি জিনিস বিশেষ কিছু নেই অবশ্য। কিন্তু একলা গাড়িতে পেয়ে যদি ছোরাছুরি বার করে?

"ভয় নেই, এই দ্যাখো আমার সাথে অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই," লোকটা যেন অনুজের মনের কথা পড়ে নিল। দুহাতে নিজের জামাটা ঝেড়ে দেখিয়ে বললে, "আসলে জায়গাটা খুব দূরে না হলেও এই রাতে চিনে যেতে পারবে না। তাই বলছিলাম। অবশ্য তোমার আপত্তি থাকলে বলি শোনো...।"

এরপর আর অনুজ না বলে পারল না, "না না কী যে বলেন, আপত্তি কিসের? আপনি আসুন না, তাহলে তো খুব ভালো হয়।"

দুজনে গাড়িতে বসে লোকটার কথায় অনুজ গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর চলল লোকটার নির্দেশমতো। নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে হাতের ইশারায়। লোকটা গাড়িতে ওঠবার পরে আর কোন কথা বলছে না। অনুজও তার হাতের দিকেই নজর রাখছিল, মুখের দিকে তাকাচ্ছিল না। খালি মনে হচ্ছিল, তাকালেই যদি দেখে একজোড়া সাদা চোখ তার দিকে চেয়ে আছে!

মিনিটপাঁচেক চলার পরেই তারা সেই টাওয়ারগুলোর কাছে এসে গেল। এতক্ষণ ঘুরেও অনুজ খুঁজে পায়নি কেন কে জানে। বড়ো বড়ো বাড়িগুলোর মাঝ দিয়ে বেশ অনেকগুলো সমকোণী বাঁক পেরিয়ে তারা চলল। মাঝে মাঝে অনুজের চোখে পড়ছিল ব্লকের নম্বর লেখা পাথরের ফলকগুলো। অবশেষে লোকটা গাড়ি থামাবার ইঙ্গিত করল। অস্পষ্টভাবে অনুজের মনে হল শেষ যে ব্লকের নামটা দেখেছিল সেটা এফ- ডি। কিন্তু সঠিক মনে করতে পারল না।

গাড়ি থেকে নেমে লোকটা সামনের উঁচু বাড়িটা দেখিয়ে বলল, "ঐ যে এফ- ডি ৫৩। চারুদত্ত চৌধুরি তো? পুলিশ অফিসার? পাঁচতলায়।"

অনুজের পরিষ্কার মনে আছে সে ডি- ৫৩ বলেছিল। তবে কি সে ঠিকানা ভুল জানত? লোকটার কথায় তো মনে হচ্ছে, চারুকে সে ভালো করেই চেনে। একটু সন্দেহে সে পিছনে লোকটার দিকে চাইল। লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "আরে আমি তো বলছি, এই বাড়ি। একবার দেখেই এসো না বাপু। আমি না হয় দাঁড়াচ্ছি এখানে।"

অনুজও তাই ঠিক করল। লিফটে চড়ে পাঁচ তলার বোতাম টিপে দিয়ে ভাবতে লাগল, চারু যখন তাকে ঠিকানা দিয়েছিল, সে নিশ্চয় শুনতে ভুল করে থাকবে। লোকটা যখন চারুকে এতো ভালো করে চেনে-

লিফটের দরজা খুলে যেতে অনুজ বেরিয়ে এল। সামনে প্রশস্ত ল্যান্ডিং- এর দু' পাশে দুটো দরজা। একটায় নামের ফলক, লেখা "জি পরাঞ্জপে"। অন্যটাই তাহলে চারুর। ব্যাটা এখনও নেমপ্লেট লাগায় নি?

চারু তো বাড়িতে নেই, অনুজ একটু ভেবে পরাঞ্জপেদের দরজাতেই নক করল। একটু পরেই সেই ভারী মেহগনি কাঠের দরজা খুলে গেল। বিলাসবহুল অভিজাত একটি ঘরের এক টুকরো অনুজের সামনে উন্মোচিত হল। দরজা যিনি খুলেছেন তিনি মধ্যতিরিশের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা। মিসেস পরাঞ্জপেই হবেন নিশ্চয়। মহিলার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে অনুজ হিন্দিতেই প্রশ্ন করল, "কিছু মনে করবেন না, চারুদত্ত চৌধুরি কি সামনের ঐ ফ্ল্যাটে থাকেন?"

"না, ওটা তো ডক্টর শেখাওয়াতের। তবে মনে হয় উনি এখন নেই।"

"এটা ডি...মানে এফ- ডি ৫৩ তো?"

"হ্যাঁ...?"

"আমি দুঃখিত, ভেবেছিলাম, আমার বন্ধু এই বিল্ডিঙয়ে থাকে, ফিফথ ফ্লোর, এফ- ডি- ৫৩। মনে হচ্ছে ওটা বোধহয় ডি- ৫৩ হবে।"

ঝাঁকড়া চুল, কটা চোখের ওপর ভারি রাগ হল অনুজের। জেনেশুনে ভুল জায়গায় নিয়ে এসেছে। চলেই আসছিল, ভদ্রমহিলা বললেন, "আপনি ফিফথ ফ্লোরে একবার দেখে নিন না। আসলে আমরা এখানে আড়াই মাস হল এসেছি, সবার সাথে তেমন আলাপ নেই...।"

"এটা ফিফথ ফ্লোর নয়?" হতবাক অনুজের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"না, এটা তো ফোরথ। ঐ দেখুন না..." মহিলা সিঁড়ির পাশেই তলার ফলকটা দেখিয়ে দিলেন, সত্যিই সেখানে জ্বলজ্বল করছে লেখা, ফোরথ ফ্লোর।

তাহলে কি লিফটের বোতাম টিপতে ভুল হল অনুজের? অপ্রস্তুতভাবে দুঃখপ্রকাশ করে অনুজ আবার লিফটের কাছে এগিয়ে গেল। লিফট সেখানে ছিল না, কলিং বোতাম টিপতে অনেক নীচে যন্ত্রদানব যেন সক্রিয় হয়ে উঠল। মিসেস পরাঞ্জপে পিছনে দরজা বন্ধ করলেন।

একটাই তো তলা, হেঁটেই উঠে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতেই লিফট এসে গেল। অনুজ তাতে চড়ে খুব খেয়াল করে ৫ নম্বর বোতাম টিপল। লিফট একটা ফ্লোর উঠেই থামল। লিফট থেকে বেরিয়ে এসেই অনুজ আবার একটা ধাক্কা খেল। সামনের দরজায় লেখা "জি পরাঞ্জপে", তলার ফলকে সেই ফোরথ ফ্লোর। অথচ লিফটটা তো একটা তলা উঠেছে? না কি ওঠেনি? যান্ত্রিক গোলযোগ?

কুণ্ঠিতভাবে সে আবার পরাঞ্জপেদের দরজাতেই নক করল। এবার একটু বেশি সময় লাগল। তারপর মিসেস পরাঞ্জপে আবার দরজা খুললেন। এবার চোখে তাঁর বিস্ময়।

"আবার আপনাকে একটু বিরক্ত করছি বলে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু লিফটে কি কোন প্রবলেম আছে?" অনুজ জিজ্ঞেস করল।

"না। কেন বলুন তো?"

"আমি আগের বার আপনার সাথে কথা বলে লিফটে গিয়ে ওপরে উঠলাম। কিন্তু দেখছি সেই একই ফ্লোরে রয়ে গেছি।"

"আপনি কী বলছেন ঠিক বুঝলাম না, " ভদ্রমহিলার মনের বিরক্তি অনুজের কাছে গোপন রইল না তাঁর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায়, "নতুন লিফট, কোন প্রবলেম নেই। আপনার নিশ্চয় ভুল হয়েছে।"

অনুজ জানে তার বোতাম টিপতে কোন ভুল হয় নি। মাথাটা কিরকম গুলিয়ে গেল। আবার পিছন ফিরে চলে আসছিল, শুনতে পেল মিসেস পরাঞ্জপে বলছেন, "আপনি সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান না হয়। আর দেখুন, কাল আমার ছেলের পরীক্ষা। একটু ব্যস্ত আছি, শুধুশুধু বারবার ডিস্টার্ব না করলে ভালো হয়...।"

না, আর ওনাকে বিরক্ত করবে না অনুজ। উনি ঠিকই বলেছেন, লিফট নয়, এবার সিঁড়ি দিয়েই যাবে সে।

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে অনুজ উঠে এলো ওপরতলায়। আগে দেখল তলার ফলকটা। বড়োবড়ো চোখ করে দেখল, চোখ কচলে আবার দেখল। সেখানে লেখা সেই ফোরথ ফ্লোর! সামনের দরজায় সেই পরাঞ্জপের নেমপ্লেট!

এবার যেন নিজের চোখকে আর বিশ্বাস করতে পারছিল না অনুজ। এখনও সিঁড়ি ওঠার ধকলে অল্প হাঁফাচ্ছে সে। এই বাড়ির সব তলাতেই কি ফোরথ ফ্লোর লেখা? কিন্তু পরাঞ্জপের ফ্ল্যাট? সেও কি সব ফ্লোরে?

মরীয়া হয়ে আবার একটা তলা উঠে গেল অনুজ। সেই ফোরথ ফ্লোর, সেই পরাঞ্জপেদের ফ্ল্যাট! দুদ্দাড় করে নেমে এলো অনুজ। সেই একই ছবি। আবার উঠল, আবার নামল। বেশ কয়েক তলা করে। এতবার ওঠানামা করে তার দম ফুরিয়ে এসেছে। দু' হাঁটুর ওপর হাত রেখে হাপরের মতো হাঁফাচ্ছে। মাথা থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে। চারতলার গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার পথ পাচ্ছে না!

এ কী হল? কোথায় এসে পড়ল সে? আবার মিসেস পরাঞ্জপেকে বিরক্ত করবে? একটা ভয়ের অনুভূতি এবার শিরশির করে তার মেরুদন্ড বেয়ে নামতে লাগল। এই নিঝুমপুরীতে একটি মহিলাকেই সে দেখেছে। সে মিসেস পরাঞ্জপে, নাকি...?

পরাঞ্জপের দরজার দিকে পা বাড়িয়েও আবার থেমে গেল অনুজ। এতক্ষণ খেয়াল করে নি, শেখাওয়াতের ফ্ল্যাটের দরজার তলা দিয়ে একটা হাল্কা আলোর আভাস দেখতে পেল সে। তবে কি ডক্টর শেখাওয়াত ফিরে এসেছেন? কিন্তু কখন? কোন পথে?

অভিভূতের মতো অনুজ শেখাওয়াতের দরজায় গিয়ে চাপ দিল। দরজা তালাবন্ধ ছিল না, খুলে গেল নিঃশব্দে। ঘরের বিপরীত দিকে একটা হালকা আলো জ্বলছে। তার আলোয় অনুজ দেখল, বাঁদিকের দেওয়ালে একটা টেবিলের সামনের চেয়ারে একটা লোক বসে। ঠিক বসে নয়, এলিয়ে আছে। মাথাটা চেয়ারের হাতলের ওপর দিয়ে পিছনের দিকে ঝুলে আছে। লোকটার একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর চোখ দুটো খোলা, সোজা অনুজের দিকে যেন চেয়ে আছে। সাদা দুটো চোখের তারার মাঝখানে স্থির হয়ে আছে দুটো কালো বিন্দু। হ্যাঁ, দেখলেই বোঝা যায় ভয়ঙ্কর সে চোখের দৃষ্টিতে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই!

ছবিঃ শংখ করভৌমিক

তরুনকুমার সরখেল

মুড়লু গ্রামের ভবেশ পান্ডে লোকটি মোটেই সুবিধের নয়। তার উপর রয়েছে তার হাত টানের দোষ। এর বাড়ির মুলো, ওর বাড়ির শিম যখন যা পায় তাই ফতুয়ার পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। ফতুয়ার পকেট দু-খানি যেন দুটো বাজারের থলি। একসঙ্গে অনেক কিছু জিনিস ঢোকানো যায়।

ভানু আর ভবেশের পাশাপাশি বাড়ি। বাড়ির পেছনদিকে রয়েছে দুজনেরই সবজি ক্ষেত। তারপর একটা বড়ো বাঁশবন। এই বাঁশবনটা ছিল ভানুদের। সেই কবে ভানুর বাবা নিজের হাতে একটি লাঠি-বাঁশের ফোঁড় এনে এখানে পুঁতেছিল। সেই ছোট্ট চারাথেকেই এখন বাঁশবন। এই লাঠি-বাঁশ গুলো খুব বেশি লম্বা হয়না। তাছাড়া লাঠি-বাঁশের ভেতরটা ফাঁপালো হয় না বলে বাজারে এই বাঁশের চাহিদাও থাকে। তো সেই বাঁশবনটা এখন ভবেশের দখলে। ভানুর বাবা মারা যাবার পরে ভবেশ বাঁশগাছের একটি পাতাও ভানুকে ছিঁড়তে দেয় না।

গ্রামের শেষ প্রান্তে শিবমন্দির। মন্দিরের পরেই অড়হরের ক্ষেত। তার পাশ দিয়ে শহরে যাবার কাঁচা রাস্তা। ভানু এই পথ দিয়েই খুব সকালে শহরে কাজ করতে যায়। ফিরে আসে

সেই সন্ধেবেলা। ভানু শহরে গিয়ে একরকম কাজ করে না। যেদিন যেরকম কাজ পায় সেই কাজই করে। কোনদিন রাজমিস্ত্রিদের দলে ভিড়ে যায় কোনদিন রাস্তা মেরামতির কাজে লেগে পড়ে। শহরে এখন বাইপাস রাস্তার কাজ চলছে পুরোদমে। ভানুরা হাতে পায়ে চটের বস্তা বেঁধে পীচ ঢেলে রাস্তা বানায়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো পীচে মাখামাখি হয়ে যায়।

সেদিন ভানু সারাদিন ধরে রাস্তা তৈরির কাজ করে যখন ছুটি পেল তখন পাঁচটা বেজে গেছে। শীতের দিন তাই পাঁচটা বাজতেনা বাজতেই ঝুপ করে অন্ধকার নেমে পড়ল। শহরের রাস্তায় রাস্তায় হ্যালোজেন বাতি গুলো জ্বলে উঠল। তার গ্রাম মুড়লু শহর থেকে পাক্কা দশ কিলোমিটার। এই এতটা পথ ভানু হেঁটেই যাওয়া আসা করে। বেচারা এখনো একটা সাইকেল কিনতে পারে নি। ভানু অন্যদিন হাতে পায়ে বাঁধা চটের বস্তা খুলে টিউবওয়েলে গিয়ে রগড়ে রগড়ে মুখ থেকে কালি ধুয়ে ফেলে। কিন্তু আজ দেরি হয়ে গেছে বলে সে সোজা গ্রামের পথ ধরল। কালো ছেঁড়া টুপিটা মাথায় একইভাবে সেঁটে রইল। চোঙা ফুলপ্যান্টের ওপর চটের বস্তা চাপানো আছে বলে ভানুর শীতটাও কম করছে।  তবে অসুবিধে হচ্ছে এটাই যে, যখন তখন রাস্তার নেড়ি কুকুরগুলো তাকে দেখে ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে দিচ্ছে। ভাবছে ভানু ভুত- টুত কিছু হবে হয়তো। কেননা মানুষ তো এরকম পীচের মত কালো হতে পারে না।

গ্রামে ঢোকার বেশ কিছু আগে রয়েছে একটি বড়ো পুকুর। পুকুর পাড়ের উপরে মাঠ ভরে আছে এক রকম টক ফলের গাছে। গ্রামের দিকে এই ফলগুলোকে বলে কুদরুম। কুদরুমের ফল ও পাতা রান্না করে খাওয়া যায়। বেশ টক টক লাগে। ভানু যখন পুকুড়পাড়ে এসে দাঁড়াল তখন হালকা চাঁদের আলো কুয়াশা ভেদ করে মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়েছে। আর ঐ মৃদু চাঁদের আলোয় ভানু দেখল ভবেশ কুদরুমের ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। ভবেশ নির্ঘাত কুদরুম ফল ছিঁড়ে নিয়ে যাবে বলে একেবারে ক্ষেতের মাঝে গিয়ে হাজির হল যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। কিন্তু ভানু তো তাকে দেখে ফেলেছে। ভানুর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধির বীজ ফটাস করে ফেটে গেল। এখন সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালি মাখা জ্যান্ত দু- পেয়ে ভূত!

ভানুও কুদরুমের ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। তারপর এক মানুষ লম্বা গাছের ফাঁকে ফাঁকে খুব সাবধানে পা ফেলতে লাগল। ভবেশ দু- হাত দিয়ে লাল টক ফল ছিঁড়ে ফতুয়ার পকেটে ভরছে। এমন সময় ভানু তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরল। ব্যাপারটা এতটাই নিঃশব্দে ও দ্রুততার সঙ্গে ঘটে গেল যে ভবেশ একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেল। তারপর ভবেশ যখন দেখল তাকে একটা  মিশমিশে কালো ভূতে ধরেছে তখন তো আর কিছু বলারই থাকল না। ভূতের ফোলা ফোলা হাতদুটো দেখে সে একেবারে হাও- মাও করে কাঁদতে শুরু করে দিল। ভানু ভবেশের কান্না শুনে বেশ মজা পেয়ে গেল। ভবেশকে আরেকটু রগড়ে দেওয়ার

জন্য সে নাকি সুরে বলল, “চল আঁজ তোঁকেই চাঁটনি বাঁনিয়ে খেঁয়ে ফেলি। রোঁজ রোঁজ চুরি কঁরার ফঁল আঁজকেই টেঁর পেয়ে যাঁবি”। ভবেশ কাঁপতে কাঁপতে বলল, “এই কান ধরছি আর কোনদিন কারো কিছু চুরি করব না”। অবশ্য সে কান ধরার সুযোগই পেল না, কেননা ভানু তার পীচ মাখা কালো হাত দিয়ে তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে।

ভানু বলল, “আঁমি কেঁ জানিস? আমি তোঁর খাঁমার বাড়ির বাঁশবাগানের ভুঁত। ভানুর বাপ সেই কবে আঁমাকে বাঁশবাগানে আশ্রয় দিয়েছে। বাঁশবাগানের বাঁশ কেঁটে কেঁটে তুঁই ফাঁকা করে দিঁয়েছিস। ভানুর বাপের লাগানো বাঁশ গাছে ভানুর কোন অধিকার নেঁই? আজ তোঁকে  আমি ছাঁড়ছি না”।

ভবেশ ঠক ঠক করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতেই সে বলল, “বাঁশবনটা তো ভানুরই। কথা দিচ্ছি আজ থেকে ঐ বাঁশবনের একটি বাঁশেও আমি হাত দেব না। আপনি ওখানে আরাম করে পা ঝুলিয়ে বসে থাকবেন। শুধু আমাকে ছেড়ে দিন”।

এত সহজেই ভবেশ বাঁশবনের অধিকার ছেড়ে দেবে ভানু ভাবতেই পারেনি। আসলে ভীতু ভবেশ তাকে একটুও সন্দেহ করে নি। তাই ভানুর গলাটাও চিনতে পারেনি। ভানু ভবেশকে ছেড়ে দিয়ে বলল, “যাঁ একছুটে বাঁড়ি চলে যাঁ, তোঁকে ছেঁড়ে দিলাম”।

নিমেষের মধ্যে কুদরুম ক্ষেতের ভেতর থেকে বেরিয়ে ভবেশ অদৃশ্য হয়ে গেল। বেচারা এরকম কালো ভূতের পাল্লায় কোনদিন পড়েনি। আর ভানু পুকুর পাড়ে এসে নিশ্চিন্ত মনে পীচ মাখা চট গুলো হাত- পা থেকে খুলে ফেলল। তারপর চোঙা প্যান্টের পকেট থেকে এক টুকরো সাবান বের করে পুকুরের ঘাটে বড়ো চাতাল পাথরটায় এসে বসল। পুকুরের ঠান্ডা জলে হাত পা ও মুখ ভালো করে ধুয়ে ফেলল। একটু একটু শীত করেছে। তা করুক তার মেজাজটা বেশ ফুরফুরে হয়ে গেছে। ভবেশকে সে ভালই কড়কে দিয়েছে।

ভানু নিজেই নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগল। ভবেশটা একেবারে ভীতুর ডিম। তা না হলে এমন হাও মাও করে কান্না জুড়ে দেয়। ভানু অন্ধকার রাস্তায় একা একা নিজের মনেই হাসতে লাগল।

ছবিঃ শিমুল

# সমু

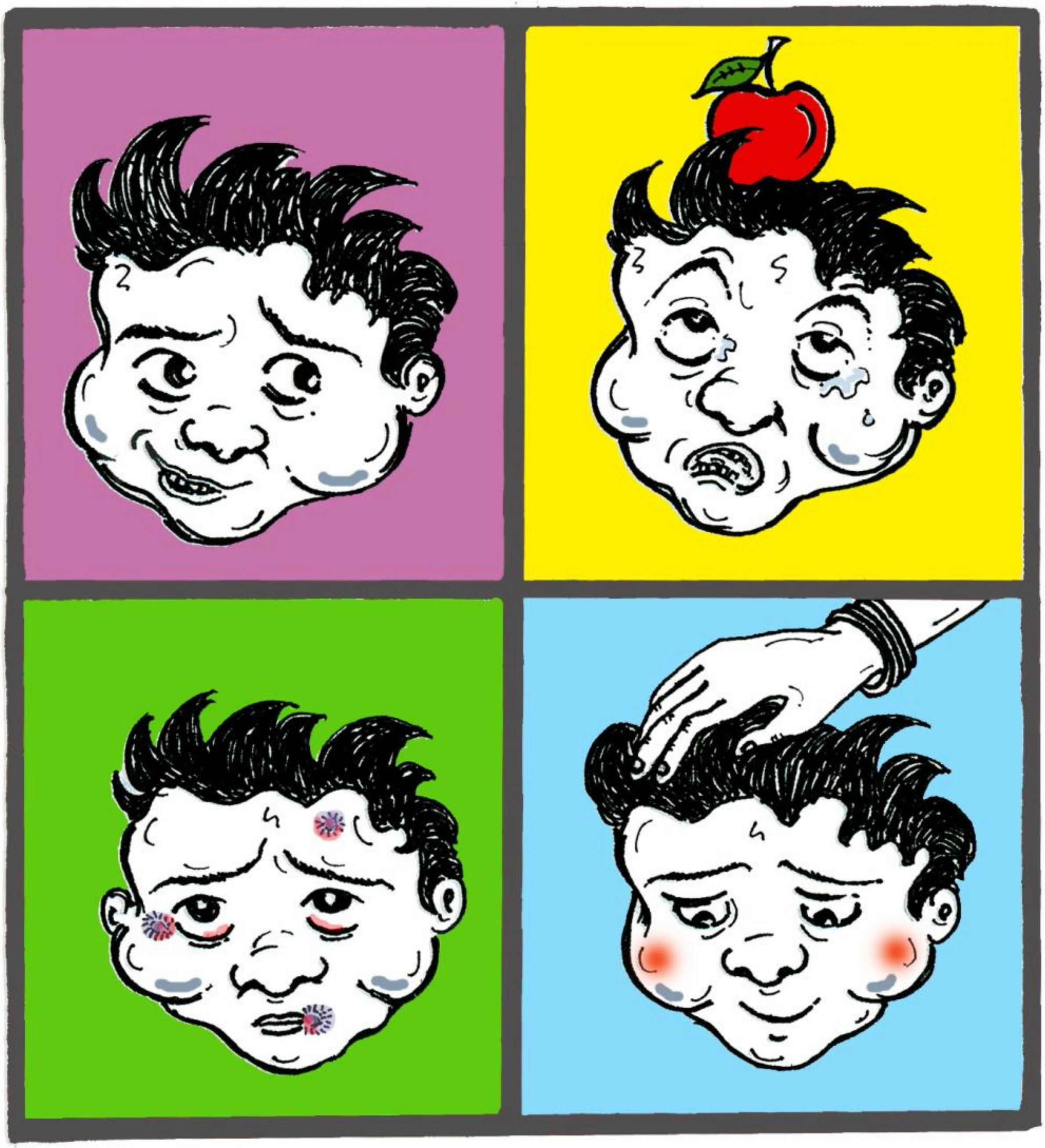

দীপক দাস

ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে মৌজ করে চায়ে চুমুক দিয়েছেন কি দেননি, একটা হট্টগোল শুনতে পেলেন অরুণবাবু। হট্টগোলটা মাঠ থেকে আসছে। মাঠে একটা জটলা হয়েছে। জটলার বেশিরভাগ ছেলেই অচেনা। কয়েকজন পাড়ার। উত্তেজিত ভাবে কী সব আলোচনা করছে। দু'একজন তাঁদের বাড়ির দিকেও তাকাচ্ছে। সকালবেলা অচেনা ছেলেদের কিসের জটলা মাঠে?

ভেবে কোনও সিদ্ধান্তে আসার আগেই তাঁর স্ত্রী ভারতীদেবী এলেন। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মাঠের জটলার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। তারপর আর্তনাদ করে উঠলেন, "সর্বনাশ! সমু আবার কিছু করে বসেনি তো?"

ভারতীদেবীর এই এক দোষ। কোথাও কোনও গন্ডগোল হলেই তাঁর সমুর কথা মনে পড়ে। গত পরশু কেতোদের বাছুরটা দড়ি ছিঁড়ে ছুট লাগিয়েছিল শুনেই ভারতীদেবীর মন্তব্য, "সমু দড়ি কেটে দেয়নি তো?"

একবার আধীরদাদুর বাঁধানো দাঁতের পাটি কাকে নিয়ে পালিয়েছিল। ভারতী দেবীর স্থির বিশ্বাস, ওটাও সমুর কীর্তি।

অবশ্য ভারতী দেবীর এরকম ভাবনার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর ছেলে যা বিচ্ছু! বাড়ি- পাড়া- ইশকুল সব জায়গা থেকে নালিশ শুনে শুনে হয়রান হয়ে যান। পাড়ায় কারও বাড়িতে গেল দেখল রান্না হচ্ছে, খপাৎ করে এক খাবলা নুন দিয়ে দিল। সেই নোনা তরকারি নিয়ে দুপুরবেলা বাড়িতে হাজির প্রতিবেশী। নিজেদের তরকারিটা ওদের দিয়ে দিতে হল। নিজের বাড়িতে কখন জলের বোতলে ভিনিগার ঢেলে রেখে দিয়েছিল। তেষ্টার চোটে সেই ভিনিগার খেয়ে ঠাকুমা তিনদিন আর ল্যাট্রিন থেকে বেরোতে পারেন না। যখন ইশকুলে গেল তখন ইশকুল থেকে অভিযোগ আসতে লাগল, সমু সবার টিফিন কেড়ে খেয়ে নেয়। না দিলে মারধর করে। মিলি বাড়িতে বলে দেওয়াতে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।

হেডস্যার সমুর মাকে ডেকে পাঠিয়ে দু'চার কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। অপমানে মাথা তুলতে পারেননি ভারতীদেবী। অরুণবাবু অফিস থেকে ফিরতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, "এই তোমার নীলরক্ত! ছেলে যে লোকের খাবার কেড়ে খায়।"

সমুরা একসময় পাতিহাল গ্রামের জমিদার ছিল। তাই সুযোগ পেলেই ভারতীদেবী নীলরক্তের খোঁটা দেন। অরুণবাবু সবশুনে মিষ্টি হেসে বললেন নীল রক্তের মানুষের মতোই তো কাজ করেছে আমার ছেলে। এ গ্রামের সবাই আমাদের প্রজা। ওই মিলির ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে আমার পূর্বপুরুষরা হুগলি থেকে এনে জায়গা দিয়েছিল গ্রামে, সমু খাজনা আদায় করছে।

সমু যত বড়ো হয়েছে তত বদমায়েশির ধরণ পাল্টেছে। একবার গুলতি তৈরি করে লোকের বাড়ির আর বিদ্যুৎস্তম্ভের আলোগুলোতে নিশানা অভ্যাস করত। একদিন সমুর বড়দা সুজয় ওর মাথায় একটা কাপ বসিয়ে হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে যাদের আলো ভেঙেছিল তাদের নিশানা লাগাতে বলেছিল। অবশ্য আগে থেকে শেখানো ছিল। শিবুকাকা গুলতি তাক করতেই সমু কেঁদেকেটে একশা। আর একবার হল কী, পড়তে বসলেই চারিদিকে রক্ত দেখতে শুরু করল সমু, পড়তে চায় না। ভারতী দেবী সুজয়কে দিয়ে দুটো পিচবোর্ড কাটিয়ে সমুর চোখের দু'পাশে আটকে দিলেন। ঘোড়ার চোখের ঠুলির মতো। তারপর সামনে একটা বই খুলে দিয়ে বললেন সোজা তাকিয়ে থাক, দেখবি রক্ত- টক্ত সব হাওয়া।

যাঁর ছেলের এত গুণ তাঁর সবসময় চিন্তা হওয়ারই কথা। তবুও অরুণবাবু সান্ত্বনার স্বরে বললেন, "সব সময় অতো চিন্তা কর কেন? সমু কোথায় ? ও তো সকালে উঠেই কোচিং ক্লাসে চলে গেছে। তা'হলে আবার চিন্তা কীসের?"

মুখে বললেন বটে 'চিন্তা কী', কিন্তু চিন্তায় কিন্তু কপাল কুঁচকে গেল তাঁর। ছেলেগুলো তাঁদের বাড়ির দিকেই আসছে। সমুর মাও সেটা লক্ষ করে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, "সর্বনাশ! আমাদের বাড়ির দিকে আসছে যে!"

অরুণবাবু বললেন, "ঘাবড়াচ্ছ কেন? জমিদার বাড়িতে ঝামেলা লেগেই থাকে। তাছাড়া ওরা আমাদের বাড়ি নাও আসতে পারে।"

অরুণবাবুর আশা সত্যি হল না। জটলার সঙ্গে আসা পাড়ার ছেলেরা 'অরুণকাকা' বলে হাঁক দিল। ডাক শুনেই ঠাকুরের নাম করতে শুরু করলেন ভারতীদেবী।

অরুণবাবু নীচে নেমে ছেলের আর এক কীর্তির কথা শুনলেন। জগৎবল্লভপুরের গ্রামে গ্রামে প্লাস্টিকের বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে একধরণের ক্রিকেট খেলা হয়। মিনি ক্রিকেট নামে পরিচিত খেলাটি দারুণ জনপ্রিয়। বড়ো বড়ো টুর্নামেন্ট হয়। ভাল ভাল পুরস্কার থাকে। টি-২০ ক্রিকেটের মতো এরও স্পেশালিস্ট খেলয়াড় আছে গ্রামে গ্রামে। তারা ভারীরকম ম্যাচ ফি নিয়ে খেপ খেলে। সমু নাকি একটা মিনি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে। দশ টাকা এন্ট্রি ফি। ষোলটা দলের খেলা। খেলা নেওয়া দলগুলো মাঠে এসে দেখে মাঠ ফাঁকা। ওরা পাড়ার ছেলেদের বলে। ছেলেরাও শুনে বাক। এই টুর্নামেন্ট সমুর একার পক্ষে আয়োজন করা অসম্ভব। পাড়ার ছেলেদের সাহায্য নিতেই হবে। তাছাড়া খেলা হবে কোথায়? পাড়াতে একটাই মাঠ। সে মাঠ প্রোমোটারকে বিক্রি করে দিয়েছে শহরে থাকা মালিক। মাঠে বড়ো বড়ো ফ্ল্যাট হবে। বড়গাছিয়া পাতিহাল ফিডার রোড পাকা হচ্ছে। রাস্তার পাশে বিশাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। হচ্ছে অফিস কাছারিও। লোক থাকার বাড়ি চাই। মাঠ বিক্রি নিয়ে প্রোমোটারের সঙ্গে ছেলেদের বেশ ঝামেলা হয়েছে। ছেলেরা তাদের একমাত্র খেলার মাঠ বিক্রি করতে চায়নি। ওরা গুলতি দিয়ে প্রোমোটারের গাড়ির কচ ভেঙে দিয়েছিল। বাড়ি তৈরির জন্য ফেলা স্টোনচিপ খালের জলে ফেলে দিয়েছিল। দলটার নেতৃত্বে ছিল সমু। ধরা পড়ে প্রোমোটারের লোকেরা মেরেছিল সমুকে। থানাপুলিশ  হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।

এদিকে খেলতে আসা দলগুলোর দাবি,হয় খেলা শুরু কর, নয় টাকা ফেরত দাও। সমুর বাবা বললেন, "নিশ্চয় ফেরত দেব। তার আগে সমুর সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। আচ্ছা ক্লাস সেভেনে পড়া একটা বাচ্চা ছেলের কথায় কীভাবে তোমরা টাকা দিলে?" ওরা জানাল সমু মিনি ক্রিকেটের বড়ো তারকা। ওকে সবাই চেনে।

অরুণবাবু সমুর কোচিং স্যারকে ফোন করে জানতে পারলেন সমু পড়তে যায়নি। চিন্তিত হলেন তিনি। একটা ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। একবার স্কুলে হঠাৎ লজেন্স-বিস্কুটের ব্যাবসা শুরু করেছিল সমু। টিফিনে ক্লাসে ঘুরে ঘুরে ল-জে-ন-স্ চাই, বি-স-কু-ট চাই হেঁকে বেড়াত। বন্ধুদের মেরেধরে কেনাত। হেডস্যার জানতে পেরে অরুণবাবুকে ডেকে মিষ্টি করে বলেছিলেন, "আপনার ছেলে বোধহয় বড়ো হলে টাটা-বিড়লা হতে চায়। কিন্তু, আমাদের স্কুল তো বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কুল নয়।" অরুণবাবুও শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছিলেন, "আগে উচ্চমাধ্যমিকটা এই স্কুলেই পড়ুক। তারপরে আপনার পরামর্শ স্মরণ করব।" কিন্তু সমু বোধহয় টাটা-বিড়লা নয়, ক্রীড়াসংগঠক হতে চায়। তাই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন শুরু করেছে। ছেলেগুলোকে তিনি বিকেলের দিকে আসতে বললেন।

ঘরে ঢুকতেই ভারতীদেবী ব্যঙ্গ করলেন, "তোমার নীলরক্তের খবর কী? বিরাট এক সংগঠককে দেখতে পাচ্ছি। না হলে এইটুকু পুঁচকে ছেলের কথায় ষোলটা টিম এন্ট্রি ফি আগাম দেয়? সংগঠক না হাতি। দ্যাখো গিয়ে টাকা নিয়ে আলুপটল বেচছে। বড়ো ব্যবসায়ীর লক্ষণ আছে বলেছিলেন না হেডস্যার?"

"আচ্ছা তাই নয় হল। ওকে একটা হিমঘরই কিনে দেব।"

"কিন্তু ছেলেটাকে তো খোঁজা দরকার।"

"কোথায় আর যাবে? খাবার সময় ঠিক ফিরে আসবে।"

কিন্তু, দুপুর দুটো পর্যন্ত সমু এল না। এবার ভারতীদেবী অস্থির হয়ে উঠলেন। অরুণবাবু বাইরে শান্ত কিন্তু মনে মনে শঙ্কিত। ছেলেটা নিশ্চয় বড়ো কিছু ঘটিয়েছে। না হলে দুপুরবেলা বাড়ি ফিরত। সুজয়কে বাইক নিয়ে একবার বেরোতে বললেন। নিজেও বের হলেন পাড়ায়।

আজ রবিবার পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে সকাল থেকে সমুর দেখা হয়নি। সুজয় ফিরে এসে জানাল ইশকুলের বন্ধুদের বাড়িতেও সমু নেই। শুনে ভারতীদেবী কেঁদেই ফেললেন। অরুণবাবু চিন্তা করলেন, সমু সাঁতার জানে। জলে ডোবার ভয় নেই। কিন্তু কোনওভাবে আহত হতে পারে। সুজয়কে আড়ালে ডেকে নিয়ে হাসপাতালে খোঁজ নিতে বললেন। জগৎবল্লভপুর হাসপাতালে সুজয়ের বন্ধু আশোক খাঁড়া ডাক্তার। ডাঃ খাঁড়া না বললেন। নিজেও চেনাজানা নার্সিংহোমগুলোতে খোঁজ নিলেন। সুজয়ের বাবা পরামর্শ দিলেন, এবার থানায় খবর দেওয়া উচিত। সুজয়ের বাইকে বেরিয়ে পড়লেন অরুণবাবু।

বিকেলের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ল সমু নিখোঁজ। বাড়ি ভিড়ে ভিড়াক্কার। ততক্ষণে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে সুজয় আর অরুণবাবু ফিরে এসেছেন। পাড়ার বন্ধুরা সমুর নানা ইচ্ছের কথা বলতে শুরু করল। শুভ বলল, "সমু একটা মোবাইলের দোকান খুলবে বলেছিল। দোকান থেকে ইচ্ছেমতো ফোন করবে সারাদিন।" শিলাদিত্য বলল, "সমু কম্পিউটার কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছিল। কম্পিউটারে অনেক অনেক গেম স্টোর করে রাখবে।" অমিতকে নাকি সমু বলেছিল ব্যাট- প্যাড- হেলমেট কিনবে ক্রিকেট খেলার জন্য।

অরুণবাবু ভাবলেন, যেগুলো করতে বাধা দেওয়া হয় সমু সেইগুলোই করতে চেয়েছে। এই ইচ্ছেপূরণ করতে চাইলে ভয়ের কিছু নেই। হয়তো দোকানদার ঠকিয়ে টাকা হাতিয়ে নিতে পারে। কিন্তু, অন্য কিছু যদি হয়? বড়গাছিয়া থানা কোনও খোঁজ পেলেই জানাবে বলেছে। সকালের সেই দলগুলো এসে গেছে টাকা নিতে। কিন্তু ভিড়ভাট্টা দেখে কিছু একটা হয়েছে অনুমান করে চুপচাপ আছে। এবার একটু রাগ হতে লাগল অরুণবাবুর। ছেলেকে কোনওদিন মারধর করেননি। আজ মনে হল, মাঝে মাঝে দু'চার ঘা লাগানো উচিত ছিল। ফিরে এলে ঘা চারেক লাগাবেন ঠিক করে নিলেন।

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে এল। কী করবেন বুঝতে না পেরে বসে পড়েছেন অরুণবাবু। ভারতীদেবী বিছানা নিয়েছেন। সেই সময়েই ফোনটা এল "থানা থেকে বলছি। আপনি বাড়িতেই থাকুন আমরা আসছি।"

'আপনি বাড়িতেই থাকুন' কথাটা খারাপ লাগল অরুণবাবুর। সমুকে যদি পাওয়া যেত তাহলে তো থানায় গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে বলত পুলিশ। পুলিশ বাড়িতে আসতে চাইছে কেন? তবে কি-- কেঁপে উঠলেন অরুণবাবু। মোবাইলটা হাত থেকে পড়ে গেল। কিছু একটা হয়েছে অনুমান করে সুজয় চেপে ধরল কাকাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই থানার জিপটা এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন অরুণবাবু। জিপ থেকে নামলেন থানার ওসি আর দুজন কনস্টেবল। ঠিক তখনই জিপটার পিছনে এসে দাঁড়াল বিশাল গাড়িটা। গাড়িটা পাড়ার লোকে চেনে। প্রোমোটারের গাড়ি। অরুণবাবুর বুকটা মুচড়ে উঠল অজানা আশঙ্কায়। সুজয় আর জেঠু শক্ত করে ধরল অরুণবাবুকে। পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে বাড়ির সামনে। দু'দুটো গাড়ির আওয়াজ পেয়ে দোতলায় ভিড় করেছে মেয়েরা। ভারতীদেবী অজ্ঞান হয়ে গেলেন আবার।

বড়ো গাড়িটা থেকে নেমে প্রোমোটার হাতটা বাড়িয়ে দিলেন গাড়ির ভিতর। সমু নেমে এল। খুশিতে লাফিয়ে উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়লেন অরুণবাবু। সুজয় তাড়াতাড়ি উঠোনে চেয়ারের ব্যবস্থা করে ফেলল। ওসি বসেই সমুকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "একটুও বকবেন

না ছেলেকে। ও আজ যা খেতে চায় খাওয়ান।” সমুর বাবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে ওসি বললেন, “সব কথা আপনি লিপেশবাবুর মুখে শুনুন।”

লিপেশবাবু অর্থাৎ প্রোমোটার ভদ্রলোক প্রথমেই বললেন,“মাফ করবেন অরুণবাবু। সমুর বদমায়েশির জন্য আমার লোক ওকে মেরেছিল। তখন বুঝতে পারিনি ওর বদমায়েশির পিছনে কারণ কী ছিল। বুঝলাম আজ সকালে। ডোরবেলের আওয়াজে দরজা খুলে দেখি সমু দাঁড়িয়ে। প্রথমে খুব অবাক হয়েছিলাম। ব্যঙ্গ করেই বললাম, ‘কী ব্যাপার? এইবার আমার বাড়ির কাচ ভাঙবে নাকি?’ সমু মাথা নেড়ে জানাল, ও আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়। ঘরে ডাকলাম ওকে। ঘরে ঢুকেই পকেট থেকে একটা নোটের বান্ডিল হাতে তুলে দিয়ে বলল, ‘চারহাজার আটশ টাকা আছে। আপনি রাখুন। খেলার মাঠটা আমাদের দিয়ে দিন।’

“ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সমু আবার বলল, মাঠের পুরো দামটাই ও দিয়ে দেবে আস্তে আস্তে। যদি আমি শীতকালটা ওই মাঠে কিছু কাজ না করি আর ওদের মিনি ক্রিকেটের আয়োজন করতে দিই। আমার বিস্ময়ের মাত্রাটা বাড়ছিল। একটা বাচ্চা ছেলে জানেই না ওই মাঠ আমি কত টাকায় কিনেছি। কত টাকা লাভ করব ওই মাঠ থেকে। টাকার পরিমাণ না বুঝেই টুর্নামেন্ট করে সমুদ্রে বালি ফেলার মতো পরিমাণে টাকা জোগাড় করে মাঠটা নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করছে। ওর এই অসম্ভব চেষ্টা কেন সেটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন? আপনাদের এই গ্রাম আর গ্রাম থাকবে না। রাস্তাটা তৈরি হলেই ভিড় বাড়তে থাকবে। অফিস কাছারি তৈরি হচ্ছে। আরও হবে। বাইরের লোকজন বাড়বে। ধানজমিগুলোতেও বাড়ি তৈরি হতে শুরু করেছে। মালিকরা টাকার জন্য আর মাঠ- টাঠ বাছবে না। অথচ এলাকায় একটাই খেলার মাঠ। সমু ভবিষ্যতের ছবিটা দেখতে পেয়েছিল। তাই বোধহয় ওর এমন মরিয়া চেষ্টা। মনটা ভারি হয়ে উঠল।”

লিপেশবাবু চুপ করে রইলেন। উপস্থিত সকলেই চুপ। কিছুক্ষণ পর আবার বলতে শুরু করলেন ভদ্রলোক, “সিদ্ধান্তটা আমি নিয়েই ফেললাম। তখন দুপুর সমুকে চান- টান করতে বলে এখানকার থানায় ফোন করলাম। আমিই সরাসরি নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু আমাকে পাড়ার অনেকেই পছন্দ করে না। এতক্ষণ পর বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ প্রতিক্রিয়ায় ভুল বুঝে পাড়ার

ছেলেরা আক্রমণ করলে ব্যাপারটা খারাপের দিকে গড়িয়ে যেত। তাছাড়া আপনারাও এতক্ষণে থানায় খবর দিয়েছেন অনুমান করেছিলাম। তাই থানার সাহায্য নিতে হল।”

লিপেশবাবু থামলেন। তারপর পকেট থেকে একটা নোটের তাড়া টেবিলের ওপর রেখে বললেন, “আগামী রবিবার মিনি ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা হবে। যারা অগ্রিম দিয়েছে তারা বাকি টাকা নিয়ে সেদিন চলে আসবে। আমি পাঁচহাজার টাকা দিলাম। জয়ী দলকে তিনহাজার আর রানার্সকে দু'হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেওয়া হবে। টুর্নামেন্ট থেকে যে লাভ হবে তা দিয়ে ব্যাট- প্যাড- হেলমেট কিনে সত্যিকারের ক্রিকেট খেলা হবে মাঠে। আর হ্যাঁ মাঠটা তোমাদেরই থাকছে। মালিকের সঙ্গে আমি কথা বলে নেব।”

শুনে ছেলের দল চিৎকার করে উঠল। তারপর সমুকে কাঁধে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল। লিপেশবাবু হাসি হাসি মুখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

লিপেশবাবু আর পুলিশরা মিষ্টিমুখ করে ফিরে গেছেন। কথা দিয়েছেন ফাইনাল খেলার দিন আসবেন। বাড়ি ফাঁকা। ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুর মা- বাবা মাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন। অন্ধকারে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে সমুকে ঘিরে তখনও জটলা চলছে। অরুণবাবু ভারতীদেবীর দিকে তাকালেন। যেন বলতে চাইলেন, দেখেছ আমাদের নীলরক্তের উদারতা?

ভারতীদেবী হাসলেন।

ছবিঃ মধুশ্রী

# চিঁড়ে

পাপিয়া গাঙ্গুলি

স্কুলে গরমের ছুটি, সারাদিন বাড়িতে অফুরন্ত সময়। খাও দাও, খেলো, বই পড় – দেদার আনন্দ। এই ছুটির সময় রিঙ্কি ঠাকুমা দাদুর কাছে থাকে, তাই আরো মজা। না বকা, না ঝকা।

এক বিরাট পেল্লায় বাড়ির দোতলার পুরোটা নিয়ে তাদের বাস। চৌকো বাড়িটার একপাশে লম্বা বারান্দা সমেত অনেকগুলো ঘর আর আরেক পাশে পুরোটা ছাদ।

এই ছাদ হল ছোট্ট রিঙ্কির সবচেয়ে পছন্দের জায়গা। এই ছাদে প্রথম বৃষ্টি ভেজা, শিল কুড়োনো, আচার খাওয়া, সন্ধেবেলা চিত হয়ে শুয়ে তারা গোনা এসব নানা ঘটনা। বাড়ির নিচে একটা ঘেরা জায়গা আছে। বাগান নামক জংলা জায়গাটা। ওর পুতুল খেলার বাজার করার জায়গা এটা।

রিঙ্কি একদিন, ছাদ, নিচের বাগানটা টহল দিয়ে এসে স্নানখাওয়া করে একটা ইন্দ্রজাল কমিকস নিয়ে, দাদুর ঘরের মেঝে থেকে ওপর পর্যন্ত জানলার ধারে বসে একমনে পড়ছিল। জানলার অপর পারে ছিল সাদা পাথরের ঢাকা বারান্দা। ওদিকটা বন্ধ থাকত। বারান্দায় টাঙানো থাকত অনেক ছবি। এমনি একটা ছবির পেছনে চড়াই বাসা বেঁধেছে। লক্ষ্য করেছিল অনেকদিন ধরে দুটো চড়াই কি ধৈর্য নিয়ে, একটা একটা করে শুকনো পাতা, খড় নিয়ে এসে ঘর বাঁধছিল।

সেদিন বই পড়তে পড়তে রিঙ্কি হঠাৎ শুনল ব্যস্ত চড়াই এর কিচিরমিচির। দেখল বাসা থেকে ছানা মাটিতে পড়ে গলা তুলে ডাকছে। উড়তে শেখে নি তখনও। আর তার মা বাবা তাকে ঘিরে কিচির মিচির করছে।

রিঙ্কি নিমেষে ভেবে ফেলল, পাখির বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে হবে। নাহলে নিশ্চুপ ঘুরে বেড়ানো সাদা বেড়ালটা নির্ঘাত খেয়ে ফেলবে। বারান্দার পাশের ছাদে লাফিয়ে নামতে দেখেছে সে তাকে।

কিন্তু জানলা থেকে অনেক দূরে পাখিটা! ছোটো রিঙ্কি নাগাল পাবে কী করে বাচ্চাটার? লম্বা স্কেল দিয়ে চেষ্টা করল। লম্বা লাঠি দিয়েও। নাঃ, নাগাল পাচ্ছে না। উউফ!! কার্নিশে বেড়ালটার সাদা লেজটা ঝুলছে। এখুনি না এক লাফে বারান্দায় আসে।

আইডিয়া! একছুটে রিঙ্কি নিয়ে এল ঝুলঝাড়ু। চড়াই মা বাবা একমনে দেখছে রিঙ্কির কান্ড আর উড়ে উড়ে চিৎকার করছে। রিঙ্কি আধা শুয়ে ঝুলঝাড়ু দিয়ে বাচ্চা চড়াইটাকে

হাতের নাগালে এনে টপ করে তুলে নিল। গরম গরম ভাব হাতের তালুতে, নরম নখের সুড়সুড়ি। অনবরত মা বাবা চড়াইয়ের কিচির মিচির।

রিঙ্কি তার পুতুলখেলার ঘর থেকে পুতুলের খাট, গদি নিয়ে এসে চড়াইছানাকে শুইয়ে দিল। ড্রপারে করে জল, দুধ দেওয়া হল। এক সময় চড়াইছানাকে মাথার কাছে রেখে রিঙ্কি ঘুমের দেশে।

ছবিঃ মৌসুমী

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ

‘ক্যাঁক’ করে সিন্দুকের দরজা খুলে ভেতরে টর্চের আলো ফেলতেই চক্ষু চড়ক। হ্যাঁ, জগা মিত্তিরের কথাই ঠিক। ঐ তো জ্বলজ্বল করছে দশ- কুড়ি আর পঞ্চাশের বান্ডিল। আনন্দে বুকের ভেতরটা তড়াক করে উঠল নন্দর। তারপর একে- একে সবকটা বান্ডিল কিছু ট্যাঁকে, কিছু পুঁটলিতে গুঁজল সে। কিন্তু কাল হল সিন্দুকের নীচে রাখা ঐ ঝোলাগুড়ের হাঁড়িটা। ইশ্, কেন যে ওটা মাথায় তুলতে গেল!. . .

নন্দ মানে, নন্দপাটারির কথা বলছিলাম। থাকে ওই ভান্ডারটিকুরি ইস্টিশনের উত্তুর কোণের কদমপুকুরের ধারে। পেশায় চোর। ওটা ওর নাকি তিন পুরুষের ব্যাবসা। বাপ করত, ঠাকুর্দাও। তা ও- ই বা অন্যথা করে কেন ? ছোটবেলায় লেখাপড়াও তেমন হল না। ওই কষ্টেসৃষ্টে কেলাস থিরি। তা, ওই বিদ্যা দিয়ে চাকরি মিলবে, না ব্যবসা করতে পারবে? অগত্যা আর কী করে, হাতেপায়ে জবজবে সরষের তেল মেখে ‘জয় মা’ বলে বাপ- ঠাকুদ্দার ব্যবসাতেই ঝপাং।

তাও বছর কুড়ি হয়ে গেল এ লাইনে। ভাবতে গেলে এখনো কেমন শিহরণ লাগে নন্দর। বাব্বা, কুড়ি বচ্ছর! কম হলনি তো! এবারে একটু বেশ্রাম নিলে কেমন হয়? যেই না মুখ ফুটে বলা, অমনি বউ কমলাবতীর কটাশ করে উত্তর, “তাই নাও না, হাড়মাস জুড়োক। ব্বাপরে বাপ! এ জীবনে গালমন্দ আর লাথিঝাঁটা তো কম খেলে নি। তার উপরে পুলিশের ডান্ডার বাড়ি। সত্যি- সত্যি ছাড়ো দিনি এবার। একটু কামকাজ করি খাও। কটা দিন শান্তি- স্বস্তিতে বাঁচি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন্দ, “তাই তো ভাবতিছি রে কমল। কিন্তু অমন সুখের ব্যবসা ছাড়ি করবটা কী বল দিকি? বয়সও তো কম হল নি। তা আমার জন্যি কোন্ কাজটা কে জোগাড় করি রেখেছে শুনি?”

আবার মুখ ঝামটা মারে কমলাবতী, “গতর আছে খাটি খাও দিনি। মাঠ আছে, ঘাট আছে- খোঁজ নাও, কামকাজের কি অভাব আছে দ্যাশে? তোমার ওই বজ্জাতি ব্যবসা এবারি ছাড়ান দাও।”

মা কালীর মতন জিভ কাটল নন্দ, “অমন কতা বলিস নি রে। বলি, এই ব্যবসার জোরেই না এখনো বেঁচেবত্তে আছি। নইলে কি হাওয়া খেতুম শুনি?” নন্দর গলায় ঝাঁজালো সুর।

পাশে এসে বসে কমলাবতী। চোখের দিকে তাকিয়ে পিঠে হাত রাখে। তারপর বিছানায় শোয়া একরত্তি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “আচ্ছা, তুমিই কও দিকি, আমাদের খোকাটা আজ না হয় ছোট, কাল তো বড়ো হবে, ইস্কুলে যাবে, নেকাপড়া শিখবে। তা, ও বড়ো হয়ে যদি জানে ওর বাবা চোর, তা কি ওর ভালো লাগবে শুনতে?”

কমলার কথায় ট্যাঁ- ফুঁ করল না নন্দ। কথাটা মনে ধরেছে হয়তো। সাপুড়ের মন্ত্রপড়া সাপের মতো কেমন একটা ঝিমুনি ভাবও এল যেন। কমলাবতীর দিকে একবার বড়ো কোমল দৃষ্টিতে তাকাল সে। তারপর বালিশটা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুয়েও পড়ল।

জমি নিড়েন দিতে- দিতে নন্দ ভাবল, এই- ই বেশ ভালো আছে সে। কোনো ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, থানা- পুলিশ নেই, জবজবে সরষের তেল মাখানো ডান্ডার বাড়ি বা গালমন্দও নেই। একেবারে বিন্দাস জীবনযাপন যাকে বলে। শুধু কাজ করো, আর খাও। কাজ না থাকলে একটু কষ্ট বটে। তা হোক, দু’মুঠো না হয় কমই খাওয়া গেল এক- দু’বেলা। তাতে দোষের কী! কেউ তো আর দেখতে আসছে না?

এভাবে দিন বেশ ভালোই কাটছিল নন্দর। কখনো কারো জমিতে ধান- পাট নিড়েন দিয়ে, কখনো জংলা সাফ করে, কখনো বা কারুর ঘরের চালায় তাপ্পি মেরে। কিন্তু পুরোনো রোগটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠল হাড়বজ্জাত ওই জগা মিত্তিরের কথা শুনে।

জমি নিড়েন দিতে- দিতে জগা- ই বলছিল সেদিন ওপাড়ার হরিপদ বাঁড়ুজ্জের ব্যাঙ্ক থেকে কুড়ি হাজার টাকা তোলার কথা। সামনের সপ্তাহে মেয়ের বিয়ে। সোনাগয়না বানানোর জন্য তাই আগাম প্রস্তুতি। কিন্তু একসঙ্গে অত্তগুলো টাকার কথা শুনে দিনকয়ের জন্য সৎ হয়ে পড়া নন্দ পাটারির আবার লোভের আগুন দাউদাউ। অর্থাৎ মতিভ্রম। এবং দুর্নামের বোঝা বওয়া সেই পুরোনো ব্যবসায় পুনরায় ঝপাং।

ভাবগতিক দেখে কমলাবতীর কেমন সন্দেহ হল যেন। এরপর, সপসপ করে গায়ে সরষের তেল মাখার হদ্দ দেখে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল।

“ব্যাপার কী, গায়ে অমন তেল মাকাচ্চো যে?”

কমলাবতীর কথায় উত্তর করে না নন্দ। একবার কটমট করে তাকালো শুধু। আবারো প্রশ্ন করে কমলা, “কী গো, কতা কইছো না যে?”

“চুপ কর দিকি। সব কতা তোর অত জানার দরকারটা কী শুনি?” গলা খেঁকিয়ে বলল নন্দ।

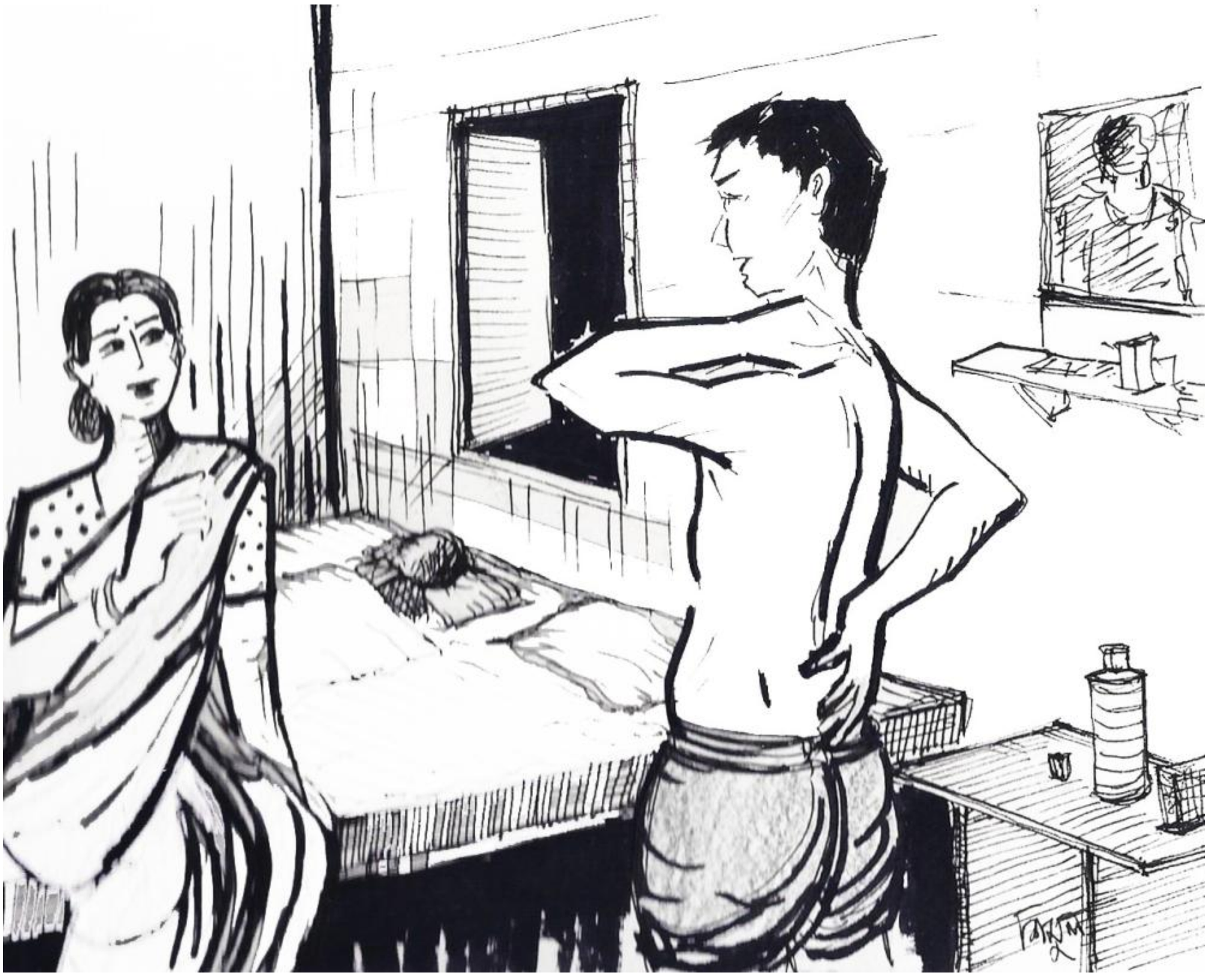

“বুজতে পেরেচি। নিশ্চয় আবার সেই বজ্জাতি ব্যবসায়- ”

কথা শেষ করতে পারে না কমলাবতী। হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে নন্দ, “চুপ, একদম চুপ! বাপ- ঠাকুদ্দার ব্যবসাকে গালমন্দ করবিনে বলে দিচ্চি।”

“হুঁ, গালমন্দ করব না ? তবে কি ফুল এনে পুজো করব?” নন্দর আরো একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল কমলাবতী। তারপর সুর নরম করে বলল, “আবার কী হল কও দিকি? এই তো বেশ কাজকম্ম করে পয়সা উপায় করছিলে। ঝুট নেই, ঝামেলা নেই। কটা পয়সাও জমেছে ঘরে।”

কমলার দিকে তাকিয়ে একগাল হাসে নন্দ। “পয়সা? আরো জমবে। চিন্তা করিসনি রে বউ। বেশ বড়ো একটা দাঁও মারতি যাচ্চি। যদি কেল্লা ফতে করতি পারি, তবে আর তোর চিন্তা নেই। সোনার দুল, নাকছাবি – সব গড়িয়ে দেব’খন।”

নন্দর অমন লোভ দেখানো কথায় একদম ভোলেনি কমলাবতী। মুখ ঝামটা মেরে শুধু বলেছে, “নিকুচি করেচে তোমার দুল আর নাকছাবিতে! চুরির পয়সায় আমায় সগ্‌গে যাবার নোভ দেখাচ্চো?”

কথাটা শুনে বড়ো রাগ হল নন্দর। তবু চুপ থাকল। শুভ কাজে নামার আগে মেজাজ বিগড়ে পাছে আসল কাজটাই পণ্ড হয়! তেলের শিশিটা হাত থেকে রেখে একটা ভাঙাচোরা ছবির সামনে এসে দাঁড়ায় সে। ওটা ওর বাবার ছবি। ইশ্‌, ধুলো জমে একশা হয়ে আছে। গামছার খুঁট দিয়ে ছবিটা মুছল নন্দ। চোখ বুজল। তারপর মনে- মনে বাপ- ঠাকুদ্দাকে পেন্নাম করে নিল একবার। বউ কমলাবতী ততক্ষণে কোলের ছেলেটিকে নিয়ে বিছানায়। একবার পিছন ফিরে তাকাল নন্দ। তারপর দরজা খুলে ফুড়ুৎ।

মিনিট দশেকের মধ্যেই হরি বাঁড়ুজ্জের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল নন্দ। ধীরে- ধীরে পকেট থেকে বার করল তার মোক্ষম যন্তরটিও। অর্থাৎ নিড়োনি। দরজার সামান্য ফাঁক গলিয়ে ঢুকিয়েও দিল তা ভিতরে। তারপর ডানহাতে হাল্কা মোচড় মারতেই চিচিং ফাঁক। বুকের ভেতরে ভয় আর আনন্দের উথালিপাথালি ঢেউ নন্দর। নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে শিকারি বেড়ালের মতো এসে দাঁড়াল টাকাভর্তি সিন্দুকের সামনে। হরি বাড়ুঁজ্জে তখন গায়ে পাতলা

একটা কম্বল চাপিয়ে নাক ডাকছেন। নন্দ অতি সন্তর্পণে পকেট থেকে বার করল তামার মোটা তারটি। তারপর সিন্দুকের মস্ত তালায় দু- এক খোঁচা মারতেই চক্ষু চড়কগাছ! চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল শুধু টাকা আর টাকা! একে- একে লুঙ্গির কোঁচড়, থলে- সব ভর্তি করে নিল নন্দ। অর্থাৎ মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কাজ হাসিল। কিন্তু ঝোলা গুড়ের অমন মিষ্টি গন্ধটাই যত গোল পাকিয়ে দিল।

সিন্দুকের নীচেই রাখা ছিল গুড়ের হাঁড়িটা। নন্দ আর লোভ সামলাতে পারল না। ভাবল, হাঁড়িটা সঙ্গে নিলেও তো মন্দ হয় না। একটু- আধটু রুটি- মুড়ি মাখিয়েও খাওয়া যাবে। আবার সামনের মাসের পোষপার্বণে কখান পিঠেপুলিও হয়ে যাবে। হঠাৎ- ই মনশ্চক্ষে বউ কমলাবতীর মুখটা ভেসে উঠল তার। আহা, কী খুশিই না হবে সে। খেজুরগুড় খেতে বড্ড ভালোবাসে ও। কিন্তু গরিবগুব্বো নন্দর অত পয়সা কই যে, কিনে খাওয়াবে! গুড়ের হাঁড়িটা মাথায় চাপাতেই মনটা খুশিতে ভরে উঠল নন্দর। যাক, গতিকে রথ দেখা কলা বেচা দুই- ই হল।

নন্দ সত্যি- সত্যিই যে কানের দুল গড়িয়ে আনবে, তা কে জানত? আর অমনি কমলাবতীও গলে জল। দুল দুটি কানে পরে একবার আয়নার সামনে এসে দাঁড়ল সে। নাঃ,

বেশ মানিয়েছে তাকে। বউটার হাসিমুখ দেখে নন্দও যারপরনাই খুশি। বাজার থেকে গিয়ে কিলোদুই চালগুঁড়োও নিয়ে এল। পৌষপিঠের বাকি আর তিনদিন। তবু দু- এক পদ পিঠে ক'দিন আগে হয়ে গেলেই বা মন্দ কী! কমলাবতী বানিয়েও ফেলল পটাপট।

কিন্তু গুড় মাখিয়ে চিতলপিঠেয় কামড় বসিয়ে সামনের বড়ো রাস্তার দিকে তাকাতেই দু'চোখ ছানাবড়া নন্দর। একেবারে ভিরমি খাবার দশা যাকে বলে। এ কী দেখছে ও ? এমন বিচ্ছিরি দিরিশ্যটা আবারো দেখতে হল তাকে! বুটের খটমট শব্দ তোলা পুলিশদুটি সটান তার ঘরের সামনে এসেই দাঁড়াল। তারপর বাজখাঁই গলায় সেই চেনা চিৎকার, "নন্দ, এই নন্দ!" থানার বড়োবাবুর সিংহ গর্জন। নন্দ কেঁচোর মতন কাঁচুমাচু করে সামনে এসে দাঁড়াল। হাতের পাকাটিমার্কা আঙুলে ধরা তখনো একটুকরো পিঠে। আর পিঠের গা- বেয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছে সুগন্ধি ঝোলাগুড়।

"এই দেখেছেন, দেখেছেন বড়োবাবু, এই সেই ঝোলাগুড়। হারামজাদা আমার বাড়ি থেকে... " ভিড় ভেদ করে নন্দর সামনে এসে প্রায় লাফিয়ে পড়লেন হরি বাঁড়ুজ্জে।

ভিরমি খেল নন্দ পাটারি। গাছের ডাল থেকে পাকা আমটি খসার মতো হাতে ধরা পিঠের টুকরটিও মাটিতে পুটুস্।

"হারামজাদা, আবার চুরি করা ধরেছিস?" চুলের মুঠি চেপে ধরলেন বড়োবাবু।

রোগা টিংটিঙে নন্দ পাটারি অমনি বড়োবাবুর হাতে পায়ে ধরে গড়াগড়ি, "সত্যি বলচি ছ্যার, আপনি তো আমারে চেনেন। জেবনে মিত্যে বলিনি। মাইরি বলচি, আমি চুরি করিনি।"

"চুরি করিস নি?"

"য়্যাঁজ্ঞে না।"

"করিস নি? সত্যি বলছিস?"

"য়্যাঁজ্ঞে, তিনসত্যি। মা কালীর দিব্যি।"

"চোপ! আবার মা কালীর দিব্যি!" মুখ ভ্যাংচালেন বড়োবাবু, "সবই যদি সত্যি বলছিস, তবে মাঠভর্তি এত ফোঁটাফোঁটা ঝোলাগুড় এল কোত্থেকে শুনি?"

"গুড়?" নন্দ পাটারির সবাক প্রশ্ন।

"হ্যাঁ- হ্যাঁ, গুড়," বলে হড়হড় করে টানতে- টানতে নিয়ে ফেললেন একেবারে মাঠের মধ্যে। সেখানে তখনো সাক্ষাৎ প্রমাণ হয়ে জ্বলজ্বল করছে শুকনো ঝোলা গুড়ের ফোঁটা।

চোখদু'টি জলে ভরে এল নন্দর। বুঝতে অসুবিধা হল না, গুড়ের হাঁড়িটা নিশ্চয়ই ফাটা ছিল। আর তাতেই ওর কপাল ফাটল। অর্থাৎ সারা আলপথ জুড়ে শুধু ওই ঝোলাগুড়ের ফোঁটাফোঁটা স্মৃতিচিহ্ন।

নন্দ অনেক হাতেপায়ে ধরল বড়োবাবুর। বউটিও। কিন্তু না, বড়োবাবু ছাড়বার পাত্র নন। অবশেষে লোহার হাতকড়া পরিয়ে পূর্বস্থলী থানায়।...

পুলিশের সঙ্গে যেতে- যেতে জলচোখে একবার বউ আর একরত্তি ছানাটির দিকে তাকায় নন্দ।

তারপর প্রতিবারের মতোই, আরো একবার মনে- মনে মা জগদম্বার দিব্যি কেটে প্রতিজ্ঞা করে, "নাঃ, আর না, এই শেষ। এমন বজ্জাতি ব্যবসায় নন্দ পাটারি আর নেই।"

ছবিঃ শিমুল

# হিটলারি

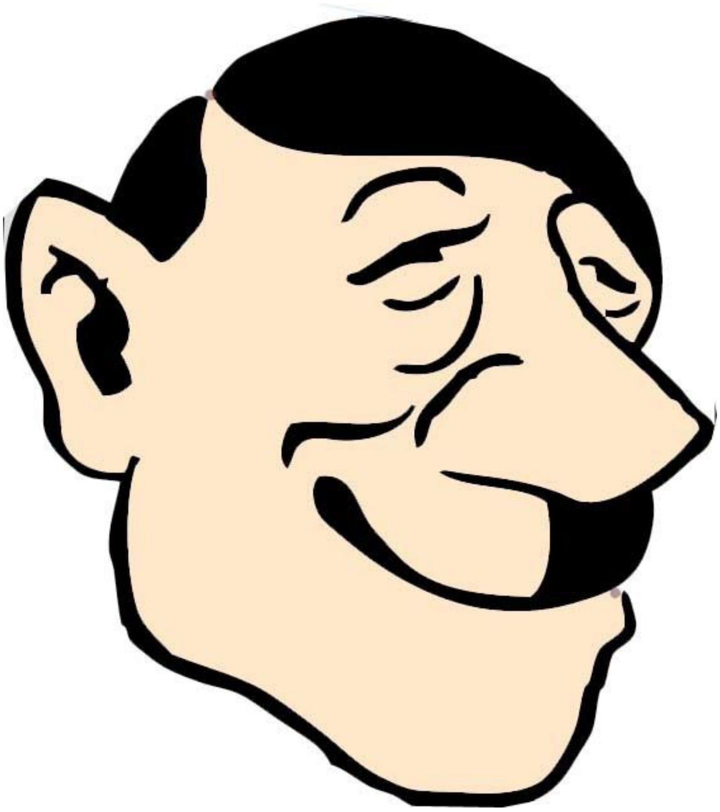

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সান্যাল

চেম্বারে রুগি নেই। সাধারণত, সন্ধে ৭ টার পর আর রোগী দেখে না চন্দন। আড্ডার জন্য প্রস্তুতি নেয় মানসিক ভাবে। কিছুক্ষণ পরেই সব আড্ডানোর লোকেরা এসে পড়বে। সত্য কম্পু মানে সত্য কম্পাউণ্ডারও যাব যাব করছে!

এই সময়ে এক মহিলা এসে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন, "আমারে একডু দেইখ্যা দেন ডাক্তারবাবু।"

চন্দন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে আপনার?"

"দ্যাহেন না, রিশ্‌কা থিক্যা পইড়া গেসি। কোমোরে দুঃখ পাইসি আর কনুই ছইড়া একাক্কার। মনে লয়, আর উঠতে পারুম না," মহিলা কঁকিয়ে কঁকিয়ে কথাগুলো বললেন।

"ও কম্পুদা, দিদিকে একটা ভোভেরান এস আরের স্ট্রিপ, একটা টিটি, ছড়ে যাওয়া জায়গাটা মারকিউরোক্রোম দিয়ে ড্রেসিং করে দিন। যান ওখানে সত্যদা দিয়ে দেবে। ভয় নেই ব্যাথা সেরে যাবে,"চন্দন বলল।

"ও ডাক্তারবাবু আমি টিটি দিয়া কী করুম? হেয়া তো আমার পোলায় খ্যালে। হেইডা টেবিল টেনিস তো? আর শাড়ি তো পইরাই আচি। ড্রেসিং এর কী দরকার?

"ওফ! এই টিটি সেই টিটি না! এটা টিটেনাস টক্সয়েড। ধনুষ্টঙ্কার বোঝেন? সেটা যাতে না হয়, তাই এই ইনজেকশান। ড্রেসিং মানে, ঐ ছড়ে যাওয়া জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ করে দেবে। বুঝলেন তো? আর হ্যাঁ! ব্যাথা না কমলে কালকে একটা কোমরের এক্সরে করিয়ে আনবেন। প্রেসক্রিপশানে লিখে দিলাম।"

মহিলা, মাথা হেলিয়ে খুব কষ্ট করে গেলেন সত্য কম্পুর কাছে। সত্যদার ইংরেজি বলার অভ্যাসের জন্য চন্দন একটু ভয়ে ভয়ে থাকে। সত্যদার ইংরেজি শুনে সবাই থরথর করে কাঁপতে শুরু করে বলেই নাম সত্য কম্পু! এই মহিলাকে আবার সত্যদা ইংরেজিতে কিছু বলে না বসে!

ইনজেকশানটা মহিলা কোমরেই নেবেন। ওঁর ধারণা, যেখানে ব্যথা লেগেছে, সেখানে টিটি ইনজেকশান নিলে তাড়াতাড়ি ব্যথা সারবে।

চন্দনের আশঙ্কা সত্যি করে শুনতে পেল, সত্যদা ইংরেজিতে মহিলাকে বলছে: “হাতে ইনজেকশান is better than কোমরে ইনজেকশান।”

মহিলা কী বুঝলেন কে জানে! ইনজেকশান নিয়ে ভিজিট আর ওষুধের পয়সা দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেলেন।

উনি বেরিয়ে যেতেই কবি বদরী সান্যালের কবিতার খাতা হাতে প্রবেশ। সত্য কম্পু বলল, “চন্দন, আমি Exit করছি। লোকজনের Entrance হচ্চে, আমি cut।

“কাট করে আবার পেস্ট করবেন না”চন্দনের উত্তর।

মুচকি হেসে সত্য কম্পু বেরিয়ে গেলেন।

চন্দনকে একা পেয়ে বদরী বললেন, “একটা অণুকবিতা শুনবে? অন্যরা এসে গেলে আর চান্স পাবো না!”

“শোনান”, ব্যাজার মুখে উত্তর দিল চন্দন।

বদরীবাবু গলা ঝেড়ে শুরু করলেন:

”হিটলার জাঁদরেল
খায় বসে কৎবেল
ঝালনুন, লঙ্কায় ভিজিয়ে
যুদ্ধের বাজারে
মাছি মেরে হাজারে
রেখে দেয় টেবিলেতে সাজিয়ে

কিন্তু, বদরীদা, এটা আমার শোনা শোনা মনে হচ্ছে! ফেসবুকে আমার এক বন্ধু , এটা বোধহয় স্টেটাস মেসেজ দিয়েছিল।

“তোমার তো সবই শোনা মনে হয়! এটা আমি নিজে লিখেছি!

“কী জানি, হবে হয়তো”চন্দনের উত্তর!

“হতে পারে চন্দন! অনেক জিনিসই অজানা থাকে!”– ক্ষেতুদা কখন যে ঢুকে পড়েছেন, সেটা দুজনে খেয়াল করে নি। বদরীবাবু কেমন যেন সিঁটিয়ে গেলেন। ক্ষেতুদা আজ কেমন যেন অন্যমনস্ক।

“তোমার কবিতাটা শুনে আজ অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল হে বদরী !!

চন্দন আশ্চর্য হয়ে প্রস্তরীভূত হয়ে গেল। ক্ষেতুদা, বদরীবাবুর কবিতা শুনে খচিতং হলেন না, এটা পৃথিবীর দশম আশ্চর্য।

“তারক কোথায় হে?”ক্ষেতুদার প্রশ্ন।

“তারকদা রেশন আনতে গেছেন,”বদরীবাবু বললেন।

“এই রাত সাড়ে আটটার সময় রেশন? সব দোকান তো বন্ধ।”

“আহা! ওই রাতে খাবার জন্য রুটি আনতে গেছেন। রেশন টার্মটা কোড নেম।”

“হুম! ক্রিপ্টোগ্রাফি!”ক্ষেতুদার গম্ভীর জবাব।

“ওটা আবার কী?”

“তথ্যগুপ্তিবিদ্যা, বুঝলে হে! বদরীর কবিতা শুনে মনে পড়ল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এর ব্যবহার। তবে ব্যাপারটাকে তুঙ্গে নিয়ে গেছিল হিটলার। জার্মান লোরেন্‌ৎস সাইফার মেশিন দিয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জেনারেল স্টাফ বার্তা গোপন করার জন্য ব্যবহার করা হতো,”ক্ষেতুদা সিগারেট বের করলেন।

তারক মিত্তিরও ঢুকে পড়েছেন,  বগলে রুটির পোঁটলা নিয়ে।

"কী যেন বলছিলেন ক্ষেতুদা! ওই কি গাফি!"

"বলছি, তবে তুমি তো ভাত খাও! আজ যে রুটি?"

"ক্ষেতুদা! মুখের স্বাদের বদল চাইছি! জিভের ওপর বদলা !! "

"হুম! বদলা তো হিটলারও নিয়েছিল,  তার মৃত্যুর খবর রটিয়ে দিয়ে!"

"আই ব্যাস,  বলেন কী! হিটলার তালে, ১৯৪৫ সালের ৩০ শে এপ্রিল আত্মহত্যা করে নি?"চন্দন উত্তেজিত।

"না হে! আমি নিজে সাক্ষী!"

"এঃ! ক্ষেতুদা! আপনি কিন্তু, ঘনাদা মানে ঘনশ্যাম দাসকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন,"তারক মিত্তির মিউ মিউ করে বললেন।

"হোয়াট ননসেন্স!"ক্ষেতুদা হুংকার দিলেন, "ঘনাদা কি মিথ্যে বলতেন নাকি! ইন ফ্যাক্ট,  ঘনাদা, আই মিন মিঃ ঘনশ্যাম দাসই তো এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমাকে ভায়া অ্যামেরিকান গভ্‌মেন্ট দিয়েছিলেন। আর তুমি যে নিজেকে স্বদেশী বলো, তার বেলা! এদিকে তো মাত্র ২০০৩ সালে রিটায়ার করেছ। গ্যাঁজা মারো, খবর রাখি না নাকি?"ক্ষেতুদা ভিসুভিয়াস!

আড্ডার মেজাজ নষ্ট হচ্ছে দেখে চন্দন বলল, "আরে ক্ষেতুদা! আপনার কথা চালিয়ে যান তো! আপনার ব্যাকগ্রাউণ্ড আমি জানি! এরা তো হালে আড্ডায় এসেছে! আরে হরি, চা দিয়ে যা! "

"জানো হিটলারকে কৎবেল খাওয়া কে শিখিয়েছিল?"ক্ষেতুদার প্রশ্ন!

"কে?"

"কে আবার! স্বয়ং মিঃ ঘনশ্যাম দাস! হিটলার টক খেতে ভালবাসত তো তাই ঘনাদা এই নুন লংকা আর কৎবেলের রেসিপিটা "এভা"কে দিয়েছিলেন। হিটলার শেষ পাতে খেতে খেতে ইহুদি মারার ছক করতো! ঘনাদা তো সেই দুঃখেই বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসে টঙের ঘরে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে নিয়েছিলেন।"

"এভা কে?"সকলেই উৎকণ্ঠিত !

"এভা ছিলেন হিটলারের স্ত্রী ! "

"উরিব্বাস! আমার কবিতা লেখা সার্থক!"বদরীবাবুও উত্তেজিত।

"সার্থক কিনা জানি না,  তবে কবিতার মধ্যে সত্যিটা লুকিয়ে আছে।"

"কীরকম, কীরকম?"

"ওই যে, 'মাছি মেরে হাজারে'। হাজারে হাজারে ইহুদি মেরেছিল তো।"

"সত্যি, মানুষ কত নৃশংস হতে পারে,  তাই না?"

"১৯৩৩ সালে নাগরিকদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছিল হিটলারের জার্মানিতে। তখন আধুনিক কম্পিউটার যুগ শুরু হয় নি ঠিকই,  তবে আদি কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে ইহুদিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করার জন্য এগিয়ে এসেছিল, ইনটারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন বা পৃথিবী খ্যাত আইবিএম কোম্পানি। কীভাবে তারা প্রতিটি ইহুদি পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করত, তা এখন বহু আলোচিত। হিটলারের শাসন কালে সমস্ত ইহুদিরা হয়ে উঠেছিল এক একটি নম্বর। তার পাশে লেখা থাকত নাম ঠিকানা। দেখা গেছে, যে অঞ্চলে এই কাজটা ভালো ভাবে করা হয়েছিল, সেখানেই ইহুদি নিধন বেশি হয়েছিল। বলি বুঝলে কিছু?"

"অ্যাঁ! অ্যামেরিকার কোম্পানি সাহায্য করেছিল? হিটলারকে?"

“তবে আর বলছি কী? আর এই অ্যামেরিকান সরকারই তো সাহায্য করে হিটলারকে পালিয়ে যেতে। সেখানে আমাকেই বেছে নেয় অ্যামেরিকা।”

“একটু খুলে বলবেন? ঘনাদাই বা কেন আপনাকে বাছলেন ওই কাজের জন্য? চন্দন বিনীত ভাবে প্রশ্ন করল, ক্ষেতুদাকে।

“বলছি, বলছি! আগে চা খাই! জিভ শুকিয়ে গেছে। বনমালী নস্কর লেনে গেলে ফাউল কাটলেট খাওয়াতেন ঘনাদা! সঙ্গে কফি! কোথায় যে গেল, সেই সব দিন ! “

“আপনি চিকেন রোল খাবেন? আনিয়ে দিচ্ছি!”

“দাও! তবে আমার জন্য দুটো আনিও।” কৃপা করে বললেন ক্ষেতুদা।

খাওয়া হয়ে গেলে, ক্ষেতুদা শুরু করলেন:

“বেশ কয়েক বছর আগে সাংবাদিক জেরার উইলিয়ামস এসেছিল ভারতে। সঙ্গে, সমর ঐতিহাসিক সাইমন ডানস্টান।”

“কেন?”

“মূর্খের মত প্রশ্ন করো না তো তারক! কেন আবার? আমার সঙ্গে দেখা করতে।”

“তাই !! তা কী বললেন ওদের?”

“কী আর বলব? একটা সাক্ষাৎকার নিল। তারপর একটা বই ছেড়েছে মার্কেটে ইদানীং! অবশ্য আমার নামটা দেয় নি ওরা। আমারই অনুরোধে। বেশি নামটাম পছন্দ হয় না আমার।

“বইয়ের নাম কী?”

“গ্রে উলফ্, দি এসকেপ অফ আডলফ হিটলার, বা ধূসর নেকড়ে আডলফ হিটলারের নির্গমন।”

“ওটা নয় পরে পড়ে নেব আমরা, এখন একটু গপ্পোটা সংক্ষেপে বলবেন আমাদের?”

“গপ্পো কী হে! সত্যি ঘটনা! একেবারে জ্বলন্ত ইতিহাস। এটা অ্যানেকডোটাল নয়। অনেক রিসার্চ, আর আমার কাছ থেকে শুনে, কষ্ট করে লিখেছে ওরা।”

“অ্যানেকডোটাল?”

“হ্যাঁ! অ্যানেকডোটাল। মানে অলিখিত ইতিহাস। যেটা গাঁজাখুরি বলে মনে হতে পারে অনেকের।”

“বলুন ! বলুন! শুনছি!”সমস্বরে চিৎকার করল সবাই।

“বলবো, তবে বাধা দেবে না কিন্তু!”

“আমরা পাগল নাকি! বলে যান!”

ক্ষেতুদা শুরু করলেন:

“প্রথমেই বলি, ঘনাদাকে তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা গোপন কাজে ফিরে

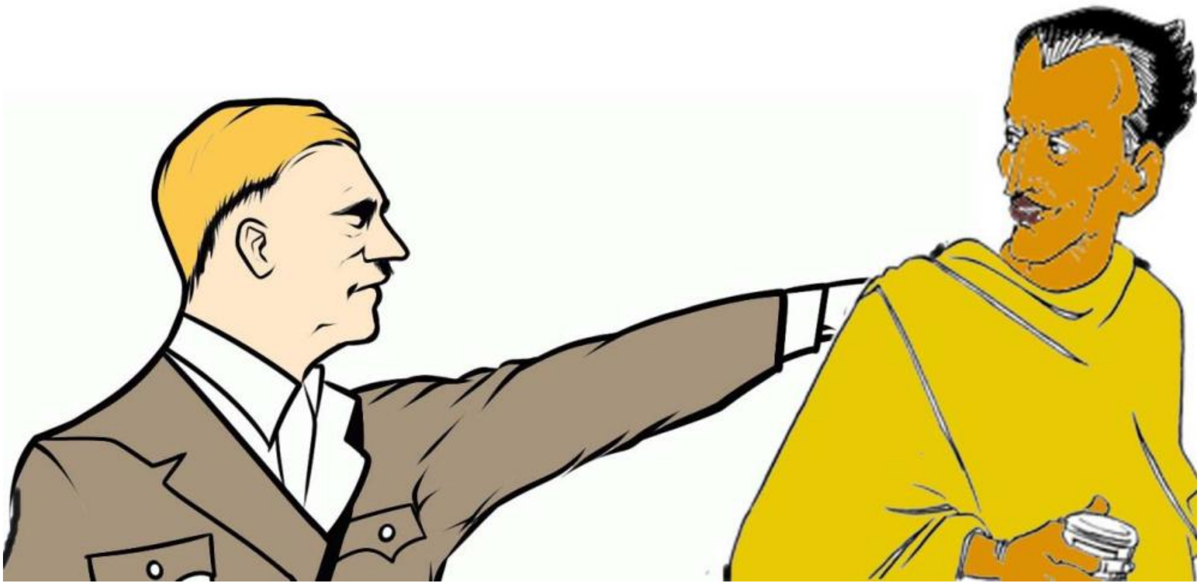

যেতে হয়েছিল। হিটলারকে অনেক বুঝিয়েছিলেন ঘনাদা, যাতে ওই সব জঘন্য কাজ না করে। হিটলারও কথা দিয়েছিল। আমার তখন কম বয়েস। ঘনাদা ভরসা করে, আমাকে রেখে গিয়েছিলেন হিটলারের কাছে। বয়েস কম হলেও আমার বুদ্ধির ওপর ভরসা ছিল ঘনাদার। শাগরেদি করছি তখন ওনার।

"তখন কি আর জানি, অ্যামেরিকার অত ষড়যন্ত্র! ১৯৪৫ সাল! দিনটা খুব ভাল করে মনে আছে আমার। সাতাশে এপ্রিল। একজন গেস্টাপো এসে আমাকে একটা গোপন খবর দিল। হিটলারের দোস্ত, মুসোলিনি, সঙ্গে স্ত্রী ক্লারা পেত্তাচিকে সঙ্গে নিয়ে ইতালি ছেড়ে পালানোর সময় জনতার হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। মিলানের বিদ্রোহী দলের দুজনকে খতম করা সারা। তাদের দুজনকে পায়ে পায়ে বেঁধে মাথা নীচু করে ঝুলিয়ে রেখেছে প্রকাশ্য স্থানে। উন্মত্ত জনতা মৃতদেহ দুটির ওপর যথেচ্ছ থুতু ছেটাচ্ছে, লাঠি মারছে, পাথর ছুঁড়ে মারছে। সে এক বীভৎস অবস্থা।

"খবরটা হিটলারের কানে তুলে দিলাম। এই প্রথম ওকে ভয় পেতে দেখলাম। বলল, 'কেতুউউ! কী হবে আমার?'

"আমি সোজা বললাম, 'তোমার পাপের ঘড়া ভরে গেছে। এবার নিজে মরার জন্য তৈরি হও।'

" 'একটা উপায় বলো না!'

" 'দেখ তালে, মরা কী ভয়ংকর জিনিস।' বলে মনে কষ্টও হচ্ছিল। সাংঘাতিক প্রতিভা ছিল লোকটার। একজন রাজনৈতিক নেতার সমরনায়ক হওয়ার ঘটনা ইওরোপে প্রথম। আমাদের নেতাজিও অবশ্য তাই ছিলেন, তবে তিনি একদম অন্যরকমের একজন মহাপুরুষ।

"আমি তখন বুঝতে পারছি, লাল ফৌজ প্রায় পুরোটা ঘিরে ফেলেছে হিটলারকে। মায়া হল। বুদ্ধি দিলাম, 'তুমি প্রথমে একটা স্টেটমেন্ট দাও।'

" 'কী রকম?'

" 'বলো, আমি বুলেট দিয়ে আত্মহত্যা করছি। বলবে, এভাও পটাশিয়াম সায়ানাইড ক্যাপসুল খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমার অনুগামীদের বলছি, আমাদের মৃতদেহটা পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিতে। এভাকেও মেরে ফেলার গল্পটা ছড়িয়ে দাও।'

“ ‘ঠিক আছে,’ জবাব দিল হিটলার। তার আগে, ও একটা মন্তব্য করেছিল। দিনটা ছিল ২৭শে এপ্রিল। সাল ১৯৪৫। বলেছিল, ‘ গোটা দুনিয়া যদি আমাকে মৃত বলে ভাবে, তবেই ভবিষ্যতের আশা করতে পারে জার্মানি।’ তাই বুদ্ধিটা আমার মাথায় এসেছিল।

“লোরেন্‌ৎস সাইফার মেশিন দিয়ে খবর পাঠান হল আমেরিকার গভমেন্টকে। পিটার বমগার্ট নামে একজন ধুরন্ধর আর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পাইলটকে আমার জানা ছিল। তাকেই পাঠাতে বললাম। ছেলেটা আমারই বয়েসি বা একটু বেশি হবে। গোপনীয়তা রাখতে জানত। প্লেন নিয়ে হাজির হল পিটার বমগার্ট। চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়লাম হিটলার আর এভাকে নিয়ে। পিটার তো দেখে থ। চোখ আর ফেরাতে পারছে না। আমি জোর ধমক দিলাম। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে প্লেন উড়িয়ে দিল পিটার।

“ও ও! একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তখন হিটলারের একান্ত সচিব ছিল মার্টিন বরমান। ১৯৪৩ সাল থেকেই এই ছকটা ওর সাথে আমার করা ছিল। হিটলারকে ইচ্ছে করেই বলিনি। ভেবেছিলাম ও আর ইহুদিদের মারবে না। বিধির বিধান, খণ্ডাবে কে?

“আকাশে উড়ে ডেনমার্কের টনডরে নামলাম আমরা। তারপর ফের ফিরে গেলাম জার্মানির ট্রাভেমুণ্ডার বিমানবাহিনীর ঘাঁটি, লুফৎওয়াফে। এই ঘোরাটা ইচ্ছে করেই প্ল্যান করেছিলাম আমি।

“পিটারকে ছেড়ে দিলাম। এবারে আর একটা প্লেনে ছদ্মবেশে উঠলাম আমরা। গিয়ে নামলাম বার্সেলোনার দক্ষিণে সামরিক ঘাঁটি রিয়সে। জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে লোরেন্‌ৎস সাইফার মেশিন দিয়ে খবর পাঠান ছিল। ফ্রাঙ্কো আগে থেকেই আর একটা প্লেন রেডি করে রেখেছিল। আমরা গিয়ে নামলাম ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের ফুয়েরতেবেনতুরায়। ওখান থেকে ইউ বোটে চড়ে সবাই ঢুকে পড়লাম অতলান্তিক মহাসাগরের গভীরে। লাল ফৌজ বাঙ্কারে পৌঁছে দেখে পাখি ফুরুৎ। স্পেন ছেড়ে তিপ্পান্ন দিন বাদে পৌঁছলাম আর্জেন্তিনার উপকূলে মার ডেল প্লাতার দক্ষিণে নিকোচিয়ায়।”

“ক্ষেতুদা, একটা প্রশ্ন।”

“বল!”

“ইউ বোট কী?”

“তোমরা তো দেখছি কিস্যু জানো না! ওটা হল সাবমেরিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খুব ব্যবহার হয়েছিল।”

“ও ! ঠিক আছে। আপনি বলে যান।”

“তারপর আর কী? আমি তো ভারতে চলে এলাম, ঘনাদার ডাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে।”

“পরে আর কোনো খবর পান নি?”

“হুঁ! পেয়েছিলাম।”

“কী? কী?”

“ওই আন্দিজের পাদদেশে এক গণ্ডগ্রামে কেটেছিল হিটলারের শেষ জীবন। দুটো মেয়েও হয়েছিল। তবে এভার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় ১৯৫৩ তে। শেষমেষ হিটলার মারা যায়, ১৯৬২ র ১৩ ই ফেব্রুয়ারি বেলা তিনটের সময়। এরপর আর কী হয়েছে আমার জানা নেই।”

ক্ষেতুদা আর একটা সিগারেট ধরালেন।

তারক মিত্তির বললেন, “একটা শেষ প্রশ্ন ক্ষেতুদা।”

“বল হে, বল!”

“আপনার মনে আছে?  মাসখানেক আগে,   আপনি সেল ফোনের সিম কার্ডের জন্য একটা ফর্ম ভরে আমাকে দিয়েছিলেন জমা করতে!”

“হ্যাঁ! তাতে কী হল?”

“না! মানে ওই ফর্মের সাথে আপনার ভোটার কার্ডের সেল্‌ফ অ্যাটেস্টেড ফোটোকপি ছিল। আর ওটাতে আপনার জন্ম তারিখ লেখা ছিল, ১৯৪৫ সালের ৮ ই নভেম্বর।”

ক্ষেতুদা আগুন ঝরা চোখে তারক মিত্তিরের দিকে তাকিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন চন্দনের চেম্বার থেকে।

# রাজপুত্রের মন খারাপ

রতনতনু ঘাটী

নির্বিঘ্নপুরের রাজপুত্র বিনতিবান্ধবের যখন তখন বড়ো একটা মন খারাপ হয় না। কখনও মন খারাপের ভাব এলে, রাজপুত্র মন থেকে তাড়িয়ে দেয়। রাজযোগাচার্য মন খারাপ না হওয়ার জন্যে একটা উপায় শিখিয়ে দিয়েছেন। দিবা- রাত্রির সন্ধিক্ষণে হরিণ চর্মের আসনে বসে যতক্ষণ পারা যায়, শ্বাস বন্ধ করে ধ্যান করতে হয়। তা হলে আর মন খারাপ হয় না।

একদিন রাজপণ্ডিত বলে দিয়েছেন, “মন খারাপ ভীষণ ছোঁয়াচে লক্ষণ। রাজারাজড়াদের মন খারাপ হতে নেই। মন শক্ত করতে হয়।”

মন খারাপ যাতে না হয়, রাজবৈদ্য তার জন্যে পাঁচন তৈরি করে দিয়েছেন। রাজপুত্রকে সকালে খালি পেটে সেই পাঁচন খেতে হয়। ঘুম থেকে উঠলেই রানি পাঁচন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বিনতিবান্ধবের শয়নকক্ষের দরজায়।

অত বড়ো প্রাসাদ। প্রাসাদের চারপাশে নীল জলের পরিখা। কতখানি চওড়া। প্রায় নদী বললেই হয়। অনেকটা কণ্ব মুনির আশ্রমের তপোবনের পাশের সেই মালিনী নদীর মতো দেখতে। তাতে রাজহাঁস ভেসে বেড়ায় সারাদিন। তিরতির করে ছোট- ছোট ঢেউ ওঠে জলে। তাতে সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করে। পদ্ম ফুটে থাকে। নীল আর সাদা। শালুক? হ্যাঁ, তাও ফোটে।

রাজপ্রহরীর মেয়েটা। তার ভাল নাম অগ্নিকা। রাজামশাইয়ের নাম অবিনয়বান্ধব। তিনিই তার এ নাম রেখেছেন। তার কত আর বয়স? রাজপুত্রেরই মতো। আট কি দশ। সকালে জুঁই ফুটে ঝরে পড়লে সে কুড়িয়ে আনে। ফ্রকের কোঁচড় ভরে। রাজপ্রাসাদের চাতালে বসে মালা গাঁথে। নিজের মনে কী সব কথা বলে। রাজপুত্র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কান পেতে শুনেছে। সেসব হল রূপকথার গল্প। রাজপুত্র ভাবে, মেয়েটা  অত রূপকথা শিখল কোথা থেকে? একটু বেলা হলে অগ্নিকা নিজে পরিখা সাঁতরে শালুক তুলে আনে। তারপর পরিখার পাড়ে এসে বসে। ভেজা জামায়। ওর তো কই জ্বর হয় না? তারপর পুটুস- পুটুস করে শালুক ডাঁটা ভেঙে- ভেঙে মালা গাঁথে। মালা গেঁথে কী করে?

গোপালজিউর মন্দিরে গিয়ে পুরুতমশাইকে দেয়। শালুক ফুলে কি গোপালজিউর পুজো হয় নাকি? তবু দেয়।

সকালবেলা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজপুত্র বিনতিবান্ধব  রাজময়দানে যুদ্ধবিদ্যা শিখে প্রাসাদে ফিরে আসে। তখন অগ্নিকা সিংহদরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে রোজ। সে হাত তুলে রাজপুত্রের ঘোড়াটা থামায়। নাকি ঘোড়াটা এমনি- এমনি থামে? কে জানে! অগ্নিকা তখন একটা জুঁই ফুলের মালা রাজপুত্রকে ছুঁড়ে দেয়। রাজপুত্র ঘোড়ার উপরে থাকে বলে অগ্নিকার হাত কুলোয় না। মালাটা হাতে নিয়ে রাজপুত্র হাসে। কিন্তু অগ্নিকা মালাটা বিনতিবান্ধবকে দেয় কেন? গোটা রাজপ্রাসাদে তার বয়সি আর যে কেউ নেই। তাই!

রাজপুত্রের তখনই পলকের জন্যে মন খারাপ হয়। কেন মন খারাপ হয়? অগ্নিকাকে কোনও কাজ করতে হয় না বলে। সে কেমন আপন মনে থাকে। ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু রাজপুত্রের সে উপায় কই? তবু মন খারাপ তাড়িয়ে দেয় রাজপুত্র।

অগ্নিকাকে রাজপণ্ডিতের কাছে গিয়ে পড়তে বসতে হয় না। পুরাণ- উপনিষদ ওলটাতে হয় না। শাস্ত্র শিখতে হয় না। অর্জুনের ক'টা নাম, তাও মনে রাখতে হয় না। স্বর্গে ক'টা ফুলের গাছ আছে, তাও না। অস্ত্র ধরা শিখতে হয়? না। যুদ্ধবিদ্যা? তাও না। ঘোড়ায় চড়া? তাও না। সে সারাদিন রাজপ্রাসাদের চারপাশে দিঘির পাড়ে, বাগানে ঘুরে বেড়ায়।

একটু বেলা হলে সে পাখি নিয়ে মেতে ওঠে। একটা হেলে- পড়া ডুমুর গাছ আছে রাজপ্রাসাদের নৈঋত কোণে। সেই ডুমুর গাছের ডালে গর্ত বানিয়েছে একটা বেনেবউ পাখি। সকাল থেকে টুক- টুক টুক- টুক করে শব্দ করে ডেকে চলে। অগ্নিকা বেনেবউয়ের বাসার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দ্যাখে। সাদা রঙের তিনটে ডিমের দিকে তাকিয়ে থাকে পলক না ফেলে। দু' সপ্তাহ পরে ডিম ফুটে পাখি হয়ে উড়ে যাওয়া পর্যন্ত, রোজ যায় অগ্নিকা। কেউ তাকে কিছুই বলে না। বলবে কেন? রাজামশাই যে তাকে ভালবাসেন। রাজামশাই অবিনয়বান্ধব তাকে ভালবাসেন কেন? রাজামশাইয়ের যে একটিও মেয়ে নেই!

আর- একবার রাজপুত্র বিনতিবান্ধবের মন খারাপ হয়। যখন রাঙা হয়ে সূর্য অস্তাচলে যায়। কত যে রং ছড়িয়ে পড়ে! আর কী তার চোখ জুড়নো রূপ! রাজপুত্রের মন খারাপ হয় সূর্য

ডুবে যায় বলে, তা নয়। সন্ধের পরে মন্ত্রী- অমাত্যদের নিয়ে রাজসিংহাসন আলো করে বসেন রাজামশাই। চারদিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় রং- বেরংয়ের ঝাড়লণ্ঠন। যে লোকটা ঝাড়লণ্ঠন জ্বালানোর কাজ করে, তার সারাদিনে ওটুকুই কাজ। বাকি দিনটা বসে- বসে ঘুমে ঢুলে পড়ে। পাশ দিয়ে কেউ গেলে ধড়ফড় করে চোখ মেলে তাকায়। ভাবে, বুঝি রাজামশাই যাচ্ছেন। রাজামশাইয়ের নাগরা জুতোর মসমস শব্দ নেই। রাজপোশাকের জরির ছমছম নেই। কৃপাণের ঝনঝনাৎ নেই। তা হলেও কি রাজা আসেন? লোকটা কী ভাবে কে জানে? তারপর আবার যে কে সেই। ঘুমে ঢুলুঢুলু!

ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে ওঠার পর ঝলমল করে ওঠে রাজদরবার। তখন ডাক পড়ে রাজপুত্র বিনতিবান্ধবের। রাজপুত্রের জন্যে একটা ছোট রাজবেশ বানিয়ে আনা হয়েছে। রাজ- দরজির কাছ থেকে। কত রঙের জরির কাজ তাতে। তাতে হিরে- মানিকও কম বসানো নেই। সেসব গুনে শেষও করা যাবে না। মাথার মুকুটটাও দেখবার মতো! রাজপুত্রের আসন রাজামশাইয়ের সিংহাসনের ঠিক পাশে। এইটুকুনি একটা সিংহাসন। সন্ধেবেলায় বিনতিবান্ধবকে আসতে হয় কেন রাজদরবারে? রাজ্য- পরিচালনা শেখার জন্যে।

তখনই তো মন্ত্রীমশাই নতুন রাজ্যজয়ের পরামর্শ দেন রাজামশাইকে। রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার ফিকির বাতলান। অমাত্যরা বসে- বসে মাথা নাড়েন। সৈন্যবাহিনী বাড়ানো হবে কিনা সে কথা রাজামশাইয়ের কানে তোলেন রাজসেনাপতি। তখনও রাজামশাই মাথা নাড়তে থাকেন। রাজপুত্র বসে- বসে শোনে সব কথা। চোখ মেলে দ্যাখে।

তারপর রাজামশাই তাঁর সিদ্ধান্ত জানান। এসব শিখতে হয় রাজপুত্রকে। বড়ো হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে হবে তো! রাজপুত্রের মনে হয়, এ কাজটা যুদ্ধবিদ্যা শেখার চেয়ে বেশ কঠিন। মনে হয়, এর চেয়ে দু'- একটা রূপকথার গল্প শুনতে পেলে দারুণ হত। ওই কথাটা তার মনে গেঁথে থাকে, রাজারাজড়াদের মন খারাপ হতে নেই।

সিংহদরজার পাশে রাজপ্রহরীর থাকার ঘর। সন্ধেবেলা অগ্নিকা ঘরের নিভু- নিভু আলোয় তার ঠাকুরমার মুখ থেকে রূপকথার গল্প শোনে। নিভু- নিভু আলো কেন? দূরে যখন ভিন রাজ্যের সৈন্য এসে পড়বে, তারা ঠাহর করতে পারবে না, কোন ঘরটা রাজপ্রহরীর, তাই। আক্রমণ করতে এসে তারা পথ ভুল করবে। মাঝে- মাঝে অগ্নিকা হয়ে যেতে ইচ্ছে করে রাজপুত্রের। কিন্তু উপায় কী?

রাতে সোনার পালঙ্কে শোয় রাজপুত্র। মাথার উপর ময়ূরের পালকের রাজপঙ্খা। ঘরের বাইরে অনেক দূরে বসে একজন পঙ্খাবারি দড়িতে টান দিতে থাকে। সারারাত। সে কিন্তু ঝাড়লণ্ঠন জ্বালিয়ে লোকটার মতো ঘুমে ঢোলে না। তখন রাজপুত্র বিনতিবান্ধব রানিমাকে বলে, "মা, আমাকে একটা রূপকথার গল্প বলো না!"

রানিমা রাজপুত্রের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে- দিতে বলেন, "এখন রাজামশাইয়ের ঘুমের সময় যে! তিনি সারাদিন রাজকার্য সেরে এখন ক্লান্ত! এখন একটিও কথা বলতে নেই বাবা!"

দেখতে- দেখতে গোটা রাজপ্রাসাদ নিঝুম হয়ে যায়। শুধু সিংহদরজার মাথার উপরের ক্ষীণ আলোটা টিমটিম করে জ্বলতে থাকে। বিনতিবান্ধবের চোখে আর ঘুম আসে না। ঝুপ- ঝুপ করে চাঁদ ওঠে ছোট- ছোট সাদা ফুলে ভরা তেলশুর গাছের মাথায়। তারপর সেই ফুলের মায়াময় গন্ধে রাজামশাইয়ের নাক ডাকতে শুরু করে। তখন রানিমার চোখেও সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের ঘুম! কিন্তু তখনও ঘুম আসে না রাজপুত্রের।

প্রতি প্রহরে-প্রহরে রাজপ্রাসাদের চার কোণ থেকে 'হে-হে-হে হুই-হুই' করে ডাক ভেসে আসে। রাজপ্রহরীরা যে জেগে আছে, রাজ্যবাসীকে জানান দেয়। আর রাজামশাইকে জানান দেয়, 'মহারাজ, আপনার রাজপ্রাসাদ সুরক্ষিত!' তখন সিংহদরজা থেকে প্রহরীর দল সাড়া দেয়, 'উ-ই-ই-ই হাঃ!' জানান দেয়, তারাও জেগে আছে!

রাজপুত্রের আর রূপকথা শোনা হয় না। মন খারাপ হতে শুরু করে তখন। রাজপুত্র মন খারাপকে তাড়াতে-তাড়াতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে সোনার পালঙ্কে।

মন খারাপ হয় কি না তারও পরীক্ষা দিতে হয় রাজপুত্রকে। এ বছরের পরীক্ষা তখনও হয়নি। রাজামশাই রাজগণৎকারকে ডেকে পাঠালেন। রাজগণৎকার দরবারে এসে হাজির হতে রাজা অবিনয়বান্ধব বললেন, "রাজপুত্রের এখনও মন খারাপের পরীক্ষা নেওয়া হয়নি কেন? কালই ব্যবস্থা করুন!"

সেই মতো পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজপুত্রের শুধু পাঁচনটুকু খাওয়া হল। তারপর না হল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা। না হল ঘোড়ায় চড়া। সেদিন রাজপ্রাসাদের একদম কোণের একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় রাজপুত্রকে। সে ঘরে মুনি-ঋষিদের মূর্তি সাজানো। তারপর একটু পরে এসে হাজির হলেন রাজযোগাচার্য। প্রথমে তিনি রাজপুত্রের মাথায় হাত রেখে পরীক্ষা করলেন। তারপর দু'-একটা ছোটখাটো প্রশ্ন করলেন। সেই পরীক্ষায় রাজপুত্র পাশ করতে হাসি মুখে চলে গেলেন রাজযোগাচার্য।

এর পর এলেন রাজমহাপণ্ডিত। তাঁর হাতে মস্ত মস্ত আঠারোখানা উপনিষদ। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের বর্ণনা করতে-করতে লক্ষ করলেন রাজপুত্রকে। কী লক্ষ করলেন তিনিই জানেন। এক-আধটা প্রশ্নও করলেন। রাজপুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে তিনিও বিদায় নিলেন।

এর পর এলেন রাজবৈদ্য। তাঁর ঝোলায় রাখা অচেনা গাছগাছড়ার গন্ধে ম ম করতে থাকল ঘরটি। তিনি ঝিনুকে করে কী একটা গাছের পাতার রস খাইয়ে দিলেন রাজপুত্রকে। পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে থাকতে বললেন নিবিষ্ট হয়ে। তারপর খুশি মনে রাজবৈদ্য চলে গেলেন। এর পর মন খারাপের পরীক্ষায় পাশ করল বিনতিবান্ধব। এদিনের মতো ছুটি হয়ে গেল তার।

মন খারাপের পরীক্ষার পরে-পরেই রাজপুত্র শুনল, অগ্নিকা তার বাবার সঙ্গে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে। কেন, চলে গেছে কেন? হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে! কাল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার পর রাজপুত্র ফিরে আসছিল প্রাসাদে। অমন সময় সিংহদরজার কাছে অগ্নিকা জুঁই ফুলের মালাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল, যেমন করে প্রতিদিন দেয়। তারপর বলেছিল, "কাল থেকে আর মালা পাবে না!"

তখন রাজপুত্র অত মন দিয়ে শোনেনি অগ্নিকার কথাটা। রাজপ্রহরীর চলে যাওয়ার কথা শুনে মনে পড়ে গেল রাজপুত্রের। রাজপুত্র বিনতিবান্ধব শুনল, কাল গভীর রাতে রাজপ্রহরী তার ঘর-সংসার নিয়ে চলে গেছে। কেন, চলে গেছে কেন? কোথায় গেছে? অনেকটা পথ পেরিয়ে, কয়েকটা পাহাড় ডিঙিয়ে, দুটো নদী পেরিয়ে আর একটা যে রাজ্য আছে, সেখানে। সে রাজ্যের রাজা মাইনে হিসেবে অনেক বেশি মোহর দেবেন। রাজপ্রহরীকে সেই রাজা বলেছেন, "তোমার মেয়েকে বিদ্যাপাঠ শেখাব। যুদ্ধবিদ্যাও শেখাব। রাজপ্রহরীর মেয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিখবে না কেন?"

এ কথা শুনে ছোট-ছোট অনেকগুলো মন খারাপ এসে ভিড় করল রাজপুত্র বিনতিবান্ধবের মনে।

একটা মন খারাপ, রাজপ্রহরীর মেয়ে অগ্নিকার সঙ্গে তার আর দেখা হবে না।

দুটো মন খারাপ, যুদ্ধবিদ্যা শিখে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসার সময় অগ্নিকা আর জুঁই ফুলের মালা দেবে না।

তিনটে মন খারাপ, অগ্নিকা আর বেনেবউ পাখির ডিম দেখতে যাবে না।

চারটে মন খারাপ, অগ্নিকা আর পরিখা সাঁতরে শালুক তুলে এনে মালা গাঁথবে না।

পাঁচটা মন খারাপ হল, সন্ধেবেলা অগ্নিকার আর রূপকথা শোনার সময় হবে না।

এই এতগুলো টুকরো- টুকরো মন খারাপ হঠাৎ মেঘ হয়ে গেল। তারপর সেগুলো একসঙ্গে জুড়ে- জুড়ে হয়ে গেল একটা বড়ো মন খারাপ!

ছবিঃ সঙ্ঘমিত্রা

# একটি দোয়েলের গল্প

**এহসান হায়দার**

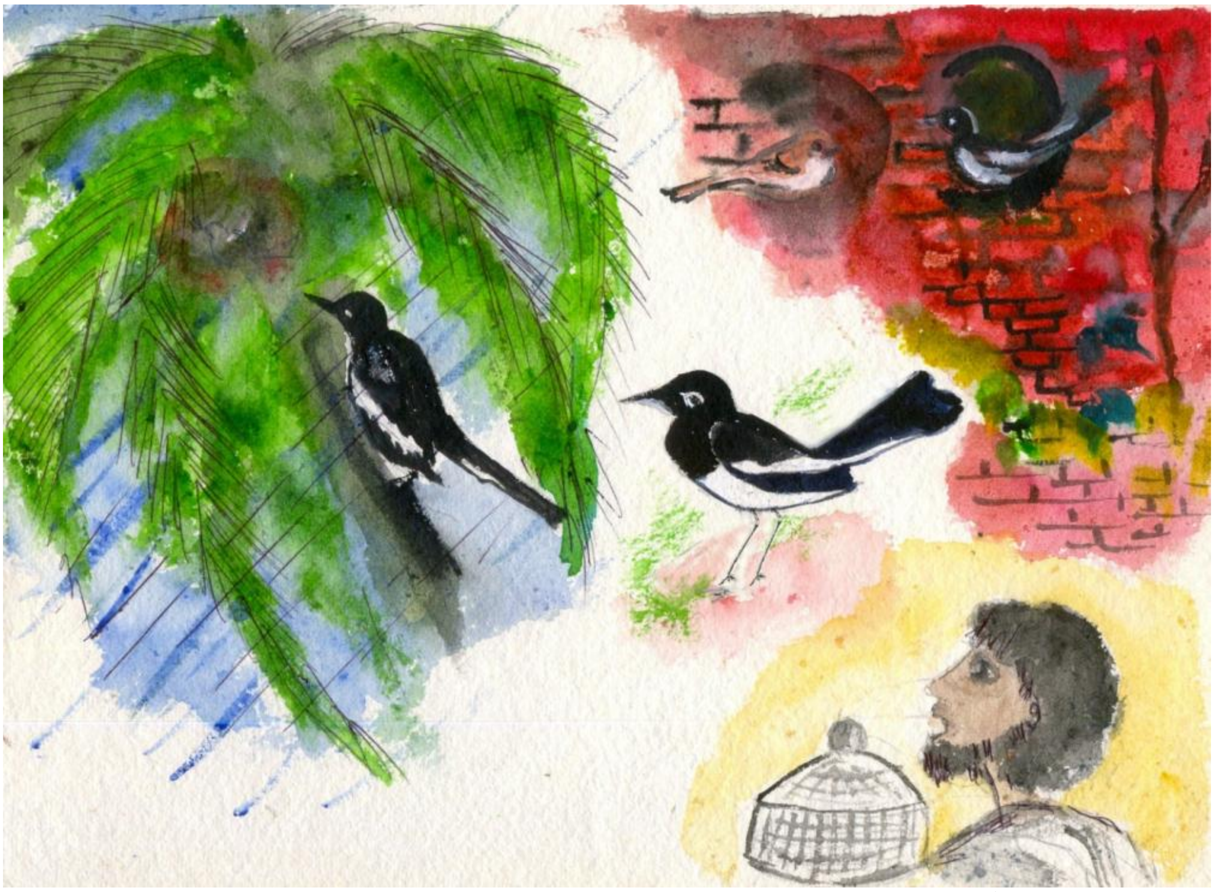

বাড়িটা পুরনো আর জংলা ধরা। এরই দেয়ালে দোয়েলের বাসা। ছোট্ট বাচ্চা আর মা দোয়েল থাকে। গত ঝড়ে বাচ্চাটার বাবা হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে দোয়েল, কোথাও নেই। তখন অবশ্য এখানে বাসাটা ছিল না। ওই যে মহল বাড়ির দো-চালা ঘরের লাগোয়া একটা নারকেল গাছ ওই গাছেই ওরা থাকত।

হঠাৎ একদিন কালো মেঘে ভরে গেল আকাশ আর বইতে লাগল ঝড়ো হাওয়া। মা দোয়েল বলল, আমি এখানে থাকব না। ভয় লাগছে, চলো অন্য কোথাও।

কিন্তু কে শোনে কার কথা; বরটা একটু একগুঁয়ে স্বভাবের ছিল তাই শেষমেষ তাকে হারাতে হল। তখন বাচ্চাটাও ছোট্ট।

পরদিন সকালে গাছটার আশেপাশে বরকে খুঁজে না পেয়ে শেষে বাচ্চাটাকে নিয়ে বাসা বেঁধেছে এই পুরনো বাড়ির দেয়ালের ভেন্টিলেটরে। একসময় বাড়ির মালিক শমসের আলি মাস্টার গ্রামের হাইস্কুলে চাকরি করত। তখন সবাই এখানেই ছিল। মাস্টারের ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা শেষ করে শহরে চাকরিবাকরি করছে। তার নিজের শরীরও বেশি ভালো না। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ছেলে-মেয়ের সাথে থাকে।

দোয়েল বাচ্চাটার সাথে গল্প করে-নানান রকমের। ওদের বাসার ঠিক পাশের ভেন্টিলেটরে চড়ুইয়ের ঘর। ওরা বর-বউ আর দুই ছেলে-মেয়ে। প্রায়ই ওরা বাইরে বেড়াতে যায়। তাই এসে বউটা গল্প করে কিচিরকিচির করে। তাদের বাচ্চারা বলে, “মা, আমাদের কবে নিয়ে যাবে? আমরাও যাব।”

মা বলে, "হ্যাঁ তোমরা তো যাবেই, তোমরা বড়ো হও। দেখবে এই ঘরের বাইরে কত্তো বড়ো একটা পৃথিবী। কী সুন্দর নীল আকাশ। ওটা হল পৃথিবীর ছাদ। তারপর রয়েছে মাঠের পর মাঠ, ফসলের ক্ষেত। সে বাছা বলে শেষ করা যায় না।

দোয়েলের বাচ্চাটা এই কথা দেয়ালে কান পেতে শোনে। আর ভাবে আজ মা এলে তার কাছে শুনবে।

সেদিন মা আসতেই বাচ্চাটা ছুটে গিয়ে মার বুকে মুখ লুকোল। বলে, "মা মা জানো ওরা রোজ বাইরের কথা বলে। চড়ুই কাকি বলেছে-ওরা বড়ো হলে তবে ওদের বাইরে বেড়াতে নেবে। আচ্ছা মা আমাকে তুমি বাইরের কথা বলো না কেন? আমারও তো শুনতে ইচ্ছে করে।"

-বাইরে কী হয় মা?

-বাইরে দেখতে কেমন?

-কোথায় সেই বাইরেটা?

মা দোয়েল বলে, "হ্যাঁ বাবা; বাইরে আর একটা পৃথিবী আছে। তার রঙ আলাদা। বড়ো বড়ো বাড়ি, গাছ-গাছালি, নদ-নদী, ফল-ফুল আর অসংখ্য মানুষ আছে। এতকিছুর উপরে একটা আকাশ আছে, আকাশের রঙ নীল। সেই আকাশে সূর্য ওঠে দিনে আর ওই আকাশে আলো জ্বালায় তোমার চাঁদমামা।"

"মামার কাছে আমাকে নিয়ে যাও না কেন?"

"মা বলে, আরে আরে পাগল ছেলে তুমি বড়ো হলে মামা তোমায় ডাকবে। তুমি নিজেই মামার কাছে যাবে, তার সাথে কথা বলবে, লুকোচুরি খেলবে।"

মা দোয়েলের কথা শুনে বাচ্চা দোয়েলটা খুশিতে নেচে ওঠে। বলে, "কত্তো মজা হবে।"

তারপর মা দোয়েল বলে, "তুমি কাল থেকে আমার কাছে ওড়া শিখবে। উড়তে পারলেই তুমি নিজেই জেনে যাবে এত্তবড়ো হাতীর মতন তুলো তুলো মেঘ রাজ্যের গল্প। তারপর বৃষ্টি মাখা সকাল দুপুর বন্ধুদের সাথে কানামাছি খেলা সে কি মজা রে!"

মার এইসব গল্প শুনে আগ্রহ আরও বেড়ে যায় বাচ্চা দোয়েলের। কাল থেকে সে ওড়া শিখবে। উড়তে উড়তে অনেক দূরে গিয়ে বেড়িয়ে আসবে। তখন মাকে এসে বলবে, জানো মা-আজ আমি ওই যে দূরের গাঁ দেখা যায় ওখানে গিয়েছিলাম। ওখানে বন্ধুদের সাথে খেলেছি আর মজার বরবটি খেলাম। কী যে আনন্দে মা তখন বলবে, আমার বাচ্চাটা বড় হয়েছে।

সেই নিয়ে কত স্বপ্ন দেখতে থাকে সে ঘুমের ভেতরে! ভোরে মা দোয়েলের ডাকে ঘুম ভাঙে বাচ্চাটার।

"ওঠো। আজ তুমি উড়বে।"

মার কথা শুনে একটু ভয় পায় বাচ্চা দোয়েল। ডানা দিয়ে চোখ কচলে মার মুখের দিকে তাকায়। মা সঙ্গে সঙ্গে আস্তে করে ধাক্কা দেয়, বাচ্চাটা পড়ে যেতে থাকে। মা বলে, "বাবা ডানা মেলো, নাড়তে থাকো, নাড়ো নাড়ো..".

পাক্কা এক ঘন্টা মার কাছে এই ওড়া শিখে খুব খিদে পেল বাচ্চাটার। মা তাকে দশটা গম খাইয়ে রেখে গেল খাবারের সন্ধানে। তখন বাচ্চাটা ভাবল, আমি নিজেই তো উড়তে পারব। কিন্তু একবারও ভাবেনি যে পড়ে গেলে আর একা একা উঠতে পারবে না।

একা একা উড়তে গিয়ে তখন সে পড়ে গেল নীচে; আর পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক পাখি শিকারি। বাচ্চা দোয়েল তাকে বলল, "আমাকে একটু তুলে দেবে?"

শিকারি দেখল কী সুন্দর ছোট্ট দোয়েল। মিষ্টি করে কথা বলে, একে তো হাটে নিয়ে গেলে অনেক দামে বেচা যাবে।

শিকারি যখন একথা ভাবছিল তখন কোথা থেকে উড়ে এসে ঠোঁট দিয়ে নিয়ে গেল মা দোয়েল বাচ্চাটাকে। তারপর বলল, একবারে উড়তে না শিখে কখনো আর নীচে নামবে না। আজ তো তোমাকে বেচে দিত ওই শিকারি।

ছবিঃ পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণ

# পাহাড়ি গ্রামের গপ্পো

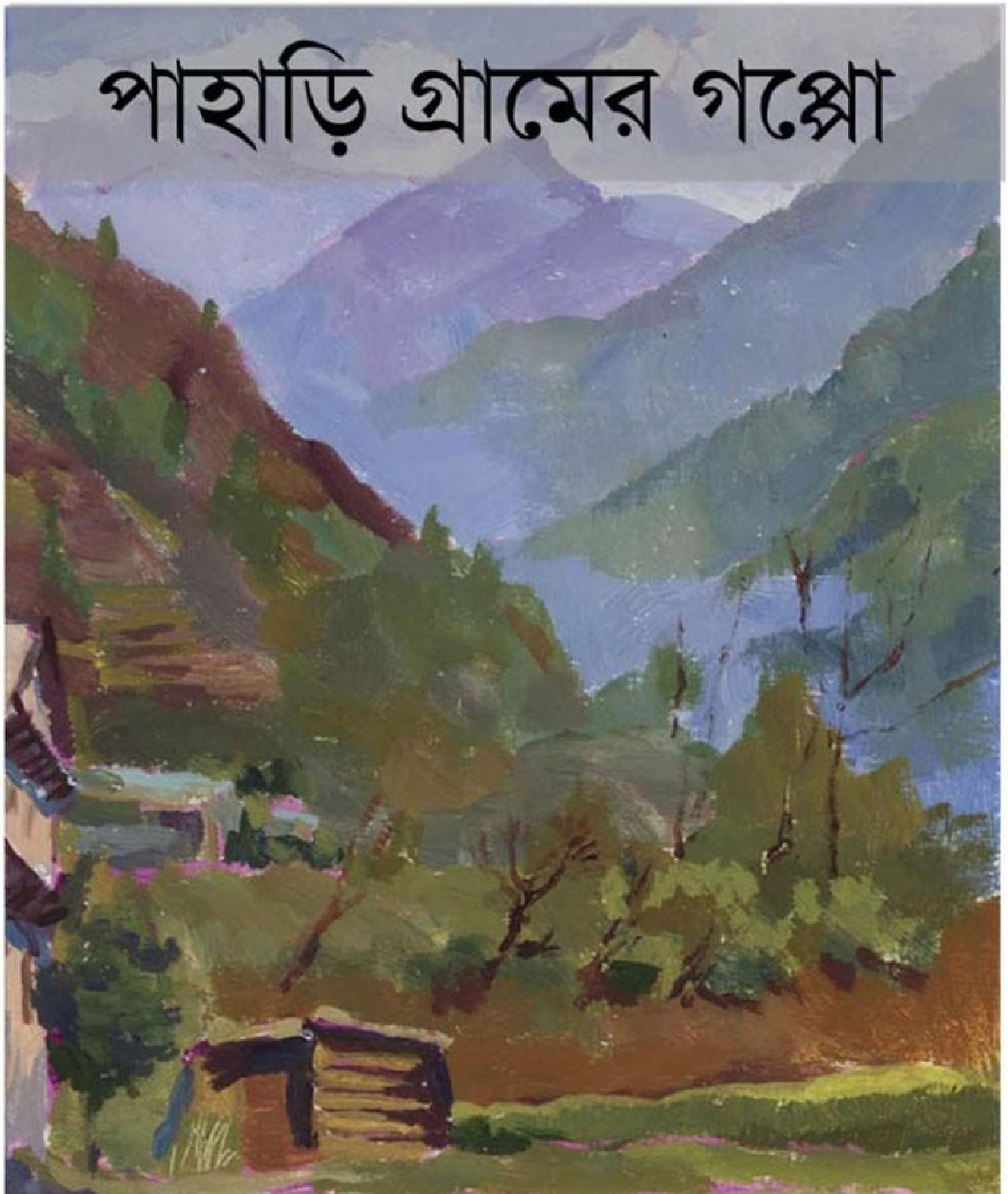

ইন্দ্রনাথ

*আমাদের দেশের উত্তরদিকে যে বিরাট পাহাড়শ্রেণী সেটাই হিমালয়। এই হিমালয় পাহাড়ের গায়ে গাড়ি চলা রাস্তার ধারে কাছে, আনাচে কানাচে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রাম। কোনো কোনো গ্রামে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে সারা দিন এমনকি দুদিন তিনদিনও লেগে যায়। ছবির মতো সুন্দর সেসব গ্রাম। আরো সুন্দর সেখানকার মানুষজন।*

*এরকমই বেশ কিছু গ্রামে যাবার সুযোগ ঘটেছে আমার, অনেকের সাথে, বেড়াতে বেড়াতে নেহাৎ এক দুদিনের জন্যে। কোনো গ্রামে একবার, কোনো গ্রামে একাধিকবার। উত্তরাখন্ডের এমন কয়েকটা গ্রাম বেড়ানোর সাদামাটা গল্পই শোনাব এবার। সেসব গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী, গভীর জঙ্গল, সবুজ পাহাড়ি ঢাল, পাহাড়ের চূড়ার মাথার সাদা বরফ, রঙ বেরঙের জানা অজানা ফুল, নানান প্রজাতির পাখি, যদি কখোনো দেখতে ইচ্ছে করে তোমাদের!*

*তোমাদেরই মতো আমার এক ছোট্ট বন্ধু আমাকে এমনি এক পাহাড়ি গ্রামের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, " জানো, আমাদের দেশটা এতো বড়ো আর এত সুন্দর......"*

# জাতোলি

বহু বছর আগে সুন্দরডুংগার পথে শেষ গ্রাম জাতোলিতে গিয়েছিলাম একবার। রূপদাদার কথা বলেছি কি এর আগে? রূপ সিং দানো হলেন পিন্ডারি সুন্দরডুংগা অঞ্চলের অন্যতম প্রসিদ্ধ গাইড। তার বাড়িই জাতোলি গ্রামে। আমরা সেবারে তার বাড়িতেই অতিথি হয়েছিলাম। খাতি গ্রামের কথা তো এর আগেই তোমরা শুনেছ, পড়েওছো। খাতি থেকে সুন্দরডুংগা নদী বরাবর সকাল সকাল রওনা দিলে, বিকেলের আগেই পৌঁছে যাওয়া যাবে জাতোলি গ্রামে। ডান হাতে নদী রইল পড়ে, বাঁদিকের ঢাল ধরে উঠে এলেই দারুণ একটা ছবির মতো শান্ত নিরিবিলি জাতোলি। বড়োজোর দশ বারো ঘর লোকের বাস। এখন হয়তো বেড়েছে আরো কিছু।

তো মজার কথাটা হল জাতোলিতে যেবার আমরা রূপ সিং –এর বাড়িতে অতিথি হিসেবে উঠি, তখন কিন্তু তার সংগে ভালো করে আলাপই হয়নি। অবাক হচ্ছ তো? পাহাড়ি প্রত্যন্ত গ্রামে এমনটাই স্বাভাবিক। তুমি হয়তো সে গ্রামে গিয়ে পৌঁছলে। শুধু সেখানকার কারো একজনের নামটুকু জানো। সটান তার বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করলেই হল। তোমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই যাবে, তা সেই নাম- জানা লোকটি থাক বা না থাক। প্রথমবারে আমাদেরও তাই হয়েছিল। পরে অবশ্য রূপ সিংজি আমাদের রূপদাদা হয়ে উঠেছিলেন। সে অন্য গল্প।

সেবারে পাথরবাঁধানো দোতলা একটাই বাড়ি দেখিয়ে গ্রামের এক বালক আমাদের বলল ওই যে ওইটা হল রূপ সিং এর বাড়ি। আমরা গিয়ে অনুরোধ করতেই, বাইরের দিকের একটা দোতলার ঘর খুলে দিয়ে এক মহিলা বললেন আপনারা এখানে থাকুন। রূপ সিংজি দিন চার পর ফিরবেন। বিকেলের আলো নিভে আসছে তখন। আমরা বাইরে বসে আলো নিভে আসা দেখতে দেখতে চা খেতে খেতে গল্প করছিলাম। সামনে অনেকটা রামদানার খেত। পেকে লাল হয়ে আছে। রামদানা পিষে আটা হয় আর তা থেকে রুটি তৈরি হয়। এদিক ওদিক অনেকগুলো সব্জির খেত। কোথাও আলু, কোথাও কপি, কোথাও স্কোয়াশ চাষ হয়েছে। সুন্দর ডুংগার পাড়ে হলে কি হবে, নদী এমনভাবে গ্রামের কাছে এসে বেঁকে গিয়েছে আর গ্রাম নদী থেকে এতটা ওপরে যে নদীর গর্জন গ্রাম অবধি পৌঁছয় না। ফলে আশ্চর্য রকম শান্ত এই গ্রামটা। এখান থেকে দেড় দুদিনের পথ বেয়ে মাইকতোলি, থারকোট, দুর্গাকোট এই সমস্ত চূড়ার পাদদেশে পৌঁছনো যায়। যারা পর্বতারোহণ করেন, এই শৃঙ্গগুলিতে চড়বার জন্য এই পথেই তাদের হেঁটে যেতে হয়। সেই পথের পাশে গ্রামের একমাত্র চায়ের দোকানের পাথরের বেঞ্চে আমরা বসে বসে গল্প করছিলাম, এমনসময় দোকানি উঠে এলেন। চোখে ঝাপসা কাচ বসানো চশমা। গায়ে একটা আদ্যিকালের ঝুল কোট।

“আপনারা কোত্থেকে আসছেন?”

“কলকাতা।”

“কলকাতা, দার্জিলিং, এইচ এম আই............”

লোকটির বিড়বিড় করা শব্দ শুনে আমাদের কৌতূহল হল। প্রত্যন্ত গ্রামে একটা অখ্যাত গ্রামে বসে এমন পোষাকের একজন চা দোকানির মুখে ঝপ করে এই নামগুলো মোটেও মানানসই নয়।

খানিক আগ্রহ প্রকাশ করতেই জানা গেল ইনি এ অঞ্চলের একদা নামডাকওয়ালা গাইড জোহর সিং। এখন বয়েসের ভারে ন্যুব্জ। ওই অঞ্চলের হেন কোন শৃঙ্গ নেই যাতে তিনি চড়েননি। বহু দেশি বিদেশি দলের সাথে ক্যাম্প ওয়ান, ক্যাম্প টু ক্যাম্প থ্রি সামিট ক্যাম্প হয়ে চূড়ার দিকে অবিচল লক্ষ্যে সঙ্গত করেছেন।

"তখন আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল এটা", বলে ভদ্রলোক চা দোকানের পেছনের কুঠুরি থেকে বস্তা মোড়া একটা জিনিস বার করে আলোয় এনে খুলে ফেললেন। দেখি, সেটা একটা চমৎকার আইস অ্যাক্স। হাতে নিয়ে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। পুরোনো সন্দেহ নেই, তবে মজবুত, ইতালিতে তৈরি।

"এখন তো বয়েস হয়েছে আর পাহাড়ে যেতে পারি না। এখন এই দোকানে বসে থাকি। আর তোমাদের মতো কেউ এলে পাহাড়ের গল্প করে একটু আনন্দ পাই।"

জোহর সিং- এর সঙ্গে গল্পে গল্পে রাত নেমে আসে, ঠান্ডা জাঁকিয়ে পড়ে। অল্প অল্প হাওয়া দেয় নদীখাতের দিক থেকে। আমরা খানিক বাদে উঠে আমাদের ডেরায় এসে ঢুকি।

এমনিতে ভারতবর্ষের এত প্রত্যন্ত গ্রামের বাড়িতে তখন পাকা শৌচালয় চট করে দেখা যেত না। নির্মল গ্রাম যোজনার আগেকার সময় সেটা। কিন্তু জাতোলিতে সব বাড়িতে না হলেও সিংহভাগ বাড়িতেই  পাকা শৌচালয়। সৌজন্য রূপ সিং। খুব ভোরে উঠে দেখি, এক প্রৌঢ় মানুষ, খাটো উচ্চতার, ঝাঁটা বালতি হাতে নিয়ে শৌচাগারটি সাফসুতরো করছেন। কেননা বাড়িতে মেহমান আছেন, তাছাড়া সকালেই ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। জানা গেল, বাড়িতে থাকলে প্রতি সকালেই এ কাজটি উনি নিজের হাতেই করেন। কে উনি?

"আরে ওই তো আমার দাদা রূপ সিং।"

তার আগের দিনই বেশ রাত করে এক অভিযাত্রী দলের সাথে ফিরেছেন। সকাল হতেই বাড়ির কাজে লেগে পড়েছেন। অতিরিক্ত বিশ্রাম নেবার যেন কোন প্রয়োজনই নেই। এরপর বহুবার রূপদাদার সংগে পাহাড়ে যাওয়া হয়েছে। কতদিন এমনি ওর বাড়িতে দেখা করতে যাওয়া হয়েছে। রূপ সিং অবিকল একই রকম আছেন। মাটির মানুষ। বিনীত, ভদ্র, নম্র, মৃদুভাষী এবং অমিত শক্তিধর। শারীরিক ও মানসিক। পাহাড়ের সমস্ত আপদে বিপদে পাশে থাকবেন নিঃশব্দ, পরম অভিভাবকের মতো।

জাতোলির সেই ভোরবেলা নিজের হাতে চা করে খাওয়ালেন রূপদাদা। তারপর দেখাতে নিয়ে গেলেন ওর খেতিবাড়ি। রামদানা ফলে আছে। গোবি আর কিছু আলু। আরও উত্তরদিকে যেখানে সুন্দরডুংগা নালা আর মাইকতোলি নালা এসে মেলে, সেখানে, কাঁঠালিয়ায়, রূপদাদা নিজের হাতে পাথরে বানানো একটা ঘর তুলেছেন, যাতে পাহাড়ের গহনে পায়ে হেঁটে বেড়াতে আসা মানুষদের রাতের মতো মাথাগোঁজার ঠাঁই মেলে। সেখান থেকে মুখ উঁচু করে মাইকতোলির দিক থেকে ভেসে আসা বরফের হাওয়ার গন্ধ টের পাওয়া যায়। শোনা যায় মাইকতোলি নালার কলরব। তার ওপরে পেল্লায় এক পাথরের খন্ড। সেটাই সেতুর কাজ করে। আশপাশে ভেড় বকরিওয়ালারা তাদের ছাগল ভেড়া নিয়ে চড়ায়। রূপদাদার বাড়ির লোকেরাও কিংবা রূপ সিং কখনো সখনো নিজেও যান। জাতোলি শেষ গ্রাম বলে তার উত্তরে এই ভূমিও জাতোলির লোকেরা নিজেদের বলেই মনে করে। তাই বলে শহরের মতো অমন পাঁচিল তোলার ব্যাপার নেই কিন্তু। তুমি চাইলেই সেখানে গিয়ে থাকতে পারো। যখন খুশি যতদিন খুশি।

ভারারির কাছে সং বলে একটা জায়গা আছে। বয়স হয়ে যাওয়াতে রূপদাদা এখন ওখানে একটা বাড়ি বানিয়ে থাকেন সরযূর পাশে। সেখানে নাতি নাতনি ছেলে মেয়ে সহ রূপদাদার ভরা সংসার। কিন্তু বাড়িতে বসে থাকে কে? একবার খোঁজ করতে গিয়ে শুনি তিনি গেছেন পাহাড়ে। সমতলের কোন স্কুলের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে। মাস্টারমশাইরা নিশ্চিন্ত। যাক রূপজি আছেন সংগে। বাগেশ্বর জেলা সদরে অনেক গণ্যমান্য লোককে দেখেছি, রূপজিকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতে। যত দেখেছি তত জেনেছি ওই মানুষটির মধ্যে অহংকারের ছিঁটেফোঁটাও নেই। মস্তবড়ো হিমালয় তার সন্তানকে তার মতোই সহিষ্ণু ও মহৎ করে তুলেছেন। আর আমরা ভালোবেসে ফেলেছি জাতোলি গ্রামের রূপদাদাকে।

# খাতিন মেমোরিয়াল

বেলারুশ

জয়শ্রী গোস্বামী

গত জুলাই মাসে এই দুঃখজনক মালয়েশিয়ান বিমান দুর্ঘটনার খবরে পড়লাম, যে প্লেনটিকে উক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছে। এই খবরটা পড়েই একটা জায়গার কথা মনে পড়ে গেল। সেই গল্পই বলব।

আমরা ১৯৯১এর নভেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়াতে গিয়েছিলাম। প্রথমে মস্কো, সেখান থেকে লেনিনগ্রাদ, সারাতভ এবং তারপর কিয়েভ। আমরা কিয়েভ থেকে মিন্‌স্ক, ও সেখান থেকে ভিয়েব্‌স্‌ক হয়ে মস্কোয় ফেরত যাব। জায়গাটা মিন্‌স্ক ও ভিয়েব্‌স্‌কের মাঝামাঝি। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে তখন। মাঝে মাঝে তুলোর মতন নরম বরফ পড়া শুরু হয়েছে। আমরা সকালে জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম মিন্‌স্ক থেকে ভিয়েব্‌স্‌কের এর পথে।

এই দুটি জায়গাই পড়ে বেলারুশে। প্রায় ঘন্টাতিনেকের রাস্তা। রাস্তার দু'দিকে প্রচুর বার্চ আর পাইনের সারি। রাস্তাটা খুব সুন্দর এঁকেবেঁকে গেছে, তবে তখন খুব একটা চওড়া রাস্তা ছিল না কারণ লোকে ওখানে গাড়ি খুব একটা চড়ত না। আমাদের গাড়িতে আমাদের সংগে কয়েকজন রাশিয়ান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন খুব মিশুকে ভদ্রলোক ছিলেন নাম ছিল মিস্টার কোন্দ্রাসভ, তিনি

মোটামুটিভাবে ইংরিজি বলতে পারতেন বলে তাঁর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। বাকিদের কাছে ইংরিজি, বাংলা বা হিন্দি সব একই ছিল।

গাড়িটা প্রায় ৪৫ মিনিট চলার পর হঠাৎ মিস্টার কোন্দ্রাসভ গাড়ির চালককে বললেন পাশেই একটা ছোটো রাস্তা আছে সেটাকে অনুসরণ করতে এবং আমাদের বললেন যে চল তোমাদের একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাই। প্রায় মিনিট দশেক পর আমরা হঠাৎ একটা খোলা জায়গায় এসে পড়লাম, সেটা দেখে মনে হল জংগল কেটে একটা বিশাল খোলা জায়গা তৈরি করা হয়েছে। কিছুটা হেঁটে যেতেই থমকে দাঁড়ালাম, সামনে একটা বিরাট পাথরের মূর্তি, একটি বৃদ্ধ একটা ১২-১৩ বছরের ছেলের মৃতদেহ দুহাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে--

মূর্তিটির নাম Unbowed man। এখান থেকেই একটা পাতলা রাস্তা শুরু হয় যার একদিকে ফুলগাছ ও অন্যদিকে রয়েছে ছোটোবড়ো মিশিয়ে পাথরের সমাধি, সংখ্যায় ১৮৬ এবং যখন আমরা ওখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম কিছুক্ষণ পরপরই খুব আস্তে ঘন্টার আওয়াজ পাচ্ছিলাম আর এই ঘন্টার বাজবার সময়গুলো আলাদা ছিল। সেইসঙ্গে খুব আস্তে একটা কিছু চলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম-দপ্-দপ্-দপ্।

অনেক সমাধির ওপরে ফুলের গুচ্ছ রাখা রয়েছে। জায়গাটা মনকে খুব ভারাক্রান্ত করে দেয়। নিশ্চয় এর কোন ইতিহাস আছে। জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারলাম সেই ইতিহাস।

এই জায়গাতে স্মৃতিসৌধ বানানো হয় এবং এটা বহু গ্রামেরই কবরখানা। আমরা যে সমাধিগুলো আগে দেখেছিলাম, সেই এক একটা সমাধি বেলারুশের যে গ্রাম গুলো, তাদের বাসিন্দাদের সংগে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, সেইসব বাসিন্দাদের স্মৃতিসৌধ। ঘন্টাগুলো প্রত্যেক ৩০ সেকেন্ড বাজে। তার মানে প্রত্যেক ৩০ সেকেন্ডে বেলারুশের একটি করে জীবন শেষ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধতে। আমরা যে একটা দপ-দপ আওয়াজ পাচ্ছিলাম সেটা তাদের হৃৎস্পন্দন। এখন অবশ্য সেটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই জায়গাটির নাম খাতিন। এই জায়গাতে ২২শে মার্চ, ১৯৪৩ তারিখে ২৬টি বাড়ির ১৫৬জন মানুষকে এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে মারা হয়। যাঁরা ওখানে ছিলেন তাঁদের মধ্যে শুধু একজন বেঁচে ছিলেন। নাম ইয়ুজিফ কামিনস্কি। তিনি তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন-- সেই পাথরের মূর্তিই হল Unbowed man। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাজিদের এরকম নৃশংসতার ঘটনা বহু শোনা যায় কিন্তু এ রকম মেমোরিয়াল দেখা যায়না।

এখন এই মেমোরিয়াল এর অনেক বদল হয়েছে। নাম খাতিন স্মৃতিসৌধ। এটি বেলারুশ এ পড়ে। যখন ফিরছি তখন দেখি স্কুলের ছোটো ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে শিক্ষকরা এসেছেন দেখাতে ও তাদের নিজেদের দেশের ইতিহাস জানাতে, যাতে তারা অতীতকে না ভুলে যায়।

# পিন্ডারি গ্লেসিয়ার ট্রেকিং

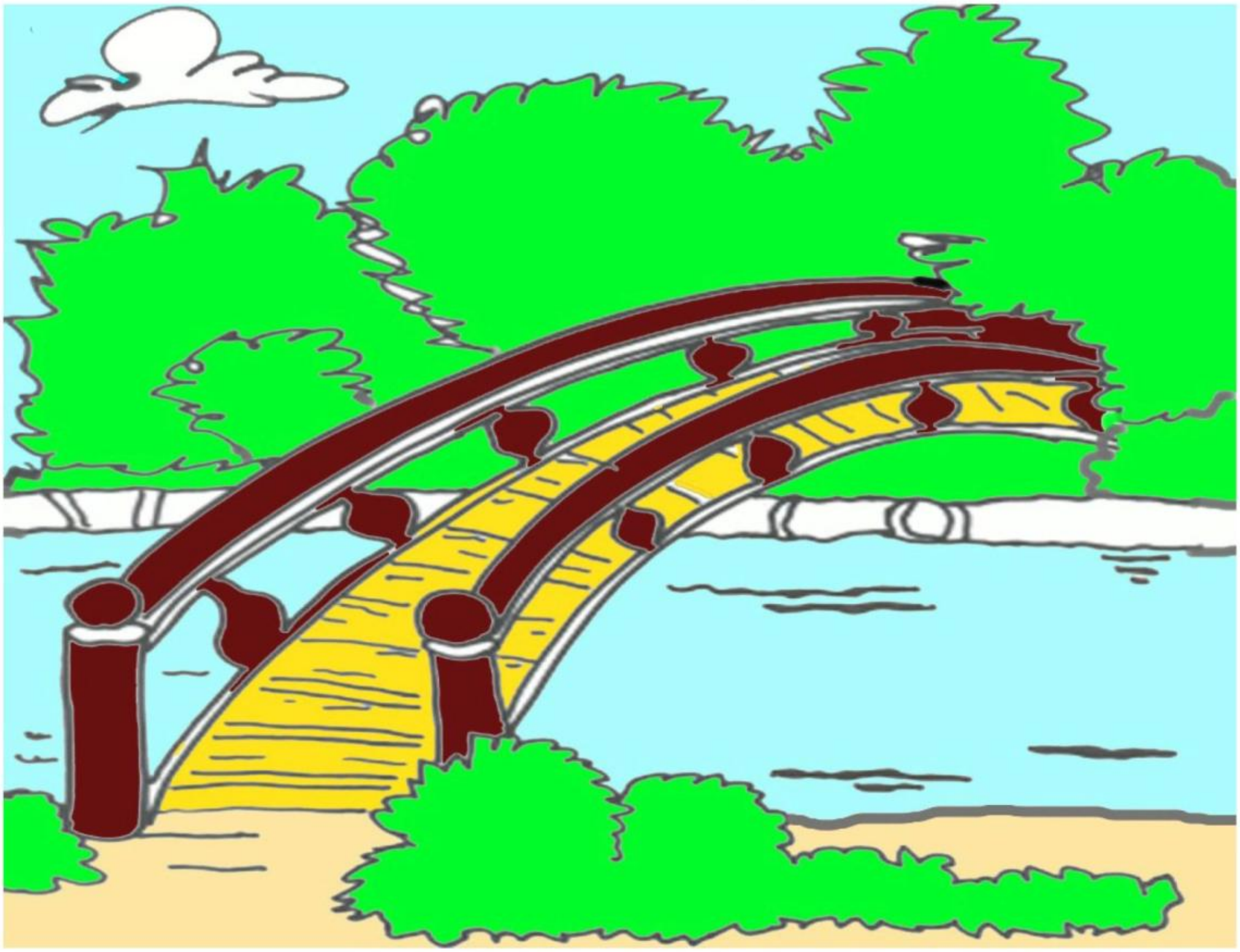

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

পায়ে পায়ে সরযূর পাড়ে
শহরের সীমানা ছাড়িয়ে
গাছপালা ভিড় করে আসে
মনও যায় কোথায় হারিয়ে

বিশ নাকি ত্রিশ কিমি চলে
সাঁকো দিয়ে নদীটা পেরিয়ে
খানিকটা চলবার পড়ে
লাগোয়া নদীর ঠিক গায়ে

ছোটোখাটো জনপদ এক
লোকজন খুব বেশি নেই
এমনই নদীর পারে বাসা
গাড়ি এসে থামে ঠিক যেই

এরপর বিকেলের দিকে
ঠান্ডাতে খানিকটা কেঁপে
লালাজির চায়ের দোকানে
ধোঁয়া ওঠা চা কাপে কাপে

খাবার সময় হল ওঠো
রাত বেশ গাঢ় হল দেখে
খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া ভালো
চাঁদ ওঠে পাহাড়ের বাঁকে

সকালে আবার করো শুরু
যেতে হবে পাহাড়ি এ পথে
এ পথ থেমেছে গিয়ে দূর
প্রত্যেকে জল রেখো সাথে

প্রথমে খানিক যাওয়া জিপে
তারপর নেমে হাঁটা হাঁটি
বেশি নয় চার কিমি মতো
ছিম ছাম বেশ পরিপাটি

শুরুতে কষ্ট হতে পারে
আমল দিও না তাতে তুমি
ঠিক দেখো পৌঁছবে ক্রমে
হিমালয় প্রণম্য ভূমি

পাহাড়ের ধার ধরে ধরে
শান্ত ছবির মতো গ্রামে
পায়ে পায়ে ঠিক এসে পড়া
লোকে একে ডাকে খাতি নামে

খাতি গ্রামে একরাত থাকা
চাইলে দুদিন থেকে যাও
বিলকুল মন ভরে যাবে
দুচোখ যেদিকে মেলে চাও
বেশ তবে এরপর জেনো
লম্বা রাস্তা আছে পড়ে
যদিও তা জঙ্গলে ছাওয়া
শুরুতে নদীর পাড়ে পাড়ে

মাঝধার বলে সব লোক
নদীতীরে অস্থায়ী চালা
বর্ষায় ভেঙে চুরে ডাঁই
তেষ্টা মেটাও এই বেলা।

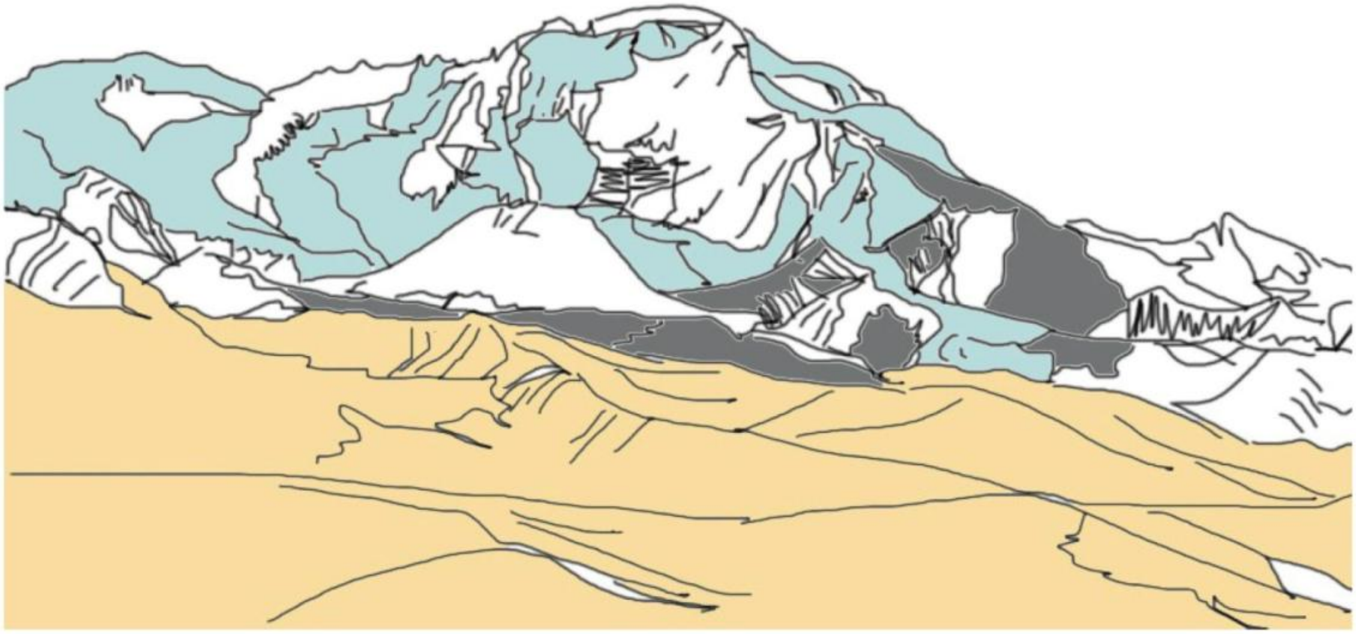

অস্থায়ী কাঠের সেতুতে
পিন্ডার পেরোতে যে হবে
সাবধানে পা ফেলে যেও
ফসকালে নদী লুফে নেবে

এইবার আমোদে আমোদে
প্রাচীন বনের ঘন ছায়া
হেঁটে যেতে হবে বহু ক্রোশ
নিবিড় পথের এই মায়া

ক্লান্তিতে পা যখন ধরা
দূর থেকে চোখে পড়ে যাবে
নদীটির ওই তীরে দ্যাখো
বাংলোটা দোয়েলির হবে

দোয়েলির দুই পাশে নদী
পিন্ডার কাফনি দুখানি
মেশে এসে পাহাড়ের কোলে
দুই নদী করে কলধ্বনি

এমন মধুর এক স্থানে
মনে হয় থাকি বহুদিন
ভোরে উঠে পুবদিকে চেয়ে
নন্দাদেবীকে চিনে নিন।

মেঘে ঢাকে একটু বেলাতে
তখন পাবে না আর দেখা
তার চেয়ে ভোরবেলা উঠে
নন্দাকে মনে ধরে রাখা

দোয়েলি ছাড়ালে এই পথ
সোজা গেছে পাহাড়ের ঢালে
গাছপালা ক্রমশ বিরল
ফুরকিয়া কাছে এসে গেলে

এখানে এতটা উঁচু বলে
হতে পারে বৃষ্টির দানা
বরফের রূপ ধরে ধরে
ছড়িয়ে থাকবে এ সীমানা

যা হোক তা হোক তবু সাদা
আশপাশ পাহাড়ের গায়ে
পিন্ডার চলে সাথে সাথে
হেসে হেসে নেচে গেয়ে গেয়ে

খানিকটা পথ আছে সোজা
খানিকটা চড়াইয়ের চড়া
আবার বেঁকেছে গিয়ে ঢালে
বাকী পথ উঠে গেছে খাড়া

চার পাঁচ ঘন্টাতে চলে
হিমবাহ আওতায় এসো
সমতল ঘাসে ঢাকা মাঠ
এইখানে থিতু হয়ে বোসো

এই ভূমি দেবতার প্রিয়
এই ভূমি স্বর্গ আদল
এইখানে দেবতারা নেমে
মহাসুখে বাজান মাদল

এইখানে তুমিও এসেছ
মনে মনে প্রার্থনা বলো
মানুষের আরো ভালো হোক
মুছে যাক যেখানে যা কালো

চারপাশে বরফের চূড়া
নন্দার তারা ভাইবোন
যে নামেই ডাকা হোক তাকে
হৃদয়ের নীচে বন্ধন

দেবভূমি হিমালয় নামে
আমাদের কাছে ধরা দেয়
এইসব গহন প্রদেশে
দেবতাও চোখ চেয়ে রয়

ফিরে যাওয়া বড়োই কঠিন
দিন শেষ হয়ে আসে দ্রুত
কোলাহলে ফের নেমে যাওয়া
ঘিরে আসে ভাবনারা যতো

এরপর থাকে কিছু স্মৃতি
স্বজনের কাছে আর বুকে
কেটে যাবে আরো কিছুকাল
এইসব স্মৃতি দেখে দেখে।

ছবিঃ ইন্দ্রশেখর

# গ্যাব্রিয়েল আর্নেস্ট

হেক্টর হিউ মানরো (সাকি)
ভাষান্তরঃ মহাশ্বেতা

স্টেশনে যাওয়ার পথে শিল্পী কানিংহ্যাম বলল, "তোমাদের এই জঙ্গলে কিন্তু একটা হিংস্র জানোয়ার আছে।" গোটা রাস্তায় এটা তার একমাত্র বক্তব্য ছিল, কিন্তু ভ্যান চিলের অনর্গল কথা বলে যাওয়ায় তার নীরবতা লক্ষ করা হয়নি।

"দু'একটা শেয়াল আর কিছু অনেক দিনের বেজি। এর থেকে হিংস্র আর কোন জানোয়ার নেই," ভ্যান চিল তার উত্তরে বলল। শিল্পী কোন উত্তর দিল না।

"হিংস্র জানোয়ারের ব্যাপারে কী বলছিলেন?" কিছুক্ষণ পর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ভ্যান চিল কানিংহ্যামকে প্রশ্ন করে।

"কিছু না। আমার কল্পনা। যাক, আমার ট্রেন এসে গেছে।" কানিংহ্যাম এই বলে চলে গেল।

সেই বিকেলে ভ্যান চিল প্রত্যহের মতই তার জঙ্গলে ঢাকা এস্টেটের ভেতরে হাঁটতে বেরোল। ভ্যান চিলের পড়ার ঘরে একটা স্টাফ করা বক ছিল ও সে অনেক ধরণের জংলি ফুলের নাম জানত, অতএব তার পিসিও তাকে এক বিশাল প্রকৃতিবিদ বলতে দ্বিরুক্তি করত না। আর যাই হোক, সে প্রচুর হাঁটতে পারত। প্রায় অভ্যাসবসতই সে হাঁটতে হাঁটতে যা দেখত তা মনে রাখত, বিজ্ঞানের উপকারের জন্য না হলেও পরে গল্প করার সময় কাজে লাগবে বলে। চারিদিকে ব্লু বেল ফোটা শুরু হলে সে সবাইকে বিশেষভাবে তার কথা জানিয়েছিল। অবশ্য সবার সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা ছিল, কারণ বাইরের ঋতুটা কী তা সবাই দেখেছে কিন্তু এ বিষয়েও সবাই একমত ছিল যে ভ্যান চিল তার বক্তব্য একেবারে মন থেকে করেছিল। অতএব কেউ তাতে কোন আপত্তি জানায়নি।

কিন্তু এই বিশেষ বিকেলে ভ্যান চিল যা দেখল তা তার রোজকার অভিজ্ঞতার থেকে একেবারেই আলাদা। ওক গাছের একটা ঝাড়ের মধ্যে একটা গভীর জলাশয়, তার ওপর ঝুঁকে থাকা মসৃণ পাথরের গায়ে হাত- পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল ষোল- সতেরো বছর বয়সের একটি ছেলে। বিকেলের জোরালো সূর্যের আলোয় আরাম করে তার তামাটে শরীরটাকে শুকোচ্ছিল সে। মধ্যে থেকে চেরা তার ভেজা চুল মাথায় লেপ্টে ছিল। তার হালকা বাদামি চোখগুলোতে কেমন যেন একটা বাঘসুলভ চমক ছিল। সে ভ্যান চিলের দিকেই অলস অথচ সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

এহেন অপ্রত্যাশিত মূর্তিকে সেখানে দেখে ভ্যান চিল নিজের অজান্তেই চিন্তা করতে লাগল। এই জংলি ছেলেটি কোথা থেকে এলো এখানে? মাসদুয়েক আগে খুব কাছেই কারখানার এক শ্রমিকের বাড়ি থেকে তার বাচ্চাটি উধাও হয়ে যায়। তখন আন্দাজ করা হয়েছিল যে কারখানার পাশে নালার জলে ভেসে গেছে বাচ্চাটি। কিন্তু সে তো একেবারে সদ্যোজাত বাচ্চা, আর এ তো একটা কিশোর!

"এখানে তুমি কী করছ?" সে ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাল।

"দেখছেন না, গায়ে রোদ লাগাচ্ছি।" ছেলেটি উত্তর দিল।

"তুমি কোথায় থাকো?"

"এখানেই থাকি, এই জঙ্গলের মধ্যে।"

"না, তুমি তো এই জঙ্গলে থাকতে পার না।"

"জঙ্গলটা বেশ ভালই তো।" ছেলেটা বলল, তার গলায় একটা অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ ভাব।

"কিন্তু রাত্রে কোথায় শোও তুমি?"

"আমি রাত্রে ঘুমোই না যে! তখনই তো আমার সবচেয়ে বেশি কাজ।"

ভ্যান চিল এবার বিরক্ত হল। ব্যাপারটার মধ্যে রহস্য কিছু একটা আছে। কিন্তু সেটা যে কী তা সে ঠিক ধরতে পারছিল না।

"তুমি কী খাও?" সে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল।

"মাংস।" সে কথাটা কেমন যেন রসিয়ে রসিয়ে বলল, যেন সেই মুহুর্তে মাংসের স্বাদ সে তার জিভে পাচ্ছিল।

"মাংস! কীসের মাংস?"

"আপনার যখন এতই কৌতুহল, তখন শুনুন। খরগোশ, বনমোরগ, এমনি মোরগ, ঠিকঠাক আবহওয়ায় ভেড়া, আর মানুষর বাচ্চা যদি পাই কখনও। যদিও এমনিতে রাত্রে ওদের ঘরের ভেতর আটকে রাখে। আর তখনই আমি শিকার করে থাকি। শেষ মানুষের বাচ্চার মাংস খেয়েছি তারপর মাসদুয়েক তো হয়েই গেছে।"

তার এই বিদ্রুপগোছের মন্তব্যটিকে অগ্রাহ্য করে ভ্যান চিল ছেলেটাকে চোরাশিকারের বিষয়টির দিকে টেনে আনার চেষ্টা করল।

"খরগোশের ব্যাপারটা কিন্তু তুমি বাড়িয়েই বলছ। আমাদের এই পাহাড়ি খরগোশ শুধু হাতে ধরা অত সহজ নয়।"

ছেলেটা এর বেশ একটা রহস্যময় উত্তর দিল ,"রাতে তো আমি চার পায়েই শিকার করি।"

"তুমি বোধহয় বলার চেষ্টা করছ যে তুমি কুকুর নিয়ে শিকার কর, তাই না?" ভ্যান চিল বলল।

ছেলেটা এবার নিচু গলায় একটা অদ্ভুত হাসি হেসে গড়িয়ে নিয়ে চিত হয়ে শুলো। হাসিটা চাপা হলেও কিছুটা জান্তব গর্জনের মত শোনাল।

"রাতে কোন কুকুরই আমার সাথে থাকতে বিশেষ ইচ্ছুক হবে বলে মনে হয় না।"

ভ্যান চিলের এবার মনে হতে লাগল যে এই অদ্ভুত চোখ- ওয়ালা, অদ্ভুত কথা বলা ছেলেটির মধ্যে একটা বড়ই অস্বস্তিকর ব্যাপার রয়েছে।

"তোমাকে এই জঙ্গলে তো আমি থাকতে দিতে পারি না।" সে এবার কর্তৃত্বপূর্ণভাবে বলল।

"আমার তো মনে হয় আপনার বাড়িতে থাকার চাইতে আমার এই জঙ্গলে থাকাটাই আপনার পক্ষে বেশি সুখকর হবে।"

সত্যিই, তার সুন্দর, সাজানোগোছানো বাড়িতে এই বন্য কিশোরটির থাকাটা একদমই সুখকর হবে না, ভ্যান চিল ভেবে দেখল।

"কিন্তু তুমি যদি নিজে থেকে এখান থেকে না যাও, তাহলে তোমাকে জোর করে তাড়াতে আমি বাধ্য হব।"

ছেলেটা তড়াক করে ঘুরে, জলাশয়টিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, আর পরমুহুর্তেই ভ্যান চিল জলাশয়ের যে ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে তার জলে ভেজা চকচকে শরীরটা নিয়ে বেয়ে উঠে পড়ল প্রায় বিদ্যুতগতিতে। একটা উদবেড়ালের পক্ষে এটা অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু ষোল সতেরো বছরের একটা ছেলেকে এরকম করতে দেখে ভ্যান চিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। সে নিজের অজান্তেই পিছু হটতে গিয়ে হড়াৎ করে পিছলে পড়ে গেল জলের ধারে ভেজা, আগাছা ঢাকা মাটিতে। আর সেই বাঘের মত, হলুদ চোখদুটো ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছিল। প্রায় প্রতিবর্ত ক্রিয়াতেই সে হাত দুটো দিয়ে তার গলাটা ঢাকতে গেল। ছেলেটা আবার হেসে উঠল, এবার সেই হাসিতে হাসির চেয়ে গর্জনের পরিমাণই বেশি। তারপর আবার সেই বিদ্যুতগতিতেই ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

"কি অদ্ভুত! বন্য জন্তু একেবারে!" ভ্যান চিল মাটি থেকে উঠতে উঠতে মন্তব্য করল। আর তারপরেই তার কানিংহ্যামের কথা মনে পড়ে গেল, "তোমাদের এই জঙ্গলে কিন্তু একটা হিংস্র জানোয়ার আছে।"

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভ্যান চিল এক এক করে গত কয়েক মাস ধরে এই অদ্ভুত বন্য ছেলেটির সাথে যুক্ত করা যেতে পারে এমন সমস্ত ঘটনার কথা নিজের মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

ইদানিং এই জঙ্গলে শিকার করার মত পশু কমে গেছে প্রায় হঠাৎ করেই, আশপাশের চাষিবাড়ি থেকে মাঝে মাঝেই মুরগি চুরি যাচ্ছে, খরগোশ তো আর প্রায় দেখাই যায় না, আর ভেড়ার ছানা নাকি পাহাড় থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এমন নালিশও তার কাছে এসেছে। সত্যিই কি ছেলেটা তাহলে কোন চতুর শিকারি কুকুরের সাহায্যে এই এলাকায় শিকার করে বেড়াচ্ছে? সে রাত্রে 'চার পায়ে' শিকার করার কথা বলেছে, আবার এও বলেছে, যে রাতের বেলা কোন কুকুর তার কাছে ঘেঁষবার সাহস পাবে না। বড়ই রহস্যময় কান্ডকারখানা।

মাসদুয়েক ধরে চলতে থাকা এইসব লুটপাটের কথা ভাবতে ভাবতে আচমকা সে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু মাস আগে কারখানা থেকে বাচ্চাটা চুরি গেছিল- সবাই ভেবেছিল নালার জলে ভেসে গেছে বাচ্চাটা, কিন্তু তার মা হলফ করে বলেছিল যে, ঠিক সেই সময় সে একটা চিৎকারের শব্দ শুনেছিল নালার উল্টো দিকে পাহাড়ের থেকে। ব্যাপারটা একেবারেই অচিন্তনীয়, কিন্তু ছেলেটার দু মাস আগে মানুষের বাচ্চার মাংস খাওয়ার কথাটা ভ্যান চিলের মাথায় ঘুরতে লাগল ক্রমাগত। ছেলেটা এসব না বললেই পারত। এরকম কথা ঠাট্টা করেও বলা উচিৎ নয়।

প্রায় অভ্যাসের বিরুদ্ধেই ভ্যান চিল বাড়িতে জঙ্গলের সেই ছেলেটার কথা কাউকে বলল না। সে যে দু মাস ধরে তার নিজের এস্টেটেই এরকম ক্ষতিকারক একজনকে আশ্রয় দিচ্ছিল তা এলাকার কাউন্সিলর ও বিচারক হিসেবে তার পদমর্যাদাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। তাছাড়া চুরি যাওয়া ভেড়া, মুরগির দামও তো লোকে তার কাছেই চাইতে পারে। অতএব সে রাত্রে তাদের ডিনার অস্বাভাবিকরকম নীরবে সম্পন্ন হল।

"কী রে, কথা বলছিস না কেন?" পিসি তাকে প্রশ্ন করল, "বাঘ দেখেছিস মনে হচ্ছে!"

ভ্যান চিল এই প্রবাদটা আগে কখনও শোনেনি। শুনেও তার খুব বোকাবোকা লাগল, সত্যিই যদি বাঘ দেখে থাকে তাহলে এতক্ষণ এ'রকম চুপ করে থাকার পাত্র সে নয়।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে ভ্যান চিল টের পেল যে গত বিকেলের ঘটনা নিয়ে তার অস্বস্তি পুরোপুরি কাটেনি। সে ঠিক করল সে ট্রেনে করে পাশের শহরে যাবে, সেখানে কানিংহ্যামকে খুঁজে বের করবে ও জিজ্ঞেস করবে সেদিন সেই হিংস্র জন্তুর কথা সে কেন জিজ্ঞেস করেছিল। এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে, সে তার আগের হাসিখুশি মেজাজ কিছুটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হল। গুনগুন করে একটা আনন্দের গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে তার সকালের পাওনা সিগারেটখানা খুঁজতে গেল সে তার বসার ঘরে। ঘরে ঢুকে অবশ্য গানের কলির বদলে গলা থেকে তার ভগবানের নাম বেরিয়ে এল। তার সোফার ওপরে কমনীয়ভাবে গা ছড়িয়ে অতি আরামে শুয়ে রয়েছে গত বিকেলের জঙ্গলের সেই ছেলেটা। আগের চেয়ে তার গা অনেক শুকনো, কিন্তু আর কোন বদল ঘটেনি তার চেহারায়।

"কোন সাহসে তুমি এখানে এসেছ?" ভ্যান চিল রাগে চিৎকার করে উঠল।

"আপনিই তো আমায় জঙ্গলে থাকতে মানা করেছিলেন।" সে ঠান্ডা গলায় উত্তর দিল।

"কিন্তু এখানে আসতে তো বলিনি! আমার পিসি তোমায় দেখলে- " আর সেই মুহূর্তেই পিসি সেই ঘরে ঢুকে পড়ল।

ভ্যান চিল কোনমতে ব্যাপারটাকে ঢাকতে বলল, "আহা রে, বেচারা ছেলেটা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে- আর স্মৃতিও। ও কে, কোত্থেকে এসেছে মনে করতে পারছে না কিছুতেই।" আর পরমুহূর্তেই ছেলেটার মুখের দিকে একবার দেখে নিল পাছে সে তার বন্য চরিত্রের কোন অপ্রত্যাশিত নমুনা দেখিয়ে দেয় পিসিকে। তা অবশ্য হল না, আর এই অনাথ, পথ হারানো ছেলেটিকে, কোন মিষ্টি বিড়ালছানা বা কুকুরছানার মতই মনের আনন্দে কাছে টেনে নিল পিসি। বলে, "ওর জন্য যতটুকু করতে পারি আমরা, করব।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন লোককে পাশের পাদ্রির বাড়িতে পাঠিয়ে সেখানকার অল্পবয়সি এক কর্মচারির বাড়িতে পরার জামাকাপড় নিয়ে আসা হল আর তার সঙ্গে জুতো, কলার, শার্ট – এই সমস্তও। পরিষ্কার ও ভদ্র জামাকাপড় পরিহিত অবস্থায় ছেলেটিকে দেখেও কিন্তু ভ্যান চিলের মনে হল তার ওই অস্বস্তিকারক ব্যাপারটা এক চুলও যায়নি। কিন্তু পিসির তাকে বড়ই মনে ধরল।

"ওর আসল নাম জানা অবধি ওকে একটা সুন্দর নাম দিতে হবে," পিসি বলল, "গ্যাব্রিয়েল- আর্নেস্ট, হ্যাঁ, তাই ভাল। বেশ ঠিকঠাক, সুন্দর নাম।"

ভ্যান চিল সায় দিল বটে কিন্তু মনে মনে তার অস্বস্তিটা রয়েই গেল। বরঞ্চ আরও বেড়ে গেল যখন জানা গেল যে তাদের বৃদ্ধ, শান্ত স্প্যানিয়েলটা ছেলেটা আসা মাত্রই দরজা দিয়ে সটান দৌড় লাগিয়েছিল বাইরের দিকে। সে এখন ঘরে ঢুকতে নারাজ। প্রায় জেদ করেই সে ফলের বাগানের অন্য কোণে বসে কাঁপছে আর কুঁই কুঁই করছে। পোষা ক্যানারি পাখিটা, যে ভ্যান চিলের মতই বাচাল, সেও আজ কয়েকটা ভীত আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বলতে পারছে না। তার ফলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কানিংহ্যামের সাথে কথা বলাটা আরও জরুরি বলে মনে করল ভ্যান চিল।

যখন সে স্টেশনের পথে রওনা দিল তখন পিসি সন্ধেবেলায় তার সানডে স্কুলের শিশু সদস্যদের সঙ্গে গ্যাব্রিয়েল আর্নেস্টের আলাপ করার ব্যাবস্থা করছে।

*******

কানিংহ্যাম প্রথমে কথা বলতে রাজি হচ্ছিল না। বলে, “আমার মা মাথার গন্ডগোলে মারা গেছিলেন। অতএব তুমি বুঝতে পারছো আমি কোন অবাস্তব, অসম্ভব, আজগুবি জিনিস দেখে থাকলেও তা নিয়ে মাথা ঘামাতে একদমই ইচ্ছুক নই।”

“কিন্তু তুমি দেখেছটা কী?” ভ্যান চিল তার পেছনে লেগে রইল।

“আমার যা দেখেছি তা এমনই অবাস্তব যে কোন সুস্থ মানুষ তা দেখে থাকলেও তা কখনও স্বীকারও করবেন না। তোমাদের ওখানে আমার শেষ সন্ধ্যায় আমি ফলের বাগানের ধারে একটা বেশ ঝাঁকড়া ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়া সূর্যাস্তের রঙ দেখছিলাম আকাশের গায়ে। হঠাৎ আমি একটা ছেলেকে খেয়াল করলাম। একটি কিশোর। সদ্যই

স্নান করে উঠেছিল বোধহয়। পাশেই তো পুকুর। পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিল সে। তাকে দেখে পৌরাণিক গল্পের পাতা থেকে উঠে আসা কোন বন্য দেবতার কথা মনে হচ্ছিল আমার। তাই তাকে আমি আমার ছবির মডেল বানাব বলে ঠিক করে ফেললাম। পরমুহূর্তেই হয়তো আমি তাকে ডাকতাম। কিন্তু হঠাৎ করেই সূর্য একেবারে ডুবে গেল, গোলাপি ও কমলার বদলে চারিদিকে তখন সন্ধের কালো ও ছাইরং। আর সেই সঙ্গে আরেকটা আশ্চর্য জিনিস ঘটল। ছেলেটা মিলিয়ে গেল।”

“অ্যাঁ! একেবারে ভ্যানিশ?” ভ্যান চিল উৎসাহিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

“না, আর সেটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার।” উত্তর দিল শিল্পী, “পাহাড়ের ওপর যেখানে ছেলেটা এক মুহূর্ত আগে দাঁড়িয়েছিল সেখানে তার জায়গায় হাজির হল একটা বিশাল বড়ো কালচে রঙের নেকড়ে বাঘ। ঝকঝকে শ্বদন্ত আর নিষ্ঠুর, হলুদ দুটো চোখ। তুমি ভাববে-- ”

কিন্তু চিন্তা করার জন্য আর থেমে থাকল না ভ্যান চিল। সে তখনই হনহন করে স্টেশনের দিকে হাঁটা লাগাল। টেলিগ্রাম করার কোন প্রশ্নই নেই।

গ্যাব্রিয়েল- আর্নেস্ট একটা নেকড়েমানব! এমন কথাটা হঠাৎ কেউ শুনলে ব্যাপারটার গুরুত্ব সে তো বুঝবেই না, বরং হাসবে। পিসি শুনলে হয়তো ভেবে বসবে ভ্যান চিল তার সঙ্গে রহস্য করছে। শুধু একটাই আশা ছিল তার, সে সূর্যাস্তের আগে হয়তো বাড়ি পৌঁছুতে পারবে।

বাড়ির স্টেশনে পৌঁছে সে গাড়িতে করে তাড়াহুড়ো করে রওনা দিল। গ্রামের আঁকাবাঁকা রাস্তা যেন শেষই হয় না। বিরক্ত লাগছিল তার। আর সেইসঙ্গে একটা শিরশিরে ভয় কাজ করছিল বুকের ভেতর। গিয়ে পৌঁছোতে পৌঁছোতে দেখা গেল, সূর্যাস্তের আলোয় চারিদিক রঙিন হয়ে উঠেছে। অবশেষে সন্ধের মুখমুখ যখন সে গিয়ে বাড়ি পৌঁছোল, পিসি তখন টেবিল থেকে না খাওয়া কেক ও জ্যাম বয়ামে ভরে রাখছিল।

“গ্যাব্রিয়েল আর্নেস্ট কোথায়?” সে একরকম চেঁচিয়ে উঠল।

“ও টুপ’দের ছোটো ছেলেটাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেছে।” পিসি বলল, “এত দেরি হয়ে গেল, ভাবলাম বাচ্চাটাকে একা পাঠানোটা নিরাপদ হবে না। সূর্যাস্তটা কী সুন্দর, না?”

সুর্যাস্তের ব্যাপারে অবিদিত না থাকলেও, ভ্যান চিল আর তার সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করতে দাঁড়াল না। যত দ্রুত সম্ভব সে ছুটতে লাগল টুপ’দের বাড়ির দিকে। রাস্তাটার একধারে কারখানার সেই নালা আর অন্যদিকে খাড়া পাহাড়। আকাশে তখনও সূর্যাস্তের লালচে আভার কিছুটা লেগে রয়েছে। এর পরের বাঁকটা নিলেই বাড়িটাকে দেখতে পাওয়া যাবে—

- আর তারপরেই হঠাৎ সমস্ত আলো চলে গিয়ে চারিদিক কালো ও নিষ্প্রাণ হয়ে গেল আর দূর থেকে ভেসে এল ভয়ার্ত এক চিৎকার। ভ্যান চিল ছোটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গ্যাব্রিয়েল- আর্নেস্ট আর টুপ’দের সেই বাচ্চাটাকে আর কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু গ্যাব্রিয়েল- আর্নেস্টের ফেলে দেওয়া জামাকাপড় রাস্তার ধারে পাওয়া গেছিল। অতএব লোকে ভেবেছিল বাচ্চাটা কোনভাবে জলে পড়ে গেছিল ও গ্যাব্রিয়েল আর্নেস্ট তাই জামাকাপড় খুলে রেখে তাকে বাঁচাতে জলে নেমেছিল, কিন্তু পারে নি।

ভ্যান চিল ও আশপাশে কর্মরত কয়েকজন কর্মচারী পরে বলেছিল যে সন্ধে নামার সময় তারা ওখান থেকে আসা একটা বাচ্চার চিৎকার শুনতে পায়। সম্ভবত চিৎকারটা জামাকাপড় যেখানে পাওয়া গেছে সেখানকার আশপাশ থেকেই করা হয়েছিল। টুপ গিন্নীর আরও এগারোখানি সন্তানাদি ছিল, তাই দুঃখ হলেও তিনি তা খুব বেশি দেখাননি। কিন্তু পিসি মনে মনে তার সেই

অনাথ বালকের চলে যাওয়া নিয়ে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর উৎসাহেই এলাকার চার্চে গ্যাব্রিয়েল-আর্নেস্টের নামে একটা পেতলের স্মারক বসানো হয়েছিল। সেটা উৎসর্গ করা হয়েছিল, ‘‘গ্যাব্রিয়েল আর্নেস্টকে, এক অজানা কিশোর, যে অন্যকে বাঁচানোর জন্য সাহসের সাথে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল।’’

ভ্যান চিল অন্য সব কিছুতে পিসির কথা মেনে নিত, কিন্তু গ্যাব্রিয়েল- আর্নেস্টের স্মারকের জন্য পয়সা দেওয়ার বেলায় এক কথায় না বলে দিয়েছিল।

ছবিঃ মৌসুমী

# জামালি কামালি

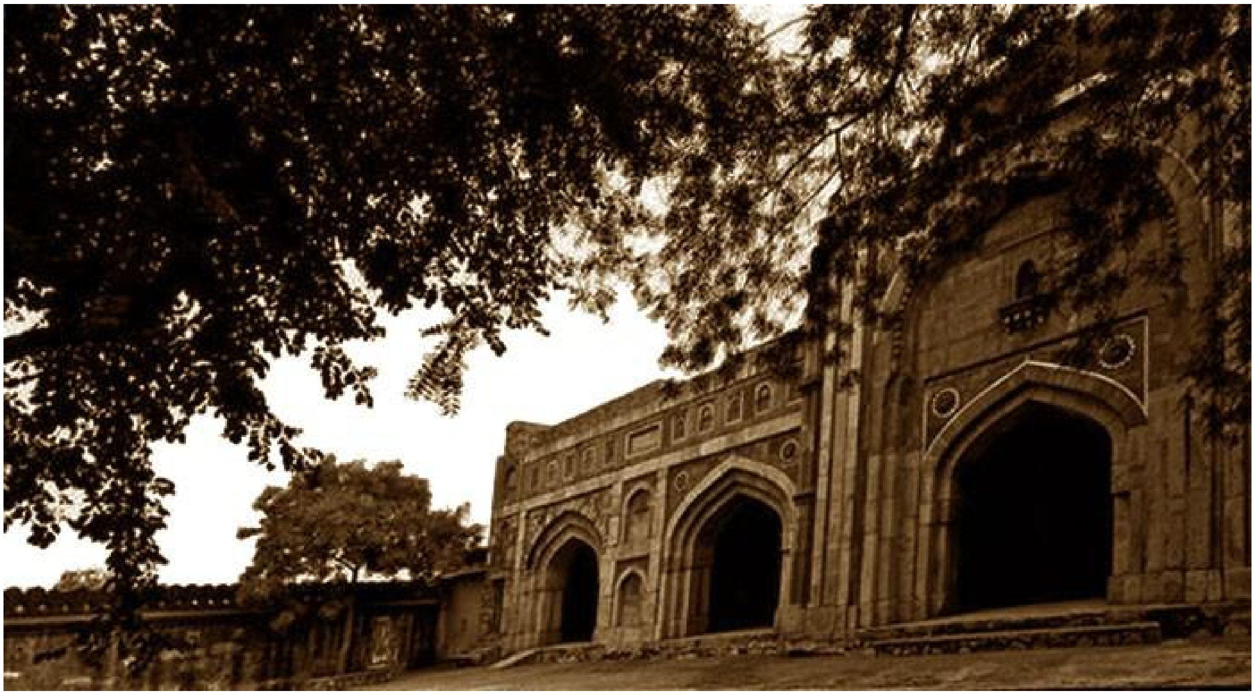

দিল্লিতে থাকো যারা বা যারা কখনো সেখানে বেড়াতে গিয়েছ তারা সবাই প্রায় কুতব মিনারে গেছ নিশ্চয়।

এই কুতব মিনারে ঢোকবার প্রধান দরজাটার থেকে আধা কিলোমিটার হাঁটলেই মেহরৌলি প্রত্ন পার্কে ঢোকবার দরজা। বিরাট বড়ো সাজানো পার্ক। ভেতরে সবুজের সমারোহের মধ্য এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে নানান প্রত্ন নিদর্শন। ঢুকতে পয়সা লাগবে না।

পার্কের একেবারে একটেরেতে একটা পুরোনো , ভাঙা মসজিদ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। বেজায় দুর্দশা তার। খোঁজ করলে জানতে পারবে ১৫২৮ সালে তৈরি এই মসজিদের নাম সেই সময়কার দুই সুফি সন্তের নামে রাখা হয়েছে জামালি- কামালি মসজিদ। জামালি ছিলেন বিখ্যাত কবি। এমন ছিল তাঁর নামডাকের দবদবা যে লোকে বলে স্বয়ং সুলতান সিকন্দর লোদি নাকি নিজের লেখা কবিতা তাঁকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিতেন। ১৫৩৬ সালে হুমায়ুনের সঙ্গে গুজারাত অভিযানে সঙ্গী হয়ে যাবার সময় তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। কামালি ছিলেন তাঁর সঙ্গী, যদিও তাঁর বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেউ বলেন তিনি জামালির স্ত্রী, কেউ বলেন শিষ্য, আবার কেউ বলেন তিনিই আসলে জামালির লেখা কবিতাটবিতার আসল ছায়ালেখক।

এ মসজিদটার ইতিহাসে অনেক গুরুত্ব আছে। যেমন ধরো, অনেকেই অনুমান করেন মুঘল স্থাপত্যের ভিত্তিস্থাপন হয় এই মসজিদ দিয়ে। এখানেই প্রথম ঝরোকা পদ্ধতি চালু করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এ মসজিদটার আরো একটা খ্যাতির বা কুখ্যাতির কারণ রয়েছে। সেটা হলো, এইখানে জিনের বাসা।

জিন ব্যাপারটা জানো ত? উঁহু, ওর মানে মুসলমান ভূত মোটেও নয়। এই ধর্মের মানুষ বলেন, আল্লাহ নাকি দুটো দুনিয়া বানিয়ে তার একটাতে বালি দিয়ে তৈরি মানুষ আর অন্যটাতে আগুন দিয়ে তৈরি জিনদের রাজত্ব দেন। সেই সমান্তরাল জিনজগত থেকে কেউ কেউ এই জগতে মাঝে মাঝে ঢুকে আসে। আমরা তাদের চোখে দেখি না কিন্তু তাদের উপস্থিতি টের পাই।

এই জগতে ঢুকে আসা জিনেরা কেউ কেউ আবার এখান থেকে ফিরে যেতে চায় না। এদের নিয়েই যতো মুশকিল। মাঝরাতে কেউ ভালো দরবারি কানাড়া গাইলে তার পাশে এসে শুয়ে শুয়ে শুনবে, কাউকে দেখে পছন্দ হলে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এমন সব কাণ্ড বাধিয়ে চলবে তারা। এরা থাকবার জন্য বেছে নেয় কোন নির্জন , পরিত্যক্ত জায়গা। সেখানে মানুষের যাতায়াত হলে এরা বিরক্ত হয়।

তা, জামালি কামালি মসজিদ তো বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থাতে পড়েই ছিলো। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া তো এই সেদিন তাকে হাতে নিয়েছে। অতদিন ফাঁকা থাকবার সময় সেখানে বেশ কিছু জিন এসে বাসা করেছে বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। ওর কাছাকাছি এলাকায় গিয়ে খুঁজলে এমন অনেক মানুষ পাবে তুমি যিনি সাক্ষি দেবেন, রাতে ওইখানে অদ্ভুত সব আলো দেখা যায়, শোনা যায় জন্তুর রাগী গলার গরগর শব্দ। সাহসী কেউ কাছাকাছি গেলে দেখেছে কেউ যেন সাঁত করে সরে গেল তার ভাঙা দেয়ালের পাশ দিয়ে, অথবা খলখল করে এক মুহূর্তের জন্য হেসে উঠেই থেমে গেল কেউ।

অন্ধকার হবার পর, কিংবা নির্জন কোন দুপুরে সেখানে গেলে অনেকেরই অনুভূতি হয়েছে যে ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে কেউ হিমেল নিঃশ্বাস ফেলেছে তার ঘাড়ে, কিংবা ঠিক সামনে একটু দূরের কোন পিলারের আড়ালে কেউ দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। ঘাড় ঘোরালেই অবশ্য সব ভোঁ ভাঁ। কিছু মানুষ তো বলেন সেখানে একা একা ঢুকে অদৃশ্য হাতের বজ্র থাপ্পড় খেয়ে মাথামুন্ডু ঘুরে গেছে তাঁদের।

তা, যাবে নাকি একবার ওখানে? বিকেল বিকেল পার্কে ঢুকে সন্ধেটা ওইখানে খানিক বসে দেখে আসতে পারো জিনে ধরে কি না। অবশ্য মসজিদের পাহারাদার তোমায় সন্ধেবেলা সেখানে ঢোকবার পারমিশন দিলে তবে তো!

# চোরাচুন্নি ও ভ্যানটোস

টুপুর

## ভ্যানটোস

রোমানিয়ার মেয়ে ভূত। এদের নাকি কেরামতি হলো ধুলোঝড় তৈরি করায় আর ঝোড়ো হাওয়া বানানোয়। এরা থাকে জলে জঙ্গলে এমনকি হাওয়াতেও। জলে মানে বেশ বড়ো ঝিলে থাকে। অবিশ্বাস্য হলেও এরা কিন্তু ঢাকা দেওয়া গাড়িতে যাতায়াত করে। অবিশ্বাস্য কারণ এরা তো হাওয়াতে থাকে! এরা নাকি বাচ্চাদের আক্রমণ করে। আর এদের হাত থেকে বাঁচতে হলে একমাত্র উপায় হলো “বাতাসের রহস্যময় ঘাস”। তবে কেউ কেউ বলেন এরা নাকি ঈশ্বরের পরিচারক।

**চোরাচুন্নি** হলো চোরের ভূত। সাধারণত যে মেয়েরা চোর ছিল তারা মরে এই ভূত হয়। এরা বেশ পাজি এবং মানুষের অনিষ্ট করার ঝোঁক এদের প্রবল। এদের পছন্দের রাত হলো পূর্ণিমার রাত। সে রাতেই এরা মানুষের বাড়িতে ঢোকে আর যাবতীয় অনিষ্ট করার চেষ্টা করে। ঘরে রাখা শাড়িজামা যা পায় চুরি করে। এদেরকে তাড়াতে গঙ্গাজল লাগে। যেসব এলাকায় এদের উপদ্রব দেখা যায়, সেখানে প্রত্যেক বাড়িতে ঘড়ায় করে গঙ্গাজল রাখা থাকে।

# ভালুকের খপ্পরে

**যখন জঙ্গলে - জঙ্গলে বেড়াতে গেলে জন্তু জানোয়ারের মুখোমুখি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে রকম কিছু মুখোমুখি হবার ঘটনা শুনিয়েছেন অরিন্দম দেবনাথ।**

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বিপদজনক ভয়াবহ পাহাড়ি ঢালটা বেয়ে উঠে, একফালি সমতল জায়গাটায় দাঁড়িয়ে, শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে ভিজিয়ে, শরীরটা বাঁকিয়ে এল এর মত করে, হাঁটুটা দু হাতে ধরে দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল ক্যাথলিন। খাড়াই পথটা ধরে নেমে পা দুটোয় ব্যথা হচ্ছে খুব। কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিল, মায়ের কাছ থেকে সদ্য উপহার পাওয়া কাঁধ থেকে ঝোলান ক্যামেরাটার ওপর। ক্যাথলিন অ্যাডাম আর তার দুই বন্ধু মাদালেইনে ওয়েবার ও মেলিসসা দাভেসের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা প্রদেশের প্যারাডাইস ভ্যালির কিংস ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্কের সুচে ক্রিক ট্রেইল ধরে ট্রেক করছিল। সবার বয়স ১৮র আশেপাশে। হাইস্কুলের গণ্ডি পার হয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে যাবার আগে চুটিয়ে ঘুরে নিচ্ছিল তিনজন।

কয়েক কিলোমিটার হাঁটার পর তারা আধা রাস্তা থেকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ ক্যাথলিনের বিকেল তিনটের সময় আধা সময়ের কাজ পাওয়ার জন্যে একটা ইন্টারভিউ দেবার কথা। পুরো ট্রেলটা ট্রেক করলে ইন্টারভিউ দেবার জন্যে ঠিক সময় পৌঁছনো যাবে না। প্রথম চাকরির ইন্টারভিউ, হাতছাড়া করার কোন ইচ্ছে নেই ক্যাথলিনের।

অদ্ভুত সুন্দর এই প্যারাডাইস ভ্যালি। বরফ ঢাকা পাহাড়, মাছ ভরা নদী, ঘন জঙ্গল, জলপ্রপাত। তারিখ, ২০০৬ এর ৭ জুন। দারুণ আবহাওয়া। রোদ ঝকঝকে আকাশ, ফুরফুরে হাওয়া ... সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চুটিয়ে উপভোগ করেছে ক্যাথলিন। এখন ফেরার পালা।

তিনটি মেয়েই বড় হয়েছে মন্তানাতে।পৃথিবীবিখ্যাত ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে ঢোকার মুখে পড়ে জায়গাটা। আশেপাশে পাহাড়, জঙ্গল, বন্যজন্তু আর হিমবাহ দেখে এরা অভ্যস্ত। তবুও সময় পেলে আশেপাশে একটু অ্যাডভেঞ্চার করে আসতে মুখিয়ে থাকে

ক্যাথলিন। ভালুক আর হরিণ হরবখত দেখে তারা। জানে আচমকা ভালুকের মুখোমুখি পড়ে গেলে পালানোর হরেক কায়দা। জঙ্গল পথে চলতে তাই এরা খুব জোরে কথা বলে, আওয়াজ শুনে ভালুকও ধারেকাছে সচরাচর ঘেঁষে না। তুষারঝড় আর তুষারপাত এখানকার নিত্যসঙ্গী।

সুচে ক্রিক ট্রেল ধরে এর আগেও কয়েকবার ট্রেক করেছে ক্যাথলিন। জঙ্গলপথটি এত মনোরম যে একটু সময় পেলেই কাউকে না কাউকে সঙ্গে জুটিয়ে ক্যাথলিন চলে আসে এখানে। কিন্তু এই প্রথম বার ঘটল দুর্ঘটনাটা।

পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেবার সময় কানে এল জঙ্গলের গাছপালা ভাঙার আওয়াজ। ফুট ৫০ দূরে ওটা কী? 'ওহ ঈশ্বর!' বলে উঠল ক্যাথলিন। চিৎকার করে সতর্ক করল দুই বান্ধবীকে। বিশালদেহী গ্রিজলি ভালুক গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। এত বড় ভালুক আগে কখনো দেখেনি ওরা।

এত সামনে থেকে এত বড় ভালুক দেখার উত্তেজনায় ওরা একটা বড়ো ভুল করে বসল। ক্যামেরা চোখে লাগিয়ে খচাখচ ছবি তুলতে শুরু করল। ওদিকে কিন্তু ভালুকটি ক্যাথলিনদের লক্ষ করে এগিয়ে আসছিল দ্রুত। ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারে ভালুকের মুখচোখের হিংস্র ভাব দেখে ক্যাথলিন বুঝল বিপদ। বন্ধুদের বলল "প্লে ডেড"! তিন বন্ধু মাটির দিকে মুখ করে মাথা হাত দিয়ে আড়াল করে লাইন বেঁধে মড়া মানুষের ভান করে শুয়ে পড়ল, ভালুকটাকে ভয়ঙ্কর বেগে আসতে দেখে চোখ বন্ধ করে খুব ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলো। শরীর যেন একদম না নড়ে। কাছে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ভালুকটা--

. জঙ্গল বন্য জন্তুদের জন্য। মানুষ সেখানে অবাঞ্ছিত। মানুষের জন্যে শহর গ্রাম... থাকার জায়গার অভাব নেই, তবুও মানুষ সেখানে যাবে। কী আর করা যাবে। জঙ্গলে যেতে গেলে কতগুলো কথা যদি আমরা মনে রাখি, তা হলে কিন্তু অনেকটাই বিপদ এড়ানো যায়। বিশেষত যদি জেনে যাই যেখানে যাচ্ছি সেখানে বন্যজন্তুর সাথে মোকাবিলা হবার সম্ভাবনা প্রবল। কী করব, আর কী করব না এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে, কী কারণে যাচ্ছি তার ওপরে। তবে জঙ্গলে কোন কারণে জন্তুজানোয়ারের মুখোমুখি হলে একটা আপ্তবাক্য মনে রাখা উচিৎ।

বন্যজন্তু আর মানুষের সাথে দূরত্ব, wildlife plus distance equals safety, এটা যত বেশি বিপদের সম্ভাবনা তত কম। কোন জন্তু বিপদের আঁচ না পেলে সহজে আক্রমণ করে না। আর সব জন্তুই মানুষের থেকে দূরে থাকতে চায়। আর সেই জন্যে জঙ্গলে জন্তুর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে,বিশেষজ্ঞরা বলেন জোরে কথা বলুন, হাল্কা পারফিউম ব্যবহার করুন। এতে করে মানুষের উপস্থিতি টের পেলে, জন্তুজানোয়ার সাধারণত দূরে সরে যায়। তা সত্ত্বেও মানুষের সাথে জন্তুর সংঘর্ষ ঘটে। অধিকাংশ সময় দেখা যায় , যখন সংঘর্ষ হয়ে ছিল , তখন বড় জন্তুর সাথে বাচ্চা ছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ ক্ষেত্রে বুনো জন্তু যদি আক্রমণ করে তবে বুঝতে হবে বাচ্চাকে রক্ষা করার জন্যে জানোয়ারটি আক্রমণ করেছিল। একবার এই প্রতিবেদক হাতির খপ্পরে পড়েছিল কয়েকজন সঙ্গীর সাথে। জঙ্গল পথে হাঁটতে হাঁটতে একদম সামনাসামনি হাতির মুখোমুখি। হাতিটা জঙ্গলের মাঝে এক পাহাড়ের ঢালের পাশে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। অনেক দিন আগের ঘটনা। তখন ডিজিটাল ক্যামেরা আসেনি। একটু পরে একটা ছোট্ট হাতি শিশু এসে বড়ো হাতির পায়ের মাঝে দাঁড়িয়ে খুনসুটি করতে শুরু করল। ফুট ৫০ দূরে দাঁড়িয়ে অনেক ছবি তোলার পর ফিল্ম শেষ, অন্ধকার নেমে আসছিল দ্রুত। হাতিটাকে তাড়াবার জন্যে মুখ দিয়ে আওয়াজ করেছিলাম। ফল হয়ে ছিল খুব খারাপ। আরও বেশ কয়েকটা হাতি ছিল আশেপাশে বড়ো বড়ো গাছের আড়ালে, যেটা আমরা টের পাইনি। আমাদের আওয়াজ কানে যেতে হুড়মুড় করে গাছ পালা ভেঙে আমাদের দিকে তেড়ে আসে অনেকগুলো হাতি। তাদের কয়েকটা বাচ্চাটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমরা পাহাড়ি ঢাল বেয়ে প্রায় গড়িয়ে নেমে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচি। হাতি ঢাল বেয়ে দ্রুত নামতে পারে না সেটাই বাঁচোয়া ছিল, আর আমরা এটা জানতাম।

বুনো জন্তুর উপস্থিতি টের পেলে সবার আগে যেটা করা উচিৎ তা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়া । শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞরা জানেন কী করে নিরাপদে বুনো জন্তুর কাছাকাছি থেকে তাকে দেখা উচিৎ। কিন্তু সাধারণ পর্যটকরা তো আর বিশেষজ্ঞ নন, অধিকাংশ সময় তাঁরা অতি উৎসাহে চলে যান বুনো জন্তুর কাছাকাছি। বিপদটা আসে তখনই।

অনেক সময় দেখা গেছে যে পর্যটকরা যেচে বিপদ ঘটিয়েছেন। ভালুককে দূর থেকে চরতে দেখে যেচে এগিয়ে গেছেন কাছে, হয় ছবি তুলতে অথবা খাবার দিতে, ফলে যা হবার তাই হয়েছে , ভালুকের আঁচড়ে মৃত্যু অথবা নাক কান ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ওয়াইল্ডলাইফ পার্কগুলোতে সব জায়গায় নোটিশ লাগানো থাকে বুনো জন্তুদের বিরক্ত না করতে অথবা কাছে না যেতে, এমন কি পর্যটকদের কী করা উচিৎ তাও বলা থাকে। তবুও দুর্ঘটনা ঘটে প্রায়শই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি উৎসাহ দুর্ঘটনার মূল। বলগা হরিণ, বাইসন ,হাতি, ভালুক ... সব দুর্ঘটনার পিছনে দেখা গেছে ওই একই কারণ। অতি উৎসাহ।

শুধু কি অতি উৎসাহ? অনেকসময় অনেক অভিজ্ঞ লোকও মারাত্মক ভুল করে বসে। যেরকম ঘটেছিল একবার চিড়িয়াখানা বিশেষজ্ঞ তথা দূরদর্শনে বন্য প্রাণী বিষয়ক অনুষ্ঠান সঞ্চালক জ্যাক হান্নার সাথে। জ্যাক যখনি কোন বন্য প্রকৃতির মাঝে যায়, তখন প্রস্তুত হয়ে যায়। সঙ্গে বিয়ার স্প্রে অন্তত থাকবেই। বিয়ার স্প্রে হল, কৌটো ভর্তি গোলমরিচের গুঁড়ো। অনেকটা আমাদের বডি স্প্রের মত। কৌটোর ওপরের বোতামে চাপ দিলে গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে চার দিকে। আর একবার তা চোখে মুখে গেলে আর দেখতে হবে না। সে মানুষ বা জন্তু যাই হক না কেন !

জ্যাক ও তার স্ত্রী সুজি একবার গ্রিনেল গ্লেসিয়ার ট্রেল হেড থেকে গ্রিনেল আসছিল। রওনা হতে একটু দেরি হয়ে গেছিল। ভালুক অধ্যুষিত অঞ্চলে, এই পড়ন্ত বেলায় এতটা হাঁটাপথের ঝুঁকি সাধারণত কেউ নেয় না। নেয়া উচিতও নয়। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গ্রিনেল পৌঁছে আধঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল জ্যাকরা। ওদের বিগফর্ক- এ একটা বাড়ি আছে। একটু এগোতেই দেখে একটি তরুণী দৌড়ে দৌড়ে আসছে, আর তার

পিছনে আরও কয়েক জন – সামনে ভালুকের একখানা দল। পালাও পালাও...

যে জায়গায় ঘটনাটা ঘটছিল সেটা সত্যিই খটোমটো জায়গা। জায়গাটা পাহাড়ের একটি বাঁক। তার একদিকে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল আর অন্যদিকে প্রায় পাঁচশো ফুট গভীর খাদ। পালানোর জায়গা নেই। অভিজ্ঞ জ্যাক জানে পাহাড়ের এ'রকম বাঁকে দৌড়ে পালানো যাবে না। একটু এদিকওদিক হলে অন্যরকম বিপদ ঘটবে। সে সব্বাইকে নিয়ে পাহাড়ের দেওয়ালের পাথরে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। “--- সব একদম চুপ করে থাকবে। নিঃশ্বাসও যেন না পড়ে,” জ্যাক ফিশফিশ করে বলল। সে জানে ভালুকের দল এগিয়ে যাবে কোন দিকে না তাকিয়ে।

সব হিসাব ঠিকই ছিল। মা ভালুকের পিছন পিছন তার ছানাপোনা দিব্যি হেঁটে চলে গেল, ঘুরেও দেখল না যে পাঁচপাঁচটা মানুষ পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু গোল বাধাল জ্যাক এর বৌ সুজি। একদম নাকের ডগা দিয়ে বিশালদেহী গ্রিজলি ভালুক ছানাপোনা নিয়ে চলে যাবে আর একটা ছবি থাকবে না! ক্যামেরা বের করে ক্লিক ক্লিক ...

-- আওয়াজ পেতে একটা ভালুকছানা দাঁড়িয়ে পড়লো, জুলজুল করে তাকাতে লাগলো এদিক ওদিক। মা ভালুক পিছনে বাচ্চা দাঁড়িয়ে পড়েছে টের পেয়ে ঘুরে দেখে

পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে কয়েকটা মানুষ। আর যায় কোথায়! বাচ্চা দুটোকে পেছনে আড়াল

করে তেড়ে এল জ্যাকদের দিকে।

“সর্বনাশ করেছে,” চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক, “কেউ নড়ো না,”

পকেট থেকে বের করে বিয়ার স্প্রের ঢাকনা খুলে, বোতামে চাপ দিল জ্যাক। ছিটকে বের হল এক ক্যান গোলমরিচের গুঁড়ো। কাজ হল না। আর একটাও ক্যান ছিল জ্যাকের কাছে, ভালুক তখন চলে এসেছে ১০ ফুটের মধ্যে, দ্বিতীয় ক্যানটাও স্প্রে করল জ্যাক। এবারে কাজ হল। রণে ভঙ্গ দিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে পালিয়ে গেল ভালুক মা। জ্যাক পরে এক ইন্টারভিউতে বলেছিল, সুজি ওইরকম মারাত্মক একটা ভুল কী করে করেছিল তার কোন ব্যাখ্যা নেই, আসলে এইগুলোই হল  অ্যাকসিডেন্ট। জানোয়ারকে তার চলার জায়গা ছাড়তেই হবে আর সেই পথে কোন বিঘ্ন ঘটলে সে আঘাত হানবে, এটাই স্বাভাবিক।

গোড়ার গল্পে ফেরা যাক। কী হয়েছিল ক্যাথলিন অ্যাডাম আর তার দুই বন্ধু মাদালেইনে ওয়েবার ও মেলিসসা দাভেজের? গ্রিজলি ভালুকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজন মেয়ের ওপর, মেয়েগুলো মরার মতো শুয়ে, ভালুকটা খানিকটা তিনজনকে শুঁকে খানিক আঁচড়ে খানিক চিৎকার করে চলে গেছিল। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক মরার মতো পড়ে থেকে তারপর আতঙ্কিত তিনজন মাটি ছেড়ে ওঠে। খানিক হাত পা নেড়েচেড়ে বিশ্বাস করতে পারে না যে ভালুকটা কেবল আঁচড়ে খানিক জামাকাপড় ছিঁড়ে চলে গেছে। প্রায় দু ঘণ্টা ধরে মড়ার অভিনয় করতে হয়েছে তাদের। ভালুকের উৎকট গন্ধে বমি হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, সেই বমি প্রায় গিলে নিতে হয়েছে। দু ঘণ্টা ধরে এরা এই আতঙ্কে ছিল যে  ভালুকটা বোধহয় এই আবার ফিরে এল, কল্পনায় দেখেছে ওদের স্কুলে ওদের স্মরণসভা হচ্ছে, বাবা মা, বন্ধুরা

কাঁদছে, কাগজে ওদের ছবি বেরিয়েছে – ভালুকের আক্রমণে নিহত তিন কিশোরী। তৃষ্ণার্ত, বিধ্বস্ত, আতঙ্কিত অবস্থায় কোনোরকমে এরা জঙ্গলপথ পার হয়ে নিজেদের গাড়ির কাছে পৌঁছয়।

ওহো, বলতে ভুলেছি। ক্যাথলিন চাকরিটাও  পেয়েছিল!

ভাষা শেখবার আসর

# বোম ফেলেছে জাপানি!

দোয়েল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

এইরে! কী মুশকিল! লেখার শুরুতেই নাম দেখে ঘাবড়ে একসা হয়ে ভাবছ এই বুঝি ঘাড়ের কাছে দুম করে একখানা বোম পড়ল?

না রে বাপু। এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ হচ্ছে ভাষার বোম...অনেকটা ওই ঠাসঠাস শুনে খটকা লাগার মত। ব্যাপারটা হচ্ছে, জাপানি একটি অতি মজার ভাষা। আর সেই মজার ফুলঝুরিতে তোমাদের মনে রোশনাই করতেই আমার এত কেরামতি।

জাপানি ভাষার কিন্তু একটি বেশ জমজমাট পোশাকি নাম আছে। আসলে এটাকে বলা হয় "নিহঙ্গো (Nihongo) "। আরে বাবা তাতো হবেই। জাপান দেশটার আসল নামটাই যে নিপ্পন বা নিহন। আর 'গো' (go) মানে জাপানিতে হল ভাষা। এই দুয়ে মিলেই হল নিহঙ্গো।

বলার সময় যাই বলা হোক না কেন লেখার সময় কিন্তু জাপানিরা ভারী সেয়ানা। তখন তারা তিন ধরনের লিপি ব্যাবহার করে। যেমন হিরাগানা, কাতাকানা ও কাঞ্জি।

ওই দেখ! কঠিন- কঠিন শব্দ শুনে ভয়েই গেল। হিরাগানা হল জাপানিদের আসল লিপি। কিন্তু কাতাকানা হল বিদেশী শব্দ লেখার জন্য। যেমন ধরো আমি বলতে চাইছি, "আমি টাই পরি না।"

এখানে টাই শব্দটা হবে কাতাকানা শব্দ। কারণ টাই বা tie জাপানি সংস্কৃতির অংশ নয়। ঠিক সেরকম ভাবেই জাপান দেশের বাসিন্দা ছাড়া প্রত্যেক দেশের বাসিন্দাদের নাম কাতাকানাতেই হবে। এই যে কোনও এক মিষ্টি ছোট্ট বন্ধুর নাম কোয়েল, কাতাকানা লিপি আর জাপানি ভাষায় তার নাম হয়ে যাবে কোয়েরু! তা, কোয়েল এর 'ল' কোথায় গেল? তোমাদের চুপিচুপি বলে রাখি জাপানি লিপিতে কোনও 'ল' নেই। তাই তো লণ্ডন হয়ে যায় রনদন, লিবিয়া হয় রিবিয়া! মানে ওই রুমালের বিড়াল হওয়ার মত ব্যাপার আর কী!

## কাঞ্জি

তাহলে বাকি থাকল কাঞ্জি (kanzi) লিপি। এ হচ্ছে জাপানিদের শখের লিপি। কারণ কাঞ্জি বা হাঞ্জি(চিনা ভাষায়) সেই সুদূর চীন দেশ থেকে আমদানি করা। ব্যাপারটা হচ্ছে কাঞ্জি আসলে পিকটোগ্রাফিক লিপি অর্থাৎ ছবির মত শব্দ। অনেকটা মিশরের হায়ারোগ্লিফিক্স- এর মত। এমন কোনও মাথার দিব্যি দেওয়া নেই যে কাঞ্জি তোমাকে লিখতেই হবে। কিন্তু তাও জাপানিরা দিব্যি সেগুলো লেখে। ওই যে বললুম শখের লিপি। তাদের ইচ্ছে হয় তাই লেখে তাতে আমাদের কী! নদী, পাহাড়, গ্রন্থাগার, ফুল, পাতা সব মিলিয়ে এরকম প্রায় সাড়ে তিন হাজার শব্দের কাঞ্জি আছে। সেগুলো মনে রাখা ভারী গোলমেলে ব্যাপার। কারণ ভুল কাঞ্জি লিখলে তার মানেও বদলে গিয়ে সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড!

তবে এরকম মজার মজার কাণ্ড জাপানি ভাষায় আকছার হয়েই থাকে। জাপানকে যে সূর্যোদয়ের দেশ বা land of the rising sun বলা হয় সেটা তো তোমরা জানো। এই সান শব্দ কিন্তু জাপানি কৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। জাপানি বলতে গেলে অন্তত পঞ্চাশ বার সান বলতে হয়!

কেন?

ইসস...! সব কি এখনই বলে দেব নাকি? সান নিয়ে শাণ দেব পরের পর্বে। এখন তবে সায়োনারা!

অমিত দেবনাথ

হ্যামারস্মিথ থেকে আলেকজান্ড্রা প্যালেস যাওয়ার জন্য, ছুটি কাটাতেই অবশ্য, একটা বড়োসড়ো ঢাকাঢুকি দেওয়া ঘোড়ার গাড়ি নেওয়াই ঠিক করলাম। কারণ আকাশের ভাবসাব দেখে দিনটা বিশেষ সুবিধের যাবে বলে মনে হচ্ছিল না, আর ভিজে একশা হয়ে ছুটি কাটানো শুরু করাটাও কোন কাজের কথা নয়। বিশেষত যখন কদিন আগেই ফ্যানি হুপিং কাশি থেকে উঠেছে। কিন্তু যখন দেখলাম আমার স্ত্রী, তার বোন, টমি, ফ্যানি, জ্যাক সবাই মিলে ভেতরটা একেবারে গাদাগাদি হয়ে গেছে, তখন আমাকে জন গিলপারের গল্পটা মনে রেখেও, রেনকোটটা নিয়ে কোচোয়ানের পাশে বসতেই হল।

আমার বরাবরের ধারণা লন্ডনের কোচোয়ানরা হল মনুষ্যপ্রজাতির মধ্যে চতুরতম। কিন্তু এই কোচোয়ানকে দেখে মনে হল ও তার মধ্যেও আরেক কাঠি ওপরে। প্রৌঢ় মানুষ। প্রশান্ত মুখে পরিপক্কতার ছাপ। একজোড়া সাদা গোঁফ। আমি আড্ডা মারতে পছন্দ করি। কাজেই আমি এর সঙ্গে সেই চেষ্টা করতে গেলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় হুঁ হাঁ ছাড়া এর মুখ দিয়ে আর বিশেষ কিছু বেরোতেই চাইছিল না, যতক্ষণ না আমি ওকে একটু জিন দিয়ে আপ্যায়িত করলাম। দেখলাম এতে ও চট করে পথে এসে গেল। কথা বেরোতে লাগল ফুরফুরে মেজাজে।

“তা স্যার, এই গাড়ি থেকে রোজগার আমার ভালোই হয়,” আমার কী একটা কথার জবাবে বলল সে, “গাড়িটা দেখুন একবার! এ কি অন্য গাড়ির মত এলিতেলি গাড়ি নাকি? ওসব গাড়ি বাচ্চা ছেলেও চালাতে পারে। আমার এই গাড়ি হল দস্তুরমত ভদ্দরলোকের গাড়ি, এ গাড়ি যে চালায় সে ও ভদ্রলোক। আমি তো বলব স্যার, পয়সা দিয়ে লোকের বিচার হয় না, তা সে লোক যাই করুক না কেন।”

“সে তো ঠিকই!” আমি বললাম।

"কিছু পয়সাকড়ি জমিয়েছি স্যার। অনেক বয়সও হয়েছে আমার, এ বয়সে আর নতুন কিছু করা যায় না, আর করবও না। এই কাজ দিয়ে কাজ শুরু করেছি। এই দিয়ে শেষও করব। বললে হয়ত বিশ্বাস করবেন না, এ লাইনে আমার সাতচল্লিশ বছর হয়েও গেল।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ স্যার, আমাদের লাইনে ওটা অনেক সময়," বলল সে, "আর কোন কাজেই এত খাটুনি নেই, সে বৃষ্টিই হোক বা ঠান্ডা বা মাঝরাত। এই গাধার খাটুনির জন্য এ লাইনে কেউ বেশিদিন টেঁকে না।"

"তা হলে তো তোমার নিশ্চয়ই বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে?"আমি বললাম,"নানা ধরনের লোক গাড়িতে ওঠে তো!"

"অভিজ্ঞতা!" ঘোড়াটাকে এক ঘা চাবুক কষিয়ে বলল সে, "এত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমি এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এ জীবনে যে কত কিছুই দেখলাম! এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত।"

"মৃত্যু!" আমি বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ স্যার, মৃত্যু," সে বলল, "আমি যা দেখেছি, তা যদি লিখতে পারতাম! তবে তা লন্ডনের কেউ বিশ্বাস করত কিনা সন্দেহ। অবশ্য কিছু গাড়োয়ানের কথা আলাদা। একবার আমি মাঝরাত্তিরে একটা মড়া ভাড়া নিয়ে গেছিলাম। চমকাবেন না স্যার, এটা সেই গাড়ি নয়।"

"ব্যাপারটা কী হয়েছিল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। গল্প শোনবার লোভে খুশি হলেও ভাবছিলাম মাটিলডা নিশ্চয়ই কিছু শুনতে পাবে না।

"অনেকদিন আগের ব্যাপার স্যার," ড্রাইভার খানিকটা কুচকুচে কালো তামাক মুখে পুরে বলল, "বছর কুড়ি তো হবেই, তবে এ ঘটনা মন থেকে মুছে যাওয়ার নয়। একদিন, তখন অনেক রাত হয়েছে, আর সে দিনটায় আমার রোজগারপাতিও বিশেষ হয়নি-- এত রাত্তিরে, থিয়েটার ভাঙার পরে স্ট্র্যান্ডের ধারে রাত একটা নাগাদ খানিকক্ষণ গাড়ি চালিয়েও একটা আঠেরো পেনির বেশি ভাড়া পাইনি, তাই যখন ভাবছিলাম বাড়ি ফিরে যাব, তখন হঠাৎ করেই আমার মনে হল আরো খানিকটা ঘুরে যাওয়া যাক, দেখা যাক আর কিছু হয় কিনা।

খানিকক্ষণ বাদেই আমি এক ভদ্রলোককে অক্সফোর্ড রোড অবধি ছেড়ে দিলাম। তারপর সেন্ট জন উড দিয়ে বাড়ির দিকে চললাম। তখন রাত দেড়টা হবে। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি নামবে নামবে করছে। ক্লান্ত ঘোড়াটাকে দিয়ে যত জোরে পারা যায় গাড়ি ছোটাচ্ছিলাম, কারণ দুজনেরই খিদে পেয়েছিল যথেষ্ট। ঠিক তখনই শুনলাম এক মহিলার গলা। রাস্তার পাশ থেকে আমাকে ডাকছে। ঘুরে তাকিয়ে দেখি, রাস্তাটা যেখানে একেবারে অন্ধকার হয়ে আছে সেখানে দুই ভদ্রমহিলা -- হ্যাঁ স্যার, দুই খাঁটি ভদ্রমহিলা-- অন্ধকার হলেও দেখতে আমার ভুল হয়নি-- দাঁড়িয়ে আছে। একজন বয়স্ক আর দশাশই, আরেকজন কমবয়েসি, মুখে একটা বোরখা ঢাকা। তাদের দুজনের মাঝখানে ইভনিং ড্রেস পরা এক ভদ্রলোক একটা ল্যাম্পপোস্টে ঠেসান দিয়ে রয়েছে আর দুজন দুদিক থেকে তাকে ধরে আছে। দেখে মনে হল নিজে থেকে দাঁড়িয়ে থাকার কোন ক্ষমতাই ওর নেই। কারণ মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েছে। যেন ওরা ছেড়ে দিলে সে পড়ে যাবে ধপ করে।

"'কোচোয়ান,' দশাশই মহিলাটি খুব কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, 'খুব বিপদে পড়েছি, আশা করি তুমি সাহায্য করবে।' গলা শুনেই মনে হল এর মধ্যে অনেক কিছু লুকোন আছে।

‘নিশ্চই ম্যাম,’ আমি বললাম, কারণ বুঝতে পারছিলাম বেশ কিছু মালকড়ি আসার সম্ভাবনা আছে। ‘এই তরুণী আর আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন।’ তরুণী মহিলা যে ফোঁপাচ্ছিল, সেটা তার বোরখার আড়াল থেকেও বোঝা যাচ্ছিল।

“ ‘কোচয়ান,’ মহিলা বলল, ‘এই ভদ্রলোক আমার ভগ্নীপতি। ওরা সদ্য বিয়ে করেছে। আমরা কাছাকাছি এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিলাম। কিন্তু ভগ্নীপতি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমরা একটা গাড়ির খোঁজ করছি যাতে ওকে বাড়ি পাঠানো যায়। এ অবস্থায় তো ওখানে যাওয়া যায় না! তুমি যদি ওকে বাড়ি পৌঁছে দাও, তাহলে খুব ভাল হয়। আমরাও তাহলে বন্ধুর বাড়ি যেতে পারি।’

“আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নেই। তবে আমি রাজি হয়ে গেলাম, আর বলতে না বলতেই ওরা দুজনে মিলে গাড়ির দরজা খুলে লোকটাকে ভেতরে পুরে দিল। আমি হাত না লাগাতেই।

“‘কোথায় যাব?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“‘সাতচল্লিশ অরেঞ্জ গ্রোভ, ক্ল্যাপহাম,’ বলল মহিলা, ‘এর নাম হফম্যান। চাকরদের ডেকে তুলে নিয়ো ঘুম থেকে।’

“‘ভাড়া কত দেবেন?’ আমি জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, কারণ নিয়ে যাওয়ার পর তালেগোলে যদি ভাড়া না পাই!

“ ‘এই নাও,’ বলে তরুণী মহিলাটি আমার হাতে যেটা গুঁজে দিল আমার মনে হল সেটা একটা সভরিন আর সেটা দেওয়ার সময় আমার হাতে এমন একটা চাপ দিল, যাতে মনে হল আমি যেখানে খুশি যেতে পারি, শুধু এই উৎপাত থেকে মুক্তি পেলেই ও খুশি।

“যাই হোক, আমি তো রওনা হলাম। ওরা দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। ঘোড়া ছোটাতে ভাল রকম চাবুক কষাতে হল। শেষ অবধি ঠিকানাটা খুঁজে পাওয়া গেল। বাড়িটা বড়োসড়ো, আর একেবারে নিস্তব্ধ। অত রাত্তিরে তো তাই হবে, বুঝতেই পারছেন। বেল বাজাতে বাজাতে শেষ অবধি একটা চাকর নেমে এল।

“‘মালিককে নিয়ে এসেছি,’ আমি বললাম।

“ ‘কাকে?’

“ ‘তোমার মালিক- মিঃ হফম্যানকে,উনি গাড়িতে আছেন, শরীরটা খারাপ। এটা সাতচল্লিশ নম্বর তো?’

“ ‘সাতচল্লিশ নম্বর ঠিকই আছে, কিন্তু আমার মালিকের নাম ক্যাপটেন রিচি আর উনি এখন ভারতে আছেন। তোমার ভুল হয়েছে।’

“ ‘কিন্তু ওরা তো ওই নম্বরটাই বলল,’ আমি বললাম, ‘আচ্ছা, এখন হয়তো ওঁর জ্ঞান ফিরেছে, উনি আমাদের হয়তো কিছু বলতে পারবেন। ঘন্টাখানেক আগে মদ খেয়ে ওঁর হুঁশ ছিল না।’

“আমরা দুজনে মিলে গাড়ির দরজাটা খুলতেই লোকটা ভেতর থেকে হড়াশ করে বাইরে এসে মাটিতে পড়ে গেল।

“ ‘উঠুন স্যার,’ আমি জোর গলায় বললাম, ‘আপনার ঠিকানাটা বলুন।’

“সে কোন উওর দিল না।

“আমি তাকে ঝাঁকালাম, ‘জাগুন স্যার,আপনার নাম ঠিকানা বলুন।’

“যথারীতি কোন উত্তর নেই। এমনকি কোন শ্বাস- প্রশ্বাসের আওয়াজও পাচ্ছিলাম না। আচমকাই আমার কী মনে হল, হাত বাড়িয়ে তার মুখে হাত বোলালাম। একেবারে ঠান্ডা সীসের মত।

“ ‘এ তো মরে গেছে,’ আমি বললাম।

“চাকরটা একটা দেশলাই জ্বালাতে আমরা দুজনে মিলে লোকটাকে দেখলাম। কমবয়সী এক যুবক। সুর্দশন, কিন্তু তার মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ, মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে। নিশ্চিতভাবে মারা গেছে তবে অনেকক্ষণ আগে।

“ ‘এখন কী হবে?’ চাকরটা বলল। দেখলাম তার মুখ সাদা হয়ে গেছে, ভয়ের চোটে মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে।

“ ‘আমি এখনই থানার যাব,’ আমি বললাম, আর গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম সেদিকেই। চাকরটা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। সেই আমার তাকে শেষ দেখা।

“এ ব্যাপারে আর কিছু শোননি নিশ্চয়ই?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“শুনিনি আবার! ডাক্তার বলেছিল গাড়িতে তোলার সময়ই সে মরে গেছিল। ইনকোয়েস্টের ঠিক আগে আবিষ্কার হল গলার একপাশে চারটে ছোট ছোট নীলচে দাগ, অন্যপাশে আরো চারটে। বলা হল যে, কোন মহিলার হাতই গলায় ওভাবে ফিট করতে পারে, কাজেই বোঝা গেল এটা একটা পরিকল্পিত খুন। কিন্তু ভাবুন স্যার , গোটা ব্যাপারাটা ওরা এমনভাবে করেছিল যে ওরা মানে ঐ মহিলারা যে কারা সেটা ধরাই গেল না, লোকটা কে সেটাও বোঝা গেল না, কারণ ওকে চেনার মত সব কিছুই ওরা ওর পকেট থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। পুলিশ একেবারে বোকা বনে গেছিল। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, ভাগ্যিস ভাড়াটা আগে নিয়ে নিয়েছিলাম, না হলে তো ওটাও যেত।”

এই সময় আমার বন্ধু ড্রাইভারের গলাটা একটু ঘড়ঘড়ে হয়ে গেল, আর গাড়ির গতিটা হঠাৎ সে খুবই কমিয়ে দিল। একটা বিরাট বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন। ভাবলাম ওকে আরেক পাত্র জিন খাওয়ানো যাক। বলতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। ভেতরে মহিলাদের কাছেও খনিকটা ওয়াইন ছিল। আমিও ভাবলাম একচুমুক জিন খাওয়ার কথা । কাজেই বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠা গেল।

।২।

"পুলিশ আর আমাতে বেশ মিশ খেয়ে গেছিল,"বলল আমার ড্রাইভার পুরোনো স্মৃতি ঘাঁটতে ঘাঁটতে, "আমার সেরা খদ্দেরকে তারা একবার ধরেছিল, আর কটা দিন ওভাবে চালাতে পারলে বড়োলোক হয়ে যেতাম স্যার।"

এই সময়, ড্রাইভার একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে আবহাওয়া নিয়ে মন্তব্য শুরু করল। আসলে ও বুঝতে পারছিল আমি আগ্রহ নিয়ে ওর কথা শুনছি, তাই একটু দর বাড়ালো আরকি।

"তোমার খদ্দের আর পুলিশের গল্পটা কী?"আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সেরকম কিছু নয়," বলল সে আবার কাহিনীতে ফিরে এসে।

"একদিন সকালে আমি ভক্সহল ব্রিজ দিয়ে যাচ্ছি,শুনি একটা লোক,বুড়ো মত, সামনে ঝোঁকা, চশমা পরা, হাতে একটা বিরাট চামড়ার ব্যাগ,মিডলসেক্সের দিকে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে।

" 'আমাকে একটু ঘোরাতে পারবে হে?' বলল সে, 'তোমার যেদিকে খুশি, শুধু বেশি জোরে যেও না, হাড়গোড় ভাঙবে তাহলে এই বুড়ো বয়সে,' বলেই সে তড়াক করে গাড়িতে উঠে জানালাগুলো বন্ধ করে দিল। আমিও গাড়ি চালাতে লাগলাম তিন ঘন্টা ধরে। যতক্ষণ না সে বলল যথেষ্ট হয়েছে। তারপর সে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে হাতে সেই বিশাল ব্যাগটা ধরে।

" 'শোন হে,' বলল সে আমায় ভাড়াটা দিয়ে।

" 'হ্যাঁ স্যার,' মাথায় টুপিটা ছুঁয়ে আমি বললাম।

" 'তোমাকে তো বেশ ভালোই মনে হচ্ছে, অন্যগুলোর মত অত হুড়ুম হুড়ুম করে গাড়ি চালাও না। তাহলে তো তোমাকে এই কাজটা দেওয়াই যায়। ডাক্তার রোজ আমাকে এইরকম ব্যায়াম করতে বলেছে। আমাকে রোজ এইখান থেকেই তুলবে।'

"যাই হোক, কথাটা হল যে তারপর থেকে লোকটাকে আমি সেই জায়গা থেকে রোজই গাড়িতে তুলতাম, হাতে সেই বিরাট কালো ব্যাগ,তারপর তিনঘন্টা ঘোরার পর আমাকে ভালো রকম ভাড়া দিয়ে নেমে যেত লোকটা। চারমাস ধরে এই কান্ড চলল, একদিনের জন্যও কামাই হয়নি। মোটা আমদানি হওয়ার ফলে আমি নতুন বাসায় উঠে গেলাম, ঘোড়ার জন্য নতুন সাজও কিনে ফেললাম। অবশ্য আমি এটা বলব না যে লোকটার ওই ডাক্তারের পরামর্শে গাড়িতে গরমের দিনেও জানালা বন্ধ করে বসে থাকার গল্পটাতে আমি বিশ্বাস করেছি। কিন্তু বেশি কৌতুহল ভাল নয় জেনেই, এর পেছনের গল্পটাতে আমি নাক গলাতে যাইনি। একদিন সারা সকাল ঘোরার পর- তখন আমি একই রাস্তাতেই ঘুরতাম- যখন লোকটাকে নামাতে যাচ্ছি, দেখলাম একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, হাবভাব এমন যেন সে বড়ো কোন একটা কাজ করতে যাচ্ছে। আর দরজা খুলে ব্যাগ হাতে লোকটা লাফ দিয়ে নেমেই একেবারে সোজা কনস্টেবলের হাতে।

" 'তোমায় গ্রেপ্তার করলাম, জন ম্যালোন,' বলল পুলিশটা।

" 'কীসের জন্য?' লোকটা ঠান্ডা গলায় বলল।

" 'নোট জাল করার জন্য,' বলল কনস্টেবল।

“ ‘যা, খেলা শেষ,’ চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, তারপর সে তার চশমা খুলে ফেলল টান মেরে, খামচে তুলে ফেলল তার পরচুলা আর গোঁফ বেরিয়ে পড়ল এক চালাকচতুর তরুণের চেহারা।

“ ‘ড্রাইভার,চললাম,’ বলল সে। সেই আমার তাকে শেষ দেখা, দুজন তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দুদিক থেকে, পেছনে আরেকজন ব্যাগ হাতে।”

“গাড়িতে চড়ত কেন?” আমি বললাম। বেশ কৌতুহল হচ্ছিল।

“আরে, ঐ ব্যাগেই তো ওর সব নোট জালের যন্ত্রপাতি ছিল। ও যদি ওর ঘরেই সারাক্ষণ দরজা বন্ধ করে কাজ করত, তাহলে লোকজনের সন্দেহ হত। তারপর তারা জানালা বা চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মারত কিনা বলা যায় না। আবার যদি আস্ত একটা বাড়িও নিত, যেখানে কোন কাজের লোকটোকও নেই, তাহলেও সেটা অদ্ভুত লাগত। কাজেই ও এই প্ল্যানটাই করেছিল। বন্ধ কোন গাড়ির ভেতরেই কাজ করবে। আর আমার মনে হয় না ওর বুদ্ধিটা খারাপ ছিল। মুশকিলটা হল, পুলিশ যেভাবেই হোক ব্যাপারটা জেনে ফেলে ওকে ধরে ফেলে। এই দেখলেন ভ্যানটার কান্ড! এক্ষুনি ধাক্কা লাগাচ্ছিল!”

।৩।

“বুঝলেন স্যার, আমি যদি সবকটা চোর ছিনতাইবাজ, এমনকি খুনেগুলোর গল্প আপনাকে বলি, যেগুলোর সবকটাই কোন না কোন সময় আমার গাড়িতে উঠেছে, তাহলে আপনি ভাববেন আমি বোধহয় গোটা নিউগেট ক্যালেন্ডারটাই তুলে আনছি আপনার জন্য।

“আরেকটা ঘটনা বলি স্যার, সেটা বলতে গেলে সবচেয়ে খারাপ। যখনই সেই ঘটনাটা ভাবি মনটা ভারী হয়ে যায়। ভাবি ব্যাটার কলারটা আগেই চেপে ধরলাম না কেন, তাহলে তো অনেক ক্ষতি বাঁচানো যেত। ঘটনাটা স্যার বছর দশেক আগের, আমার আবার সন তারিখ অত

মনে থাকে না। আমার গাড়িতে উঠল একটা পেটানো চেহারার নাবিকের মত লোক, ডকে যাবে বলে।

"একটু আগে যে ঘটনাটার কথা বললাম, তারপর থেকেই গাড়ির ভেতরে উঠে যে কেউ যাতে যা খুশি করতে না পারে, তার জন্য সামনে একটা কাচ বসিয়ে নিয়েছিলাম ঐ যে দেখুন, আপনার খোকাটি যাতে এখন নাক ঠেকিয়ে বসে আছে। যাতে মনে হলেই ভেতরে কী হচ্ছে আমি দেখে নিতে পারি।

"এ লোকটা ওঠার পরই আমার কেমন সন্দেহ হওয়ায় আমি একঝলক তাকালাম, দেখলাম লোকটা সিটে বসে আছে, কোলের মধ্যে একগাদা কয়লা নিয়ে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। এখন স্যার দেখতেই পাচ্ছেন, আমার জানালাটা বেশি বড়ো নয় আর এটা দিয়ে ভেতরটা যেরকম দেখা যায়, ভেতর থেকে বাইরেটা সেরকম নয়। সে একটা স্প্রিং বা ঐরকম কিছু টানছিল, আর দেখলাম কয়লার গাদার একদিকটা লাফিয়ে উঠছে। তারপর দেখলাম সেটা একটা ফাঁপা বাক্স, কালো রঙ করা, আর একদম সাদামাটা। যাইহোক আমি তো ওর মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি।

"ব্যাপারটা যখন প্রায় ভুলেই গেছি, তখনই ব্রেমেরহাভেনের বিস্ফোরণের খবরটা এল, আর লোকজনের মুখেও শোনা গেল কোল টর্পেডোর কথা। তখন আমার মনে হল এটা সেই লোকটার কাজ না তো?" ব্যাপারটা পুলিশকে বলেওছিলাম কিন্তু ওরা পাত্তাই দিল না। কোল টর্পেডো কী জানেন তো? জানেন না? ওহ্! একবার বুঝলেন, একটা লোক তার জাহাজটার যা দাম, তার চেয়েও বেশি দামে সেটা বিমা করেছিল। তারপর সে একখানা বাক্স বানাল, যেটা দেখতে কয়লার বাক্সের মত, তারপর সেটা ডিনামাইট বা ঐরকম কিছু দিয়ে ঠেসে ভর্তি করে অন্য কয়লার গাদার মধ্যে রেখে দিল, যখন জাহাজে মাল ভরা হচ্ছিল। তারপর যখন অন্যান্য বাক্সের সঙ্গে ঐ বাক্সটাও কয়লার বাক্স ভেবে ফার্নেসের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হল, তখন জাহাজ শুদ্ধু উড়ে গেল। কত জাহাজ স্যার এভাবে তলিয়ে গেছে।"

"তোমার তো দারুণ সব অভিজ্ঞতা হয়েছে!" আমি বললাম।

"কী বলছেন স্যার," বলল ড্রাইভার, "আমি তো এখনও শুরুই করিনি, আর আপনার জায়গা এসে গেছে। এরকম কত ঘটনা আমি আপনাকে বলতে পারি, সেগুলো সব সত্যি। খাঁটি সত্যি। গসপেলের মতই। আবার যদি কখনো আপনার ভদ্রমহিলাদের একটু হাওয়া খাওয়ার ইচ্ছে হয়, আমার খোঁজ করবেন কপার স্ট্রিটে- চুরানব্বই নম্বর- আর তখন যদি আপনি আমার পাশে বসেন, আমি আপনাকে এমন সব ঘটনা শোনাব যে চমকে যাবেন। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই, ঐ দেখুন আপনার ছোট্ট খোকা পাগলের মত করছে, আপনার স্ত্রী বাইরে বেরোতে চাইছে, আরেকজন আবার ছাতা দিয়ে জানালা ঠুকছে। আস্তে, আস্তে স্যার! সাবধানে নামুন হ্যাঁ ঠিক আছে। নম্বরটা ভুলবেন না স্যার- চুরানুব্বই। গুড ডে ম্যাম! গুড ডে স্যার!"

তারপর সেই কোচোয়ান তার গাড়ি নিয়ে রাস্তার ভিড়ে মিশে গেল, আর তাকে দেখতে পেলাম না।

ছবিঃ শিমুল

# ইয়েডোর ওটোকোডেটের গল্প

*(গোমপাচি ও কোমুরাসাকির গল্পের একটি পরিশিষ্ট)*

সংহিতা

দ্বিতীয় পর্ব

একদিন, যখন সোজায়েমন বাড়ির বাইরে, তাঁর পুত্র সোনোসুকে সুনেহেইকে ডেকে বলল, "তুমি তো জানো বাবা বল খেলতে কী ভালো বাসেন; খেলাটাও দারুণ। আজ তো বাবা নেই, চল না হয় তুমি আর আমিই খেলি?"

"তবে তো বেশ অভিনব খেলা হবে দেখছি!" বলল সুনেহেই, "বেশ তবে, প্রভু বাড়ি ফেরার আগেই আমরা একচোট খেলে নি, জলদি আসুন।"

তারপরই ছেলেদুটি বাগানে গিয়ে বলে লাথি লাগানোর চেষ্টা শুরু করল। কিন্তু যতই কসরৎ করুক না কেন বল কিছুতেই মাটি থেকে হাওয়ায় তুলতে পারল না। শেষে সোনোসুকে কষে এক লাথি লাগাতে বলটা মাটির থেকে লাফিয়ে উঠল; কিন্তু তার লক্ষভ্রষ্ট হওয়ায় বলটা পাঁচিলে ঠোক্কর খেয়ে পাশের বাগানে গিয়ে পড়ল। বাগানটা ছিল হিকোসাকা জেম্পাচি নামে এক সাংঘাতিক রগচটা তলোয়ার শিক্ষকের।

"ভাই রে! এখন কী হবে? বাবার অনুপস্থিতিতে বাবার বল হারালাম! এখন আমাদের অভদ্র প্রতিবেশির থেকে বলটা ফেরত চাইতে গেলে অশেষ লাঞ্ছনা গঞ্জনা জুটবে।"

"একদম কিচ্ছু ভাববেন না", বলল সুনেহেই, "আমি বরং গিয়ে আমাদের অসাবধানতার জন্য ক্ষমা চাইব আর বলটা ফেরত আনব।"

"বেশ, কিন্তু তাতে তুমি ভীষণ তিরস্কৃত হবে। আর সেটা আমি চাই না।"

"কিচ্ছু ভাববেন না, আমি ওঁর ট্যারাব্যাঁকা কথার ধার ধারি না।"

আর তাই সুনেহেই পাশের বাড়ি গিয়ে বল ফেরত চাইল। যখন ছেলে দুটি পাশের বাগানে বল নিয়ে খেলছিল, খেঁকুরে জেম্পাচি তখন বাগানে পায়চারি করছিলেন । তিনি যখন তাঁর বাগানের চন্দ্রমল্লিকাগুলো কেমন সুন্দর হয়েছে ভেবে মনে মনে মহাখুশি হয়ে উঠছিলেনতখনই পাঁচিল টপকে বলটা সিধে এসে তাঁর মুখে লাগে। চাটুবাক্য খোশামোদে অভ্যস্ত জেম্পাচির মুখের ওপর বল এসে পড়াটা খুবই অনভিপ্রেত ছিল। ফলে তিনি ভয়ানক রেগে গেলেন ঘটনাটায়।

যখন তিনি মনে মনে ভাবছেন যে যেই কেউ বলটা ফেরত চাইতে আসবে তখন কী করে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া যায়, ঠিক তখনই সুনেহেই জেম্পাচির বাড়িতে ঢুকল আর তাঁর এক ভৃত্যকে বলল, "আমি খুবই দুঃখিত যে আমার প্রভুর অনুপস্থিতিতে আমি তাঁর বল নিয়ে খেলছিলাম। এলোমেলো লাথি লাগাতে লাগাতে বলটা পাঁচিল ডিঙিয়ে আপনাদের বাগানে

গিয়ে পড়ে। আমার অসাবধানতা দয়া করে মাপ করুন, আর আমাকে বলটা ফেরত দিয়ে কৃতার্থ করুন।"

ভৃত্যটি জেম্পাচির কাছে গিয়ে জানাল সুনেহেই- এর বক্তব্য। জেম্পাচি রেগে টং হয়ে বসেছিলেন। তিনি সুনেহেইকে তাঁর সামনে হাজির করতে বললেন। সুনেহেই হাজির হলে বললেন, "কী হে ছোকরা, তোমার নাম কি সুনেহেই?"

"হ্যাঁ, আমি খুবই ভয়ে আছি যে আপনি হয়তো আমাকে আমার অসাবধানতার জন্য ক্ষমা করবেন না। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন আর বলটা ফেরত দিন।"

"আমি ভাবছিলাম তোমার প্রভু সোজায়েমনের দোষ। কিন্তু এখন দেখছি তুমিই বলটায় লাথি কষিয়েছিলে। "

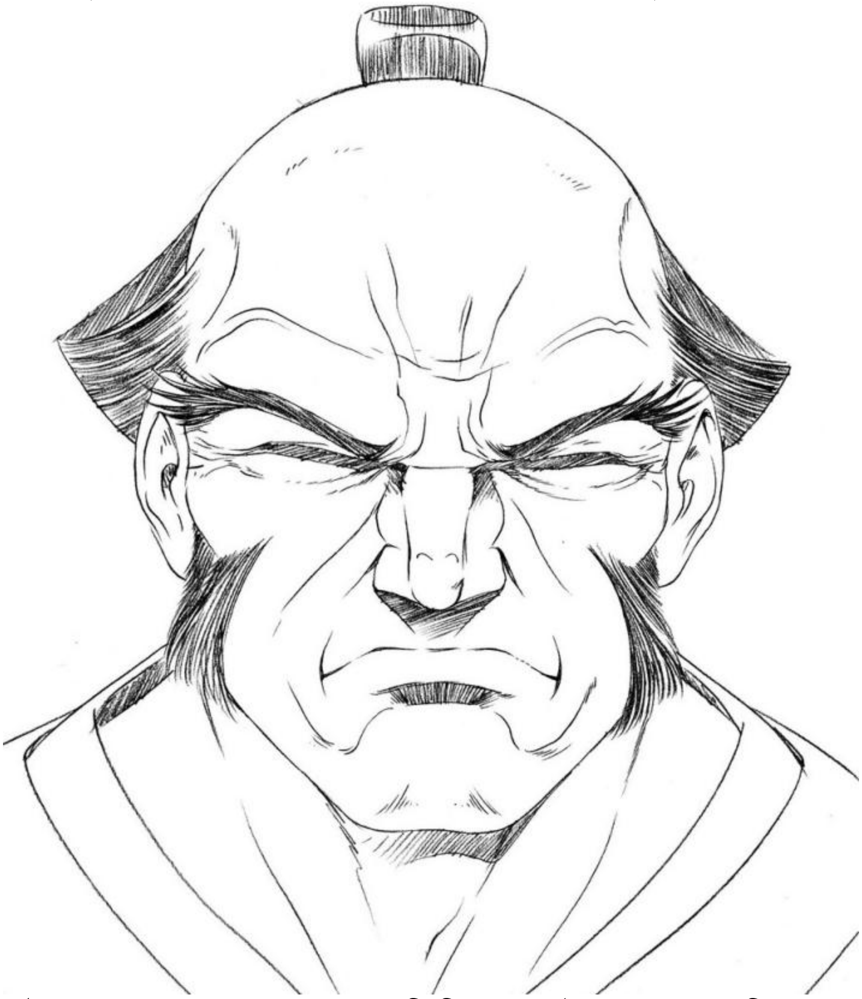

"হ্যাঁ, তাই- ই, আমি সত্যিই দুঃখিত যা করেছি তার জন্য। দয়া করে যদি বলটা ফেরত নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন আমায়।"

মাথা নিচু করে মিনতি করল সুনেহেই।

শুনে জেম্পাচি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "জানিস হতচ্ছাড়া, তোর জঘন্য ফুটবলটা সোজা আমার মুখে এসে লেগেছে? আমার উচিৎ তোকে এইখানে এক্ষুণি মেরে ফেলা, যেটা আমার অধিকারও বটে। তবে তোর প্রাণের ওপর আমি দয়া করলাম। তোর ফুটবলটা নে আর দূর হ!" তারপর তিনি সুনেহেই- এর কাছে গিয়ে তাকে মারধর করলেন, তার মাথায় লাথি কষালেন আর তার মুখে থুথু দিলেন।

এতক্ষণ যে সুনেহেই ফুটবল ফেরত পাওয়ার আশায় বেশ বিনয়ী আচরণ করছিল, এবার সে রাগে লাফিয়ে উঠল। বলল, "আমার অসাবধানতার জন্য যথেষ্ট ক্ষমা চেয়েছি এতক্ষণ, আর তুমি আমাকে অপমান করলে আর আমার গায়ে হাত তুললে! তুমি মহা ফালতু লোক তো হে! নিয়ে নে বল , আমার এসব কিচ্ছু চাই না।" বলেই সে নিজের ছোরা বার করল আর ফুটবলটা চিরে আধখানা করে ছুঁড়ে দিল জেম্পাচির দিকে। তারপর ঘরে ফিরে এলো।

কিন্তু জেম্পাচি এতে আরও চটে গেল। এক ভৃত্যকে ডেকে বলল, "এই সুনেহেই ছোকরা তো মহা উদ্ধত। পাশের বাড়ি যা, দেখ সোজায়েমন আছে কিনা। থাকলে বল সুনেহেইকে আমার এক্ষুণি চাই, ব্যাটাকে আমি মেরেই ফেলব।"

এরপর ভৃত্য চলল খবর নিয়ে।

সুনেহেই এর মধ্যেই ফিরে গিয়েছিল প্রভুর বাড়িতে। তাকে দেখতে পেয়ে সোনোসুকে বলল, “তোমার সাথে যে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে সেটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তুমি কি ফুটবলটা ফেরত পেয়েছ?”

“জেম্পাচির ওখানে গিয়ে আমি বারবার ক্ষমা চাওয়ার পরেও সে আমাকে মেরেছে, আমার মাথায় লাথি কষিয়েছে, আমার মুখে থুথু ফেলেছে। ভীষণ অসম্মান করেছে আমাকে। বজ্জাতটাকে আমি তখনই মেরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু আমি জানতাম যে আপনাদের বাড়ির কাজের লোক হয়ে জেম্পাচিকে মারলে আপনারা সবাই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন। আপনাদের কথা ভেবেই আমি জেম্পাচির সব দুর্ব্যবহার মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু এখন আমার এই প্রার্থনা যে আমাকে রেহাই দিন, আমি স্বাধীন যোদ্ধা রনিন হয়ে যাই যাতে আমি এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি।”

“খুব ভালো করে চিন্তা করো যে যা করবে ভাবছ তার আদৌ দরকার আছে কিনা। কারণ আমরা একটা ফুটবল খুইয়েছি মাত্র, তার জন্য বাবা আমাদের বকবেনও না।” বলল সোনোসুকে।

কিন্তু সুনেহেই সেসব শোনার ছেলে নয়। সে অপমানের বদলা নেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল। এদের কথাবার্তার মধ্যেই এসে হাজির হলো জেম্পাচির ভৃত্য সুনেহেই- এর সমর্পণের দাবি নিয়ে। কারণ হিসেবে সে জানাল যে সুনেহেই নাকি জেম্পাচিকে অপমান করেছে। তাকে সোনোসুকে বলল যে তার বাবার অনুপস্থিতিতে সে কিছুই করতে পারবে না।

অবশেষে সোজায়েমন বাড়ি ফিরলেন। সব শুনে তিনি বেশ দুঃখ পেলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন যখন আবার জেম্পাচির কাছ থেকে আরেকজন এলেন সুনেহেই- এর সমর্পণের দাবি নিয়ে। তিনি দুই কিশোরকে ডেকে বললেন, “এই জেম্পাচি লোকটা নেহাতই হৃদয়হীন নিষ্ঠুর। তুমি যদি যাও ওখানে, আমি নিশ্চিত যে ও তোমাকে মেরেই ফেলবে। সুতরাং এই পঞ্চাশ রিয়ো নাও আর ওসাকা কিংবা কিয়োটো চলে যাও। সেখানে গিয়ে নিরাপদে নিজের স্বাধীন ব্যবসা শুরু করতে পারবে।”

প্রভুর দয়া ভরা কথা শুনে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গেল সুনেহেই- এর। সে বলল, “প্রভু, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন। কিন্তু আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত। জেম্পাচির ওপর প্রতিশোধ মেটানোর জন্য আমি মরণপণ চেষ্টা করতে চাই।” ,

“বেশ, প্রতিশোধ যখন প্রয়োজন তোমার, যাও, লড়াই করো। আশা করি যে সফল

হবে। তবে তোমার তলোয়ারটা বোধ হয় তেমন জোরদার নয়। আমি তোমাকে একটা তলোয়ার দিচ্ছি।" এই বলে সোজায়েমন নিজের তলোয়ারটাই সুনেহেইকে দিতে চাইলেন।

"না, প্রভু।" জবাব দিল সুনেহেই। তারপর বলল, "আমার কাছে রাই কুনিতোশির বানানো একটা বিখ্যাত তলোয়ার আছে। আমাকে আমার বাবা দিয়েছিলেন। সেটা আমি আপনাকে কখনও দেখাই নি বটে, তবে সেটা আমি সযত্নে তুলে রেখেছি আমার ঘরে।"

সোজায়েমন সুনেহেই-এর তলোয়ারটা হাতে নিয়ে দেখে খুবই প্রশংসা করলেন সেটার। আরও বললেন, "এই তলোয়ারটা বেশ ভালো। তুমি এটার ওপর নির্ভর করতে পারো। এটা নাও আর সসম্ভ্রমে লড়ো। শুধু মনে রেখ জেম্পাচি একজন ধূর্ত তলোয়ারবাজ। সতর্ক থেকো।"

প্রভুকে তাঁর অসামান্য দয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে সুনেহেই বিদায় নিল। হাজির হল জেম্পাচির ডেরায়। তাঁর ভৃত্যকে বলল, "মনে হয় তোমার প্রভু আমার সাথে কথা বলতে চান। আমাকে দয়া করে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।"

(চলবে)

**আলেক্সেই তলস্তয়**

ওলগা সার্ৎসে- র ইংরিজি অনুবাদ

থেকে বাংলা ভাষান্তরঃ ইন্দ্রশেখর

অনেককাল আগে এক দেশে থাকত এক বুড়ো আর তার বুড়ি। তাদের কোন ছেলেপিলে ছিল না। তাই তাদের ভারী দুঃখ। একদিন বুড়ো একটা কাঠের লম্বা টুকরো খুদে একটা মানুষ পুতুল বানিয়ে তাতে কাঁথা জড়িয়ে দিল আর বুড়ি তাকে কোলে নিয়ে বেজায় আদর করতে শুরু করতে করতে গান ধরল,

তেরিওশা চোখ বোঁজো না,
ঘুমোয় আমার লক্ষ্মী সোনা
গাছের পাখি, জলের মাছ
শশক, শেয়াল, বনের গাছ
সবাই গেল ঘুমের দেশে
চোখটি বোঁজো একটু হেসে

অমনি হল কি, একটু একটু করে সেই কাঠের পুতুল বদলে হয়ে গেল ছোট্ট একটা সত্যিকারের ছেলে। দেখে বুড়োবুড়ির খুশি আর ধরে না।

দেখতে দেখতে তেরিওশা একটু বড়ো হল। ভারী বুদ্ধিমন্ত ছেলে সে। বুড়ো তখন তাকে একটা নৌকো বানিয়ে দিল। তার সারা গায়ে ধবধবে সাদা রঙ আর তার লাল টুকটুকে দাঁড়। তেরিওশা সেই নৌকোয় উঠে বসে বলল,

ছোট্ট ডিঙি, ছোট্ট ডিঙি একটা কথা রাখ
চল ভেসে চল সেই যেখানে বিরাট মাছের ঝাঁক

ছোট্ট নৌকো অমনি তার কথা শুনে তরতর করে ভেসে গেল নদীর গভীরে। এক বোঝা মাছ সঙ্গে করে ফিরে এল তেরিওশা।

তার পর থেকে তেরিওশা রোজ ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। দুপুর হলে তার মা খাবারের পুঁটুলি নিয়ে নদীর ধারে এসে ডাক দেয়,

ফিরে আয় তেরিওশা খেয়ে যা রে দুটি
দুধ আছে, মধু আছে, আছে দই, রুটি

দূর থেকে মায়ের গলা পেতেই তেরিওশা লাল টুকটুক দাঁড় বেয়ে বেয়ে নদীর পাড়ে এসে যায়। মা তখন তার মাছের বোঝা নামিয়ে নিয়ে, তার মুখ হাত ধুইয়ে, জামাকাপড় পালটে, তাকে খাইয়ে টাইয়ে আবার পাঠিয়ে দেয় মাছ ধরতে।

একটা ডাইনি কিন্তু এই সবকিছু দেখত লুকিয়ে লুকিয়ে। একদিন সে করল কি, নদীর ধারে এসে খ্যানখেনে গলায় ডেকে বলল,

ফিরে আয় তেরিওশা খেয়ে যা রে দুটি
দুধ আছে, মধু আছে, আছে দই, রুটি

তেরিওশা তো শুনেই বুঝতে পারে গেছে এ তার মায়ের গলা নয়। সে ভয় পেয়ে তার নৌকোকে বলতেই নৌকো তাকে এক ছুটে জলের আরো গভীরে নিয়ে পালিয়ে গেল। ডাইনি তখন কামারবাড়ি গিয়ে বলে, “আমার গলাটাকে একটু সরু করে দে দেখি, যাতে তেরিওশার মায়ের মতন শোনায়-- ”

কামার তো যতটুকু পারে তার গলাটাকে সরু করে দিল। তখন ডাইনি ফের নদীর ধারে এসে ডাক দিল,

ফিরে আয় তেরিওশা খেয়ে যা রে দুটি
দুধ আছে, মধু আছে, আছে দই, রুটি

এইবার তেরিওশা বোকা বনে গেল। ভাবল বুঝি সত্যিসত্যিই মা তাকে খেতে ডাকছে। এই ভেবে যেই না সে পাড়ে এসে ওঠা, ডাইনি তাকে ধরে একটা ঝোলায় ভরে নিয়ে গিয়ে উঠল সটান তার বনের ভেতরের কুঁড়েঘরে। সেখানে পৌঁছে ঝোলা নামিয়ে রেখে ডাইনি তার মেয়ে আলিওনকাকে ডেকে বলে, “শিগগির উনুন জ্বলে ছেলেটাকে সেঁকে আন, আমি আরো কিছু খারাপ খারাপ কাজ করে আসছি ততক্ষণ।”

আলিওনকা উনুনে আঁচ দিল। আগুন গণগণে হয়ে উঠতে সে তেরিওশাকে একটা বেলচার ওপরে বসিয়ে দিয়ে বলে, “নে, এখানে টানটান হয়ে শুয়ে পড় দেখি।”

তেরিওশা কিন্তু তার কথা মোটেই শুনল না। চারদিকে হাত পা ছড়িয়ে বেলচার ওপরে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। আলিওনকা যতই বেলচা ঠেলে, তাকে আর উনুনের মধ্যে ঢোকাতে পারে না। তখন সে বেজায় রেগে গিয়ে বলে, “তোকে না বললাম, বেলচার ওপর টানটান হয়ে শুতে? বসে রইলি যে বড়ো?”

তেরিওশা ভালোমানুষের মতন মুখ করে বলল, “সে আবার কেমন করে করে? জানি না তো! দেখিয়ে দাও না। ”

“আরে যেভাবে কুকুররা ঘুমোয়, যেভাবে বেড়ালরা ঘুমোয় সেইভাবে শুয়ে পড় না।”

“উঁহু। তুমি আমায় দেখিয়ে দাও,” তেরিওশা জেদ ধরে বলল। শুনে আলিওনকা যেই না তাকে বেলচার ওপরে শুয়ে দেখাতে গেছে তেরিওশা অমনি তাড়াতাড়ি বেলচা উনুনের ভেতরে ঠেলে দিয়ে উনুনের দরজা দিয়েছে বন্ধ করে। সেই করতেকরতেই শোনে বাইরে ডাইনির পায়ের শব্দ। সে তখন তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে একটা বুড়ো ওকগাছের মাথায় চড়ে বসল।

ডাইনি বাড়ি ফিরে উনুনের দরজা খুলে আলিওনকাকে গবগব করে খেয়ে ফেলল প্রথমে। তারপর ভরা পেটে বাইরে এসে ঘাসে গড়াগড়ি দিয়ে মহাখুশিতে গান ধরল,

তেরিওশার মাংস খেয়ে পেটটি ভরে
এবার তবে ঘুমিয়ে নেবো আরাম করে

ওক গাছের মাথা থেকে তেরিওশা ফিশফিশিয়ে জবাব দিল, “আলিওনকার মাংস খেয়ে পেটটি ভরে—”

ডাইনি ভাবল, বুঝি ওকে গাছের পাতায় হাওয়ার শব্দ হল। সে তখন ফের গাইতে লাগল,

তেরিওশার মাংস খেয়ে পেটটি ভরে
এবার তবে ঘুমিয়ে নেবো আরাম করে

গাছের মাথা থেকে তেরিওশা ফের বলল, “আলিওনকার মাংস খেয়ে পেটটি ভরে—”

এইবার ডাইনি ওপরদিকে তাকিয়ে দেখে গাছের আগায় তেরিওশা বসে আছে। সে দৌড়ে এসে ওকে গাছের গোড়াটা কামড়ে ধরল। ওক গাছও শক্ত কম নয়। কামড়াতে কামড়াতে ডাইনির তো সামনের দুটো দাঁতই খুলে এলো শেষমেষ। তখন সে কামারবাড়িতে দৌড়ে গিয়ে বলে, “দুটো লোহার দাঁত বানিয়ে দে দেখি চটপট—”

কামার তো দুটো শক্তপোক্ত লোহার দাঁত বানিয়ে দিল তাকে। সেই দাঁত পরে ফিরে এসে ডাইনি ফের একবার কামড় বসালো ওকগাছের গোড়ায়। এইবার আরো দুখানা দাঁত খুলে এল তার। ফের ডাইনি কামারের কাছে গিয়ে আরো দুখানা লোহার দাঁত বানিয়ে নিয়ে এল। এইবার চারখানা লোহার দাঁতের কামড়ে ওকগাছের গুঁড়ি টুকরো টুকরো হবার দশা। গাছ তখন এদিক হেলে আর ওদিক হেলে। তার মাথায় বসে তেরিওশা তখন করে কী? হঠাৎ সে দেখে আকাশ দিয়ে একদল রাজহাঁস উড়ে যাচ্ছে। দেখে সে তাদের কেঁদে কেঁদে বলল,

ওরে আমার বন্ধু হাঁসের দল
আমায় নিয়ে মায়ের কাছে চল

শুনে সর্দার হাঁস জবাব দিল, “আমাদের পেছনে আর একদল হাঁস আছে। তাদের গায়ে জোর কম। ওরা তোমায় নিয়ে যাবে’খন।” এই বলে সে তার দলকে নিয়ে উড়ে গেল। নীচে থেকে ডাইনি সেই শুনে ওপরদিকে একবার দেখে নিল, তারপর ঠোঁট মুছে নিয়ে ফের ওক গাছের গোড়ায় কামড় বসালো। পরের দলটা আসতে তেরিওশা ফের কেঁদে কেঁদে বলে,

ওরে আমার বন্ধু হাঁসের দল
আমায় নিয়ে মায়ের কাছে চল

সর্দার হাঁস জবাব দিল, “আমাদের পেছন পেছন খানিক দূরে একটা বাচ্চা হাঁস উড়ে আসছে। সে তোকে নিয়ে যাবে’খন।” এই বলে সে তার দলকে নিয়ে উড়ে চলে গেল। ডাইনির কামড়ে ওকগাছ তখন পড়োপড়ো। এমন সময় সেই ছোট্ট হাঁসটা উড়ে এল। তেরিওশা তাকে মিনতি করে বলল,

তোমার বুকেই দয়ামায়া একটু হলেও আছে
প্রাণটা বাঁচাও, আমায় নিয়ে চল মায়ের কাছে।

ছোট্ট হাঁসের প্রাণে খুব দয়া হল। নিচে নেমে এসে সে তেরিওশাকে পিঠের ওপরে বসাল, তারপর উড়ে গিয়ে নামল সোজা তেরিওশাদের বাড়ির জানালার পাশে।

ওদিকে বুড়োবুড়ি তো তেরিওশা হারিয়ে গেছে ভেবে কেঁদেকেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। দুদিন ধরে ঘরে রান্নাবাড়া খাওয়াদাওয়া সব বন্ধ। সেদিন অনেক কষ্টে বুড়ি দুখানা পাটিসাপটা বানিয়ে সবে বুড়োকে ডেকে বলেছে, “এই নাও, একটা তোমার আর একটা আমার,” ওমনি জানালার পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, “আর আমারটা?”

বুড়ি বুড়োকে বলল, “দেখে এসো তো কে পাটিসাপটা চাইছে?”

বুড়ো বেরিয়ে এসে দেখে এ তো তেরিওশা!!

তখন তো বাড়িতে খুশির ধুম। তেরিওশাকে তার বাবা মা মিলে যা আদর করল সে আর বলবার নয়। ছোট্ট হাঁসের ছানা পেল ভালো ভালো খাবার আর জল। তারপর সে কিছুদিন তেরিওশাদের বাড়িতেই থেকে গিয়ে ভালো ভালো খাবারদাবার খেয়ে কদিনের মধ্যেই হয়ে উঠল একজন ভারী রূপবান আর শক্তিশালী রাজহাঁস।

এখন তার নিজের একটা হাঁসের দল হয়েছে। তাদের আগে আগে নীল আকাশে ডানা ছড়িয়ে ওড়ে সেই দয়ালু রাজহাঁস, আর মাঝেমাঝেই মনে করে তার বন্ধু তেরিওশার কথা।

## ব্রাহ্মী সংখ্যাঃ স্থানীয় মান(প্লেস ভ্যালু) এবং শূন্য

ভারতীয় সংখ্যা, স্থানীয় মান আর শূন্যের আবির্ভাবকালের কথা না বললে অংকের বিচিত্র জগতের গল্প সম্পূর্ণ হবে না সে কথা বলা বাহুল্য। আরো ঠিক করে বলতে গেলে, ভালো করে শুরুও করা যাবেনা অংকের ইতিহাসটাকে বলা, যদি না এই তিনটে ব্যাপার নিয়ে খানিক আলোকপাত করে নেয়া যায়।

দশভিত্তিক গণনা ভারতে ছিল বহুকাল আগে থেকেই। আজ আমরা যে ধরণের সংখ্যাটংখ্যা নিয়ে কাজকর্ম করি তার শুরুটা হয়েছিল ৩০০ খৃস্টপূর্বাব্দে, ব্রাহ্মী সংখ্যামালার মধ্যে দিয়ে। তবে এই সংখ্যামালা কিন্তু স্থানীয় মান পদ্ধতি (মানে একক, দশক, শতক এই পদ্ধতি) অনুসরণ করত না। এর আবির্ভাব ৪০০ খৃস্টাব্দ নাগাদ।

৬০০ খৃস্টাব্দ নাগাদ দেখা গেল, এই স্থানীয় মানযুক্ত দশমিক পদ্ধতির ব্যবহার ভারতবর্ষে ভালোভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে বললে এইরকম দাঁড়ায়—

স্থানীয় মান পদ্ধতিতে কোন বড়ো সংখ্যাকে লিখতে গেলে এই পদ্ধতিতে সেই সংখ্যাটাকে কয়েকটা ছোট অংকের সমষ্টি হিসেবে লেখা হয় আর সমষ্টির প্রত্যেকটার নিজস্ব মানটাকে না লিখে তার মানটাকে ধরা হয় সংখ্যার মধ্যে কোন জায়গায় সে রয়েছে সেইটার হিসেবে।

ধরো লিখব একশো পঁয়তাল্লিশ। একে লেখা হবে ১০০ আর ৪০ আর ৫ এইভাবে, কিন্তু (১০০) (৪০) (৫) না লিখে লিখবো ১৪৫। শেষের থেকে তিন নম্বর জায়গায় যে এক রয়েছে তার

মান হবে  তিন অংকের সং খ্যা (১০০), শেষের থেকে দ্বিতীয় জায়গায় যে ৪ টা রয়েছে তার মান হবে দুই অংকের বা ৪০ আর শেষের থেকে এক নং জায়গায় যে ৫ রয়েছে তার মান হবে এক অংকের , বা ৫।

এর যে ফলটা ঘটল সেটা প্রায় ম্যাজিকের মতন। যতবড়ো সংখ্যাই হোক না কেন, এই পদ্ধতিতে তাকে ০,১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ এই ক'টামাত্র চিহ্ন দিয়ে খুব কম জায়গাতেই লিখে ফেলা সম্ভব হল।

এই যে স্থানীয় মানের ব্যবহার করে সংখ্যাকে লেখা এর একটা পদ্ধতি প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ানদের জানা ছিল। তবে তারা গণনাটা করত ৬০ এর ভিত্তিতে, আর শূন্যের ব্যবহার না জানায় বড়ো বড়ো সংখ্যাকে ভারতীয় পদ্ধতির মতন এত সহজে প্রকাশ করতে পারত না । ভারতীয়রা শূন্যের ব্যবহার করে গোটা পদ্ধতিটাকে দশ ভিত্তিক করে দিয়ে অংক কষাকে অনেক সহজ বানিয়ে দেয়।

ব্যাপারটা নিয়ে এ লেখার একেবারে গোড়াতেই বলেছি একবার। এইবারে সে ব্যাপারটাতে ভারতীয় অংকওয়ালাদের বিশেষ অবদানটা কোনখানে সেইটে একটু ভেঙে বলব।

গুনতে বসে সবাই বলে শুরুতে আছে এক। ভারতীয়রা সমস্যাটাকে অন্যভাবে ধরল। তারা বলল, এক- এর আগে কী? শুরুটা হয় কোত্থেকে?

এক এর আগে কী তুমিই বলো? উত্তরটা মজার। এক- এর আগে—কিচ্ছু নেই। তাহলে বলতে হয় শুরুটা হয় কীসের থেকে?

"কিচ্ছু না" এই থেকে।

একটা কলসি আছে খালি। তাতে কী আছে? উত্তর হল, কিচ্ছু না। এইবারে তাতে এক লিটার জল ভরলাম। এইবারে তাতে কী এল? না, ১ লিটার জল।

বিশ্বের শুরুতে কী ছিল? কিচ্ছু না। তারপর কী হল? না একটা বিশ্ব।

তাহলে এই যে শুরুর কিচ্ছু না, একে হিসেব থেকে বাদ না দিয়ে ভারতীয়রা বলল, ও নিজেই একটা সংখ্যা। যেহেতু তার কোন মান নেই, (সে যে কিচ্ছু না) তাই তাকে তারা বলল, "শূন্য" আর তার চিহ্ন দিল ০।

এইখান থেকে শুরু করে হাতের দশটা আঙুল হিসেবে দশটা আলাদা আলাদা সংখ্যাচিহ্ন তৈরি করা হল—০,১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯।

এর পরের সংখ্যাটার জন্যে ভারতীয় গণিতজ্ঞ করলেন কী, নতুন আর কোন চিহ্ন না এনে ফের ১ থেকে গোণা শুরু করতে বললেন, তবে তফাতটা হল, এইবারে প্রথমে লিখব ১ আর তার পরে ফের ০ থেকে ৯ বসিয়ে বসিয়ে যাব।

তাহলে ৯ এর পর প্রথমেই আসবে কে? আসবে ১ আর তার পরে একটা ০। বা ১০। একে বলা হল দশ। এখানে ১ এর স্থানীয় মান হল দশ। আর তার পরে বসল একটা শূন্য।

এবারে কে আসবে?  প্রথমে ১ আর তার পরে ১। তাকে বলব এক- দশ বা একাদশ। এখানে প্রথম ১ টার স্থানীয় মান হল ১০ আর দ্বিতীয়টার হল ১। তারপর আসবে ১ ও তার পিঠে ২। বলব দুই –দশ বা দ্বাদশ। এখানে প্রথমের ১ টার স্থানীয় মান হল ১০ আর তার পরের ২ টার স্থানীয় মান হল ২।

এমনিভাবে যখন ১ এর পিঠে ৯ তে পৌঁছোব তার পর আবার প্রথম সংখ্যাটাকে বদলে ২ করে দিয়ে ফের তার পিঠে ০ থেকে ৯ একের পর এক বসিয়ে পরের সংখ্যাগুলো তৈরি করে

যাব। ৯৯ অবধি পৌঁছুলে পরে ফের একবার ফিরিয়ে আনব শুরুতে ১ কে, তার পিঠে দুটো শূন্য বসিয়ে ফের চালু করে দেব ১০০,১০১,১০২ এইভাবে। এখানে অংকগুলোর স্থানীয় মান আবার ওই একইভাবে ঠিক করা হবে।

শূন্য তৈরি করবার পর তা দিয়ে যোগ বিয়োগ গুণ করবার কাজটা রপ্ত হলেও তাকে দিয়ে যে ভাগ করা যায় না সেটা বুঝতে কিন্তু গণিতজ্ঞদের অনেক কাল সময় লেগে গিয়েছিল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 零 | | |
| 1 | 壹 | 10 | 拾 |
| 2 | 貳 | 20 | 貳拾 |
| 3 | 叄 | 30 | 參拾 |
| 4 | 肆 | 40 | 肆拾 |
| 5 | 伍 | | |
| 6 | 陸 | $10^2$ | 佰 |
| 7 | 柒 | $10^3$ | 仟 |
| 8 | 捌 | $10^4$ | 萬 |
| 9 | 玖 | $10^8$ | 億 |

আবিষ্কার হবার পর আরবদের হাত ঘুরে শূন্যের ইউরোপে পৌঁছতে কিন্তু অনেকগুলো শতাব্দি লেগে গিয়েছিল।

আসলে দশভিত্তিক গণনার একটা পুরোনো পদ্ধতি চিনেও ছিলো কিন্তু। তবে সে দেশের লোকেরা লিখত ছবি এঁকে। ফলে দশভিত্তিক গণনাপদ্ধতি থাকলেও শূন্যটাকে ব্যবহার করে সহজে অংক কষার পক্ষে তা অচল ছিলো। কেন, তা সঙ্গের ছবিটা দেখলেই বুঝবে।

খেয়াল করে দেখো, দশকে কিন্তু তারা ১ আর শূন্যের চিহ্ন সাজিয়ে তৈরি করছে না। ২০ লিখছে (২)(১০) এমনিভাবে।

আবার ১০০ লিখতে ফের নতুন চিহ্ন বসাচ্ছে।

অর্থাৎ ১০ ভিত্তিক গণনা থাকলেও তারা সংখ্যা লিখতে গিয়ে প্লেস ভ্যালু বা স্থানীয় মান পদ্ধতি ব্যবহার করছে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১০ ভিত্তিক একটা গণনা পদ্ধতি চিনেদের ছিল, স্থানীয় মানভিত্তিক একটা গণনাপদ্ধতি ব্যাবিলনিয়ানদের ছিল। কিন্তু এই দশভিত্তিক আর স্থানীয় মানভিত্তিক দু'খানা গণনাপদ্ধতিকে একসঙ্গে ব্যবহার করে যে আদর্শ এবং বেজায় শক্তিশালী গণনাপদ্ধতি তৈরি হয়, যা আজ একুশ শতকের দুনিয়াতেও সারা পৃথিবী মেনে চলে তার উদ্ভাবন আমাদের দেশে।

ক্রমশ

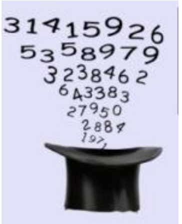


# প্রফেসর ট্যানজেন্টের র‍্যাপিড থিঙ্কিং

**সূর্যনাথ ভট্টাচার্য**

প্রফেসর ট্যানজেন্টের মাথার ছিট ক্রমে লংক্লথের আকার নিচ্ছে। একদিন বললেন, "একটা ব্যারোমিটারের সাহায্যে কী করে একটা দশতলা বাড়ির হাইট মাপবেন বলুন তো?"

আমি প্রমাদ গুনলাম। ভয়ে ভয়ে বলতে হল, "প্রফেসর, আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন সেটা তো বোধগম্য হল না। সবাই জানে ব্যারোমিটার দিয়ে বায়ুমন্ডলের চাপ মাপা হয়।"

"আর সবাই যা জানে না, আমার কারবার আবার তাই নিয়েই," প্রফেসর একটা ক্ষমার হাসি দিয়ে বললেন, "এখন যা জিজ্ঞেস করলাম বলতে পারবেন কি?"

এই লোকটার পাগলামি দেখলে রাগও ধরে আবার কৌতূহলও যায় না। সহজে জব্দ না হবার জন্যে মাথা-টাথা চুলকে বললাম, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। এতো খুব সহজ। দশতলা বাড়ির নীচে আর ওপরের হাওয়ার চাপের পার্থক্য থেকে নিশ্চই বাড়িটার হাইট বার করে নেওয়া যাবে।"

"হল না," আমাকে দমিয়ে দিয়ে প্রফেসর বললেন, "একটা দশতলা বাড়ির যা উচ্চতা তার জন্য বায়ুমন্ডলের প্রেশারের পার্থক্য সাধারণ ব্যারোমিটারে ধরা পড়বে না। তাছাড়া বায়ুমন্ডলের চাপ আর উচ্চতার মধ্যে এমন কোনও সরলরৈখিক সম্পর্ক নেই। তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহের গতি, তার ঘনত্ব এইসব অনেক কিছু ফ্যাক্টর আছে যার ওপর এই সম্পর্ক নির্ভরশীল। সুতরাং হল না।"

আমি আরও খানিক ভেবে বললাম, "বুঝেছি। ব্যারোমিটারে তো একটা স্কেল আছে, তাই দিয়েই—"

প্রফেসর হো হো করে হেসে বললেন, “তাই দিয়ে টিকটিকির মতো দেওয়াল বেয়ে বেয়ে দশতলা বাড়ি মেপে ফেলবেন, কেমন! হা হা হা হা—। ওসব নয়, একটু বৈজ্ঞানিকভাবে চিন্তা ভাবনা করুন।”

এবার বেজায় রাগ হল। বললাম, “আপনি তো মস্ত বৈজ্ঞানিক। আপনিই বলুন দেখি?”

“তাই বলছি। দু’ভাবে এটা করা যায়,” প্রফেসর ট্যানজেন্ট এবার নিজের এরিয়ায় এসে অনুকম্পাভরে বললেন, “প্রথমটা হল ডেস্ট্রাক্টিভ মেথড। কিছুই না, ব্যারোমিটারটা বাড়ির ছাদ থেকে নিচে ফেলে দিন, আর জমিতে এসে পড়বার সময়টা মেপে নিন। ব্যাস, নিউটনের ফর্মুলায় ফেলে হাইট বার করে নিন।”

আমি হাসবো না কাঁদবো না বুঝতে পেরে হতবুদ্ধি হয়ে বললাম, ”আর দ্বিতীয় মেথড?”

“হ্যাঁ, সেটা বেটার কারণ নন-ডেস্ট্রাক্টিভ,” প্রফেসর প্রাঞ্জল করলেন, ”একটা দড়ি বেঁধে ব্যারোমিটারখানা ছাদ থেকে নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে একটু দুলিয়ে দিন। এটা যেহেতু এখন একটা পেন্ডুলাম, তার অসিলেশনের ফ্রিকোয়েন্সি থেকে ফর্মুলার সাহায্যে তার লেংথ বার করে নিন।”

প্রফেসরের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল। বলে ফেললাম, “তার চেয়ে ওই যে দড়িটায় ঝোলালেন সেটার লম্বাইটা মেপে নিলেই তো হয়?”

দেখলাম এই সহজ ব্যাপারটা প্রফেসরের মাথায় আসেনি বলে তিনি বিলক্ষণ অপ্রস্তুত। কিন্তু হার মানবেন না। বললেন, “দেখুন আমি সব জিনিসই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে—”

আমাদের এই আলোচনা পটল শুনছিল কোথাও থেকে। হঠাৎ বেরিয়ে এসে বললে, “এর চেয়েও সহজ একটা পথ আছে স্যার।”

প্রফেসর বিরক্ত হয়ে বললেন, “সেটা কী?”

“সেটা হল, বাড়িটা যে কন্ট্রাক্টর তৈরি করেছে, তাঁকে ওই ব্যারোমিটারটা ঘুষ দিয়ে জেনে নিলেই হল। হি হি...”

প্রফেসরের জব্দ হওয়া মুখটা দেখে মনে মনে বললাম, বেশ হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, “অর্বাচীন অবৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আর থাকা গেল না। কত মাথা খাটিয়ে এই সব প্রশ্ন বানাতে হয়, মূর্খেরা বুঝলে তো। নাঃ চলি, আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।”

আমি শ্লেষভরে বললাম, “তা চললেন কোথায়?”

“ওসব আপনি বুঝবেন না। অখিল গোবরডাঙ্গা র‍্যাপিড থিংকিং কম্পিটিশনের প্রশ্নগুলো আমিই তো তৈরি করলাম, পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না?”

এই বলে পকেট থেকে একগোছা কাগজ বার করে দেখালেন।তারপর আবার কী ভেবে বললেন, “দেখবেন নাকি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটু অন্যভাবে চিন্তা করে? দেখুন, কদ্দূর করতে পারেন—”

আমি কিছু বলার আগেই একখানা কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। কাগজটায় চোখ বুলিয়ে দেখি একটা কোশ্চেন পেপার। প্রশ্নগুলো বেশ অদ্ভুত ঠেকলো, মাথা ঘামাতে শুরু করে দিলাম। তোমরাও দেখো না--

---

**অখিল গোবরডাঙ্গা দ্রুত- মনন প্রতিযোগিতা**

সব প্রশ্নের চট করে উত্তর দিতে হবে।প্রত্যেক উত্তরের জন্যে গড়ে দশ সেকেন্ডের বেশি সময় নেওয়া যাবে না।

( ক্যালকুলেটর ব্যবহার নিষিদ্ধ)

১।দশটা বল তিনটে থলের মধ্যে কীভাবে ভরবেন, যাতে প্রত্যেক থলিতেই অযুগ্মসংখ্যক বল থাকে?

২।নয় থেকে এক সংখ্যাগুলি উল্টোদিক থেকে লিখুন দেখি।

৩।গ্রিক বাগ্মী ল্যারিঞ্জাইটিসের জন্ম খৃষ্টপূর্ব ত্রিশ সালের ৪ঠা জুলাই। তিনি মারা যান ত্রিশ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন?

৪।কোন দু'টি পূর্ণসংখ্যার গুণফল ১৩?

৫।একটি বাচ্চা একটা বইয়ের ৬, ৭, ৮৪, ১১১ ও ১১২ সংখ্যক পৃষ্ঠাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে। সে মোট ক'টা পাতা ছিঁড়েছে?

৬।কাগজ থেকে কলম না তুলে এবং একই রেখায় দাগা না দিয়ে নিচের নয়টা বিন্দু চারটে সরলরেখা দ্বারা কিভাবে যুক্ত করবেন—?

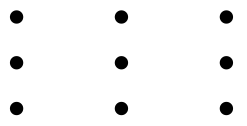

৭।কাগজ থেকে কলম না তুলে এবং একই রেখায় দাগা না দিয়ে পাশের দুই সমান্তরাল সারিতে রাখা ছ'টা মুদ্রা দু'টো সরলরেখা দ্বারা কিভাবে যুক্ত করবেন—?

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 |

৮।পাশের কাগজের টুকরোটায় লেখা বারোটা সংখ্যার মধ্যে কোন ছ'টা সংখ্যার যোগফল ২১?

৯।একটা বৃত্তাকার পিৎজাকে তিনবার সরলরেখায় ছুরি চালিয়ে সমান আট টুকরো কিভাবে করা যায়?

১০।এক ভদ্রলোক কাউন্টারে চেকটা দেবার আগে তার পিছনে একটা ত্রিভুজ এঁকে তার পাশে লিখে দিলেন ১৩×২≅২৬। চেকটা নিয়ে ক্যাশিয়ার বলল, "ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু।" সে কীভাবে জানলো, ভদ্রলোক ডাক্তার?

১১।একটা পিঁপড়ে একটা স্কেলের ১২ ইঞ্চি দাগ থেকে যাত্রা শুরু করে ৬ ইঞ্চি দাগে এলো ১২ সেকেন্ডে। একই গতিতে চলতে থাকলে আর কতক্ষণ পরে সে ১ ইঞ্চি দাগে পৌঁছোবে?

১২।শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলো কী বিশেষ নিয়ম মেনে এইভাবে সাজানো হয়েছে? 8- 5- 4- 9- 1- 7- 6- 3- 2- 0 ?

১৩।এক ডজনে যদি ১২টা পাঁচ পয়সার স্ট্যাম্প হয়, তাহলে ক'টা কুড়ি পয়সার স্ট্যাম্প হবে?

১৪।পাশে দেখানো ছবির মধ্যে যে কোনও একটা মুদ্রা সরিয়ে কিভাবে রাখলে দু'টো সমকোণী সরলরেখার প্রত্যেকটিতে চারটে করে মুদ্রা থাকবে?

১৫।এক শহরে মহিলার সংখ্যা ১৪, ৭০, ৩৪০। তাদের মধ্যে ৩% মহিলা এক কানে দুল পরে। বাকিদের অর্ধেক দু'কানেই দুল পরে। আর বাকিরা কোনও কানেই দুল পরে না। মোট তারা ক'টা দুল পরে?

১৬।এই প্রশ্নে নীচে দেওয়া বিবৃতিগুলিতে তিনটি ভুল আছে। কী কী?—

ক) ২ + ২ = ৪

খ) $৮ \div \frac{১}{২} = ৪$

গ) ৭ − (−৪) = ১১

ঘ) −১০(৬-৬) = −১০

১৭।একজন টাইপিস্ট চারটে চিঠি টাইপ করে চারটে খামে গন্তব্যের ঠিকানাগুলি লিখল। এবার ভুলবশত চিঠিগুলো চারটে খামে এলোমেলোভাবে ঢুকিয়ে ফেলল। শুধুমাত্র একটাই চিঠি ভুল ঠিকানায় যাবার সম্ভাবনা কত?

১৮। একটা বৃত্তাকার গোলকের উপর যেকোনো তিনটি বিন্দু গোলকটির একই অর্ধে পড়ার সম্ভাবনা কত?

১৯।পাঁচটা দেশলাই কাঠি দিয়ে একটা ঘন বা কিউব কিভাবে বানানো যায়?

২০।ব্রিজ খেলায় তাস বিলি করে দেওয়ার পরে কোন সম্ভাবনাটা বেশি? আপনার ও আপনার পার্টনারের হাত মিলিয়ে কোনও একটা রঙের সবক'টা তাস পাওয়ার, নাকি সেই রঙের কোনও তাস না পাওয়ার?

২১। রাম একটা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।বলুন তো—

ক) সে যখন দ্বিতীয় প্রতিযোগীকে অতিক্রম করে গেল,তখন সে কোন পজিশনে এলো?

খ) শেষ প্রতিযোগীকে অতিক্রম করলে তার পজিশন কী হবে?

২২। এক হাজারের সঙ্গে ৪০ যোগ করুন। এবার আরও এক হাজার যোগ করে তারপর ৩০ যোগ করুন। এরপর আরও এক হাজার যোগ করে তার সাথে ২০ যোগ দিন। শেষকালে আরও এক হাজার যোগ করুন ও সঙ্গে আরও ১০। মোট কতো হল?

---

আপনারাও ততক্ষণ চেষ্টা করুন।আমি তো মাথা ঘামিয়ে উত্তরগুলো বার করে ফেলেছি। সম্পাদক মশাইকে পাঠিয়ে দিলাম। উনি যথাসময়ে জানিয়ে দেবেন না হয়।

# অবাক চা- পান

**রবি সোম**

কলেজে আমাদের এক বছরের সিনিয়র ছিল দর্জিলদা। প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে দারোয়ানের পোষা কুকুর পর্যন্ত সকলেরই দারুণ প্রিয়পাত্র ছিল সে। ড: তলাপাত্র সিঁড়িতে কিংবা করিডোরে দর্জিলদার সাথে মোলাকাত হলেই দাঁড়িয়ে পড়তেন, খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিতেন পড়াশোনার ব্যাপারে । আর টমি ? প্রবলভাবে লেজ আন্দোলিত করে প্রকাশ করত হর্ষ ।

দর্জিলদাকে দেখে টমির প্রবল লেজ- নাড়া প্রেরণা যুগিয়েছিল একজনকে। সঞ্চরমান লেজের এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ কীভাবে তৈরি করা যায় তা নিয়ে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের ভোম্বল প্রচুর ভাবনা- চিন্তা করছে বলে কলেজে রটে গিয়েছিল। আমাদের মতো সাধারণ ছাত্ররা তাই ভোম্বলকে খুবই সমীহ করে চলতাম। পরবর্তীতে ভোম্বলের গবেষণা কতদূর ফলবতী হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায়নি।

যাই হোক, দর্জিলদার সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তার কারণ কী সেটা বলা দরকার। খুঁজলে দর্জিলদার মতো দিলদরিয়া, আমুদে ছেলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কিন্তু মিলবে না দর্জিলদার মতো যে কোনো সমস্যার সহজ ও চটজলদি সমাধান করার দুর্লভ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

বেঙ্গালুরুতে একই কোম্পানিতে চাকরি পাবার পর ক্লাসমেট সুজিত ও আমি কৃষ্ণরাজাপুরম এলাকার একটি কন্নড় পরিবারে পেয়িং গেস্ট হিসেবে আস্তানা গেড়েছিলাম। গৃহস্বামীর শর্ত ছিল , ঘরে রান্না- টান্না করা যাবে না , বাইরের আমিষ খাদ্য ঘরে এনে খাওয়াও চলবে না। তবে ছাড় ছিল চা- কফি তৈরিতে কিংবা বাইরে থেকে কিনে আনা নিরামিষ খাবার গরম করে ভক্ষণ করার ব্যাপারে।

দর্জিলদা  যে বেঙ্গালুরুতে ব্যাবসা করছে সে খবর রাখলেও ঠিকানা জানা না থাকায় খোঁজ করতে পারিনি। গণবোধ্য বিজ্ঞানের একটি বাংলা ই- ম্যাগাজিন থেকে আমার মেল আইডি পেয়ে যোগাযোগ করেছিল দর্জিলদাই। পপুলার সায়েন্স নিয়ে আমি যে কিঞ্চিৎ লেখালিখি করি তা জানা থাকায় শুধু নামেই আমাকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় নি। ফোন করলাম। আমি ও সুজিত ব্যাঙ্গালুরুতেই আছি জেনে দর্জিলদা যারপরনাই খুশি হল। দর্জিলদা থাকে বনসওয়ারি অঞ্চলে। আমাদের ঠিকানা শুনে বলল, জায়গাটা সে বিলক্ষণ চেনে। পৌঁছতে কোনো অসুবিধে হবে না। ঠিক হল, পরের রোববার সকাল আটটা নাগাদ দর্জিলদা  দেখা করতে আসবে ।

পরের রোববার যথাসময়ে হাজির হল দর্জিলদা। শহরের বিখ্যাত সরকারি হস্তশিল্প সামগ্রীর বিপণি "কাবেরী" থেকে এনেছিল দুটো গিফট্। বিদেশবিভুঁই- তে বহু বছর বাদে দেখা হলে স্মৃতিমেদুর পরিবেশে যা যা হয় তার সবকিছুই সংঘটিত হল আমাদের ঘরে। কিছুক্ষণের জন্য যেন টাইম মেশিনের সওয়ার হয়ে সবাই পৌঁছে গেলাম কলেজ- জীবনের ফেলে- আসা ধূসর অতীতের দিনগুলোতে !

প্রাতরাশের আয়োজনে খামতি ছিল না। ভেজিটেবল প্যাটিস , চিজ স্যান্ডউইচ , কেক, আপেল,কলা , মিষ্টি , প্যাকেটজাত ফলের রস সবকিছুরই ছিল ব্যবস্থা । একপলকে সব কিছুর ওপর চোখ বুলিয়ে  দর্জিলদা বলল, "ভূতের রাজা  তোদের বর- টর দিয়েছে নাকি !  সব ঠিক আছে , তবে ফ্রুট জুস চলবে না। চলবে ব্ল্যাক টি । আমি দারুণ ফ্লেভারের ভালো পাতা- চা নিয়ে এসেছি তোদের জন্য। সেটা দিয়েই দুধ- ছাড়া চা চটপট বানিয়ে ফ্যাল দেখি।"

"চা!"  আমরা দু"জনেই প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম।

দর্জিলদা ভীষণ অবাক হল । বলল , "আঁতকে ওঠার কী হল , বলিনি তো সবাই মিলে উচ্ছের রস খাব ! "

--- 2 ---

"আসলে..মানে...", ঠেকে ঠেকে কোনোক্রমে কথাটা বলেই ফেলল সুজিত, "আমাদের বাসন- টাসন  তেমন নেই। আছে শুধু একটা ছোটো ডেকচি , গোটাকয়েক চামচে, ডজনদুয়েক কাগজের কাপ আর ডজনখানেক কাগজের প্লেট। সবচেয়ে বড়ো কথা, নেই চা- ছাকনি। তাই ইচ্ছে হলেও চা করতে পারি না, কফি পাউডার দিয়ে কালো কফি খেয়েই খুশি থাকতে হয়।"

হো হো করে হেসে উঠল দর্জিলদা, "হাতি- ঘোড়া নয়,  সমস্যার মূলে তাহলে সামান্য একটা চা- ছাকনি ! তবে এটা ফাঁপড়ে পড়ার মতো ব্যাপারই নয়। পাতা- চা হলে ছাকনি ছাড়াও চা বানানো যায় স্বচ্ছন্দে। আজ তোদের শিখিয়ে দেব কায়দাটা। সুজিত, তিন কাপের চেয়ে সামান্য বেশি জল ডেকচিতে বসিয়ে দে।"

অন্য কেউ হলে আমরা এমনধারা আজগুবি বক্তব্য মেনে নিতাম না, তর্ক জুড়তাম নির্ঘাত। কিন্তু দর্জিলদার কথার দামই আলাদা। তবে মনে যে একটু ধন্ধ রয়েই গিয়েছিল সেকথা অস্বীকার করব না।

ডেকচিতে জল মেপে সেটা হিটারে চাপাল সুজিত। ফুটবার উপক্রম হতেই দর্জিলদা এগিয়ে গেল চা বানাতে। আমরা মনোযোগ সহকারে দর্জিলদার  কর্মকাণ্ড লক্ষ করতে  থাকলাম। পরের ঘটনাক্রম সংক্ষেপে এইরকম :

জল ভালোভাবে ফুটতে শুরু হতেই হিটারের সুইচ অফ্ করে আন্দাজমত চা পাতা দেওয়া হল ডেকচির জলে। পাতাগুলো শুরু করল বিচিত্র নৃত্য- সামান্য ডুবছে , পরক্ষণেই ভেসে উঠছে, সাঁ করে দৌড় লাগাচ্ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে- - মানে এরকম ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনটাই।

মিনিটখানেক পরে ডেকচিটা হিটার থেকে মাটিতে নামিয়ে রাখা হল। অচিরেই পাতার গতিবিধি শ্লথ হতে থাকলো। সময়ের সাথে শুরু হল থিতিয়ে পড়ার প্রবণতা। এক মিনিটও কাটল না, সব পাতাই এসে জড়ো হল নিচে। অত: পর তিনটি কাগজের কাপে সুগার কিউব রেখে সাবধানে ডেকচিকে কাত করে লিকার ঢালা হল কাপে। যৎসামান্য লিকার ও থিতিয়ে পড়া পাতাগুলো রয়ে গেল ডেকচিতেই। এভাবে ছাঁকনি ব্যবহার না করেই তৈরি হল গরমা- গরম চা।

বিস্ময়ের ঘোর কাটার পর প্রথম কথা বললাম আমি, “কী সাংঘাতিক কাণ্ড! দর্জিলদা , তুমি কি ম্যাজিক জানো ?”

স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হল দর্জিলদার মুখ। উত্তর দিল , “ম্যাজিকই বটে! তবে ভানুমতীর খেল্ নয়, বিজ্ঞানের ম্যাজিক ! ”

“চা পাতাগুলো প্রথমে কিছুক্ষণ প্রচুর নাচানাচি করলেও একটু পরেই যেন হতোদ্যম হয়ে থিতিয়ে পড়ল। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার! এই ভোল পাল্টানোর কারণটা সহজ করে বুঝিয়ে দাও না দর্জিলদা।” অনুরোধ করল সুজিত।

“খুবই সোজাসাপটা ব্যাপার,” ব্যাখ্যান শুরু করল দর্জিলদা, “গরম ডেকচির সংস্পর্শে এসে নিচের জল গরম হতে থাকে। ঠাণ্ডা জলের তুলনায় গরম জল হালকা। তাই নিচের জল ওপরে ওঠে , আর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে ওপরের অপেক্ষাকৃত ভারী জল মাধ্যাকর্ষণের টানে নামে নিচে। এই প্রক্রিয়া, বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম “পরিচলন”, চলতে থাকে আর এভাবেই পুরো জলটা গরম হতে থাকে এবং অবশেষে ফুটতে শুরু করে।

হিটার বন্ধ করার সাথেসাথেই পরিচলন বন্ধ হয় না। তবে হিটার থেকে মাটিতে নামানোর পর ঠান্ডা মেঝের সংস্পর্শে এসে এই ক্রিয়া থেমে যায়। ফুটন্ত জলে চা পাতা ফেলার সময় পরিচলন স্রোতের ঊর্ধ্বমুখী ঠেলা ও মাধ্যাকর্ষণের নিম্নমুখী টানে পড়ে টালমাটাল অবস্থা হয় পাতাগুলোর। প্রথমদিকের পাতার নাচের কারণ এটাই। পরের দিকে ঠেলা না থাকলেও টানটা থেকেই যায়। তাই পড়ে থিতিয়ে। পাতাগুলো থিতু হওয়ার পর পাত্রটাকে সন্তর্পণে কাত করে ওপরের পাতাহীন লিকারকে কাপে ঢালতে অসুবিধে হয়না। পদ্ধতিটার পোশাকি নাম আস্রাবণ। নাম গালভরা হলেও খুবই সহজ ব্যাপার, তাই না?”

“তুমি চা খেতে জেদ ধরলে বলেই আজ অনেককিছু শিখতে পারলাম,” অকপটে স্বীকার করলাম আমি।

“শুধু শিখলেই কী পেট ভরবে ? ওদিকে চা তো জুড়িয়ে শরবত হতে চলল!”

দর্জিলদার কথায় সবাই হেসে উঠলাম।

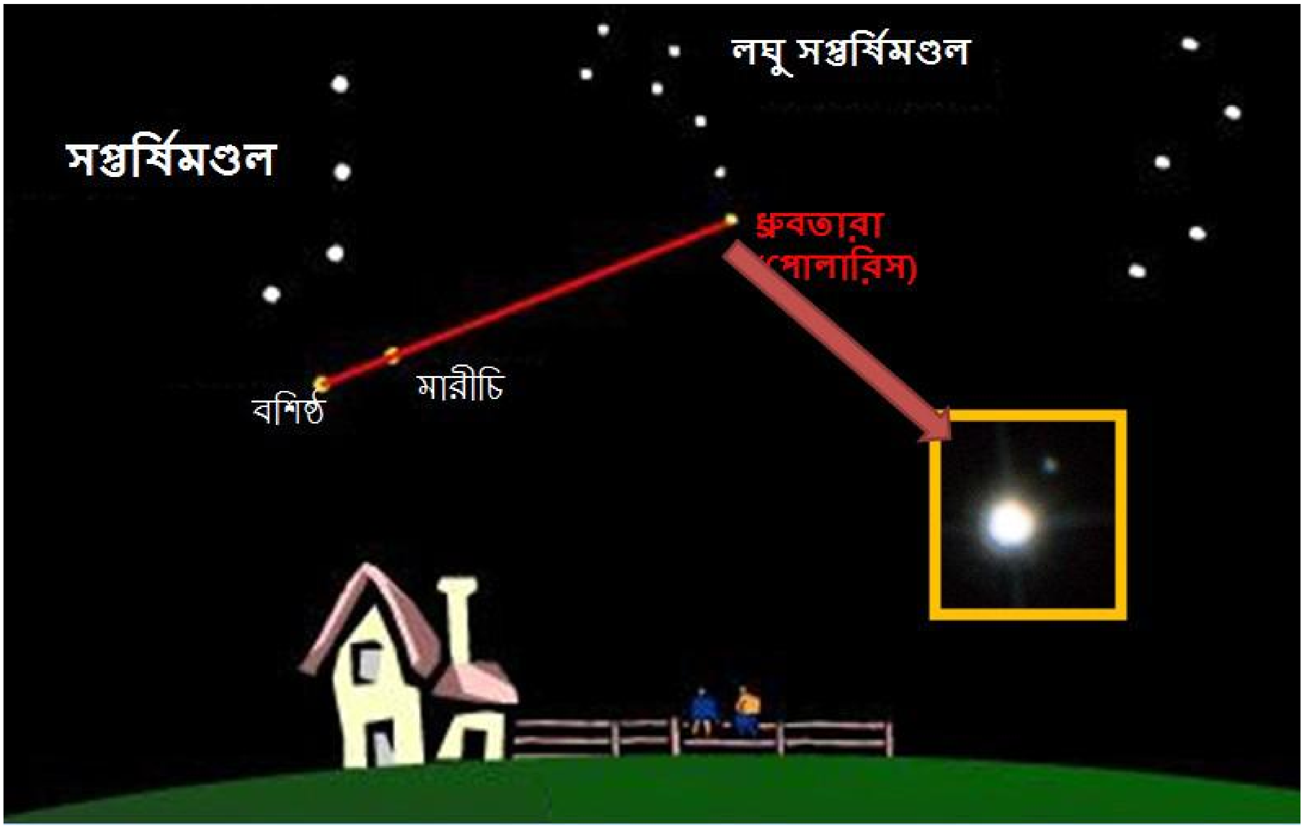


# ‘ধ্রুবতারা’ ধ্রুব নয়

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সীমাহীন মহাবিশ্বে রয়েছে অসংখ্য তারাজগত। এক একটি তারাজগতের মধ্যে আছে লক্ষ কোটি নক্ষত্র। এরকমই একটি তারাজগতের নাম ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা। এখানে নক্ষত্র বা তারা আছে দশ হাজার কোটি। আমাদের সূর্য তার মধ্যে একটি। ছায়াপথের এক প্রান্তে থাকা সূর্যকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সৌরজগত। এই সৌরজগতের একটি গ্রহ পৃথিবী যেখানে আমাদের বাস।

সূর্যের আলোয় দিনে আকাশের দিকে তাকানো যায় না। সূর্য অস্ত গেলে, রাত নেমে এলে, আকাশের চেহারা পাল্টে যায়। ঝলমল করে ওঠে গ্রহ, উপগ্রহ আর লক্ষ লক্ষ তারা- যেন কালো ভেলভেটের উপর বসানো মণিমুক্তা। মিট্ মিট্ করে জ্বলা দূর আকাশে এদের দেখতে ভালোবাসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তারারা আমাদের বন্ধু। যখন কম্পাস ছিল না তখন এরাই কম্পাসের কাজ করত। আদ্যিকালে নাবিকেরা রাতের অন্ধকারে এই তারাদের দেখেই পথ খুঁজে পেত। ঋতুর পরিবর্তন, চাষবাসের সময় ইত্যাদি বুঝতেও প্রাচীনকালের মানুষেরা আকাশের তারাদের উপর নির্ভর করত। ক্যালেন্ডার আবিষ্কারের আগে আকাশে এদের অবস্থান দেখেই সময়ের হিসেব রাখা হত।

দিনে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় তারাদের দেখা যায় না। তাই সন্ধ্যা থেকে ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা এদের দেখতে পাই। তবে আকাশের সব তারাকে আমরা একসঙ্গে দেখতে পাই না। আবার সব তারাকে সব সময়ও দেখতে পাই না। পৃথিবীর

উত্তর গোলার্ধে আমরা যারা থাকি তাদের পক্ষে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশ দেখা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষ উত্তর গোলার্ধের আকাশের তারাদের দেখতে পায় না।

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সব তারাই পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সরে সরে যায়। শুধু একটি তারা আছে যেটা কখনও নড়াচড়া করে না। সন্ধ্যার আকাশে একে যেখানে দেখা যায় ভোররাতেও সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর গোলার্ধের এই স্থির তারাটি 'ধ্রুবতারা' নামে পরিচিত।

সব তারা নড়াচড়া করলেও এই তারাটি নড়ে না কেন? এর কারণ তারাটির অবস্থান। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে যেমন ঘুরছে তেমন নিজের অক্ষের উপর লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে। পৃথিবী পাক খাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। সেই সঙ্গে আমরাও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছি। তাই আকাশের তারাদের দেখে মনে হয়, ওরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ওরা সরছে না, সরছি আমরা। ধ্রুবতারা আছে পৃথিবীর অক্ষ বরাবর। বলা যায় পৃথিবীর ছাদের উপর। আমরা কোনো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যদি নিজের চারপাশে ঘুরতে থাকি তাহলে এক একবার ঘরের এক একটি দেওয়াল দেখতে পাব। কিন্তু মাথার উপর ঘরের ছাদে যে ফ্যানটা ঝুলছে সেটা সব সময় দেখতে পাব। ধ্রুবতারার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটছে।

রাতের আকাশে তাকালে মনে হবে কিছু তারা মিলে যেন এক একটি ছবি এঁকে রেখেছে। কোনটা মানুষের মত, কোনোটা জীবজন্তুর মত আবার কোনোটা বা অন্য ধরনের।

এরকমই জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত একটি ছবি আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। সাতটি তারাকে নিয়ে এই ছবি তৈরি হয়েছে। একে আমরা বলি সপ্তর্ষিমণ্ডল (Constellation Ursa Major) তারাদের চেনার জন্য প্রাচীনকালের মানুষ আশপাশের কিছু তারাকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে জুড়ে নানা পার্থিব আকৃতির সঙ্গে মিল খোঁজার চেষ্টা করেছে। এক একটা আকৃতি- বিশিষ্ট তারাদের একসঙ্গে বলা হয় মণ্ডল (Constellation)। আকাশে এরকম ৮৮টা মণ্ডল আছে। জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত সপ্তর্ষিমণ্ডলের মাথা বরাবর একটা কাল্পনিক রেখা যদি টানা যায় তবে সেটা গিয়ে ধ্রুবতারাকে স্পর্শ করবে। তাই অসংখ্য তারার ঝাঁকের মধ্য থেকে ধ্রুবতারাকে খুঁজে পাওয়া আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়।

ধ্রুবতারাকে রোজই দেখা যায়। সন্ধ্যা থেকে ভোররাত- প্রতিদিনই সে দাঁড়িয়ে থাকে উত্তর মেরু বরাবর। হঠাৎ যদি সেটা ভ্যানিশ হয়ে যায়, কেমন হবে? যত উদ্ভট কথা। তা আবার হয় নাকি? সেই প্রাচীনকাল থেকে ধ্রুবতারাকে দেখে আসছি, এখনও দেখছি, ভবিষ্যতেও দেখব। হ্যাঁ, ভবিষ্যতেও ধ্রুবতারা দেখব তবে এই তারাটিকে নয়। এখন ধ্রুবতারা নামে যে তারাটিকে আমরা দেখি তার প্রকৃত নাম “পোলারিস”। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মত আকাশে আরও একটি সাতটি তারার মণ্ডল আছে। এর নাম লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল বা শিশুমার মণ্ডল(Constellation Ursa Minor)। এই মণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা পোলারিস। এই তারাটি সূর্যের তুলনায় পঞ্চাশ গুণ বড়। স্বাভাবিকভাবে এর আলোও বেশি। সূর্যের তুলনায় আড়াই হাজার গুণ বেশি আলো দেয় এই তারাটি। পৃথিবী থেকে অনেক দূরে( ৪৩০ আলোক বর্ষ) থাকায় সাধারণ উজ্জ্বল তারার মত দেখায়।

প্রায় দু’হাজার বছর আগে পোলারিস ধ্রুবতারার আসন দখল করে। অর্থাৎ, এই তারাটি পৃথিবীর অক্ষের কাছাকাছি চলে আসে। বর্তমানে এটি অক্ষের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক অক্ষ বরাবর অর্থাৎ, অক্ষের উপর আসতে তারাটির আরও প্রায় ৮৮ বছর সময় লাগবে। অর্থাৎ, আগামী ২১০০ সালে পোলারিস ঠিক উত্তর মেরুর উপরে আসবে। তারপর আবার শুরু হবে একটু একটু করে সরে যাবার পালা। এখন প্রশ্ন হল, পোলারিসের আগে ধ্রুবতারার জায়গাটি কার দখলে ছিল? নাকি ধ্রুবতারা বলে কিছু ছিলই না? তাহলে তো পোলারিস সরে গেলে ধ্রুবতারা আবার ভ্যানিশ হয়ে যাবে? না, পোলারিস সরে গেলেও ধ্রুবতারা থাকবে। রাজার সিংহাসনে যেমন রাজা বদল হয়, তেমন নির্দিষ্ট সময় অন্তর ধ্রুবতারার স্থান বিভিন্ন তারার দখলে যায়।

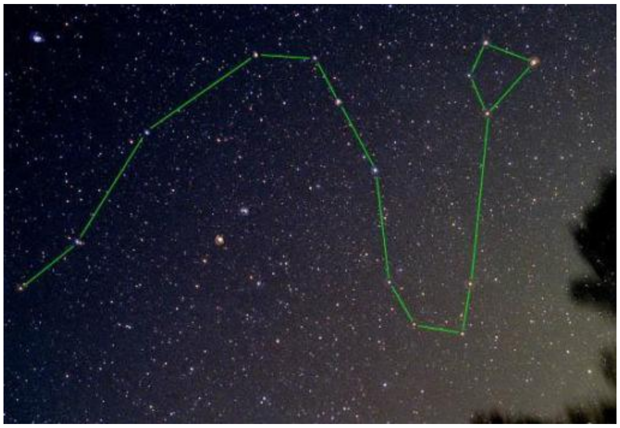

কালেয় নক্ষত্রমণ্ডলের(Constellation Draco) সবচেয়ে উজ্জ্বল তারার নাম

‘থুবান’। পোলারিসের আগে এই তারাটিই ধ্রুবতারা নামে পরিচিত ছিল। তিন হাজার বছরের পুরানো মিশরের পিরামিডের গায়ে থুবানের কথা উৎকীর্ণ আছে। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে এই তারাটিকে প্রচেতা বা ধ্রুব নামে উল্লেখ আছে। খ্রিস্ট জন্মের দু’হাজার আটশ বছর আগে থুবান উত্তর মেরুর ঠিক উপরে ছিল। তারপর একটু একটু করে সরতে থাকলেও প্রায় তিন হাজার বছর সে তার ধ্রুব অবস্থান বজায় রেখেছিল। তারপর পোলারিসকে সে তার সিংহাসন ছেড়ে দেয়। পোলারিস এখনও আরও দু’হাজার বছর রাজত্ব করবে। অর্থাৎ, সে ৪০০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত আমাদের কাছে ধ্রুবতারা হয়েই থাকবে।

তারপর তাকে ধ্রুবত্বের আসন ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে। এতদিনের রাজ্যপাট সব তুলে

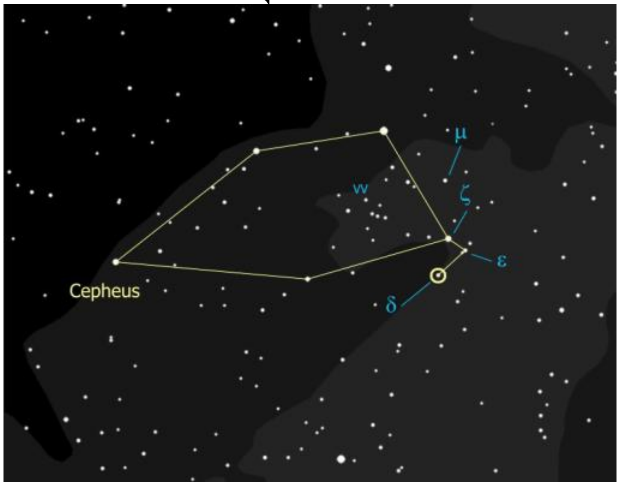


দিতে হবে বর্ষপর্ব মণ্ডলের(Constellation Cepheus) তারা ‘আলরাই’- এর(Alrai) হাতে। এই তারাটির রাজত্বকাল অবশ্য বেশিদিনের হবে না। হাজার দুই বছর পরেই তার জায়গায় চলে আসবে একই নক্ষত্রমণ্ডলের তারা ‘অগ্নিসম’(Alprik)। এখন থেকে প্রায় বারো হাজার বছর পরে বীণামণ্ডলের(Constellation Lyra) তারা ‘অভিজিৎ’(Vega) হবে ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারাদের মধ্যে এই তারাটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল। এইভাবে চলতে থাকবে পালা বদলের পালা।

বর্তমানের তারাটি অর্থাৎ, পোলারিস আর কি ফিরে আসবে ধ্রুবতারার আসনে? আসবে। প্রায় পঁচিশ হাজার আটশ বছর পরে। উত্তর মেরুর আকাশে যতগুলি মন্ডল আছে তাদের একটা চক্র পূর্ণ করতে ঐ সময় লাগে।

কেন এমন হয়? ধ্রুবতারা ধ্রুব হয় না কেন? মেরু আকাশের মন্ডলগুলি কেন সরে সরে যায়, আর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তারা ধ্রুবতারা হয়?

এর জন্য দায়ী কিন্তু আমাদের পৃথিবী। উত্তর মেরুর আকাশের মণ্ডলগুলি স্থির হয়েই আছে। অল্প অল্প করে সরে যায় পৃথিবীর অক্ষরেখা। অক্ষরেখার এই সরে যাওয়ার গতিকে বলা হয় ‘সূক্ষ্মগতি’(precession)। এই কারণেই ধ্রুবতারা স্থির হলেও চিরস্থির নয়। তাই নির্দিষ্ট সময় পর পর নতুন কোনো তারা ধ্রুবতারার স্থান দখল করে।

পৃথিবীর অক্ষরেখায় এই সূক্ষ্মগতি হওয়ার কারণ গ্রহটির আকৃতি এবং এর উপর সূর্যের আকর্ষণ। পাশাপাশি অবশ্য চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহেরও টান রয়েছে।

কোনো কোনো মানুষের পেটে চর্বি জমে ভুঁড়ি হতে দেখা যায়। পৃথিবীর পেটে অর্থাৎ, নিরক্ষীয় অঞ্চলে অতিরিক্ত ভর জমে সেরকমই ভুঁড়ির মত তৈরি হয়েছে। একুশ কিলোমিটার পুরু এই অতিরিক্ত ভর পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। এই কারণেই পৃথিবীর মেরুদেশ দুটি কিছুটা চাপা আর নিরক্ষীয় অঞ্চল কিছুটা মোটা। এই বাড়তি ভরের জন্য পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর একটু হেলেদুলে ঘোরে। এই হেলেদুলে

ঘোরার দরুনই সূক্ষ্মগতির সৃষ্টি। পৃথিবীর এই হেলেদুলে ঘোরার কারণ ঐ বাড়তি ভরের বেল্টের উপর সূর্যের আকর্ষণ। সূর্য যখন নিরক্ষীয় রেখা(**equator**) বরাবর (২১ মার্চ এবং ২১ সেপ্টেম্বর) থাকে তখন আকর্ষণ লম্বভাবে এই বেল্টের উপর পরে। ফলে সেসময় কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু যখন কর্কটক্রান্তি(**Tropic of cancer**) বা মকরক্রান্তিতে (**Tropic of Capricorn**) থাকে তখন বেল্টের উপর এই টান তেরচা ভাবে পড়ে। আর তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। ২১ জুন সূর্য কর্কটক্রান্তিতে আসে। এই সময় সূর্য বেল্টটিকে তেরচাভাবে টানতে থাকে। আমরা জানি মহাকর্ষ বল দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতি। যেহেতু বেল্টের উত্তর প্রান্ত ও দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে সামান্য হলেও দূরত্বের একটা পার্থক্য থাকে তাই দুই প্রান্তে সূর্যের আকর্ষণেরও তারতম্য ঘটে। এর ফলে পৃথিবীর অক্ষরেখা খুব ধীরে ধীরে কাঁপতে থাকে। এই কাঁপনের ফলেই তৈরি হয় সূক্ষ্মগতি। পৃথিবীর এই বেল্টের উপর সূর্য, চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহদের সম্মিলিত আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর সূক্ষ্মগতির মান দাঁড়ায় বছরে ৫০.২৯ সেকেন্ড অফ আর্ক। এই সূক্ষ্মগতির দরুন পৃথিবীর অক্ষ ধীরে ধীরে সরে যায় এক মণ্ডল থেকে আর এক মণ্ডলের দিকে। অক্ষরেখার সূক্ষ্মগতি খুব কম হওয়ায় এই সরে যাওয়া কাজটি ১-২ দিনে হয় না। দীর্ঘ সময় লাগে। আর যখন যে মণ্ডলের যে তারা বরাবর পৃথিবীর অক্ষরেখা থাকে তখন সেই তারাটিই আমাদের কাছে ধ্রুবতারা নামে পরিচিত হয়।

আগেই বলেছি, বর্তমান ধ্রুবতারা 'পোলারিস' শিশুমার নক্ষত্রমণ্ডলের একটি তারা। এই মণ্ডলটিকে প্রাচীনকালের পন্ডিতগণ হাঁটু ভাঁজ করা মানুষ রূপে কল্পনা করেছিলেন। আর এই কল্পনা থেকেই প্রাচীন ভারতে জন্ম নেয় রাজা উত্তানপাদের পুত্র 'ধ্রুব'-র সিংহাসন লাভের কাহিনী। আপাত দৃষ্টিতে একে আষাঢ়ে গল্প মনে হলেও এর পিছনে রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা। এই গল্পের 'ধ্রুব' প্রকৃতপক্ষে পোলারিস তারা। আর ধ্রুব-র সিংহাসন লাভ হল থুবানের জায়গায় পোলারিসের মেরুতারকা হওয়া। এই কাহিনী থেকে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতের পন্ডিতেরা জানতেন যে ধ্রুবতারা ধ্রুব নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তারা ধ্রুবতারার স্থান নেয়। একথা ঋগ্বেদেও উল্লেখ আছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধ্রুবতারা নিয়ে বিভিন্ন কাহিনী আছে। ফিনিশীয়দের 'সাম্পো অপহরণ' কাহিনী প্রকৃতপক্ষে এক ধ্রুবতারা থেকে অন্য ধ্রুবতারার পরিবর্তনের কথা।

মানুষের লেখা গল্পগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ছল-চাতুরির কথা লেখা থাকলেও মহাকাশে কিন্তু এমন কোনো ঘটনা ঘটে না। সেখানে যা কিছু ঘটে প্রকৃতির নিয়মেই ঘটে। পোলারিসের আগে থুবান ছিল ধ্রুবতারা। প্রাকৃতিক নিয়মেই নির্দিষ্ট সময়ের পরে সে সরে গেছে, এসেছে পোলারিস। সময়কাল পূর্ণ হলে পোলারিসও সরে যাবে। তখন ধ্রুবতারা হবে আলরাই। এই ভাবেই চলতে থাকবে পৃথিবীর অক্ষরেখার সূক্ষ্মগতির চক্র। একটি চক্র পূর্ণ হতে সময় লাগে ২৫৮০০ বছর। তাই বলা যায় একবার ধ্রুবতারার আসন পাবার পর প্রতিটি তারাকে দ্বিতীয়বার ধ্রুবতারার আসন পেতে পঁচিশ হাজার আট'শ বছর অপেক্ষা করতে হয়। বর্তমান ধ্রুবতারা পোলারিসকেও তাই করতে হবে।

# সায়ন – এক

অমিতাভ প্রামাণিক

হাইড্রোজেনের হাই ওঠে, তাই লাথি মারে লিথিয়াম।
সোডা খেলো সোডিয়াম, ফুলাচ্ছে পেটটা পটাশিয়াম।
রুবিদি রয়েছে রুবিডিয়ামে তো, সিজিয়াম পড়ে সিজার –
ফ্রান্স ঘুরে এলো ফ্রান্সিয়ামটা, মস্তকে নেই ঘি যার!

এই সব এলিমেন্টরা রয়েছে পিরিয়ডিক টেবিলে
ফার্স্ট গ্রুপে সব একজোট হয়ে, মুখস্ত করে নিলে?
একটা ইলেকট্রন উড়ে গেলে খালি হয়ে যায় ট্যাঁক
বাইরের শেলে, তাই তো এদের যোজ্যতা সব এক।

হাইড্রোজেনের সবেধন ঐ ইলেকট্রনটা ছাড়া
রয়েছে কেবল একটা প্রোটন। তাই সে সর্বহারা
হয়ে যায় ঐ ইলেকট্রনটা কোনভাবে গেলে চলে।
তখন সে শুধু একটা প্রোটন, ডাকা হয়ও তাই বলে।

অ্যাসিড যেগুলো, তাদের মধ্যে ঘটে তো এই ব্যাপারই।

মোটামুটি সব অ্যাসিডেই আছে হাইড্রোজেন। আর তারই
ইলেকট্রনটা ছেড়ে যায় তাকে যেই হয় ফেলা জলে –
কিলবিল করে প্রোটনরা সব চারিদিকে দলে দলে।

জলের অণুরা ঘিরে ধরে সেই প্রোটনকে এই বেলা।
তৈরি হয় এক নতুন জিনিস বিচিত্র সেই খেলা!
ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জ, যেই সেটা হয় দূর,
পজিটিভ চার্জ নিয়ে প্রোটনরা খুশি খুশি ভরপুর।

হাইড্রোজেনের সিম্বল জানো? সেটা তো এইচ। বাস,
নেগেটিভ চার্জ চলে গেছে, তাই প্রোটন এইচ প্লাস।
এইচ টু ওর সাথে মিলে গিয়ে এইচ -থ্রি ও প্লাস হতে
হাইড্রোনিয়াম আয়ন নামেতে ঘুরে মরে সেই স্রোতে।

অ্যাসিড বংশ ছোটখাট নয়, অনেকেই তার শরিক।
পাকস্থলির রসে রয়েছেন শ্রীমান হাইড্রোক্লোরিক;
নাইট্রিক, সালফিউরিক এরা মিনারেল প্রজাতির।
জীবজগতেও এরা কমবেশি করে আছে বেশ ভিড়।

যা যা খেতে টক, তার অন্দরে উঁকি মেরে দেখো, ঝিলিক
মারবে যে সব অ্যাসিড, তাদের আছে কার্বক্সিলিক
নামে এক গ্রুপ, সি ও ও এইচ, বুঝতে হচ্ছে কি লেট?
জলে গুলে গিয়ে এরাই প্রোটন আর কার্বক্সিলেট।

দইয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে, তেঁতুলে টার্টারিক;
কাঁচা আমে আছে ম্যালিক অ্যাসিড, লেবুটাতে সাইট্রিক।
কোনটা অ্যাসিড কীভাবে বুঝবে? না না, ফুলিও না গাল –
খুব সোজা, এরা সবগুলো করে নীল লিটমাস লাল।

অ্যাসিড হয়েছে? চোঁয়া ঢেকুরের বেড়ে গেছে খুব স্পিড?
ঘাবড়িও না তো, গালে ফেলে দাও একটু অ্যান্টাসিড।
তারা কী রকম? কী যৌগে থাকে অ্যান্টাসিডের স্মারক?
উত্তর পাবে নেক্সট ইস্যুটাতে। শুধু জেনে রাখো – ক্ষারক!

টেকনো টুকটাক

# রেল কাম ঝমাঝম

কিশোর ঘোষাল

‘পথের পাঁচালী’র সেই ঐতিহাসিক দৃশ্য

**মা**ঠভরা কাশফুল হাওয়ায় এলোমেলো দুলছে। ওদিকে দূরে মাঠের ওপারে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটে যাচ্ছে রেলগাড়ি। আর রেলগাড়ি দেখবে বলে মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে চলেছে দিদি দুগ্‌গা আর তার ভাই অপু। সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালি’ সিনেমার এই অতুলনীয় দৃশ্য যারা দেখেছ, তারা নিশ্চয় ভুলতে পারবে না সেই রেলগাড়ির কথা।

১৯৬৮ সালে আমি যখন তোমাদের মতো কিংবা তোমাদের চেয়েও ছোট্ট ছিলাম বার দুয়েক ঐ রকম রেলগাড়িতে চড়েছিলাম, কলকাতা থেকে কালনা যাবার সময়। সে ট্রেনের নাম ছিল বাজারসাউ প্যাসেঞ্জার। রেলগাড়ি বলতেই আমাদের যে ‘কুউউউ- ঝিক- ঝিক’ কথাটা মনে আসে, সেই ট্রেনটা ছিল ঠিক তাই। বেজায় শব্দ করে ধীরেসুস্থে এগিয়ে চলত সেই ট্রেন। খুব গড়িমসি, আলসে ধরনের তার চালচলন। প্রত্যেক স্টেশনে দাঁড়ানোর পর আবার চলতে যেন তার ইচ্ছেই হত না। ইঞ্জিনের বয়লারে বেলচা করে কয়লা ভরে দিতেন ড্রাইভারমশাই, মাথার ওপরটা ভরে উঠত কয়লার ধোঁয়ায়, সঙ্গে থাকত কয়লার গুঁড়ো। বাবা বলতেন, ওপরে তাকাস না, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে। তারপর ফোঁস ফোঁস শব্দ করে ইঞ্জিনের তলা থেকে বেরিয়ে আসত বাষ্প, রেলগাড়ি খুব অনিচ্ছায় নড়ে উঠত সামনের দিকে। মাঝে মাঝেই ক্লান্ত হয়ে, বড়ো বড়ো জাংশান স্টেশনে দাঁড়িয়ে সেই রেলগাড়ি ঢকঢক করে বিস্তর জল খেত, রেল কোম্পানির লম্বা গলা জিরাফের মতো উঁচু পাইপ থেকে। আর চলার পথে মাঝে মাঝে ডেকে উঠত কুউউউউউ...। সেই রেলগাড়ি ঘণ্টায় ৩০/৪০ কিমির বেশি দৌড়তে পারত বলে মনে হয় না।

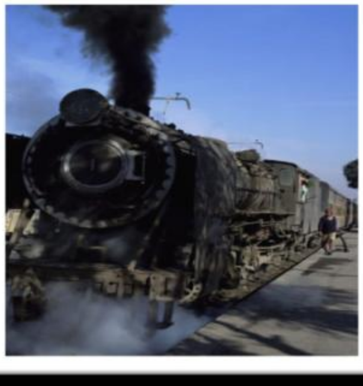

ভারতবর্ষে ১৮৫৩ সালে মুম্বাই থেকে থানের মধ্যে প্রথম যে রেলের ওপর চাকা গড়ানো শুরু হয়েছিল, সেই চাকা গড়াতে গড়াতে বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম ও ব্যস্ততম রেল পরিষেবায় ভারত আজ অন্যতম। বয়লারের মধ্যে কয়লার আগুনে জল গরম করে, তার স্টিম মানে বাষ্প দিয়ে রেলগাড়ি চালানোর স্টিম ইঞ্জিন বা স্টিম লোকোমোটিভ ভারতবর্ষে শেষ বানানো হয়েছিল ১৯৭০

সালে, তার নাম ছিল ‘অন্তিম সিতারা’ বা ‘শেষ তারা’। তার আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল ডিজেল ইঞ্জিনে টানা রেলগাড়ির যুগ। এই রেলগাড়ি অনেক ছটফটে, চৌখস এবং অনেক বেশি ক্ষমতাশালী। এই চটপটে ডিজেল ইঞ্জিনকেও পিছনে ফেলে দিয়ে বেশ অনেকদিন হল এগিয়ে এসেছে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন, আরো বেশি চটপটে আর পরিবেশবান্ধব। কয়লা কিংবা ডিজেলের মতো ধোঁয়া ছড়িয়ে কালো করে দেয় না আকাশকে কিংবা বাতাসকে।

ভারতবর্ষে প্রথম ডিজেল ইঞ্জিন চালু হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। কিন্তু তড়িৎ-চুম্বকিয় পদ্ধতির (EMU) বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয়ে গিয়েছিল ১৯২৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি, প্রথম ডিজেল ইঞ্জিন চালু হওয়ার বেশ কিছুদিন আগেই। সেসময় শুধু শহরতলির কম দূরত্বের মধ্যেই এই বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয়েছিল।

বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে হল, এর বিশালরকম প্রাথমিক খরচ। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে রেললাইন পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিবহণ, রেলের লাইন বরাবর ট্রেনের মাথার ওপর বিদ্যুতের নিয়মিত সংযোগ এবং তার সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে সময়ও লাগে, আর খরচও হয় বিপুল। তবে প্রথম দিকের এই ব্যয় একবার করে ফেলতে পারলে, বৈদ্যুতিক ট্রেনের তুলনামূলক খরচ অনেকটাই কম এবং সুবিধেও অনেক। ভারতে এই বৈদ্যুতিকরণের কাজ জোরদারভাবে শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পর। ভারতের মোট রেল লাইনের পরিমাণ প্রায় ৬৫,৪৩৬ কিমি, সেখানে ২০১৪ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ২৪,৮৯১কিমি রেল লাইনে বৈদ্যুতিকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

আধুনিক রেলযাত্রার শুরু হয়েছিল ১৮২০ সালে ইংল্যাণ্ডে। আগেই বলেছি আমাদের দেশে ১৮৫৩ সালে প্রথম রেলযাত্রা শুরু হয়েছিল এবং ১৯৪০ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বে চতুর্থ স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল রেলপথের দৈর্ঘে। কিন্তু সেই তুলনায় রেল পরিষেবার উন্নতি ঘটেছে খুবই ধীর গতিতে। আজও ভারতের দ্রুততম ট্রেনের গতি গড়ে মাত্র ৯০কিমি প্রতি ঘণ্টার আশেপাশে। ভারতের দ্রুততম ট্রেন নিউদিল্লি-ভূপাল শতাব্দি গড়ে ৯১.৮২কিমি প্রতি ঘন্টায় দৌড়োয়। আমাদের দ্বিতীয় দ্রুততম ট্রেন মুম্বাই-নিউদিল্লি রাজধানীর গতি গড়ে ৯১.৪২ কিমি প্রতি ঘন্টায়। আর শিয়ালদা-নিউদিল্লি দুরন্ত ভারতের তৃতীয় দ্রুততম ট্রেন, যার গতি গড়ে ৯১.১৩ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। সারা বিশ্বের তুলনায় আমাদের রেল পরিষেবার উন্নতির বহর বেশ মন্থর, সে গতির দিক থেকেই হোক, যাত্রী নিরাপত্তার দিক থেকেই হোক, কিংবা শৃঙ্খলা বা সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারই হোক।

চিনের সুপারফাস্ট

এখন বিশ্বে কোথায় কোন ট্রেন কীভাবে দৌড়চ্ছে তার একটু খোঁজখবর নিলেই, ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

জাপানের বুলেট

আমাদের থেকে প্রায় প্রায় ৫৫ বছর পরে, চিনে ১৯০৮ সালে সাংহাই থেকে নানজিং প্রথম রেলযাত্রা শুরু হয়েছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই ট্রেন ছিল স্টিম ইঞ্জিনের। সেই চিনদেশেই ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে উহান শহর থেকে গুয়ানঝাউ শহর পর্যন্ত ৯২২ কিমি পথ পাড়ি দিয়েছিল যে ট্রেনটি তার গতি ছিল গড়ে ৩৮০ কিমি

প্রতি ঘন্টায়, যদিও পরীক্ষার সময় এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি ছিল ৪৮৭.৩ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। এই ট্রেনটিই এখনো পর্যন্ত বিশ্বের দ্রুততম বাণিজ্যিক ট্রেন। এই ট্রেনের ইঞ্জিনটিও তড়িৎ- চুম্বকিয় পদ্ধতির (EMU) বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন, যদিও আমাদের চেয়ে যে অনেক উন্নত প্রযুক্তির, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম ট্রেনটি চলছে জাপানে, এই ট্রেনটির নাম শিংকানসেন, যাকে আমরা সবাই বুলেট ট্রেন বলেই জানি। এই ট্রেনটির পরীক্ষিত গতি ৪৪৩ কিমি প্রতি ঘন্টায়, যদিও সাধারণভাবে গড়ে ৩২০কিমি প্রতি ঘণ্টায় এই ট্রেনটি দৌড়ে থাকে।

বিশ্বের তৃতীয় দ্রুততম ট্রেনটি চলছে ফ্রান্সে, এই ট্রেনটির নাম টি জি ভি রুশু এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি ৩৮০ কিমি প্রতি ঘন্টায় হলেও, সাধারণতঃ এই ট্রেন গড়ে ৩২০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় চলে। ১৯৯৬ সাল থেকে এই ট্রেন যাত্রী পরিষেবা দিয়ে চলেছে, এই ট্রেন ৩৭৭ জন যাত্রী বহন করতে পারে।

ফ্রান্সের TGV রুশু

এই গতিতেও কিন্তু থেমে নেই চিনের এবং অন্যান্য দেশের প্রযুক্তিবিদেরা, আরো দ্রুত আরো উন্নত রেল পরিষেবার জন্যে তাঁরা কাজ করছেন ম্যাগলেভ ট্র্যাক এবং ম্যাগলেভ ট্রেন নিয়ে। ম্যাগলেভ কথাটা দুটো শব্দ থেকে বানানো- ম্যাগনেটিক লেভিটেশান (Magnetic Levitation) । তোমরা বিজ্ঞানে পড়েছ, চুম্বকের বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ হয় আর সমমেরুতে হয় বিকর্ষণ, মানে দুটো চুম্বকের একই মেরু কাছাকাছি আনার চেষ্টা করলে, তারা একে অন্যকে দূরে ঠেলতে থাকে।

এই ট্রেন যে লাইনের ওপর চলে (ছবিতে দেখ) সেটা সাধারণ রেল ট্র্যাক নয়, বিশেষভাবে বানানো চুম্বকের পাত বলতে পারো। ট্রেনের তলাতেও এইরকম একটি ধাতব পাত থাকে। নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুতের প্রবাহে ট্রেনের তলার ধাতব পাতে ট্র্যাকের চুম্বকের সমমেরুর চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করলে, চুম্বকের ধর্ম অনুযায়ী, পুরো ট্রেনটা ট্র্যাক ছেড়ে সামান্য ভেসে ওঠে এবং ট্রেন গতি পায়। একবার এই গতি পেয়ে গেলে, বিদ্যুতের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে ট্রেনের গতি বাড়ানো কিংবা কমানো চলে।

সাংহাই ম্যাগলেভ ট্রেন

সাংহাই পুডং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পুডং শহরের কেন্দ্র পর্যন্ত যে ৩০.৫০ কিমি রেলপথ সেই রেলপথের নাম সাংহাই ম্যাগলেভ টর‍্যাক এবং ট্রেনটির নাম সাংহাই ম্যাগলেভ ট্রেন। ২০০৪ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই ট্রেনটি পরীক্ষামূলক ভাবে ৫০১ কিমি প্রতি ঘন্টা গতিতে চালানো হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। যদিও বাণিজ্যিকভাবে এই ট্রেনের গতি গড়ে ৪৩১ কিমি প্রতি ঘন্টায়।

জার্মানি ম্যাগলেভ ট্রেন

জার্মানি ম্যাগলেভ ট্রেনটির সর্বোচ্চ গতি ৪৫০কিমি প্রতি ঘণ্টায়, কিন্তু নিরাপত্তার কারণে ৪২০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় চালানো হয়।

সারা বিশ্বে অনেক দেশেই খুব সীমিত পরিসরে, এই প্রযুক্তির ট্রেন চালু হয়ে গেছে কিংবা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এই সব দেশের মধ্যে  জাপান, কানাডা, আমেরিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ম্যাগলেভ ট্রেনের সুবিধে অনেক। যেহেতু এই ট্রেনের সঙ্গে লাইনের কোন সম্পর্ক থাকে না বরং শূন্যে ভেসে দৌড়ে চলে, সেই কারণে কোন শব্দ হয় না, কোন রকম ঝাঁকুনি ছাড়াই মসৃণ এর গতি। সাধারণ ট্রেনে রেলের ওপর ট্রেনের চাকার দুরন্ত গতির ফলে প্রচণ্ড ঘর্ষণে ট্রেনের চাকা, যন্ত্রপাতি এবং রেল ভীষণ ক্ষয়ে যায়, ক্ষতিও হয় বিস্তর। তার জন্যে প্রায়ই কারখানায় পাঠাতে হয় মেরামতির জন্যে। আর রেল মেরামতির জন্যেও নিয়মিত লক্ষ রাখতে হয়। ম্যাগলেভ ট্রেনে এই ক্ষয়ক্ষতি এবং এই রকম মেরামতি নেই বললেই চলে। কিন্তু যেহেতু এই ট্রেন পুরোপুরি সূক্ষ্ম প্রযুক্তি এবং কম্পিউটার নির্ভর, তাই সামান্য কিছু ভুলত্রুটি থেকেও মারাত্মক দুর্ঘটনাও হয়ে যায়। এরকম দুর্ঘটনা ঘটে গেছে জাপানে এবং জার্মানিতেও। তাই বলে বিজ্ঞানীরা কিন্তু মোটেই হাল ছাড়ছেন না, কম খরচে আরো দ্রুত দৌড়ে চলার নিরাপদ পরিবহণ পরিষেবার লক্ষ্যে, তাঁরা নিরন্তর দৌড়েই চলেছেন।

# আপেক্ষিকতা ও পদার্থবিজ্ঞানী অমল কুমার রায়চৌধুরি

সংহিতা

একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের সাধনার পথ সবসময়েই দুরূহ। ডক্টর অমল কুমার রায়চৌধুরির সাধনার কথা জানলে সে কথা আরও বেশি করে মনে হয়। ডঃ রায়চৌধুরির অন্বেষণ ছিল আপেক্ষিকতা নিয়ে। তাঁর গবেষক জীবনের ঊষাকালে তাঁকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট আলোকিত করতে তেমন মানুষ প্রায় কেউই ছিলেন না। কেবল ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস। তা তিনিও নারাজ ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী অমল কুমারের গবেষণা নিয়ে আলোচনা করে তাঁর গবেষণায় সাহায্য করতে। দীর্ঘকাল প্রায় একলব্যের মতো অমল কুমার সাধনা করে গেছেন। ফলও পেয়েছিলেন। যদিও তিনি প্রবাসে দীর্ঘকাল কাটান নি, তবুও বিদেশের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা জগতে তাঁর বেশ নামডাক হয়েছিল। চেনে নি তাঁকে তাঁর দেশের মাটিই, যতক্ষণ না বিদেশ থেকে স্বীকৃতির ঢেউ এসে দেশের মাটিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

ব্যাপারটা মজার শোনালেও খুব মজার নয়। স্টিফেন হকিং ভারতে যতটা পরিচিত, অমল কুমার রায়চৌধুরি তার এক দশমাংশও পরিচিত নন। অথচ অমল কুমারের তত্ত্ব ও সমীকরণের ওপরেই অনেকাংশে নির্ভরশীল মহাজগৎ সম্পর্কে হকিং- এর তত্ত্ব। সাধারণ আপেক্ষিকতা ও মহাবিশ্বতত্ত্ব নিয়ে তাঁর গবেষণা খুবই মৌলিক এবং প্রায় পথিকৃৎ। তাঁর তত্ত্বের আওতায় আসে মহাবিশ্বের বৃহদাকার বস্তুসমূহের উৎপত্তি। ১৯১৭ সালে পদার্থবিদ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মহাবিশ্বের যে গাণিতিক ব্যাখ্যা রেখেছিলেন, তাকে পরিণতির দিকে সম্প্রসারিত করেছিলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ অমল কুমার।

ভারতীয় আপেক্ষিকতাবাদীদের অন্যতম অমল কুমার রায়চৌধুরির জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ সালে। সেকালে বরিশালে পড়াশোনার ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল না। যেহেতু অমল কুমারের বাবা কলকাতার একটা ইশকুলে গণিত শিক্ষক ছিলেন,

সেহেতু খুব অল্প বয়সেই অমল কুমারের পড়াশোনা শুরু হয় কলকাতাতে। সম্ভবত অঙ্কের প্রতি তাঁর যে গভীর ভালোবাসা তা তাঁর বাবার প্রভাবেই। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন যে পরীক্ষার খাতায় তাঁর কষা অঙ্কের পদ্ধতি দেখে প্রধানশিক্ষক এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে সেই পদ্ধতিতে কষা অঙ্কটি তিনি ইশকুলের ম্যাগাজিনে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। তবে একথাও সত্যি যে অমল কুমারের পরিবারে তাঁর প্রজন্মের অনেকেই গভীর ও উচ্চতর পড়াশোনা এবং গবেষণার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁদের পিতৃব্য খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরির থেকে।

ইশকুলের পর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন অমল কুমার রায়চৌধুরি। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর সম্মান লাভ করেছিলেন। তারপর যোগ দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ইন্সটিউট অফ কালটিভেশন অফ সায়েন্সে। সেখানে তিনি চার বছর গবেষণা করেছিলেন এক্স- রে ক্রিস্টালোগ্রাফি বিষয়ে, যা মূলত পরীক্ষামূলক চর্চার ক্ষেত্র। কিন্তু তাঁর আত্মিক তৃপ্তি ছিল তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় যার চর্চায় গভীর গাণিতিক ব্যুৎপত্তি নিতান্ত আবশ্যক। আর তিনি ছিলেন গণিতে খুবই পারদর্শী।

১৯৫০ সালে তিনি আশুতোষ কলেজে শিক্ষক পদে যোগ দেন। পরে ১৯৬১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে। তাঁর সহজ ব্যাখ্যা আর তীক্ষ্ণ রসবোধের জন্য তিনি ছাত্রমহলে জনপ্রিয় ছিলেন। উচ্চতর গতিবিদ্যা নিয়ে তিনি পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন বাংলায়। মহাবিশ্বতত্ত্ব নিয়ে তাঁর বইটি সে তত্ত্বের সাথে এই বিষয়ের গবেষকদের প্রাথমিক পরিচয়ে অপরিহার্য। এছাড়া সনাতন বলবিদ্যা, তড়িৎচুম্বক ক্ষেত্রের সনাতন তত্ত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও জ্যোতির্বিদ্যা ও মহাবিশ্ববিজ্ঞান নিয়েও তিনি বই লিখেছেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর অবদান তিনি রেখেছেন ১৯৫১ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত নিয়মিত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও মহাবিশ্ববিজ্ঞান নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে।

তাঁর দীর্ঘ গবেষক জীবনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি সম্মানিত হয়েছেন বহুবার। তিনি ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর জেনারেল রিলেটিভিটি অ্যান্ড গ্র্যাভিটেশনের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত। আপেক্ষিকতাবাদ চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে তিনি বহুবার নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও মাত্র এক বছর কাটিয়েছিলেন মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ট্রামে চেপে প্রেসিডেন্সি কলেজ যাতায়াত ও প্রেসিডেন্সি কলেজের কাছে তাঁর প্রিয় চানাচুরওয়ালার থেকে চানাচুর কিনে খাওয়ার অভ্যেস তাঁর বড়ো প্রিয় ছিল। আশির দশকে জাতীয় ক্ষেত্রেও তিনি প্রভূত সম্মানিত হন। ১৯৮২ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৭ সালে ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন আইএনএসএ সংস্থার সিনিয়র সায়েন্টিস্ট। তা ছাড়াও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব জেনারেল রিলেটিভিটি এন্ড গ্র্যাভিটেশনের সভাপতিও ছিলেন তিনি ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮২ সাল। অধ্যাপক জে এ হুইলারের বিশেষ প্রশংসা পেয়েছিলেন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি অর্জনের সময়। তাছাড়াও তিনি সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পেয়েছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অধ্যাপনা থেকে অবসর নিলেও তিনি সক্রিয়ভাবে সাম্মানিক অধ্যাপনা করতেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনারেল রিলেটিভিটি অ্যান্ড কসমোলজিতে।

১৮ই জুন ২০05 সালে হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান হয়। কিন্তু সক্রিয় গবেষণার যে মহান দীপশিখাটি তিনি জ্বালিয়েছিলেন তা অম্লান রয়ে গেছে তাঁর সন্তান ও ছাত্রদের নিরন্তর আপেক্ষিকতা ও মহাকাশবিদ্যা চর্চায়।

**সম্পাদকীয় সংযোজনঃ এই বিজ্ঞানসাধকের ওপরে একটি ডকুমেন্টারি দেখতে চাইলে তা পাবে নিচে দেয়া লিংকটিতেঃ**
**https://www.youtube.com/watch?v=i9_hm2qe34s**

# জলের নীচের তিরন্দাজ

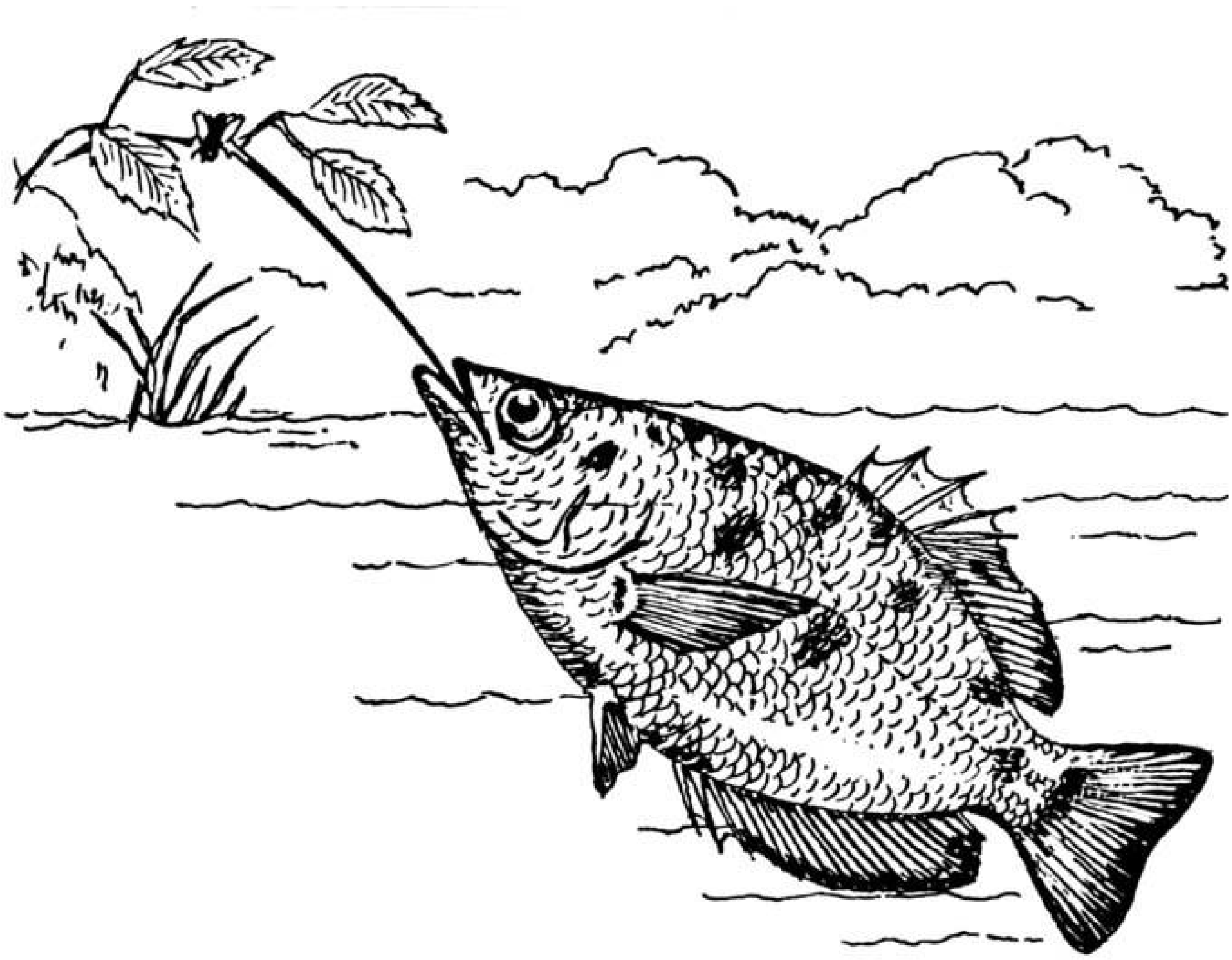

পোকাটা বেশ নিশ্চিন্তে বসে ছিল গাছের নিচু ডালে। চারপাশে ঝুপসি ঝুপসি গাছপালা নিচের নোনতা জলাভূমির ওপরে ঝুঁকে আছে। গাছের গোড়ায় বড়ো বড়ো শুলো মানে শ্বাসমূল কাদা থেকে নাক উঁচিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এইখানে কোনো বদমাশ পাখি টাখি ঢুকে এসে তাকে খুঁটে খেতে পারবে না।

বেচারা জানত না, আকাশ থেকে নয়, তার জন্য যমদূত এসে হাজির হয়েছে তার পায়ের নিচে, জলার টলটলে জলের তলায়।

মোটামুটি সেন্টিমিটার দশেক মাছটার চালচলন ভারী শান্ত। নিজেদের মধ্যে মাঝেমধ্যে খানিক মারপিট করলেও জলার অন্যান্য মাছেরা তাকে ভদ্রলোক বলেই জানে। জলের একেবারে ওপরের দিকে নিঃশব্দে ভাসতে ভাসতে সে তীক্ষ্ণ চোখে নজর করছিল পোকাটার দিকে। রসালো খাবার। ফসকালে চলবে না। চোখটাকে ঘুরিয়ে এমনভাবে সে ধরেছে যাতে পোকার ছবিটা পড়বে তার অক্ষিপটের একটা বিশেষ এলাকায় যাতে জলের জন্য ছবির প্রতিসরণ তার নিশানা স্থির করবার পথে বাধা না হয়।এইবার সাবধানে সে মুখটাকে একটু বের করল জল থেকে। তারপর জিভটাকে সরু করে তালুতে ঠেকিয়ে তৈরি করে নিল তার বন্দুকের নল। এইবারে তাতে জল টেনে নিয়ে ফুলকার প্রবল চাপ দিল সেই জলের ওপর। হঠাৎ তার মুখ থেকে জলের একটা সরু ধারা তীক্ষ্ণশলা তিরের মতই ছুটে বেরিয়ে গেল।

জলটা বেরোবার সময় চোয়াল দিয়ে বহু লক্ষ বছরের অভ্যেসে রপ্ত করা কায়দায় একটা মৃদু চাপ দিয়েছিল সে। ফলে ছুটন্ত জলের তোরের পেছনের দিকের জলটার গতি তার ফলার দিকের জলের গতির থেকে বেশি হয়ে গেল। ছুটতে ছুটতেই জলের তিরটার পেছন থেকে গুটিয়ে গিয়ে হয়ে গেল একটা ছুটন্ত জলের গোলা।

ফসকে গেছে গোলাটা—পোকার একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে গাছের ডালে লেগেছে। ফের একটা তীর ছুঁড়ে দিল শিকারী—তারপর ফের আরেকটা—এইবারে নিশানায় লেগেছে তার জলকামানের গোলা—ছুটন্ত জলের গোলা এসে ঘিরে ধরল তার শিকারকে। তার ধাক্কায় ছ’পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে পোকা ছিটকে পড়ল জলে।তারপর বেসামাল হয়ে হাবুডুবু খেতে খেতেই তার কাছে এগিয়ে এলো মূর্তিমান মৃত্যুর মত হাঁ করা একটা মুখ। তীরন্দাজ মাছ তার শিকারকে গিলে খেয়ে ফের ভেসে গেল পরের শিকারের খোঁজে।

ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া অবধি বিস্তীর্ণ এলাকার নোনা জলের জলাভূমিতে এই তীরন্দাজ মাছ বা আর্চার ফিশের বাস। সাতটা প্রজাতির এই পরিবারকে বিজ্ঞানীরা ডাকেন “টক্সোটিডা” নামে। মোটামুটি ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হলেও তাদের এক সদস্য , টক্সোটিডা ক্যাটারিয়াস, ১৬ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

তিরন্দাজ মাছের বাচ্চারা আড়াই সেন্টিমিটার লম্বা হয় যখন তখন থেকেই তারা জলকামান ছুঁড়তে শুরু করে দেয়। কিন্তু তখন তাদের টিপ ভালো থাকে না। ফলে তারা ছোটো ছোটো দলে ঘোরে, আর শিকার দেখলেই একসঙ্গে তির ছুঁড়তে শুরু করে দেয় যাতে একজনের তাক ফসকালে অন্যজনেরটা গিয়ে নিশানায় লাগতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে এই ছোটোরা আবার দলের বড়োদের শিকার দেখে দেখে নিজেদের নিশানা ঠিক করতে শেখে একটু একটু

করে। ঠিক কতো কোণ করে ছুঁড়তে হবে জলকামান, কতোটা দূরত্ব থেকে মারলে তা শিকারের গায়ে ঠিকঠাক লাগবে সেই সবই তার শেখে অন্যদের দেখে।

মাছেদের মধ্যে এমন ইশকুলে পড়ার ব্যাপারটা জীবজগতে খুব বেশি চোখে পড়ে না।

# শেফালিকা বা শিউলি

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপুজোর কিছুদিন আগে যখন রোদ্দুরের তেজ বেশ খানিকটা কমে যায়, সেই সময়ের সকালবেলাটা খুব মনোরম। সকালে ঘুম ভাঙার পর কিছুক্ষণ বিছানাতেই এপাশ ওপাশ করতে ইচ্ছা করে, সেই সময় জানালা দিয়ে শিশিরভেজা শিউলিফুলের গন্ধ এসে পরিবেশটাকে বড়োই মধুর করে তোলে। বিছানা ছেড়ে উঠেই তাই জানালা দিয়ে শিউলিগাছের দিকে অজান্তেই চোখ চলে যায়।

দুর্গাপুজোর কয়েকটা দিন পরেই কালীপুজো। এই পুজোর আগে আর পরে সব মিলিয়ে দশবারোটা দিন গ্রামের বাড়িতেই কাটে। নিতে হয় পুজোর প্রস্তুতি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বারান্দায় এসে প্রথমেই চোখে পড়ে শিউলিফুলের কার্পেট মোড়া উঠোনটার দিকে। অজস্র টাটকা ফুল সঙ্গগ্রহ করে কলাপাতার উপরে রাখা হয় ঠাকুরঘরের সামনে। সে এক অসাধারণ মুহূর্ত। শিউলি ফুল ছাড়া শরৎকালটা তাই ভাবতেই পারি না।

ছোট্টবেলা থেকেই শিউলি গাছ দেখে আসছি। বাড়ির গাছটা যেন একইরকম রয়েছে। উচ্চতায় ১২-১৪ ফুট। কাণ্ডের বেড় ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি, ধূসর বর্ণের। তবে অন্য গাছের মত কাণ্ডটা গোল নয়, একটু ট্যারাব্যাঁকা। ভিতরের অংশটা খানিক উন্মুক্ত। সরু,লম্বা ডালগুলি প্রথমে সবুজ, পরে রঙ পালটে ধূসর হয়ে যায়।

পাতাগুলি কর্কশ, হাত দিলে খসখসে বোধ হয়। ছোট পান পাতার মত দেখতে। পাতার উপরের দিকের রঙ সবুজ, নীচের দিকের রঙ সাদাটে। পাতাগুলির গোড়ার দিকের ধারটা করাতের দাঁতের মত খাঁজ কাটা। কোন কোন পাতার ধার বিশেষত ছোট পাতার, পুরোটাই মসৃণ বা দাঁতবিহীন।

ফুলগুলির পাপড়ির রঙ শ্বেতশুভ্র, গোলাকারভাবে সজ্জিত। বোঁটা নলাকার, রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণের। সুন্দর গন্ধযুক্ত ফুলগুলি ফোটে শেষরাতে এবং ভোরবেলা সেগুলি ঝরে পড়ে। কোন কোন গাছে সারা বছর দু চারটি করে ফুল ফোটে। তবে শরৎকালে গাছ ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

বিজ্ঞানীরা শেফালিকা বা শিউলি গাছের নামকরণ করেছেন **NYCTANTHES ARBORTRITIS**

রবীন্দ্র পুরষ্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত লেখক আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য তাঁর লেখা ‘চিরঞ্জীব বনৌষধি’র তৃতীয় খণ্ডে শেফালিকা বা শিউলি গাছ সম্বন্ধে সুন্দর একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন, পারিজাত নামে নাগরাজের একটি কন্যা ছিল। তারনাম ছিল পারিজাতক। সূর্যদেব তাকে অতিশয় ভালোবাসতেন।পরে সূর্যদেব অন্য একটি নারীর প্রেমে মুগ্ধ

হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেন। এই দুঃখে নাগরাজকনয়া পারিজাতক দেহত্যাগ করেন। প্রাণত্যাগের ঘটনাটার স্থানেই এই ফুলের গাছটি জন্মেছিলো। তাই সূর্যদেবের প্রতি অভিমানে তাঁর উদয়ের পর্বেই সে ঝরে পড়ে যায়।

শিউলি গাছ উপকারী ভেষজ বলে পরিচিত। এই গাছের পাতা থেকে হোমিওপ্যাথ ওষুধ তৈরি হয় যা জ্বর ও সায়াটিকা সারাতে ব্যবহৃত হয়।

গাছের পাতার রস বলবর্ধক, জ্বর ও আমবাত দমনে ব্যবহার করা হয়। কয়েকটি কচি পাতার এবং আদার রসের মিশ্রণ জ্বরে উপকারী। লবনমিশ্রিত শিউলিপাতার রস কৃমিনাশক।

# ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প

জন লকউড কিপলিং

অনুবাদঃ পিয়ালী চক্রবর্তী

## বাবুই

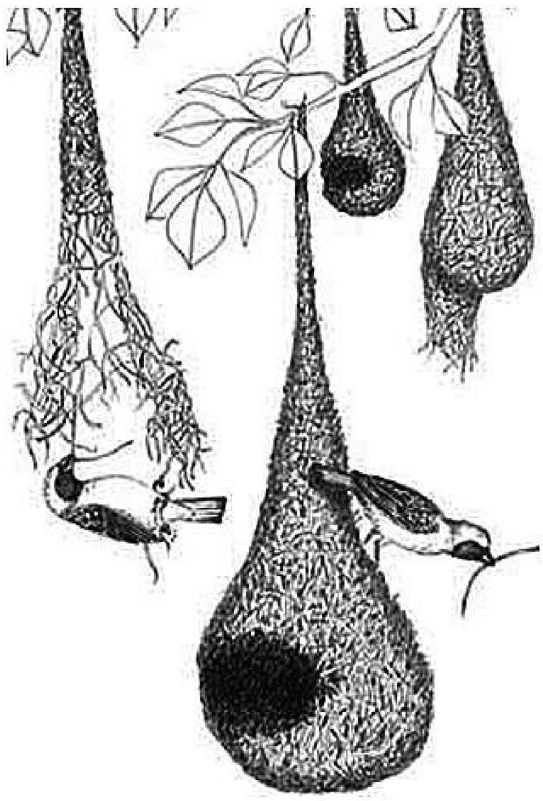

টিয়াপাখির থেকেও ভালো কলাকৌশল জানা পাখি কোনটা বল তো? এই পাখিও কিন্তু একটা প্রিয় পোষ্য আর একে প্রশিক্ষণ দিলে খুঁজেপেতে নিয়ে আসবার খেলায় পটু হতে পারে। এই ছোট্ট পাখির নাম বাবুই।

আমার এক বন্ধুর এক পরিচিত ওয়েটার ছিল, যার একটা বাবুই পাখি ছিল। যাকে বললেই সে গাছের একটা ফুল বা পাতা ঠিক ঠোঁট দিয়ে তুলে আনত। এরা অনেকটা ইউরোপিয়ান গোল্ডফিঞ্চের মত হয়, যারা কেউ কেউ নিপুণ দক্ষতায় বাসা বাঁধে, আর কেউ জল, বীজ নিয়ে আসে এদের জন্য। তবে বাসা বাঁধার দক্ষতায় আর বুদ্ধিতে বাবুই, গোল্ডফিঞ্চকেও হার মানায়। বাবুই এর এই প্রতিভা, আর আশ্রয়হীন অসহায় বাঁদরদের নিয়ে একটা চলতি ছড়া আছে। যেসব ছেলেমেয়েরা ভারি কুঁড়ে হয়, কাজকর্ম মোটেই করে না, তাদের এই উদাহরণ দেওয়া হয়, যে বাবুই কেমন ঠোঁট দিয়ে বাসা বোনে, কিন্তু বাঁদরের দুটো হাত পা থাকা সত্ত্বেও কিছুই করে উঠতে পারেনা।

বাবুইয়ের বাসা কেমন দেখতে মনে আছে? অনেকটা গলা লম্বা করে থাকা মুরগির মত না? আর বাবুই পাখি বাসায় আলো জ্বালানোর জন্য নিয়ে আসে জোনাকি আর রেখে দেয় বাসার ওপরের দিকে। ঘাস, লতা, পাতার তন্তু দিয়ে তৈরি দেওয়ালের সাথে আটকে। মাটির টুকরো, জোনাকি এইসব রাখে বাবুই তার বাসায়।

আর যখন তারা বাসা বানায়, খেলার জন্য আরেকটা বাসা বানিয়ে রাখে আসল বাসায় ঢোকার মুখটায়। যেখানে পাখিরা খেলে আর পুরুষ পাখিরা বসে গান গায় স্ত্রী পাখিদের উদ্দেশ্যে। কেউ কেউ বলে এগুলোই নাকি প্রাথমিক শিক্ষা বাসা তৈরি করার।

## খাঁচার গায়ক পাখিরাঃ

উত্তর ভারতের দিকে যে সমস্ত মানুষ অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ করেন, এই যেমন ধর কেউ সেলাই করেন, কাপড়ের ওপর সুতোর কারুকার্য করেন, বা জুতো তৈরি করেন, তাদের পাশে রাখা খাঁচায় যদি বুলবুল, চন্দনা, শ্যামা, ময়না গান শোনায়, তবে

কাজ করার মজাই আলাদা। তাই এইসব পাখিরা গান শুনিয়ে মানুষের মন খুশি রাখতে পারে। ইংল্যান্ডের মানুষের মত আমাদের ভারতীয় কর্মী মানুষেরাও যার যার সুরেলা পাখির খাঁচা কোন গাছতলাতে একজায়গায় রেখে চারপাশে গোল হয়ে বসে তাদের গান শোনে। পুষ্যিরা তীক্ষ্ণ সুরেলা গলায় গান জমায়।

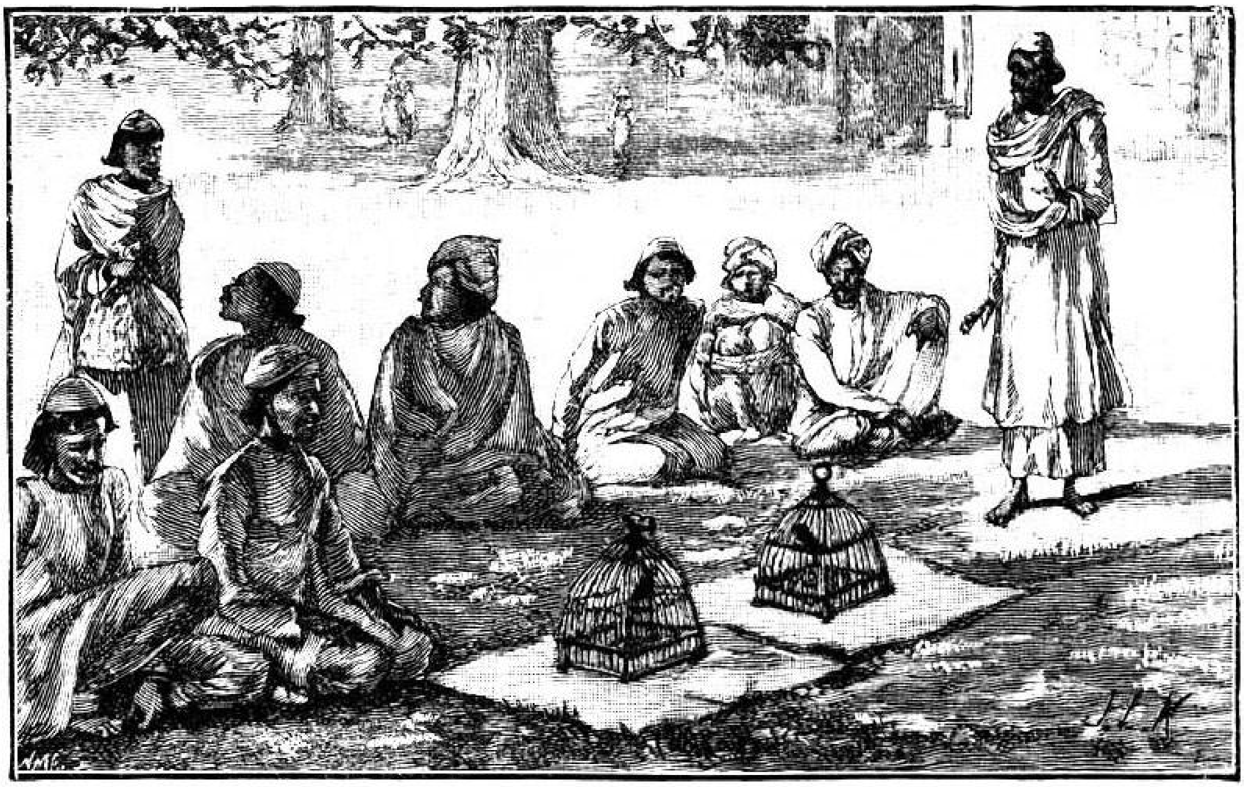

এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে যে পাখিদের অন্ধকারে রাখলে নাকি তারা আরও ভাল গান গায়। এক পক্ষীপ্রেমিকের কাছে শুনেছিলাম, সে নাকি প্রতি বছর তার পাখির খাঁচা নতুন কাপড় দিয়ে মুড়ে দেয়, কিন্তু পুরনো কাপড়টাও খোলে না। এ কিন্তু ভারি অন্যায়, অমানবিক, তাই না বল?

আবার পাহাড়ি ময়না, সবচেয়ে সুন্দর কথা বলে, গান গায়, তাকে কিন্তু এই ঢাকা খাঁচায় রাখা হয় না।

অথবা মুনিয়া পাখি, সেই ছোট্ট ল্যাজ যে পাখিটার, তাদের অনেকজনকে একসাথে খাঁচার মধ্যে রেখে দেওয়া হয় যাতে দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। শুধু রাত্রে ছাড়া এদের কিন্তু ঢেকে রাখা হয়না। রাত্রে মশার উৎপাতে যাতে ওদের কষ্ট না হয়, তাই কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা হয়।

দিল্লীতে যারা পাখি পোষে, পাখির খেলা দেখায় তাদের প্রায়ই দেখা যায় একটু ইংরেজি অক্ষর ইউ এর আকৃতির পিতলের দাঁড়ে পাখি নিয়ে যেতে। এই একই দৃশ্য দেখা গেছে পিকিং শহরেও, একশোরও বেশি চীনা মানুষ সেখানে দল বেঁধে হাঁটত, প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছোট পাখি। আবার মধ্য ইংল্যান্ডের কিছু দেশে লিনেট, বুল ফিঞ্চ পাখিদের এ'রকম দাঁড়ের সাথে বেঁধে রাখা হত আর এদের বলা হত 'ব্রেসড বার্ডস'।

## মারকুটে পাখি:

এই পাখিগুলোকে নিয়ে লোকজন খুব মজা করে। বুলবুল, কোয়েল, তিতির, আর ছোটো মুনিয়াপাখিগুলোকে খুব উৎসাহ দেওয়া হয় মারপিট করার জন্য। একটা ভালো লড়িয়ে কোয়েলের দাম হামেশা পঁচিশ টাকা ওঠে। আর নিজামের রাজধানী হায়দ্রাবাদে তো একটা

ডানপিটে পাখির জন্য প্রায় ১৫০ টাকাও দিতে রাজি সকলে। ধূসর তিতির পাখি, মানে সবচেয়ে মারকুটে পাখি, চকোর এমন কি কালো তিতিরকেও পোষ্য হিসাবে রাখা হয়।

এদের যারা মারামারি করতে শেখায়, তারা সকাল সকাল বা সন্ধের দিকে খাঁচাটা নিয়ে বেরোয় আর কোনো বাগান বা খোলা জায়গায় গিয়ে খাঁচাটা খুলে দেয়। আর অমনি তিতির পাখি ডানাটা চারিদিকে ছড়িয়ে গুটিগুটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে দৌড় লাগালেই মনে হয়, যেন সুন্দরী এক কন্যা পরনের ঘাগরাটা বেশ একটু উঁচু করে তুলে দৌড়ে আসছে।তাইতো এখানকার ছেলেরা তাদের সুন্দরী প্রেয়সীদের প্রশংসা করে বলে তারা যেন তিতিরপাখির মত দৌড়োয়। তাছাড়া এই পাখির কত সুনাম, কত কবিতায় চাঁদ, পদ্মফুল এসবের সাথে এই পাখির কথাও লেখা আছে। আবার চকোর সম্পর্কে বলা হয় এই পাখি নাকি আগুন খেতে পারে।

ভারতীয় গৃহবধূরা বাড়িতে কোয়েল পাখি পোষা একদম পছন্দ করেনা। বলে এরা নাকি অশুভ। তবে তিতির পাখি মারকুটে হলেও ঘরে তার জায়গা মেলে, কারণ লোকে বিশ্বাস করে তাকে পুষ্যি রাখলে সে বুঝি সংসারের সব অশুভ তার নিজের ওপর টেনে নেবে। আসলে ভারতবর্ষে ঘরে পশুপাখি পোষবার প্রধান কারণই কিন্তু এই বিশ্বাসটা।

দিল্লী, অমৃতসর, লাহোর, হায়দ্রাবাদ, আগ্রা, কানপুর এসব জায়গায় কোয়েল আর তিতিরের লড়াই খুব বিখ্যাত, ঠিক যেমনটা ইংল্যান্ডে মুরগির লড়াই ছিল।

## পাখির বাজার

লন্ডনের সেন্টমার্টিন লেনের পাখির বাজার নাকি আর বসে না। তবে লখনউ শহরে নিয়মিত বসে পাখিদের বাজার। আর কী নেই তাতে? মারামারির জন্য তিতির, কোয়েল, মোরগ, ধাওয়া করার জন্য বাজপাখি, এছাড়া পায়রা, কত রংবেরঙের গান গাওয়া আর কথা বলা পাখি যে কোন ইউরোপিয়ান পাখির বাজারকে হার মানায়।

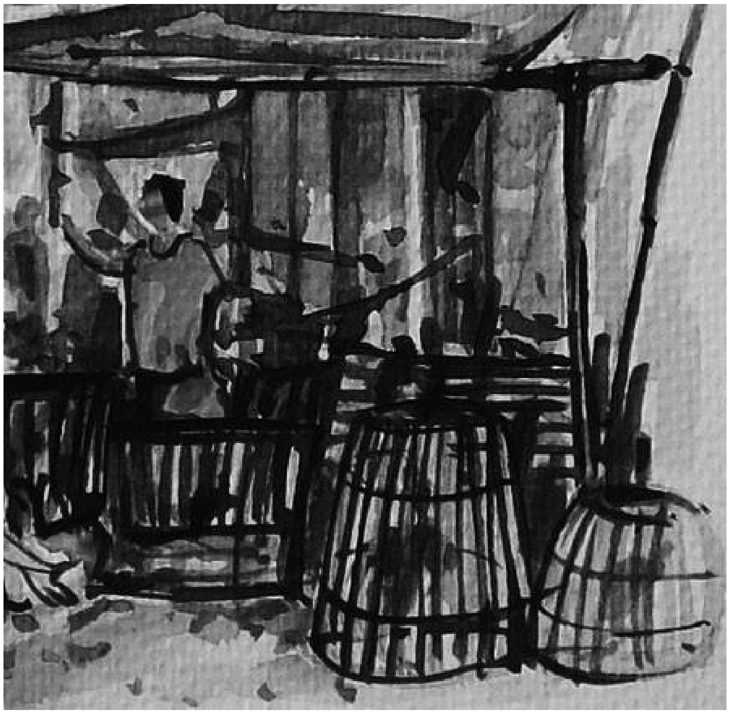

তবে দেশ যাই হোক, পাখির বাজারুদের চরিত্র কিন্তু মূলত একই রকম। ইউরোপের পাখি বাজারের স্পাইটালফিল্ডস উইভার কিংবা স্ট্যাফোর্ডশায়ার পটার পাখিরা যদি এদেশি ভাষা জানত তাহলে মনে হয় এদেশের পাখিরসিকদের হাতে মানিয়ে নিতে তাদের কোন সমস্যাই হত না। পাখি নিয়ে নাড়াচাড়া করা, তাদের খাওয়ানো, পাখির দরদস্তুর, অদলবদল-- পাখি বিষয়ে এমন সমস্ত ব্যাপারেই কি এদেশে কি ইউরোপে, রসিকদের চালচলন একই জাতের হয়ে থাকে।

# কৌখাল

স্বপ্না লাহিড়ী

সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে বাইরে দোলনায় বসে একটু একটু দোল খাচ্ছিলাম। ভোরের সূর্য সোনা রোদ্দুর ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে, বাতাসে। তার প্রখর হয়ে উঠতে এখনো ঢের দেরি। চারপাশে কত পাখি ডাকছে, হুটোপুটি করে বেড়াচ্ছে এ ডালে থেকে ও ডালে, এ গাছ থেকে ঐ গাছে, বেশ লাগছিল।

হঠাৎ দেখি একটা কৌখাল পাখি দোলনা থেকে একটু দূরে খুব মনোযোগ সহকারে, মাটি থেকে কী সব খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। অবাকই হয়ে গেলাম একটু। আজ হল কী পাখিটার? এতো কাছে তো কখনো আসে না? দুটো চারটে বাঁশঝাড়ের ভেতরে বাইরে ঘুর ঘুর করে বটে, তবে কাছে গেলে পাঁচিলের ওপরে বা আম গাছটার ডালে তড়াক করে উড়ে বসে। আজ এত কাছে, কেয়ারই করছে না!

ভাবলাম এত মন দিয়ে খাচ্ছে , নিশ্চই আমাদের সিঙাড়া জিলিপি বা আলুর চপের মতন মুখরোচক কিছু হবে। পাখিটা মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, “মোটেও নয়। তার থেকেও সুস্বাদু। তোমাদের রসগোল্লার মতন, ” বলেই মুখ নামিয়ে ঠোঁট দিয়ে একটা মোটাসোটা সাদা রঙের পোকা তুলে কপাৎ করে গিলে ফেললো।

আমি নাক কুঁচকিয়ে বলে উঠলাম, “ছিঃ।”

পাখিটা বিরক্ত হয়ে বললো, “ছিঃ মানে কী, অ্যাঁ? তোমাদের ফেলে দেয়া সিঙাড়া, কচুরি, বিস্কুটের গুঁড়োগুলোকে তো আমরা বেশ স্বাদ নিয়েই খাই, কক্ষণো ছিঃ বলি না, আর তুমি কিনা আমার পোকাটাকে ছিঃ বললে? তোমাদের মানুষ জাতের এই দোষ। সবেতে ছিছিক্কার।”

আমিও রেগেমেগে বললাম, “খবরদার জাত তুলে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।”

কৌখালটা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “তা, তোমরা মানুষ বলে কি পাখিরা মানুষ নয়?”

আমি হো হো করে হেসে বললাম, ”পাখিরা আবার মানুষ!  কোন উজবুকিস্তানে জন্ম তোমার, যে উজবুকের মতন কথা বলছো?”

কৌখাল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ”বুড়ো বয়সে শুধু দোলনায় না দুলে, একটু পড়াশোনা করলেই তো পারো! জ্ঞানগম্যি বাড়বে।  জ্ঞানই মানুষকে মানুষ বানায়, পাখিকে পাখি। আমাদের দুজনের উৎস এক তা জানো?”

বললাম, “কিছু কিছু মিল আছে বটে, তা বলে আমরা মোটেই এক নই। দুজনেরই শরীরে গরম রক্ত বইছে এই যা মিল।”

পাখি কিছু না বলে উড়ে গিয়ে বসলো রাধাচূড়াটার ডালে। ভাবলাম, যাক আপদ গেছে। ওমা, একটু বাদেই ফের শোঁ করে নেমে এসে বলল,  “কী ব্যাপার, চা টা খাওয়া হবে কি হবে না? বেলা যে গড়িয়ে যাচ্ছে, সে খেয়াল আছে?  যাও যাও চা করে আনো।”

একেবারে ধমক! তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে এক গেলাস চা, একটা বিস্কুট নিয়ে এলাম।  ঘাড় উঁচু করে আমাকে দেখে বলে উঠল,  “নাঃ, বড়ই কিপটে তুমি। একটামাত্র বিস্কুট আনলে। আমারটা কই?”

আমি আমারটাই দিয়ে দিলাম ওকে।  বিস্কুটটা খেয়ে রুমালে অর্থাৎ পাশের গাছটার গোড়ায় মুখ মুছে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে খানিকক্ষণ উদাস নয়নে,  তারপরে এক্কেবারে কাছে এসে রাগ রাগ স্বরে বলল,  “বলি কোন আক্কেলে তোমরা আমার কৌখাল নাম দিয়েছ শুনি?  না আমি কাকের মতন দেখতে, না আমি কাকের খাল জড়িয়ে ঘুরে বেড়াই। দেখেছো আমার গায়ের রঙ কত মসৃণ কালো? মোটেই কাকের মতন খসখসে নয়। দুটো ডানায় কী সুন্দর খয়েরি রঙের ছোপ। লেজটাও কেমন পেখমের মতন।  ঠোঁট দুটো লিপিস্টিক ছাড়াই  চকচক করছে আর যখন কুব কুব করে গান ধরি তখন ওস্তাদ রাশিদ খাঁ- ও মাথা নেড়ে আহা বলে ওঠেন। ”

তারপর আমার প্রায় ঘাড়ের কাছে এসে ফিক করে হেসে বলল, “আহা কী রূপের ছিরি তোমার, রঙ দেখলে তো কাকও লজ্জা পাবে, আবার যেখান সেখান মেদও জমিয়েছো বেশ। রূপের গাঙে রূপ ভেস্যে যাচ্ছে।

আমি রেগেমেগে উঠে দাঁড়াতেই , ডানা মেলে উড়তে উড়তে কৌখালটা বলল, “আহা চটো কেন? ওই যে বললাম, পড়াশোনাটা চালিয়ে যাও আর পাখিদের ক্লাসিফিকেশনে গিয়ে, আমার নমেংক্লেচর পাল্টে দেবে।”

আমি ঘরে যেতে যেতে ভাবলাম এতখানি সাহস পাখিটার, আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেল ? সহে না ! ! ! সহে না.......

# মেঘালয়

মেঘালয় ভারত মায়ানমার সীমান্তের থেকে বেশ দূরে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে। তাই এই এলাকা ইন্দো- মায়ানমার বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের অংশ হতেই পারে। কিন্তু কোন নথিতে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

মেঘালয়ের নামের মধ্যেই আছে মেঘের বাড়ি। তাই এখানে বৃষ্টি পড়ে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি। চেরাপুঞ্জি, মৌসিনরাম আর মৌসুমাই জায়গাগুলো এ রাজ্যেই। বৃষ্টির মাপজোপ নিয়ে দেখা গেছে যে এখানে সারা বছরে ৪০০০ (চার হাজার) থেকে ১১,৪৩৬ (এগার হাজার চারশো ছত্রিশ) মিলিমিটার মতো বৃষ্টি পড়ে। তাপমাত্রা সমতল এলাকায় ১২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আর কেন্দ্রীয় মালভূমিতে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ঘোরাফেরা করে।

তবে মেঘালয়ের গাছপালা আর জীবজন্তু তো আর শুধু বৃষ্টিপাতের ও উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল নয়। তাদের অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে ভূপ্রকৃতি, মাটি আর পাথরের উপরেও। মেঘালয়ের উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের পলি ঢাকা সমভূমি থাকলেও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে শিলং মালভূমির প্রাচীন আগ্নেয় আর রূপান্তরিত শিলার (ইগনিয়াস ও মেটামরফিক রক) রাজত্ব। মাটিও খনিজে ভরপুর। আবার ইন্দো- বার্মা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের বৈশিষ্ট্য যে কার্স্ট টোপোগ্রাফি বা গুহা/কন্দরময় লাইমস্টোন বা চুনাপাথরের এলাকা সেটা কিন্তু মেঘালয়ে পাওয়া যায়।

মেঘালয়ের ৯,৪৯৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বনে ঢাকা। এই এলাকা রাজ্যের সম্পূর্ণ ভূখন্ডের ৪২.৩৪% যার মধ্যে রিজার্ভ ফরেস্ট দখল করে ১১.৭২%, প্রোটেক্টেড ফরেস্ট ০.১৩%, বাকি ৮৮. ১৫% বনাঞ্চলকে কোন দলেই ফেলা হয় নি এখনও। এর মধ্যে জাতীয় উদ্যান দুটি – নকরেক জাতীয় উদ্যান ও বালপাকরাম জাতীয় উদ্যান। এর মধ্যে নকরেক জাতীয় উদ্যান সম্প্রতি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মর্যাদা পেয়েছে। তার কারণ এখানকার লেবু গাছেরা, যারা চিহ্নিত হয়েছে খাঁটি ভারতীয় লেবুর প্রজাতি হিসেবে। তাছাড়া আছে তিনটি অভয়ারণ্য।

জীববৈচিত্র্যের নিরিখে নকরেক গুরুত্বপূর্ণ মূলত এই জঙ্গল খুব অল্প সংখ্যক রেড পাণ্ডার বাসস্থান বলে। তাছাড়া এই অঞ্চলে পর্যুদস্ত অস্তিত্বের স্টাম্পড টেলড ম্যাকাক নামক বাঁদরেরও বাস। তাছাড়া বিপন্ন অস্তিত্বের হাতি থাকে। তবে এই অঞ্চলে হাতি সংখ্যায় প্রচুর।

বনবিদ চ্যাম্পিয়ন ও শেঠের শ্রেণিবিভাগ অনুসারে পাঁচ রকমের বন দেখা যায় মেঘালয়ে।

সেগুলো হল ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরহরিৎ বন,(ট্রপিক্যাল ওয়েট এভারগ্রিন) ক্রান্তীয় প্রায় চিরহরিৎ বন,(ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন) নিরক্ষীয় আর্দ্র পর্ণমোচী বন(ইকোয়েটোরিয়াল ওয়েট ডেসিডুয়াস) , গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পত্রবিশিষ্ট পার্বত্য বন এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পাইন বন।

মেঘালয়ের বনের পরিমাণ উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে। তার মূল কারণ ঝুম চাষ। পুরোনো চাষের জমির ফলন কমে গেলে সেই জমি ফেলে রেখে বনের থেকে নতুন জমি হাসিল করে চাষের কাজে লাগানো হচ্ছে। ফলে নতুন করে বন বাড়ছে না। বরং বনের পরিমাণ যাচ্ছে কমে। বিপন্ন প্রজাতির গাছ আর পশুদের স্বার্থে ঝুম চাষে নিয়ন্ত্রণ আনা জরুরি। তাহলেই এ রাজ্যের বিপুল বনসম্পদ সংরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

# হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে—

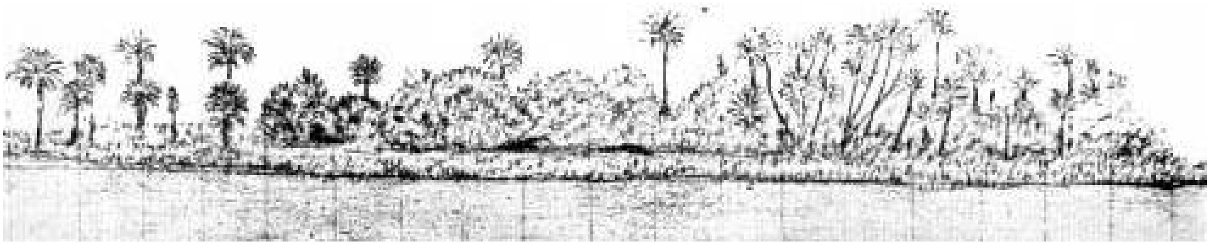

আবু হোসেন

চল রে মিনি হাঁটতে যাই
বাঁয়ে চাই, ডাইনে চাই
এদিক নদী বইছে জোরে
একূল ওকূল ঝাপসা করে
ওদিক পাহাড় তুলছে হাই
চলরে মিনি হাঁটতে যাই
মিতুন, আমি, টুকলু ভাই
হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর
হারাণগঞ্জ নারাণপুর
ছোট্ট দোকান এক বুড়ি
বেচছে ছোলা, গুড় মুড়ি
নিঝুম দুপুর তার দাওয়ায়
ঘাম ঝরানো ঝিম হাওয়ায়
আরাম করে একটু খাই
খাবার পরে আবার পাড়ি
বাজিয়ে সিটি লোহার গাড়ি
মাঠের বুকে লোহার রেল
যাচ্ছে ছুটে বোম্বে মেল
হাঁটতে হাঁটতে দেখবো তাই
চল না মিনি হাঁটতে যাই
হাঁটতে হাঁটতে দুপুর শেষ
মাঠের শেষে নতুন দেশ
আমের বাগান কলার বন
ক্ষেত পুকুরে মানুষজন
গাছের মাথায় টিয়ের ঝাঁক
জ্বলছে হাপর ঘুরছে চাক
একটা বুড়ো কয় ডেকে
আসছো বলো কোত্থেকে
বলব থাকি হাকিমপুর
এখান থেকে অনেক দূর
বলবে সে আয় আমার ঘর
রাতটা খানিক আরাম কর
কুয়োর জলে আরাম স্নান
উঠোন জোড়া চাঁদের বান--

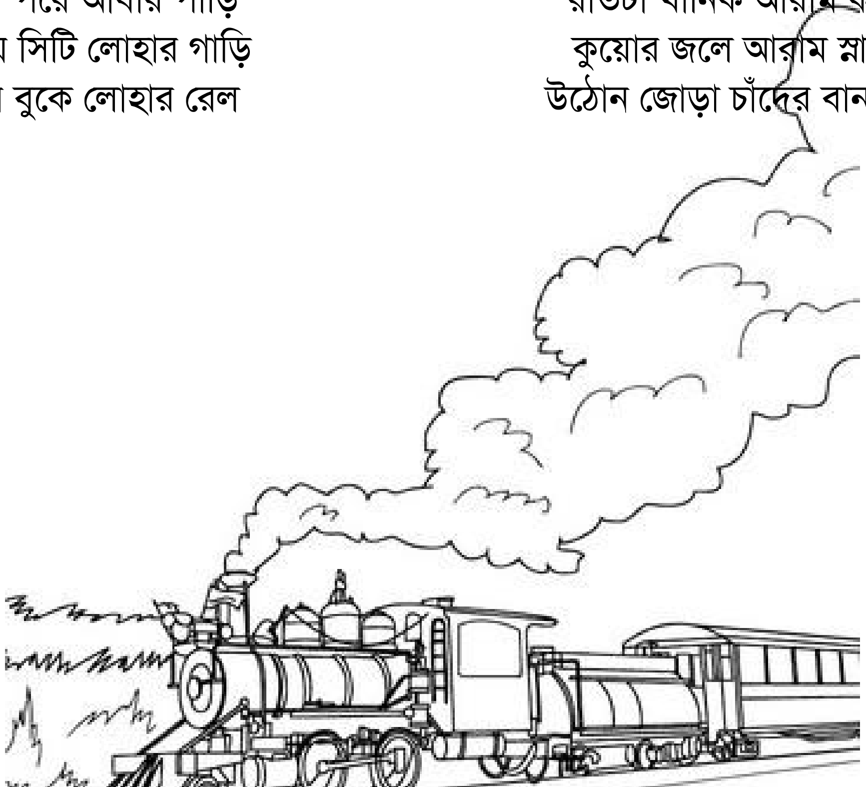

# চুরমুর

প্রকল্প ভট্টাচার্য

একদেশে এক রাজার কথা বলছি তোদের, শোন।
তার তো ছিল পেটের ব্যারাম,ভুগত সারাক্ষণ।
বদ্যি হাকিম ওঝারা সব আসত যে দলবেঁধে,
ওষুধ দিত, বিষুধ দিত, পথ্যি দিত রেঁধে।
অসুখ তবু বেড়েই চলে, শয্যা নিলেন শেষে,
রাজার ব্যথায় শোকের ছায়া নামল সারা দেশে।
এই পাড়ারই হাবুল পড়ে রাজার ছেলের ক্লাশে,
কথায় কথায় একদিন তার এ সব কানে আসে।
“আরে ,ও সব পেটের অসুখ অনেক দেখা আছে!
আমার এমন ওষুধ জানা, পারবে কে তার কাছে!”
শুনেই কথা রাজার ছেলে চমকে উঠে বলে,
“কীসে ওষুধ?নামটাতো বল,কিনব যে তাহলে!”
হাবুল বলে, “ঐ মোড়ে যে ফুচকাওয়ালা আছে,
চুরমুর চাট দারুণ বানায়, কী লাগে তার কাছে!
তারই স্বাদে জ্বরজারি বা পেটব্যথা হয় দূর,
রাজামশাই যাবেন সেরে খেলেই সে চুরমুর।”

তার কথাতে রাজার ছেলে দৌড়ে গেল চলে
ফুচকাওয়ালার দোকানটাকে রাখবে চিনে বলে।
ওমা, কোথায় ফুচকাওয়ালা! পাড়ার ক্লাবে পুজো,
প্যাণ্ডেলে তাই রাস্তা ভরাট। ‘পরের মাসে খুঁজো’
এই বলে সব সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু রাজার ছেলে
হাল না ছেড়ে একটা নতুন উপায় খুঁজে পেল।
রাজার সাথে পুজোর কদিন সমস্ত মণ্ডপে
গলির মোড়ে, বাজার ভিড়ে, কিম্বা কফি শপে
যতোই পাবে ফুচকার স্টল, চাখবে সবক’টাই,
যে ভাবে হোক, রোগবিনাশক চুরমুর তার চাই!
এবার পুজোয় ফুচকা তোমরা খাবে তো নিশ্চয়ই,
দেখতে হয়ত পেতেও পারো ভিড়ের মধ্যে ঐ
পেটরোগা সেই রাজামশাই শালপাতা হাতেতে
সোঁও- সোঁ করে ব্যস্ত বুঝি তেঁতুলজলটা খেতে।
“লঙ্কা একটু কম;আরে ভাই,ফাউটা দিলে না তো?”
রোগবিনাশক সেই চুরমুর এখনও অজ্ঞাত।

# চোখের জলে

সঙ্গীতা সামন্ত

চোখ ঝলসানো রৌদ্রের তাপে পুড়ছে মাঠের ঘাস
তিনকোণা শত উপবাসী মুখে উঠছে নাভিশ্বাস
মাটিকে শুধাই, “বল না কীভাবে তোর ঋণ দেব শোধ?”
“একটা টুকরো মেঘ ডেকে আনো এইটুকু অনুরোধ।”
অভাগা মাঠের তৃষ্ণা মেটাব ছিল না তেমন সাধ্য
কোন কোণে মেঘ বাসা বেঁধে আছে জানি না সে উপপাদ্য
দিশেহারা হয়ে কাজলের টানে মেঘের প্রতিমা গড়ে
চোখের পাতায় আসন পেতেছি সযতনে সমাদরে
ঘুড়ি হয়ে সেই মেঘের প্রতিমা ছড়াল শহর গ্রাম
সঙ্গে নিয়েছে নীলরঙা এক দৃপ্ত চিঠির খাম
চিঠির পাতায় লেখা, “ওরে মেঘ,বাঁচাবো এ ধরাতল
আমারই অশ্রু প্লাবন ডাকবে আছে সেই সম্বল।”

# বোঝো!

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

কিবারু হাসে রাজুল চোখে কহস মেনে কালান
গাটুন বলে সকসখানি কৌরে দূরে মেলান
শিকন মানি কেমন বাণী চাহানধুপির আদল
সালুনপাহার বোঝানবাহার গহরগানি টহল
আসানবাটি দামনঘাঁটি পহর গুনে সদ্য
সাথেরসিনি শামিনিটুনি লক্ষ্য বুনন পদ্য
কোলেরপিটি জন্টিকিটি পটনপ্রখর স্বপ্ন
শহরাডুবি পালানকভু ছিছিক্কারে বন্য
পাপিনবুঝি পালিনতোমা পাপনভূমি রাজাল
ভালানখুশী মাহারমণি বুকপজতল চাতাল
ভাটুনি কালুন শাটুনি বালুন আলোর মালা তোরে
প্রজান মরণ শোমির ছোঁয়ায় বাঁচছেরে রোজ ভোরে।

ছবি ইন্দ্রশেখর

# মাঠের মাঝে তিনটি খরিশ

**তরুণকুমার সরখেল**

সেদিন মাঠে খেলতে গিয়ে খুব সক্কাল বেলা,
দেখল হারু তিনটি খরিশ মন দিয়েছে খেলায়।
মাঠের মাঝে হারু তখন দরদরিয়ে ঘামে,
কে বাঁচাবে এবার তাকে দেখছে ডানে- বামে।

ঠিক তখনই নিতাই মুদি মাঠের মাঝে এসে
বলল, খরিশ দেখা মানেই ব্যাপার সব্বনেশে।
তারপর কী হল বলি সংক্ষেপেতে আমি
ছুটে এসে আট বছরের বাগদিপাড়ার ভামি

ধরল টুঁটি তিনটি সাপের এবং দিল ছুঁড়ে।
তাই না দেখে নিতাই- হারু আনন্দে নাচ জো্রে।

ছবিঃ সঙ্গমিত্রা

# গিটারওলা ছোকরাটা

অচিন্ত্য সুরাল

ছোকরাটা দ্যাখ গিটার হাতে
এমন ব্যাটা হাড়হাভাতে
নন্দনে বা বইমেলাতে
ভিড় জমাতে গান ধরে
ইচ্ছে করে গান ভাঙি তার
কাড়তে পারি হাতের গিটার
ফন্দি আঁটে গান শোনাবার
আপনভোলার ভাণ করে!
সম্প্রতি সে আফিসপাড়ায়
ঘুরছে রোজই গিটার ছাড়াই
কী যে খোঁজে কীসের তাড়ায়
বিরসবদন রূপ ধরে !

মুখজোড়া তার বিষণ্নতা
স্পষ্ট হলেও আমার কথা-
যা স্বাভাবিক তার অন্যথা
মানব কেন চুপ করে
ছোকরাটা ভাই সত্যি ন্যাকা
সেদিন হঠাৎ পেলাম দেখা
পার্কে বসে একলা একা
আমার চোখে চোখ রাখে
সরিয়ে রেখে অবজ্ঞাকে
দেখতে গিয়ে দেখেছি তাকে
গিটার ছাড়া বিশ্রী লাগে
ঝাঁকড়াচুলের ছোকরাকে

ছবিঃ শংখ করভৌমিক

# ম্যাজিক রানির বন্ধু হবি?

চিতল মাছের মুইঠ্যা রেঁধে নাম রেখেছি চৈতালিক,
হাত ঘুরোলেই পয়দা হবে টুপির মধ্যে দুই শালিক।
ভাগ্যে যদি দুর্বিপাক,
অমনি হাঁকলি কার্ডিয়াক!
কী শিখলি ছাই ঢপের খেলা বেদম ঐন্দ্রজালিক?
পান সুপারি ভেট দিলে লাল করতে পারি সাদারে --
তাই দেখে তুই ঘাবড়ে ডেকে আনলি মেজোদাদারে!
এ- ও যদি অস্বস্তিকর,
আমার সঙ্গে দোস্তি কর,
ভোজের বাজি বেচতে পাবি হপ্তাবাজারে।
এমন মন্ত্র পড়ব, যে মুখ দেখবি অণুবীক্ষণে।
ম্যাজিক রানি মক্ষি আমি আমার কাছে শিক্ষা নে।
আন লিখে এক দরখাস্ত,
ছল শেখাব জবরদস্ত,
লোক চরাবি তখন -- ভেক বদলে প্রতিক্ষণে।
আজ প্রভাতে একলা- চিত্ত কটকটাচ্ছে বড্ড কি?
হাওয়ার পায়রা ঘুঁটের কুকুর কেবল শঠে শাঠ্য কি?
যদিও আমি ফন্দিবাজ,
চল পাতাব সন্ধি আজ,
কিনবি যদি হাপ্ প্রাইসে যাদুর ফিকির ফাঁকি।

ছবিঃ লেখক

# প্রজাপতির সকাল

মীম নোশিন নাওয়াল খান

সকাল হল ঝলমলে খুব,
পাতার ভেতর ঘরে,
প্রজাপতি সাজছে বসে,
বের হবে তারপরে।
রঙিন পাখায় মাখল ভীষণ
জুঁই ফুলদের ঘ্রাণ,
মাখল গালে ফুলের রেণু,
আজ খুশি খুব প্রাণ।
পরল পায়ে ফুল- পাপড়ি,
জুতোর মাপে কাটা,
লাগছে কেমন দেখতে আবার
একটুখানি হাঁটা।
পাতার উপর শিশির কণা,
আয়না হল বেশ,
সেইখানেতে নিজকে দেখে,
সাজটা হল শেষ।
প্রজাপতি মেলল ডানা,
পাতার ঘরটা ছাড়ি,
দিল উড়াল, ঘুরতে যাবে
শিউলি ফুলের বাড়ি।

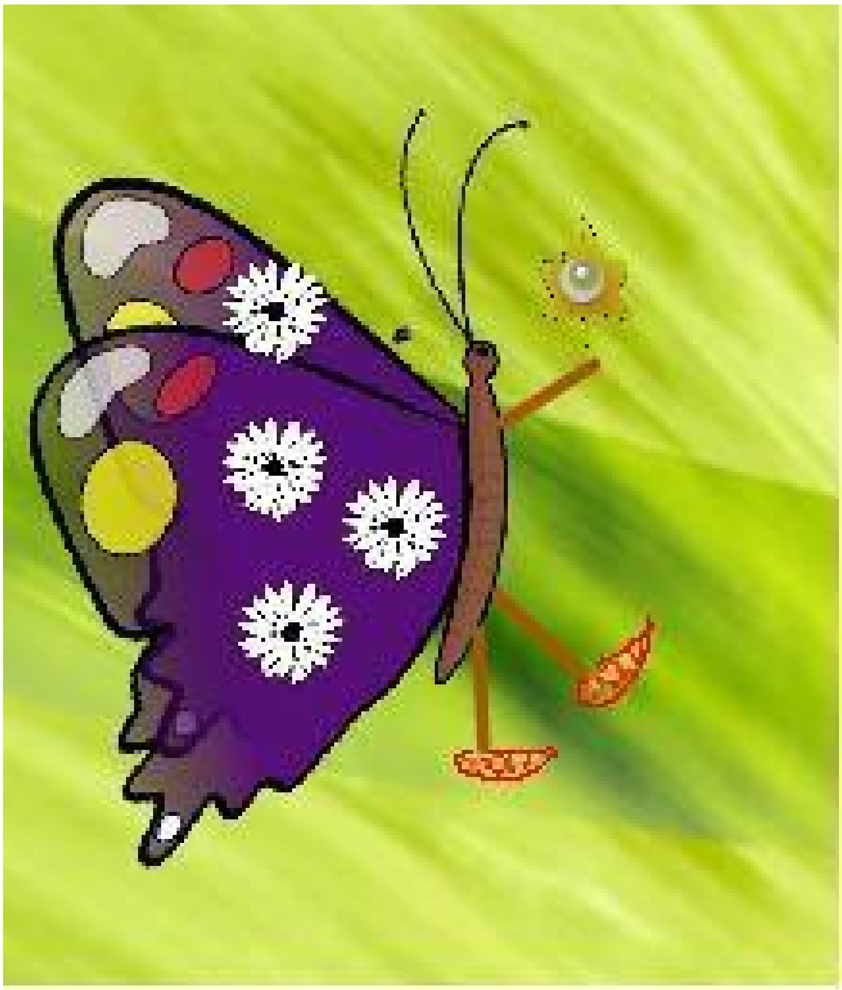

# ব্যাঙাবেঙির কথা

শেখর রায়

মেঘ ঘনালে আঁধার করে
বৃষ্টি নামে মুষলধারে
গহিন কালো দিঘীর পাড়ে
তালের সারি মাথা নাড়ে।
ভাবছে বসে ব্যাঙা বেঙি
আকাশটা কি হল ফুটো ?
জুটবে আহার কেমন
করে দু'বেলা দু'মুঠো !
যা ছিল সঞ্চয় ভাঁড়ারে
জলে ধুয়ে সাফ আহা রে !
এমন সময় দেখে ব্যাঙা
বাড়ছে জল ডুবছে ড্যাঙা
কোথায় ড্যাঙা , কোথায় তল
হু –হু করে বাড়ছে জল
সাথে ছানাপোনার দল।
বলে বেঙি বুঝলি ব্যাঙা
পারিস যদি ম্যাঘরে ঠ্যাঙা
এত বৃষ্টি দেয় ক্যান
বুদ্ধিশুদ্ধি নাই ক্যান?
শুনে ব্যাঙা বলে- আঁই
এসব কথা কইতে নাই
ম্যাঘ –বৃষ্টি দ্যাবতা
জানিস ওদের ক্ষমতা ?
হলে তুষ্ট মেটায় সাধ
করেন তারা আশীর্বাদ ।

ছবি সঙ্ঘমিত্রা

# ধাঁধা

## ধাঁধা ১

তুমি একটা গেম শো তে গেছ। হোস্ট তোমাকে ক, খ, গ লেখা তিনটে বন্ধ দরজার সামনে নিয়ে গিয়ে বলল এর পেছনে একটা প্রাইজ লুকোন আছে। তুমি একটা দরজা পছন্দ করো। প্রাইজওয়ালা দরজা পছন্দ করলেই তোমার জিত। তুমি বললে "ক"। হোস্ট তখন ' খ' লেখা দরজাটা তোমায় খুলে দেখিয়ে দিল যে সেটা খালি। তারপর সে তোমাকে একটা সুযোগ দিল তোমার পছন্দটা বদলাবার। তুমি কী করবে?

## ধাঁধা ২

বুঝলি, রেসের শুরুতে ছিলুম লাস্ট পোজিশানে। তারপর একে একে এগোতে এগোতে লাস্ট ল্যাপের শুরুতে থার্ড ম্যানকে পেরিয়ে গেলাম। তারপর ফিনিশিং লাইনে পৌঁছোবার ঠিক আগে সেকেন্ড ম্যানটাকেও টপকে ফার্স্ট হয়ে গেলাম। আহা কী উত্তেজনা!

- মিথ্যে বোলো না তো!

- মিথ্যেটা আবার বললুম কোথা?

সেইটেই তো ধাঁধা।

## ধাঁধা ৩

ছটা গ্লাস এক সারিতে রাখা। প্রথম তিনটেতে জল ভরা, শেষ তিনটে খালি। একটা গ্লাস নাড়াতে পারবে একবারই। তার ফলে হয়ে যাবে-- জল- খালি- জল- খালি- জল- খালি-- এইরকম সজ্জা। পারবে?

## ধাঁধা ৪

- - ছেলেপিলের পরীক্ষার ফল কেমন হল?

- - আর বলবেন না মশাই। দুটো বাদে বাকিগুলো অংকে ফেল, দুটো বাদে বাকিগুলো ভূগোলে ফেল আর দুটো বাদে বাকিগুলো বাংলায় ফেল।

- - সে কী? কটী ছেলেমেয়ে আপনার?

- - ধুত, নিজেই হিসেব করে নিন না। জ্বালাবেন না তো।

# কুইজ

১। রেড ডেটা বুকে কীসের খবর থাকে?
২। পৃথিবীর ছোটো হিরের শতকরা ৯০ ভাগ কোথায় পালিশ হয়?
৩। সূর্যালোকের কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবুজ পাতা শোষণ করে?
৪। মিলেট কাকে বলে?
৫। ভারতের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক কোনটা?
৬। লোহিত কণীকা বধ্যভূমি কোনটা?
৭। HOOCCOOH কোন অ্যাসিডের নাম?
৮। সাদা সোনা কাকে বলে?
৯। জেব্রাফিশের মাতৃভূমি কোথায়?
১০। ফিলে কার নাম?

# জানো কি

১। দুনিয়ার সবচেয়ে দামি পোশাক হল ‘নাইটিংগেল অব কুয়ালালামপুর’। একটা ৭০ক্যারাট হিরে আর ৭৫১ খানা কৃস্টাল বসানো পোশাকটার দাম পড়েছে ৩০ মিলিয়ন ডলার।

২। দুনিয়ায় তিন নম্বর সবচেয়ে দামি পোশাক হল স্পেস স্যুট। একেকটার দাম পড়ে মোটামুটি ১১ মিলিয়ন ডলার করে। গাউনটার দামে প্রায় তিনখানা স্পেসস্যুট হয়ে যাবে। উরিব্বাস।

৩। বাজারে গিয়ে দেখো, মোটামুটি দুশো টাকা দামে একটা ভালো শাড়ি কেনা যায়। অনেক গরিব মানুষ একটা শাড়ি পেলে সারা বছর চালিয়ে দেন। ওই সবচেয়ে দামি পোশাকটার বদলে সে টাকা দিয়ে শাড়ি কিনে গরিব মানুষদের দিলে কতজন গরিব মানুষ একটা করে নতুন শাড়ি পাবেন বল দেখি? – এক কোটি আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জন।

৪। এখন অবধি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি দামে যে খাবার বিক্রি হয়েছে সেটা হল একটা ইটালিয়ান হোয়াট আলবা ট্রাফল। (বিচ, পপলার এইসব গাছের শেকড়ে একধরণের ছত্রাক হয়, তাদের কন্দই হল ট্রাফল। ) এক লক্ষ ষাট হাজার ডলার দিয়ে সেটি খাবার জন্য কিনেছিলেন হংকং-এর এক ব্যবসায়ী।

৫। দশ টাকায় তিনটে রুটি আর একথাবা তরকারি পাওয়া যায় আমাদের দেশে। তাইতে একজন লোকের এক বেলার খাবার হয়ে যায়। তাহলে বল দেখি ওই একটা ট্রাফল না কিনে ও টাকাটা দিয়ে যদি গরিব মানুষকে খাওয়ানো হত তাহলে কতোজন মানুষ এক বেলার খাবার পেতো? ন লক্ষ বিরানব্বই হাজার জন। দারুণ, নয়?

## ড্রুডলঃ

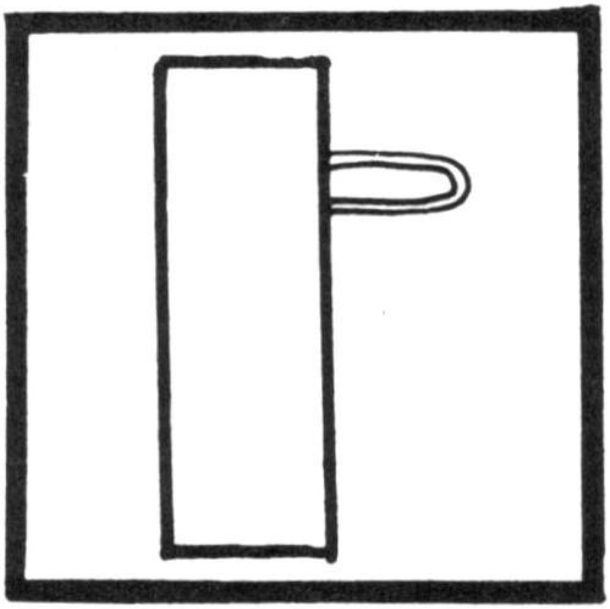

# কীসের ফটোঃ

# অবিশ্বাস্য

# আশ্চর্য উলকি

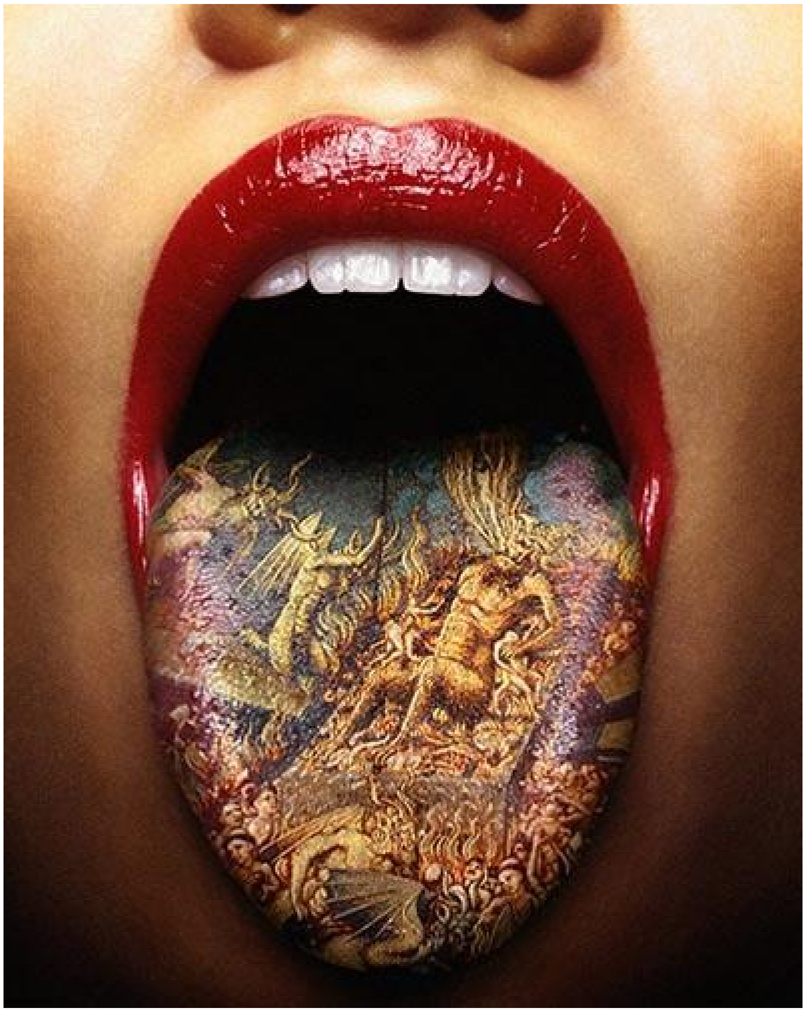

**গত সংখ্যার উত্তর**

**ধাঁধা- র উত্তর**

**এক:** zero, one, two, three, four ... ninety-nine (এই একশ'টা শব্দের মধ্যে এ, বি, সি, ডি নেই!)

**দুই:** ৩০ কিমি যায় ১ ঘন্টায়
১ কিমি ১/৩০ ঘন্টায়
ফেরার সময়
১ কিমি ১/৬০ ঘন্টায়

যদি দূরত্ব কে "x" কি.মি. ধরি,
তাহলে ২x কি. মি. যায় = (x/৩০ + x/৬০) ঘন্টায়
১ ঘন্টায় যায় = (২x) / (x/৩০ + x/৬০) কি. মি.
সুতরাং, গড় গতিবেগ = ৪০ কি.মি. প্রতি ঘন্টা (৪৫ নয়!)

**তিন:** বল গ্লাসের বাইরে এইভাবে...

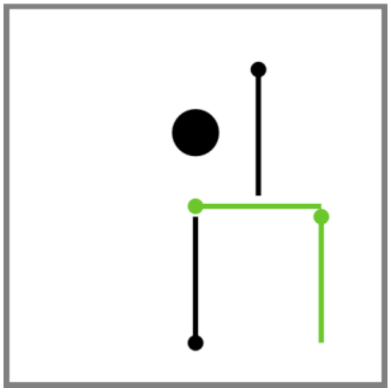

**কুইজের উত্তরঃ**
<u>মিথ্যেবাদী</u>
গ,গ,গ,খ,খ,খ,ক,গ,খ,
যতগুলো না মিলবে তাকে দশ দিয়ে গুণ করে ১০০ থেকে বাদ দাও। তুমি তত পার্সেন্ট মিথ্যুক
<u>সাহসী</u>
খ,ক,খ,গ,গ,ক,গ,খ,ক

যতগুলো না মিলবে তাকে দশ দিয়ে গুণ করে ১০০ থেকে বাদ দাও। তুমি তত পার্সেন্ট সাহসী

<u>সাবধানী</u>

খ,খ,ক,ক,ক,গ,খ,ক,গ

যতগুলো না মিলবে তাকে দশ দিয়ে গুণ করে ১০০ থেকে বাদ দাও। তুমি তত পার্সেন্ট সাবধানী

**ড্রুডলের উত্তর**

একটা কাঠের পাওয়ালা জলদস্যু মুরগির পায়ের ছাপ

**কীসের ফটোঃ**

মায়ের মাথায় মেহেন্দি মেখেছে।

**শব্দখেলা**

জামা ইবাবু  কম লা লেবু একলাখেওনা

হাতের তেলোয় ভাতের ফ্যান

মাদুর্গা পুজো

আবোলতাবোল

গভীর অন্ধকার

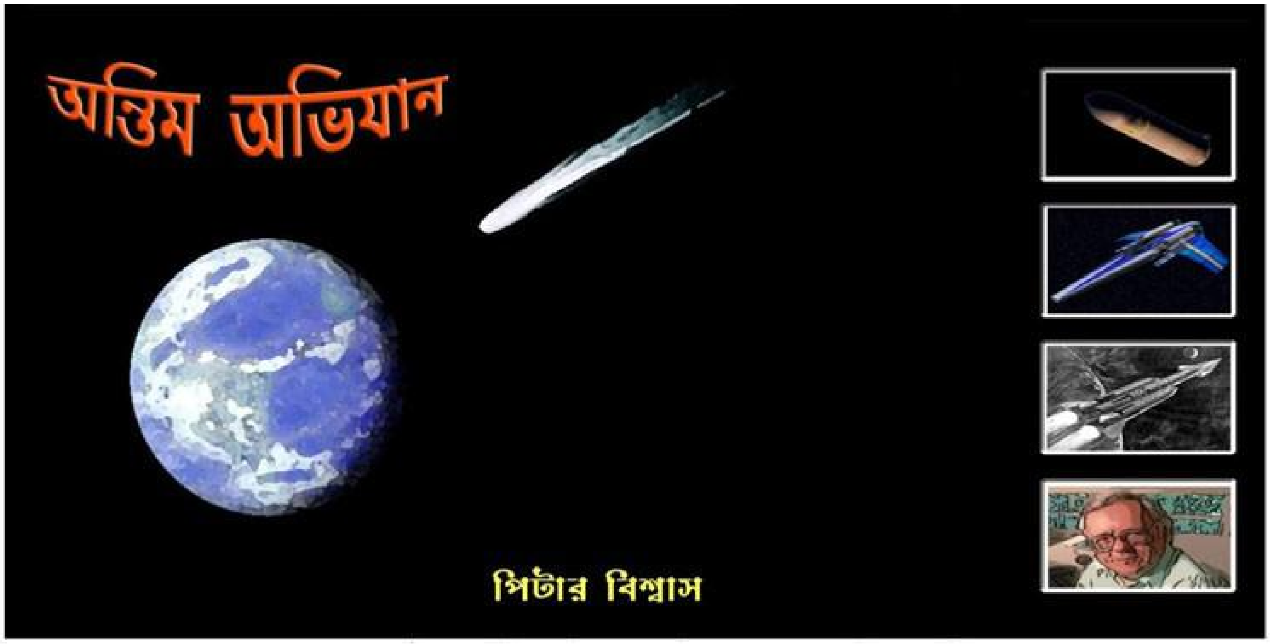


।৫।

রাত গভীর হয়েছে। মানুষদুজন জলধারাটির পাশে শুয়ে ঘুমোয়। বেশ কিছুদিন ধরে ক্রমাগত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে পালিয়ে চলা মানুষদুটির চোখে নিশ্চিন্ত ঘুম ছিল না। আজ অবশেষে সমস্ত পরিচিত শত্রুর চোখের আড়ালে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে এসে তারা আর সতর্কতা বজায় রাখতে পারে নি। জিষ্ণুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে প্রফেসর বোস তার পাশে বসে সতর্কভাবে জেগে থাকবার চেষ্টা করেছিলেন কিছুক্ষণ। আলো নিভিয়ে দিয়েছেন। এই গুহার রাজত্বে অন্য মানুষের উপস্থিতির যে ইঙ্গিত দিয়েছে জিষ্ণুর খুঁজে পাওয়া পাথরের অস্ত্রটা, তা দেখবার পর বিশ্রামের সময়ে আলো জ্বেলে রেখে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিতে সাহস হয় নি প্রফেসর বোসের।

সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের আড়ালে কখন যে তাঁর চোখদুটো জুড়ে এসেছে নিজেই টের পাননি তিনি। হঠাৎ সেই অন্ধকারের নৈঃশব্দ ভেঙে ছোট্ট একটা নুড়িপাথর এসে টুপ করে পড়ল তাঁর পাশে। ক্ষীণ শব্দটুকু তাঁর ঘুমে কোন ব্যাঘাত ঘটাল না। তারপর আরো কয়েকটা নুড়ি পাথর এসে পড়ল চারপাশে। অবশেষে, তাঁরা যে ঘুমিয়ে রয়েছেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর আস্তে আস্তে অন্ধকারের মধ্যে থেকে কতগুলো ছায়াছায়া শরীর এগিয়ে এল তাঁদের কাছে। জীর্ণ চেহারার একটি অবয়ব ঝুঁকে পড়ে মানুষদুজনকে পরীক্ষা করল কিছুক্ষণ। ততক্ষণে তাঁর ইশারায় আরো কয়েকজন মানুষ এসে পাশে পড়ে থাকা জিনিসপত্রের পুঁটুলিগুলোকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

এইবার বৃদ্ধ তাঁর কোমরের ছোট একটি পুঁটুলি থেকে একটি সদ্য তুলে আনা ছত্রাকের কন্দ বের করে আনলেন। হাতের তেলোয় নিঃশব্দে সেটিকে থেঁতো করে নিয়ে তা এগিয়ে ধরলেন ঘুমন্ত মানুষদুটির নাকের কাছে।

মিনিটখানেক সেটি সেইভাবে ধরে থাকবার পর নিচু হয়ে একবার তাদের নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ইশারা করলেন বৃদ্ধ। একটা মশাল জ্বলে উঠল কাছেই কোথাও। তার ধিকিধিকি আলোতে কাঠ ও লতাপাতা দিয়ে তৈরি দুটি সরু মাচা নিয়ে এগিয়ে এলো একদল মানুষ। নিঃশব্দে, সুশৃংখল দক্ষতায় নিঃসাড় মানুষদুটির দেহ মাচাদুটির ওপর শুইয়ে নিয়ে তারা এগিয়ে গেল সেই জলধারার উজানের দিকে।

গুমগুম শব্দটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। এইখানে পাতাল জলধারাটি অনেক উঁচুতে থাকা একটি ফুটো বেয়ে এসে প্রবলবেগে নিচে আছড়ে পড়ে নদী হয়ে বয়ে চলেছে। সেই আছড়ে পড়া জলধারার দিকে সটান এগিয়ে গিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল মানুষের দলটা।

জলধারার উল্টোদিকে একটা গভীর সুড়ঙ্গের মুখ। এককালে এই পথেও হয়ত বয়ে আসত কোন জলস্রোত। আজ ভূপ্রকৃতির বদলের সঙ্গে সঙ্গে সে জলধারা শুকিয়ে গেছে। পড়ে আছে তার পাতাল খাতটি।

সেই সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল দলটা। আস্তে আস্তে জলের শব্দ থেমে আশ্চর্য একটা নৈঃশব্দ এসে ছেয়ে ফেলল তাদের। গলিপথটা অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় ভেঙে ছড়িয়ে গেছে চারদিকে, সেই অতিকায় পাহাড়ের শ্রেণীর পেটের ভেতর। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে অনায়াসে তাদের মধ্যে থেকে সঠিক পথগুলি বেছে নিয়ে তারা এগিয়ে চলল সেই গোলকধাঁধার পথে- - - -

* * * * * * * *

- -ঠাণ্ডা ঠান্ডা ঠেকছিল জিষ্ণুর। গায়ের চাদরটা কখন যেন সরে গিয়েছে পায়ের ওপর থেকে। মাথার নিচে নরম বালিশে মুখ গুঁজে চোখ পায়ের ওপর চাদরটা ফের টেনে নিয়েই চমকে উঠে বসল সে। পাথরের পাটার ওপর পাতা একটা নরম বিছানায় শুয়ে আছে সে। ছোটোমতন একটা ঘর। ঘর না বলে ছোটো একটা গুহাই বলা উচিত হবে। তার দেয়ালগুলো আবছা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আলোর উৎস ঠিক কোথায় বোঝা যায় না। তাড়াতাড়ি পাথরের পাটাটার থেকে নেমে আসতে গিয়েছিল সে এমন সময় একটা হাত এসে তাকে বাধা দিল, “উঠো না জিষ্ণু।”

“বাবা-আমরা- ”

“ভয় পেয়ো না। ভয় মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু জিষ্ণু। আমাদের অজ্ঞান করে কেউ ধরে এনেছে এখানে- - ”

স্বল্প আলোয় ততক্ষণে চোখ সয়ে এসেছে জিষ্ণুর। প্রফেসর বোসের শান্ত মুখটা চোখে পড়ছিল তার। তাঁর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে চোখ ফেলে সে একটু অবাক হয়েই বলল, “আলো জ্বলা দেয়াল! কিন্তু সে কী করে- ”

সেদিকে চোখ ফেলে একটু হাসলেন প্রফেসর বোস, “আহা! প্যানেলাস স্টিপটিকাস! মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার কোন শেষ নেই জিষ্ণু। কোন উন্নত টেকনোলজি নয়, এ একধরণের ছত্রাক। আলো দেয়া এ জাতের ছত্রাকের চাষ করেছে এরা গুহার দেয়াল জুড়ে। তাতেই আলোর সমস্যা মিটেছে। সম্ভবত এদের গোটা বসতির দেয়াল জুড়েই এ বন্দোবস্ত রয়েছে।”

জিষ্ণু উঠে এসে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। গোটা দেয়াল জুড়েই খণ্ড খণ্ড ভেজা কাঠের টুকরো আটকানো রয়েছে। তার ওপরে গজিয়ে ওঠা ছত্রাকের দল আলো ছড়াচ্ছিল। সেইদিকে দেখতে দেখতেই অন্যমনস্কভাবে সে বলল, “কিন্তু আমাদের এভাবে ধরে এনে- ”

প্রফেসর বোসের শক্তপোক্ত হাতটা জিষ্ণুর কাঁধে এসে ঠেকল, “বুঝতে পারছি না। তবে এরা মনে হয় কোন ক্ষতি করতে চায়না আমাদের। নইলে ধরে এনে এইভাবে নরম বিছানায় আরাম করে শুইয়ে রাখতো বলে মনে হয় না। তাছাড়া, আমাদের জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায় নি। ওই দেখো।”

প্রফেসরের আঙুলের ইশারা অনুসরণ করে জিষ্ণু দেখল, তাদের জিনিসপত্রের পুঁটুলিগুলো সযত্নে ঘরটির মেঝের ওপরে রাখা রয়েছে।

“কিন্তু- কেন- ”

“জানি না জিষ্ণু। তবে আমাদের আটকে যে রাখা হয়েছে সেটা পরিষ্কার,” বলতে বলতে হাতে ধরা টর্চের আলো ফেলে ঘরের একপাশে দেখালেন প্রফেসর বোস। সেখানে গুহামুখটা একটা পাথরের চাঁই দিয়ে বন্ধ করা আছে, “আমি ওটায় ধাক্কা দিয়ে দেখেছি। শক্ত করে আটকানো।”

"কিন্তু এরা যদি আমাদের কোন ক্ষতিই না চাইবে তাহলে এইভাবে আমাদের আটকে রাখবার প্রয়োজনটা কী?"

"সেটা এদের সঙ্গে কথা না বললে বোঝা যাবে না। আর তার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতেও হবে না আমাদের, " বলতে বলতে হাতে ধরা একটা ছোট্ট যন্ত্রের পর্দাটা জিষ্ণুর দিকে ঘুরিয়ে ধরলেন প্রফেসর বোস, "পর্দাটা দেখো জিষ্ণু। জীবনসংবেদি এই যন্ত্রটা পুরু পাথরের আবরণের অন্যদিক থেকেও একশো মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে যে কোন জীবন্ত বস্তুর উপস্থিতি ধরতে পারে।"

পর্দার বুকে তখন সবুজ আলোর পটভূমিতে কয়েকটি আলোকবিন্দু ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠছিলো।

"একদল মানুষ। এদিকে আসছে। তৈরি হও জিষ্ণু, " বলতে বলতে একটি ছোট লেজার বন্দুক বের করে জিষ্ণুর দিকে এগিয়ে ধরতে ধরতেই প্রফেসর বোস সাবধানবাণী দিচ্ছিলেন, "যতটুকু বোঝা গেছে এরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমরা এদের এলাকায় ঢুকে এসেছি কিন্তু তবুও আমাদের ধরে এনে অতিথির মতোই আচরণ করেছে এতক্ষণ। একেবারে নিরুপায় না হলে অস্ত্রের ব্যবহার করবে না। আমি ওর শক্তি মৃদু আঘাতে বেঁধে দিয়েছি। আমার নির্দেশ না পাওয়া অবধি ওকে কখনই মারণ আঘাতের জন্য বাঁধবে না। যতক্ষণ না আমি সংকেত দিই অস্ত্রটা পকেটের বাইরে বেরও করবে না, " বলতে বলতেই নিজের হাতে ধরা লেজার বন্দুকটার বোতাম টিপে সেটিকে মৃদু আঘাতের জন্য তৈরি করে নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখলেন প্রফেসর। আলোকবিন্দুগুলি ততক্ষণে বড়ো হয়ে যন্ত্রের পর্দা ছেয়ে ফেলেছে প্রায়। মৃদু গুমগুম শব্দ উঠছিলো পাথরের দরজায়। তারপর তা আস্তে আস্তে একপাশে গড়িয়ে যেতে শুরু করল- - - -

দরজার সামনে যে মানুষটি এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর বয়স আন্দাজ করা সহজ নয়। জীর্ণ শরীরটি , অথচ মেরুদণ্ড একেবারে টানটান। কোমরে জড়ানো একখন্ড সাদা কাপড় ছাড়া শরীরে আর কোন পোশাক নেই। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত দুটি সামনে করে নিচু গলায় বলে উঠলেন, "হিন ইন্‌ন, কিয়াউক—"

বলতে বলতে লম্বা লম্বা পায়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে এলেন মানুষটি। দরজার বাইরে তাঁর পেছনে আরো অনেক মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। সম্ভবত তারা বৃদ্ধের আদেশের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রফেসর বোস নিচু হয়ে তাঁর পুঁটুলির থেকে একটা ছোট যন্ত্র বের করে এনে সেটিকে সামনে বাড়িয়ে ধরেছিলেন। ততক্ষণে তাঁর একেবারে সামনে চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ। সে দৃষ্টিতে কোন রাগ বা ভয় ছিলো না। ফেরতিনি বলে উঠলেন, "হিন ইন্‌ন, কিয়াউক মেইক সোয়ে—"

প্রফেসরের হাতের শব্দসংবেদি যন্ত্রটির পর্দায় ততক্ষণে ভাষাটির পরিচয় ভেসে উঠেছে। বার্মিজ ভাষায় কথা বলছেন বৃদ্ধ। সেইদিকে একনজর দেখে যন্ত্রটিকে একটি নির্দেশ দিয়ে প্রফেসর শান্ত গলায় বাংলায় বললেন, "আমরাও বন্ধু। কোন ভয় নেই—"

যন্ত্রটির থেকে একেবারে তাঁর মত একটি গলা বলে উঠল, "ডোঃ মেইক সোয়ে। হিন ইন্‌ন—"

বৃদ্ধ বিস্মিত চোখে যন্ত্রটির দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। আর তার পরই তাঁর চোখদুটিতে হাসি ঝিলমিল করে উঠল। হাত বাড়িয়ে প্রফেসর বোসের থেকে যন্ত্রটি নিয়ে ছুঁয়ে দেখলেন একবার। তীক্ষ্ণধি মানুষটি ধরে ফেলেছেন যন্ত্রটি কী করছে। সেটিকে মুখের কাছে তুলে ধরে ফের বলে উঠলেন, "হ্সান সেত।"

যন্ত্র থেকে এইবার বাংলা ভাষায় তাঁর জরাজীর্ণ কিন্তু পরিষ্কার গলাটিই ভেসে এল— “অদ্ভুত যন্ত্র।”

তারপর প্রফেসর বোসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাইরের পৃথিবীর মানুষ, আমাদের সন্ধান পেলে কীভাবে?”

“নিতান্তই হঠাৎ করে মান্যবর,” প্রফেসর বোস উত্তর দিলেন, “আপনাদের অস্তিত্বের কথা আমরা আগে থেকে জানতাম না।”

বৃদ্ধের মুখ গম্ভীর হল, “মিথ্যা বলবে না যুবক। এই পাতালদেশে মিথ্যা বলার শাস্তি বড়ো ভয়ংকর। আবার প্রশ্ন করছি, আমাদের সন্ধান তুমি পেলে কী করে?”

প্রফেসর বোস শান্ত মুখে জবাব দিলেন, “আমি মিথ্যা কথা বলিনা মান্যবর, আমরা সত্যিই আপনাদের অস্তিত্বের কথা আগে থেকে জানতাম না। নিতান্তই পথ ভুল করে-- ”

“পথ ভুল করে? তোমার পোশাক আশাক, চেহারা থেকে অনুমান করা যায় তোমরা কোন দূর শহরের বাসিন্দা। সেখান থেকে এই জঙ্গলে কেন এলে? দুর্গম পথ পার হয়ে এই পাহাড়ে এসে পৌঁছোলে—সে- ও কি ভুল করে?”

প্রফেসর সত্যব্রত বোস নিঃশব্দে মানুষটির দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বৃদ্ধের হাসিমাখা চোখদুটিতে গভীর অবিশ্বাসের স্পর্শ লেগেছে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে বললেন, “আপনার সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে মান্যবর। আপনার জায়গায় হলে আমিও এই একই সন্দেহ করতাম। কিন্তু অনুরোধ করব, আপনি আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন।”

“কেন বিশ্বাস রাখব?”

“রাখবেন, তার কারণ, আমরা ইচ্ছা করলে আপনাদের সমস্ত বাসস্থানটিকে ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখি। কিন্তু তা আমরা করিনি, করতে চাইও না। এর সামান্য একটু প্রমাণ আমার সঙ্গের এই বালকটি আপনাকে দেখাবে। মান্যবর, আপনারা আমাদের এই ঘরে বন্দি রেখেছেন এর দরজায় একটি বিরাট পাথরের খণ্ড চাপিয়ে। কোন একা মানুষের পক্ষে তা খোলা অসম্ভব। আমি অনুরোধ করব, আপনার সঙ্গে আসা সৈন্যদের ওই পাথরের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে তাদের নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার আদেশ দিন।”

বৃদ্ধ প্রফেসর বোসের মুখের দিকে তাকিয়ে কী একটা ভাবলেন, তারপর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলেন, “কাং সিক, ভেতরে এসে বন্দিকে বাইরে নিয়ে যাও। এই ঘরে এখন আমি আর ওই বালকটি থাকব। তারপর দরজা বন্ধ করে সকলে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়াও।”

“বুদ্ধিমানের মতই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মান্যবর,” বলতে বলতেই প্রফেসর বোস পকেট থেকে ছোট্ট লেজার বন্দুকটি বের করে এনে তাঁকে দেখিয়ে বললেন, “এই ছোট্ট যন্ত্রটি আমার সঙ্গে থাকল। এ’রকম আরেকটি যন্ত্র আমার ছেলের কাছেও রইল।”

ততক্ষণে বাইরে থেকে দুজন যোদ্ধা ঘরের ভেতর এসে প্রফেসর বোসকে দু পাশ থেকে ধরে বাইরের দিকে রওনা দিয়েছে। চলতে চলতেই জিষ্ণুর দিকে একবার ঘুরে দেখলেন প্রফেসর। তারপর বললেন, “ভয় পাবে না জিষ্ণু। এত পুরু পাথরের স্তরের নিচে থেকে লেজারের বিচ্ছুরণ টের পাবেনা বাইরের দুনিয়া। আমরা এখানে নিরাপদ। সেইসঙ্গে খেয়াল রাখবে কোন প্রাণহানি না হয়। এটি একটি প্রদর্শনীমাত্র। কারো প্রাণ নেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়।”

ঘরঘর শব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল ফের। জিষ্ণু পকেট থেকে ছোট্ট মারণাস্ত্রটি বের করে এনে তার বোতাম টিপছিল একমনে। সর্বোচ্চ শক্তিতে বাঁধতে হবে একে এইবার। একটু পরে

খেলনার মত দেখতে যন্ত্রটি হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে সে ইশারায় সরে দাঁড়াতে বলল বৃদ্ধকে। তারপর হঠাৎ তার হাতে ধরা যন্ত্রটা থেকে ছিটকে বের হয়ে এল গনগনে লাল একটা আলোর রেখা। মুহূর্তে বিকট শব্দ করে ভেঙে চৌচির হয়ে উড়ে গেল গুহার পাথরের দরজা।

*****

“মান্যবর, এমন বহু অস্ত্রই আমাদের সঙ্গে আছে। অথচ ভেবে দেখুন, আপনারা আমাদের বন্দি করে এনেছেন, তুচ্ছ পাথরের খণ্ড দিয়ে আমাদের আটকে রেখেছেন, কিন্তু আমরা একবারও তার প্রতিবাদ করি নি। ক্ষমতা থাকলেও আপনাদের কারাগার থেকে বের হয়ে যাই নি।”

প্রশস্ত সভাগুহাটিও বন্দিকক্ষের মতই ছত্রাকের আলোতে মৃদু আলোকিত। কথা শেষ করে সামনে সাজানো পাথরের পাত্র থেকে একখণ্ড ছত্রাক তুলে মুখে দিলেন প্রফেসর। বড়ো সুস্বাদু এই ছত্রাকগুলি। একেকটি হাতের মুঠোর মতো বড়ো বড়ো, গাঢ় কমলা রঙের ফলের মত দেখতে।

“বেশ। তোমার যুক্তি আমি মেনে নিলাম,” বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। খানিক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির স্মৃতি তখনো তাঁর চোখের সামনে ভাসছে, “অবশ্য অকারণে আমরাও হিংসা করি না।”

“আপনার এই কথাটিতে আমি বিশ্বাস করি মান্যবর। আমাদের বন্দি করলেও , অতিথির মতই আপ্যায়ন করেছেন আপনারা।”

বৃদ্ধ একটু হাসলেন। তারপর বললেন, “এবারে বলো, কেন এসেছো তোমরা এখানে? পথ ভুলে শহর থেকে যে আসো নি তা তো পরিষ্কার। তাহলে?”

“না মান্যবর। আমরা কোন শহর থেকে আসিনি।  শুধু বলতে পারি যে ভয়ংকর বিপদ মাথায় নিয়ে আমি এই অরণ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছি তা শুধু আমাদের একার নয়। সে বিপদে আপনাদের অস্তিত্বও একইরকম ভাবে বিপন্ন হতে চলেছে।”

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, “বৃথাই চিন্তা করছ যুবক। শোনো, আজ থেকে বহুকাল আগে ঐরাবতক নদীর মহাপ্রলয়ে পৃথিবী জনশূন্য হয়ে গেলে আমাদের পূর্বজরা তার তীর পরিত্যাগ করে পৃথিবীর এই গর্ভদেশে আশ্রয় নেন। স্বয়ং পৃথিবী মাতা আমাদের রক্ষাকর্ত্রী। যতদিন আমরা এই প্রস্তরদুর্গে আছি, তোমাদের দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রফেসর বোস বললেন, “না মান্যবর। যে দুর্যোগের সংবাদ নিয়ে আমরা এখানে এসেছি, তা একবার ঘটলে এই পাথরের আবরণও আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। তার কাছে আপনার ঐরাবতক নদীর মহাপ্লাবনও তুচ্ছ হয়ে যাবে।”

বৃদ্ধের চোখে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ছিল। সেটি লক্ষ করে প্রফেসর বোস দৃঢ় গলায় বললেন, “আমাকে একটা সুযোগ দিলে আমি আপনাকে তার প্রমাণ দেখাতে পারি।”

“কী প্রমাণ দেখাবে তুমি?”

“অকাট্য চাক্ষুষ প্রমাণ মান্যবর। কিন্তু তার জন্য আমাদের কিছু যন্ত্রাদি সাজাবার প্রয়োজন হবে। আপনি কি তার অনুমতি দেবেন আমাদের?”

“কী করতে চাও?”

প্রফেসর বোস নিচু হয়ে তাঁর কাছে রাখা পুঁটুলিটির থেকে একটি ছোট্ট যন্ত্র বের করে এনে বললেন, “এই যন্ত্রটি বহুদূর অবধি দৃষ্টিক্ষেপণে সক্ষম। এই গুহাক্ষেত্রের বাইরে খোলা আকাশের নিচে এটিকে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করতে আদেশ দিন আপনার সৈনিকদের। যন্ত্রটি বুদ্ধিমান। আমার নির্দেশ মেনে এর পেছনে সংযুক্ত ধাতব রজ্জুটি দিয়ে এ আমার প্রয়োজনীয় দৃশ্যগুলিকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিলে আসল ঘটনাটি আপনাকে বোঝাতে সুবিধে হবে আমাদের---   ”

ক্রমশ

তারপর মামা- ভাগনের সেই নাটক। শুরুতেই জমে গেল খেলা। মামা একা বেরোলে তো এই নাটকটা করা যায় না। আমাদের কথাবার্তা শুনে বাচ্চাদের কী হাসি কী হাসি। বড়োরাও শব্দ না করে হাসছে। ঝোলাগোঁফওয়ালা বুড়োমতো একটা লোকের শুধু চোখদুটো হাসছে, আমি লক্ষ করলাম।

তারপর শুরু হল আসল খেলা। দারুণ জমে গেল। প্রত্যেকটা খেলার পরে মামা দারুণ দারুণ সব মজার কথা বলে। ভালুকের গল্প শোনায়। পঞ্চাকে ওষুধ খাওয়ানোর সেই গল্প শুনে সব্বাই তো হেসে কুটিকুটি। আমিও দু'চার কথা বলি। সুবিধে করতে না পারলে মামা সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয়। অদ্ভুত জমাটি খেলা চলল দেড় ঘন্টা ধরে।

খেলার মাঝে মাঝে দু'চার জনকে দেখলাম পয়সা না দিয়ে চলে যেতে। কেউ কেউ দিয়েও গেল। বাচ্চারা সবাই তো বটেই, বেশিরভাগ বড়োরাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলা দেখল।

খেলা শেষ হতে বেশ পয়সা পড়ল। অনেকে হাতে দিল। ছুঁড়েও দিল কেউ কেউ। এটা আমার ভালো লাগল না। কেন বাবা, আমরা কি ভিখিরি নাকি? পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে সার্কাস দেখতে পারো তুমি?

সেই ঝোলাগোঁফওলা বুড়ো লোকটা মামাকে ডেকে বলল, "ওহে ছোকরা, তোমার পেটে ভালোই বিদ্যে আছে মনে হয়। কতদূর লেখাপড়া করেছ?"

"আজ্ঞে বি. এ. পাস।"

"তা, এ লাইনে কেন?"

"চাকরি পেলাম না। অন্য যে ক'টা লাইন ধরবার চেষ্টা করেছি সব বেলাইন হয়ে গেল। তাই এই লাইনটা দেখছি চেষ্টা করে। কোনো কাজই আমার কাছে ছোট নয়, যদি সৎভাবে করা যায়।"

"গুড, ভেরি গুড," বলতে বলতে ঝোলাগোঁফওলা পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে মামাকে দিল, "এই নাও।"

একটা বাচ্চা ছেলেকে ছুটে চলে যেতে দেখে আমি ভেবেছিলাম পয়সা দিতে হবে বলে পালাচ্ছে। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেরবার জন্য তৈরি হচ্ছি, সে দেখি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। হাতে একখানা পাঁচটাকার নোট। আমার হাতে টাকাটা দিয়ে বলল, "আমার কাছে টাকা ছিল না তো, তাই বাড়ি গেছিলাম আনতে।"

"তুমি ভারি ভালো ছেলে," বলে আমি ওর হাত ধরে পঞ্চার কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম, "পঞ্চা "একে আদর করে দাও।"

পঞ্চার আদর নিতে প্রথমে একটু ভয় পেলেও কী যে খুশি হল ছেলেটা কি বলব! ও নিশ্চয় কোনদিন এই ঘটনাটা ভুলবে না। ওর সব বন্ধুদের বলবে।

ওই পাড়াতেই আরো এক জায়গায় খেলা দেখিয়ে আমরা বাড়ি ফিরছি। মন খুব খুশি। বেশ ভালো রোজগার হয়েছে আজকে।

রাস্তার ধারের একটা দোকানে আলুর চপ ভাজছিল। দু'খানা করে গরম গরম আলুর চপ খেলাম মামা আর আমি। দারুণ খেতে। দোকানি লোকটা বেশ ভালো। অনেক গল্প- টল্প করল আমাদের সাথে। আমাদের ভদ্রলোক- ভদ্রলোক চেহারা দেখে প্রথমটায় তো বিশ্বাসই করতে পারেনি যে আমরা ভালুকের খেলা দেখাই। বলেও ফেলল সেকথা। মামা তাকে বলল, "দ্যাখো ভাই, কোনো কাজই ছোট না। আমি ফুচকার ব্যবসাও করেছি, চালাতে পারিনি। আমার এই ভাগনে বলেছিল তেলেভাজার দোকান দিতে। আমি রাজি না হয়ে যে ভালো করেছিলাম সে তোমার আলুর চপ খেয়েই বুঝতে পারছি। এই টেস্ট আমি কিছুতেই আনতে পারতাম না। সব কাজেই দক্ষতা লাগে ভাই।"

প্রশংসা শুনে খুব খুশি দোকানি, "সে আপনি ভাববেন না, আবার যদি কখনো তেলেভাজার দোকান দিতে চান চলে আসবেন আমার কাছে। আমি সব শিখিয়ে দেব।"

তেলেভাজার দাম মিটিয়ে আমরা বাড়ির রাস্তা ধরতে যাচ্ছি, পঞ্চার গলার দড়ি ধরে আস্তে টান দিলাম, সে কিন্তু উঠল না, বসে রইল যেমন কে তেমন।

"ও মামা, পঞ্চা যে নড়ছে না," আমি বললাম।

"সে কী!"

মামা এবার টানল দড়ি ধরে, তবু নড়ে না পঞ্চা। ভালো মুশকিল। পঞ্চা মোটেই অবাধ্য ভালুক নয়, তবে এ রকম করছে কেন? বেয়াড়া স্বভাব তার নয় মোটেই। আদর করে কত

ডাকলাম আমি, কত বলল মামা। কে শোনে কার কথা? গ্যাঁট হয়ে বসে আছে তো আছেই। এদিকে তেলেভাজা কিনতে আসা লোকেরা মজা দেখতে ভিড় জমাচ্ছে।

হঠাৎ কথাটা এসে গেল মাথায়, মামাকে বললাম “মামা, দুটো তেলেভাজা কিনে দাও না ওকে, আমার মনে হচ্ছে...”

“বলছিস? দেখি।” মামা বুঝতে পারে আমার মতলবটা।

মামা দুটো আলুর চপ কিনে এনে পঞ্চার সামনে রাখল। চটপট খেয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল পঞ্চা। ভালো ছেলেটির মতো হাঁটতে শুরু করল আমাদের সঙ্গে। এই কান্ড দেখে লোকেরা তো হেসে খুন।

হাঁটতে হাঁটতে মামা বলল “দশা, তুই পঞ্চার স্বভাবটা খারাপ করে দিয়েছিস ভালো ভালো খাইয়ে।”

সেদিন পঞ্চার জন্য কচুরি এনেছিল মামাই, আমি আনিনি। রোজই দেখি চারটি ভাত বেশি রাঁধে দিনের বেলায়, রাত্তিরে রুটিও করে খানকয় বেশি। বুঝতেই পারছ বেশি ভাতরুটি পঞ্চার জন্যেই। অথচ এখন দোষ চাপানো হচ্ছে আমার ঘাড়ে!

আমি হেসে বললাম “কথাটা ঠিক বললে মামা? ভেবে দ্যাখো কে বাড়িয়ে দিয়েছে পঞ্চার নোলা।”

মামা চুপ করে থাকল একটুক্ষণ, তারপর লাজুক লাজুক হাসল, “কী করব বল, ওরও তো নানারকম খাবার খেতে, মুখ বদলাতে ইচ্ছে করে। ওকে না দিয়ে খাই কী করে?”

মামার অবস্থা দেখে আমার মায়া হয়, বলি “তা ঠিক। পঞ্চা তো আমাদের পরিবারেরই একজন। ওকে না দিয়ে খেতে আমারও ভালো লাগে না। তোমার মনের কথা আমারও মনের কথা।”

এই হচ্ছে আমার ন'কড়ি মামা। মনটা দয়ামায়ায় একেবারে থইথই করছে।

খানিক দূর যেতে না যেতে আমাদের ক্লাসের অভিমন্যুর সাথে দেখা। বড়োলোকের ছেলে। দেমাক খুব। ওকে কেউ তেমন পছন্দ করে না। মামা আমাকে বলে দিয়েছিল ইস্কুলে কাউকে পঞ্চার কথা না বলতে। আমি বলিনি।

এখন ভালুক নিয়ে যেতে দেখে অভিমন্যু ভীষণ অবাক।

“এ কী রে দশা! ভালুক কোথায় পেলি? তোদের ভালুক? বলিসনি তো তোদের ভালুক আছে।”

“কী আর বলার কথা ভাই,” হাঁটতে হাঁটতেই বললাম আমি, “তোমরা অ্যালসেশিয়ান কুকুর পোষ, আমরা ভালুক পুষি, এই আর কী।”

“যাঃ। ভালুক আবার কেউ পোষে নাকি?”বলেই চোখ কোঁচকাল অভিমন্যু মামার হাতের ডুগডুগিটা দেখতে দেখতে “ভালুকের খেলা দেখাস নাকি তোরা? তোরা ভালুকওলা!”

অভিমন্যুর নাক- উঁচু কথাবার্তা হাবভাব আমার একদম পছন্দ হয় না।স্পষ্ট গলায় জোর দিয়ে বললাম “হ্যাঁ, আমরা ভালুকওলা, ভালুকের খেলা দেখাই। পঞ্চাশ টাকা দিলে তোদের বাড়িতে গিয়েও খেলা দেখিয়ে আসব।”

“দূর,” বিচ্ছিরি করে ঠোঁট বেঁকাল অভিমন্যু, “আমরা ভালো ভালো সার্কাস দেখি, আজেবাজে ভালুকের খেলা দেখতে যাব কেন?”

পঞ্চাকে আজেবাজে বলা! রাগে আমার সারা গা চিড়বিড় করে উঠল। ইচ্ছে করছিল দিই একটা থাপ্পড় কষিয়ে। টেরটি পাবে ননীগোপাল।

মামা বোধহয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছিল, তারও নিশ্চয় রাগ হচ্ছিল, বলল "শোনো খোকা, আমাদের ভালুকের খেলা তোমাদের দেখতে হবে না। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানে খুব বড়ো সার্কাস বসেছে, বাড়িতে বোলো, তোমাকে নিয়ে যাবে দেখাতে।"

"কোথায় বললেন?" অভিমন্যু জিজ্ঞেস করল।

"ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানে। মনে থাকবে তো?"

"ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান" বিড়বিড় করতে করতে অভিমন্যু ছুট লাগাল। বেশ বোঝা গেল বাড়ি গিয়ে এক্ষুনি আবদার ধরবে নিয়ে যেতে।

আমি হেসে মরি। আমি তো জানি ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানটা কী। বাগদাদের দক্ষিণে ইউফ্রেতিস নদীর ধারে নেবুকাডনেজার নামে এক রাজা এটা তৈরি করেছিল। মাটি থেকে দু'শো ফুট ওপরে। মামা পারেও বটে।

আবার আমরা হাঁটছি। মামা গম্ভীর। কী যেন ভাবছে।

একসময় মামা বলল "বুঝলি দশা, তোকে নিয়ে খেলা দেখাতে বেরোনো ঠিক হয়নি। কথাটা কেন যে আমার মাথায় আগে আসেনি। যাকগে, তুই আর বেরোবি না খেলা দেখাতে।"

"কেন মামা?"

মামা কোন উত্তর দিল না। চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

বাড়ি ফিরে গুনেগেঁথে দেখা গেল আজকের রোজগার একশো একতিরিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। কোনোদিন কোনো ব্যবসায় একদিনে এত লাভ হয়নি। মামা হাসি হাসি মুখে বলল একথা।

সেদিন পেট পুরে মাংসভাত খেলাম আমরা। পঞ্চাকে দেওয়া হল রোল করে আটখানা রুটি আর আলুর দম। ভাগ্যিস মাংস খাওয়ার জেদ ধরেনি!

অভিমন্যুটা মহা পাজি। ক্লাসে রটিয়ে দিল আমরা ভালুকওলা, ভালুকের খেলা দেখিয়ে বেড়াই।

ছেলেরা অনেকে এসে আবদার ধরল তাদের ভালুক দেখাতে হবে। আমি তাদের বোঝালাম, "একদিনে তো সবাইকে নিয়ে যাওয়া যাবে না ভাই। আমাদের ছোট্ট ঘর, একজন দু'জন করে নিয়ে যাব। দেখবি কী চমৎকার ভালুক আমাদের, কেমন আদর করবে তোদের।"

এরা ভালো ছেলে। তারক সোমনাথ বাবলুদের এক এক দিন বাড়িতে এনে পঞ্চাকে দেখিয়ে দিলাম। পঞ্চা ওদের আদর করল আমি বলতেই। দু'একটা ছোটোখাটো খেলাও দেখিয়ে দিলাম। ওরা খুব মজা পেল।

কিন্তু অভিমন্যুদের একটা দল আছে আট- দশ জনের, ওদের কাজই হচ্ছে দুষ্টুমি করে বেড়ানো। ওরা আমাকে ভালুকওলা ভালুকওলা বলে খ্যাপাতে খ্যাপাতে লাগল। আমি ক্লাসের ফার্স্ট বয়, হুট করে ঝগড়া মারামারি তো করতে পারি না, মনে মনে যতই রাগ আর দুঃখ হোক চুপ করে থাকি। মামার মনে কষ্ট দিতে চাই না, তাকেও বলি না কিছু।

কিন্তু কত আর সহ্য হয় মানুষের।

একদিন অভিমন্যু আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বরেনকে বলল "যে ইস্কুলে ভালুকওলা ফার্স্ট হয় সে ইস্কুলে না পড়াই ভাল।"

"যা বলেছিস," বরেনও তাল মেলাল।

আর সহ্য হল না আমার, রেগেমেগে বললাম "যা না, ছাগলওলাদের ইস্কুলে গিয়ে ভরতি হ, এখানে তো পাশ করতেই জিব বেরিয়ে যায় তোদের, ওখানে ফার্স্ট- সেকেন্ড হতে পারবি।"

"কী বললি?" তেড়ে এল অভিমন্যু।

“যা বললাম শুনেছিস,” আমিও ডেঁটে বললাম।

অভিমন্যু বলল “জানিস আমাদের গাড়ি আছে?”

“তোর মাথায় গোবর পোরা তাও জানি।”

“সাবধান দশা্” অভিমন্যু চ্যাঁচাল।

“সাবধান অভি! আমিও চ্যাঁচালাম।

বরেনও কম যায় না। “আমাদের তিনখানা বাড়ি, দুটো তেলকল, জানিস তুই?”

“তোর কপালে দুটো শিং থাকলে মানাত, বলে সবাই,” আমিও নাছোড়বান্দা।

“তবে রে- ” বলেই অভিমন্যু স্কুলের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে জাপটে ধরল আমাকে।আর বরেন দুমদুম করে আমার পিঠে কিল মারতে লাগল।

কিন্তু পারবে কেন আমার সঙ্গে। আমাকে অনেক কাজ করতে হয়। হাত- পা শক্ত শক্ত। ওদের মতো আলুসেদ্ধমার্কা শরীর নয় আমার। এক ঝটকা মারতেই ছিটকে পড়ে গেল অভিমন্যু। প্রথমেই ঘুরে বরেনের মুখে মোক্ষম একখানা ঘুষি কষিয়ে দিলাম। ‘বাপ রে’ বলে ও মুখ চেপে বসে পড়ল। ওদিকে অভিমন্যু উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি তেড়ে যেতেই ও পালাবার চেষ্টা করল। দিলাম ওর পেছনে একখানা জব্বর গোলকিক!

ঘটনা ঘটেছিল ইস্কুল ছুটির পর রাস্তায়।

পরদিন ইস্কুলে গিয়ে দেখি অভিমন্যু, বরেন কেউ আসেনি।

সেকেন্ড পিরিয়ড শেষ হতেই বেয়ারা তারাপদ এসে বলল “দশকড়ি, হেডমাস্টারবাবু তোমাকে ডেকেছেন। যাও।”

“কেন?”

“যাও না, গেলেই দেখতে পাবে।” বলে তারাপদ চলে গেল।

ভয়ে ভয়ে অফিস ঘরের দিকে এগোচ্ছি আর মনে করার চেষ্টা করছি কী দোষ করেছি আমি। দোষ বলতে এক কালকের ওই মারামারি। ওতে আমার দোষ কোথায়?

আমি বারান্দায়। একটু দূরেই অফিস ঘরের দরজা। দরজাটার দিকে তাকাচ্ছি, আর ভয় ভয় করছে। পা যেন ভারি হয়ে আসছে। হেডস্যার যা গম্ভীর।

ছবিঃ মৌসুমী

১। কম্পিউটারওয়ালা সমুদ্রে ডোববার সময় কী বলে চেঁচিয়েছিল?
উত্তরঃ F1- - - - F1- - -

২। মিসঃ কাবুল, তুই এক পায়ে লাল আর অন্য পায়ে সবুজ মোজা পরেছিস কেন?
কাবুলঃ কী করব? সকালবেলা দেখি বাক্সে যে দু'জোড়া মোজা আছে তাদের দুটোই এইরকম।

৩। মিসঃ হাবুল, বোর্ডে গিয়ে ম্যাপ থেকে উত্তর আমেরিকাটা খুঁজে বের কর।
হাবুল দেখাল।
মিসঃ গুড। কাবুল, উত্তর আমেরিকা কে আবিষ্কার করেছিল? কবে।
কাবুলঃ হাবুল। ঠিক দু মিনিট আগে।

৪। মিসঃ হাবুল, কাবুল, হোমটাস্কে যে আমার পুষ্যি রচনা দিয়েছিলাম তাতে দুজনের খাতায় হুবহু এক লেখা কী করে হল?
হাবুল, কাবুলঃ আমাদের বাড়িতে একটাই কুকুর তো!

৫। আজ ভ্যালু এডুকেশনের খাতা বেরিয়েছে। কাবুল বেজায় মার খেয়েছে। প্রশ্ন ছিল এইরকমঃ "আমি রাস্তায় দেখি একটা লোক একটা গাধাকে বেজায় মারছে। আমি গিয়ে তাকে থামালাম। এতে আমার কোন গুণের পরিচয় প্রকাশিত হল?
কাবুল তার চারখানা উত্তর থেকে বেছে নিয়েছিল "ভ্রাতৃপ্রেম।"

আদিত্যবিক্রমের নৌকো

সাত বছুরে আদিত্যবিক্রম পড়ে সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলের ক্লাস টু -এ। বলো দেখি তার নৌকোখানা যাচ্ছে কোথা দিয়ে? তুমি বলবে নদী বেয়ে। জয়ঢাক কিন্তু ঠিক বুঝেছে আদিত্যর মন পবনের নৌকোটা উড়ে যায় আকাশে দাঁড় বেয়ে। আদিত্যি কী বলছো ?

## তানের অপুদুর্গা

আমাদের তানবাবু এইবারে বড়ো হবার পথে। লা মার্টিনিয়ার বয়েজ এর ক্লাস ফোরের ছাত্র। পথের পাঁচালির ছবি এঁকে পাঠালেন তিনি জয়ঢাককে।

**ক্ষিতিজের দিগন্ত**

লিটল ফ্লাওয়ার অ্যাকাডেমির ক্লাস ওয়ানের ক্ষিতিজ জয়ঢাকের জন্য এই ছবিটা পাঠালো। কেমন লাগলো তোমাদের বোলো।

# ভূতেরাও ভাল হয়

লেখা ও ছবিঃ ঋত্বিক
এপিজে স্কুল
ক্লাস ফাইভ

হোটেল থেকে যখন বেরোলাম জঙ্গলের দিকে তখন সূর্যটা বেশ চকচক করছিল। একটুক্ষণ পর যা বৃষ্টি শুরু হল তা তো বলার নয়। হোটেল থেকে অনেক দূর এসে গেছিলাম তাই আর কোন উপায় না পেয়ে জঙ্গলের পাশে একটা কাঠের বাড়ি ছিল সেটাতেই উঠলাম।

কয়েকটা লোক ছিল,ওরা আমায় ঢুকতে দিল।সন্ধে হয়ে গেছে,বৃষ্টি আর থামে না। আর ওদের কাছে একটা ছাতা আছে কিন্তু সেটা একটু পোড়া।তাই ওখানেই শুতে হল।

রাত্তিরে খেতে দিল,কিন্তু সে- ও সব পোড়া। দেয়ালেও কী সব পোড়ার দাগ। অতি কষ্টে খেলাম, ঘুমোলাম।

পরের দিন হোটেলের লোক এল।বাইরে থেকে ডাকল, "স্যার স্যার, ওখানে কেন আছেন? বাইরে আসুন আর হোটেলে চলুন।" হোটেলে যেতে যেতে ওরা বলল, "ওখানে কী করে রাত কাটালেন? ৩০ বছর আগে এখানে একটা পরিবার জঙ্গলের আগুনে পুড়ে মরেছিল!"

# নৈতিক সংকট

সংহিতা

প্রহ্লাদ ছিলেন দৈত্য কুলপতি। তাঁর পুত্রের নাম বিরোচন। বিরোচন বিবাহযোগ্য হলে এক কন্যাকে তাঁর কনে করতে চান।

রাজা অঙ্গিরসের পুত্র সুধন্বন সেই একই কন্যার পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন। ফলে দুই বীর বিরোচন আর সুধন্বনের মধ্যে তুমুল বিবাদ বেধে যায়। দুজনেই একে অপরের প্রাণ নেওয়ার পণ করেন।

বিরোচন মনে করতেন যে তিনিই সেরা পুরুষ তাঁর সময়ে। তিনি যথার্থই কাঙ্খিত কন্যাকে অর্জন করে তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সুধন্বন মনে করতেন যে তিনিই তাঁর সমসাময়িক যুবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সেহেতু তিনি মনে করতেন যে কাঙ্খিত কন্যার পাণিপীড়নের প্রথমাধিকার তাঁরই হওয়া উচিৎ।

দুজনের কলহ যখন মীমাংসার সম্ভাবনা ছাড়িয়ে জটিলতর হয়ে উঠল তখন দুজনেই গেলেন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের কাছে। দৈত্যকুলপতি প্রহ্লাদকে তাঁরা বিচারক হতে বললেন তাঁদের তর্কের। তাঁদের উভয়েরই একটাই দাবি, “আমাদের দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর? মিথ্যে বলবেন না।”

এই প্রচন্ড কলহে ভয় পেয়েছিলেন দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদ। প্রশ্ন শুনে প্রহ্লাদ সুধন্বনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রচণ্ড ক্রোধে সুধন্বন তখন প্রায় যমের মুষলের মতো অগ্নিবর্ণ। তিনি গর্জে উঠেছিলেন, “আপনি যদি মিথ্যা উত্তর দেন আমাদের প্রশ্নের কিংবা উত্তরই না দেন, তবে বজ্রবাহুর বজ্রাঘাতে আপনার শির শতখন্ডে খন্ডিত হবে।”

ডুমুর গাছের পাতা যেমন তিরতির করে কাঁপতে থাকে সারাক্ষণ তেমনই সুধন্বনের কথা শুনে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ। মিথ্যা বলা পাপ, আবার সত্যোচ্চারণে তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের অভিমান আহত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পুত্র দুঃখ পাবে ভাবলেও পিতা হয়ে তাঁর মন যন্ত্রণায় কাতর হয়। দ্বিধায়, শঙ্কায় অস্থির দৈত্যকুলপতি গেলেন মহাজ্ঞানী ঋষি কাশ্যপের কাছে। কাশ্যপ মুনিকে তিনি বললেন, “হে দিব্যজ্ঞ, ত্রিকালের ন্যায়নীতিতে আপনার অপার জ্ঞান, দেব, রাক্ষস, নর, ব্রাহ্মণ সবাই আপনার কাছে নীতির প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়, কারণ আপনিই নীতিজ্ঞানে ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠতম। আমাকে বলে দিন আমার কী পরিণতি হবে যদি আমি কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা থাকলেও তা না বলি বা মিথ্যে বলি?”

কাশ্যপ মুনি উত্তর দিলেন, "যে উত্তর জানা সত্ত্বেও লোভে, রাগে কিংবা ভয়ে তা উচ্চারণ করে না তাকে বরুণের অঙ্কুশ সহস্র পাকে বাঁধে। আর যে চক্ষুকর্ণগোচর ঘটনার সাক্ষী থেকেও সেই ঘটনার বিবরণ দেয় অযত্নে, অযথাযথ সে নিজেই বরুণের অঙ্কুশ সহস্র পাকে পড়ে। একেক বছর কাটলে পরে সে বাঁধন একেক করে শিথিল হয়। সুতরাং যে জানে, তার অকপটে সত্য বলাই উচিৎ। পাপবিদ্ধ ধর্ম যখন কোনো সভার সামনে আসে সংশোধনের অভিপ্রায়ে সাহায্য নিতে তখন সভাস্থ সব্বার কর্তব্য পাপের শূল ধর্ম থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া, নাহলে তাঁরা নিজেরাই সেই পাপশূলে বিদ্ধ হবেন। একটা সভায় যদি যথার্থ নিন্দার্হ কার্যকলাপ তিরস্কৃত না হয়, তবে কর্মকান্ডের দোষের অর্ধেকটাই বর্তায় সভাধিপতির ওপর, একচতুর্থাংশ বর্তায় কুকর্মের কর্মীদের ওপর আর বাকি একচতুর্থাংশ বর্তায় সভায় উপস্থিত বাকি সকলের ওপর। কিন্তু কোনো সভার নিন্দার্হ কার্যকলাপ যদি যথার্থ তিরস্কৃত হয়, তবে সভাধিওপতি ও অন্যান্য সদস্যরাও পাপমুক্ত থাকেন। কৃতকর্মের পাপ তখন বর্তায় কেবলমাত্র পাপাচারীর উপর। হে প্রহ্লাদ, যাঁরা নৈতিকতার প্রশ্নে মিথ্যা উত্তর দেন তাঁরা সাত পূর্বতন পুরুষ আর সাত উত্তরপুরুষের যাবতীয় উৎকর্ষ জলাঞ্জলি দেন। ঈশ্বরের কাছে ধনহীন, সহায় সম্বলহীন, স্বজনহীন, প্রাণহীন, মানহীন সবার দুঃখই সমান এবং এক। কেবলমাত্র মিথ্যেবাদীই সবার দুঃখকে আলাদা আলাদাভাবে দেখানোর চেষ্টা করেন। চোখে দেখে, কানে শুনে, বিচার দিয়ে বুঝে একজন মানুষ কোনো ঘটনার সাক্ষী হয়। তাই সাক্ষীর সব সময় সত্যি বলাই উচিৎ। সত্যবাদী সাক্ষী কখনোই ধর্মবুদ্ধি কিংবা বিষয়ে বঞ্চিত হন না।"

কাশ্যপ মুনির পরামর্শ শুনে প্রহ্লাদ তাঁর পুত্রকে বললেন, "সুধন্বন তোমার চেয়ে শ্রেয়তর। কারণ সত্যই তাঁর পিতা অঙ্গিরস আমার তুলনায় শ্রেয়তর। সুধন্বনের মা-ও তোমার মাতার তুলনায় শ্রেয়তর। সুতরাং, বিরোচন, এখন সুধন্বনই জীবনের অধীশ্বর।"

প্রহ্লাদের মত প্রকাশে মুগ্ধ হয়ে সুধন্বন বললেন, "হে দৈত্যরাজ, যেহেতু আপনি সন্তানের প্রতি স্নেহান্ধ হয়ে মিথ্যা কথনে প্রবৃত্ত হননি, তাই আমার আশিসে আপনার এই পুত্র শতায়ু হবেন।"

# সেরিবান জাতক

নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়

সে অনেককাল আগের কথা। এক গ্রামে থাকত এক বুড়ি আর তার নাতনি। বেজায় গরিব তারা, আর তেমনই দু:খী। তিনকুলে কে- উ ছিল না তাদের।

অথচ আগে এমনটি ছিল না। তখন তাদের গোলাভরা ধান, গোয়ালে দুধেল গরু, লোকজনে বাড়ি একেবারে গমগম করত। তারপর একে একে সব মরে গেল, টাকাকড়িও একদিন ফুরিয়ে গেল। থাকার মধ্যে এখন আছে একটা প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়ি, কিছু পুরোনো আসবাব আর বাসনপত্র। পাড়ার লোকের বাড়ি টুকটাক কাজ করে দিয়ে যা দু- চার পয়সা জোটে তাই দিয়ে বুড়ি আর তার নাতনির এখন দিন চলে।

একদিন সেরিবা নামে এক ফেরিওয়ালা এল তাদের গ্রামে। হরেকরকম জিনিস তার ঝুড়িতে। "চুড়ি- বালা- হার- দুল চা-- ই, পুতুল চা-- ই, খেলনা চা—ই"—হাঁকতে হাঁকতে সে যাচ্ছিল গ্রামের পথ দিয়ে।

ছোট্টো মেয়েটির খুব ইচ্ছে হল একগোছা নতুন চুড়ি হাতে পরতে। সে ঠাকুমার কাছে বায়না ধরল। কিন্তু বেচারা ঠাকুমা! তার কাছে সেদিন চুড়ি কেনার মতো একটাও পয়সা ছিল না।

তখন নাতনি এক উপায় ঠাওরাল—“চিলেকোঠায় যে বাসনগুলো আছে ওগুলোতো কোনো কাজে আসে না।ওর বদলে চুড়ি কেনা যায়না?”

ঠাকুমা ভাঙা বাসনের স্তূপ থেকে একটা থালা বের করে সেরিবাকে দেখাল। অনেকদিন পড়ে থেকে থেকে সেটার রঙ হয়েছে কেলেকুষ্টি। সেরিবা থালাটার পিছনটা একটা পড়ে থাকা পাথরের টুকরো দিয়ে ঘষতেই থালার আসল রঙ ফুটে বেরোল।

আরে এ যে দেখি সোনার থালা! সেরিবা মনে মনে চমকে উঠল।

কিন্তু বুড়ি যখন বুঝতে পারেনি তখন একে ঠকাতে হবে। এই না ভেবে সে বুড়িকে বললো, “তোমার এ থালার দাম কানাকড়িও না, এ আমি নেব না।”

বলে সে হাঁটা লাগাল। তার আসল মতলবটা ছিল অন্যরকম। সে ভাবল একটু বাদে ঘুরে এসে ঐ থালাটার সঙ্গে আরো কিছু দামি বাসন প্রায় বিনিপয়সায় হাতাবে।

ঠাকুমা, নাতনি দুজনেরই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন সময় সেরিবান নামে আরেকজন ফেরিওয়ালা “চুড়ি চা-- ই, খেলনা চা—ই” হাঁকতে হাঁকতে সেই পথে এল। নাতনির পেড়াপেড়িতে ঠাকুমা একেও থালাখানা দেখাল।

“এ সোনার থালা কেনার মতো অত টাকাকড়ি যে আমার কাছে নেই মা,” সেরিবান বলল।

“সে কী বাবা, এক্ষুণি একজন এটা দেখে বলে গেলো যে এর দাম কানাকড়িও নয়।তুমি আমার কাছে ভগবান। তুমি যা দেবে তাই আমার কাছে যথেষ্ট। আমি এটা তোমাকেই দেব,” বুড়ির গলা কান্নায় বুঁজে আসে।

সেরিবানের কাছে তখন শ'পাঁচেক কাহন ছিল। কাহন কাকে বলে জানো তো? তখনকার টাকাকে কাহন বলত। যাকগে সে কথা; সেরিবান তার সেই পাঁচশ কাহন আর ঝুড়িতে যত জিনিসপত্র ছিলো সমস্ত বুড়িকে দিয়ে দিল। শুধুমাত্র নদী পারাপারের জন্য কটা পয়সা বুড়ির থেকে চেয়ে নিল।

সেরিবান চলে যাবার খানিক বাদেই সেরিবা আবার এসে হাজির- “কই গো বুড়ি; দাও তোমার ভাঙা থালাটা। আর যদি কিছু থাকে তো তাও দাও, চুড়িক'টা দিয়েই যাই। বাচ্চা মেয়ে চুড়ি পরতে চেয়েছে। আমার নাহয় একটু লোকসানই হল। সবসময় কি আর লাভ দেখলে চলে?”

“অত কষ্ট করে তোমার দরকার নেই বাপু,” সেরিবাকে দেখেই বুড়ি এই মারে কি সেই মারে, “এই তো আরেকজন এল। সে ওটা সোনার থালা বলে দাম দিয়ে কিনে নিয়ে চলে গেছে।”

“এ্যাঁ! কোনদিকে গেছে সে?” আঁতকে উঠলো সেরিবা।

“দেখো এতক্ষণে সে হয়ত নদীর ওপারে চলে গেছে।”

বুড়ির কাছে এটুকু শুনেই সেরিবা দৌড়োল নদীর দিকে। সেরিবানকে নিয়ে নৌকো তখন মাঝনদীতে।

“নৌকো ফেরাও, নৌকো ফেরাও,” হাত - পা ছুঁড়ে সেরিবা পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল। নৌকো আর ফিরল না। সেরিবা তখন রাগে, দু:খে বুক ফেটে মারা গেলো।

***সেই জন্মে বুদ্ধদেব ছিলেন সেরিবান আর তাঁর খুড়তুতো ভাই দেবদত্ত, যে কিনা বরাবর তাঁর শত্রুতা ক'রে এসেছে , সে ছিলো সেরিবা।***

# বীরভদ্র

কুলদারঞ্জন রায়

সেকালে একসময় দেবতারা কশ্যপ ইত্যাদি মুনিদিগকে লইয়া শোকর নামক এক পরমসুন্দর পর্বতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই পর্বতে মুনিঋষিদিগের আশ্রম ও বাসুদেবের এক মন্দির ছিল। দেবতা ও ঋষিগণ বাসুদেবের পূজা করিয়া গিরিশিখরের নিকটে উপস্থিত হইলে হঠাৎ অতি ভয়ংকর ও বহুবিস্তৃত এক অগ্নিশিখা আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং দেখিতে দেখিতে সকলে ভস্ম হইয়া গেলেন। সেইসময় শিবের অনুচর মহাতেজস্বী বীরভদ্রও সেই পর্বতে বেড়াইতেছিলেন। তিনি হঠাৎ হাহাকার শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন, "লোক বিপদে পড়িলেই এইরূপ বিলাপ করিয়া থাকে আর শবদাহের গন্ধও পাইতেছি। ব্যাপারখানা কী?" এই ভাবিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া সেই আগুনের নিকটে গেলে পর দেবতা ও ঋষিদিগের দাহ দেখিতে পাইলেন। তখন সেই ভীষণ আগুন বীরভদ্রকেও পোড়াইতে আসিল।

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় মহাদেব তাঁহার মাথার একগাছি জটা দিয়া এই বীরভদ্রকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় বীরভদ্রের ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ-- যেন দ্বিতীয় মহাদেব। ইনি দক্ষযজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদিগকে মারিয়া যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করাইয়া দেন। এমন কি, কৃষ্ণকে পর্যন্ত ইঁহার নিকটে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং আগুন তাঁহার কী করিবে? জল পড়িলে তৃণের আগুন যেমন শীতল হইয়া যায়, বীরভদ্রকে দেখিয়া এই প্রচন্ড আগুনও তেমনই শান্ত ভাব ধারণ করিল। তখন বীরভদ্র ভাবিলেন, "এই আগুন বড় সহজ দেখিতেছি না, মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি পোড়াইয়া নাশ করিবে। অতএব ইহাকে আমি পান করিব।"

এই ভাবিয়া তিনি চক্ষের নিমেষে এই ভয়ানক আগুন পান করিয়া দেবতা ঋষিদিগের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই পুড়িয়া ছাই হইয়াছেন, উত্তর দিবে কে? তখন তিনি করিলেন কি, নিজের শরীর হইতে কিঞ্চিত ভস্ম লইয়া তাহাতে সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়িলেন। তারপর সেই মন্ত্রপূত ভস্ম মৃত দেবতা ও ঋষিদিগের ভস্মে রাখিবামাত্র সকলেই শরীর ধারণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

জীবন পাইয়া দেবতাদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা বীরভদ্রকে অনেক ধন্যবাদ করিয়া পরে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন পর্বতের অন্যদিকে গেলেন তখন হঠাৎ প্রকান্ড একটা সাপ আসিয়া সকলকে ঘিরিয়া ফেলিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বীরভদ্রের তো রাগ হইবার

কথাই; তিনি সেই সাপের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্রমাগত এক বৎসরকাল দুইজনের অতি ভীষণ যুদ্ধ হইল। তারপর মহাবীর বীরভদ্র দুই হাতে সাপের মুখ ধরিয়া তাহাকে চিরিয়া দুই ভাগ করিলেন ও দেখিলেন সাপের পেটের মধ্যে সকলেরই মৃতদেহ রহিয়াছে। তিনি তখনই সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা সকলকে পুনরায় জীবিত করিলেন। তখন সকলে মহা সন্তুষ্ট হইয়া বীরভদ্রকে কত যে ধন্যবাদ করিল তাহা আর কী বলিব!

এইরূপে দ্বিতীয়বার জীবন পাইয়া তাঁহারা পুনরায় চলিতে চলিতে খানিক দূরে গিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মহা ভয়ংকর এক রাক্ষস। তাহার দশটা হাত, পাঁচটা পা ও আটটা মাথা। ক্ষুধার্ত রাক্ষস উদর পূর্ণ করিবে ভাবিয়া বানররাজ বালীর সহিত যুদ্ধ করিতেছে। বিষ্ণু যখন বরাহরূপ ধরিয়াছিলেন তখন তাঁহার শরীরে যতটা বল ছিল বালীর শরীরে তাহার দ্বিগুণ বল।

ইহার উপর আবার তাহার ছোটো ভাই সুগ্রীব তাহার সহায়। কিন্তু তবু সেই দুর্দান্ত রাক্ষস বালীর সহিত মুষ্টিযুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ সুগ্রীবকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া বালী ভাবিতেছিল কী করিয়া দুষ্ট রাক্ষসকে মারিয়া ভাইকে রক্ষা করিবে। এই অবসরে রাক্ষস বালীকেও পেটের মধ্যে পুরিল। এই ভয়ংকর কান্ড দেখিয়া দেবতা ও ঋষিগণ প্রাণের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদিগকে আর অধিক দূর যাইতে হইল না—দশ হাত বাড়াইয়া সেই ভীষণ রাক্ষস সকলকে গিলিয়া ফেলিল।

মহাত্মা বীরভদ্রও এই ব্যাপার দেখিলেন। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। এবং নিমেষে পঞ্চাশ যোজন এক পাথর লইয়া রাক্ষসের মাথাগুলির ঠিক মধ্যখানে আঘাত করিলেন। সেই দারুণ আঘাতে তাহার একটি মাথা চূর্ণ হইয়া গেল।

বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ একটি পর্বতের চূড়া লইয়া রাক্ষসকে পুনরায় আঘাত করিলে সে অনায়াসে পর্বতের চূড়াটি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "এতক্ষণ তোমার বল দেখিলাম, এখন একবার আমার বল দেখ।" এই বলিয়া দুইখানি তলোয়ার লইয়া একখানি বীরভদ্রের হাতে দিয়া পুনরায় বলিল, "আইস আমরা তলোয়ার যুদ্ধ করি।"

এ কথায় সম্মত হইয়া বীরভদ্র তলোয়ার গ্রহণ করিলে পর দুইজনে মহা ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুরন্ত রাক্ষস আশ্চর্য্য কৌশলে বীরভদ্রের গলায় আঘাত করিয়া রক্তপাত করিল। তখন তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দারুণ এক আঘাতে রাক্ষসের দুইটা মাথা কাটিয়া এমনই এক সিংহনাদ করিলেন যে সেই শব্দে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া দিলেন। এইরূপে উভয়ে ক্রমাগত তিন বৎসর যুদ্ধ করিলেন কিন্তু কাহারও জয় হইল না। অবশেষে মহাবীর বীরভদ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সাঙ্ঘাতিক এক আঘাতে রাক্ষসের সবগুলি মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর তাহার পেট চিরিয়া দেবতা, ঋষি ও বানর দুইটিকে বাহির করিলে পর সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দেবী পার্ব্বতী অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতেছেন।

পার্ব্বতীর সঙ্গে দেবর্ষি নারদও ছিলেন। তখন তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের নিকট গিয়া এই ব্যাপার বর্ণন করিয়া কহিলেন, "এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া বীরভদ্র আজ অতি উত্তম কাজ করিয়াছে। এই রাক্ষসের বৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত। আমি বলিতেছি। শুনুন।

অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর রাজত্বে এক মহা ক্ষমতাশালী রাক্ষস দেবতাদিগের সহিত এক বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়াছিল। ওই রাক্ষস যুদ্ধে বহুবার হত হইলেও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাহাকে জীবিত করেন। তখন সে শুক্রাচার্য্যকে বলিল, "প্রভু, বারবার মরিয়াও আপনার কৃপায় আমি পুনর্ব্বার জীবন পাই। আমার মনে আছে একবার যমের সহিত আমার যুদ্ধ হইয়াছিল। আর তখনও আপনি আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। তাই আমি মনে করিয়াছি যে এখন হইতে যাহাকে গিলিব, সে আমার পেটে গিয়াই যাহাতে মরিয়া যায় সেজন্য আমি কঠোর তপস্যা করিয়া বর লাভ করিব। আপনি দয়া করিয়া উপদেশ দিন।"

এ কথায় গুরু শুক্রাচার্য্য বলিলেন, "তুমি সমন্ত পঞ্চক তীর্থে গিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা মহেশ্বরের আরাধনা কর। তবেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"শুক্রাচার্যের উপদেশমত সেই দুষ্ট রাক্ষস সমন্ত পঞ্চকে গিয়া চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া ছয়মাসকাল অতি দারুণ তপস্যা করিল।

কিন্তু তবু কোন দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন না দেখিয়া সে যে উপায় অবলম্বন করিল তাহা অতিশয় ভয়ংকর। একটি একটি করিয়া নিজের মাথা কাটে আর আগুনে আহুতি দেয়---

*তারপর কী হল? জানতে হলে নজর রাখো পরের সংখ্যার এই পাতায়—*

*মূল গ্রন্থঃ পুরাণের গল্প—কুলদারঞ্জন রায়। ১৯৩৬। (বানান অপরিবর্তিত)*

# ভারতবন্ধু বিপ্লবী সাংবাদিক বেঞ্জামিন গাই হর্নিম্যান

উমা ভট্টাচার্য

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। কার্জন বাংলাকে ভেঙে দু টুকরো করলেন। প্রতিবাদে গর্জে উঠল বাঙালিরা। রবীন্দ্রনাথ উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ হিন্দু- মুসলমান,পার্শি, খ্রিস্টান নির্বিশেষে বাংলার সব মানুষকে 'রাখীবন্ধন' উৎসব পালন করার আহ্বান জানালেন।

'রাখীবন্ধন' উৎসবের পরে সবাই উদাত্ত কণ্ঠে কবিগুরু রচিত 'রাখীসঙ্গীত' 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি গাইতে গাইতে মিছিল শুরু করল। মিছিলের সামনের সারিতে দেখা গেল ধুতি পরে, খালি গায়ে,হাতে রাখী বেঁধে, মুখে অনভ্যস্ত বাংলায় রাখীবন্ধনের গানটি গাইতে গাইতে আপামর বাঙালির সাথে পথে হাঁটছেন ৩২ বছর বয়সী এক ইংরেজ সাহেব, নাম তাঁর 'বেঞ্জামিন গাই হর্নিম্যান'। আজীবন ভারতবন্ধু আর চরম ব্রিটিশবিরোধী এই ইংরেজ সাংবাদিক পুলিশের নিষেধ অমান্য করে মিছিল এগোবার জন্য পুলিশের লাঠিচার্জ মাথা পেতে নিলেন। তবু থামলেন না সাথী প্রতিবাদী বন্ধুদের ছেড়ে।

বেঞ্জামিন গাই হর্নিম্যান ভারতে এসেছিলেন ইংরাজি কাগজ 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তিনিও একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী অভিধা পেয়েছেন তাঁর অসামান্য সংগ্রামী লেখার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরালো করার জন্য। ভারতবাসীদের পাশে দাঁড়াবার জন্য তাঁর হাতিয়ার ছিল কলম আর তীক্ষ্ণ প্রতিবাদী ভাষা, আর তাঁর আক্রমণের একমাত্র লক্ষ ছিল ব্রিটিশের অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা আর সেই শাসকেরা। উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো। তিনি না থাকলে হয়ত ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যালীলার ছবি আর খবর এত দ্রুত জানতে পারত না ভারতবাসী, ব্রিটেনের প্রগতিপন্থী দল তথা সারা বিশ্ব।

সরকারীভাবে রেখেঢেকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের খবর প্রকাশের আগেই তিনি কড়া সেন্সরশিপের ঘেরাটোপ থেকে ছিনিয়ে আনলেন এই ঘটনার সচিত্র বিবরণ।এমনই ছিল তাঁর গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদ বিদ্যুত তরঙ্গের মত পৌঁছে গেল বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর লেখা প্রবন্ধের মাধ্যমে। কাজের ব্যাপারে তাঁর ছিল সামরিক তৎপরতা আর সংবাদ সংগ্রহের গোপনীয়তা রক্ষার কৌশল ছিল আশ্চর্যজনক।

১৮৭৩ খ্রিঃ মধ্য ইংল্যান্ডের সাসেক্সের এক সেনাপরিবারে জন্ম। বাবা উইলিয়াম ছিলেন ইংল্যান্ডের রয়াল নেভির পদস্থ অফিসার, আর মা সারার পিতা টমাস ফরস্টারও ছিলেন গ্রিক নৌবাহিনীর একজন মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার। এক অভিজাত ধনী পরিবারের সন্তান হিসাবে তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল প্রথমে পোর্টসমাউথের গ্রামার স্কুলে পড়বার। পরে যোগ দিলেন মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে। কিন্তু পাশ করে সামরিক বিভাগে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা হলনা তাঁর, ব্যাবসা করার চিন্তা করলেও সেটা তাঁর কাছে পছন্দের লাগল না। ১৮ বছর বয়সে ঠিক করে ফেললেন তিনি সাংবাদিক হবেন।

ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথের 'সাদার্ন ডেলি মেল'পত্রিকায় লেখালেখি দিয়ে শুরু হল তাঁর সাংবাদিক জীবন। একে একে কাজ করলেন 'দি ডেলি এক্সপ্রেস', 'দি ডেলি ক্রনিকল', 'দি ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' প্রভৃতি পত্রিকায়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনে বসে কাজ করতে করতেই ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নানা কুকীর্তির আর ভারতীয়দের উপর নানা অত্যাচারের খবর পেতেন। ইচ্ছা হত ভারতে আসার।

ভারতে আসবার সুযোগও এল সাংবাদিকতার সূত্রে। ইংল্যান্ডের 'দি ইংলিশম্যান' ও 'দি ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট নাইট ১৮৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'দি স্টেটসম্যান'আর 'নিউ ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' নামে দুটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করলেন ভারতে। একটি সংস্থার হাতেই ছিল এই কাগজ দুটি পরিচালনার ভার। প্রথম থেকেই 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার কলকাতা অফিসের নিউজ এডিটর, ও সহকারী এডিটর হিসাবে যোগ দেবার ডাক পেলেন হর্নিম্যান। এই তাঁর প্রথম ভারতে আসা ।

কার্জনের 'বঙ্গ- ভঙ্গ' বিরোধী আন্দোলনে সারা কলকাতা যখন উত্তাল সেই সময় তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ জানাতে দুই বাংলার মানুষ একাত্ম হয়ে আন্দোলন শুরু করল। মিটিং মিছিল শুরু হল। মিছিলে অংশ নিলেন হর্নিম্যান,কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার নবনিযুক্ত সাংবাদিক। আর তারপর কলকাতায় বসেই শুরু হল তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী 'কলমযুদ্ধ'। এই কাজের মাধ্যমেই তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হল বাংলার নানা বিখ্যাত বিপ্লবীদের সঙ্গে। উদ্দেশ্য একটাই। ব্রিটিশ শাসকদের বিরোধিতা। ভারতীয়দের উপর তাদের অত্যাচার, দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের ব্যর্থতা,তাদের শাসনে এদেশের মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায়, তীক্ষ্ণ বয়ানে লিখে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন শাসকদের। স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন তিনি।

১৯১১সালে বঙ্গ- ভঙ্গ রদ হবার পর রাজধানী দিল্লীতে চলে যেতে এবার তাঁর কিছুদিন কর্মক্ষেত্র হল দিল্লির পত্রিকা অফিস। এরপর সুযোগ এল বোম্বে থেকে কাজ করার। সেই সময় ফিরোজ শাহ মেহতা নামে একজন পার্শী ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান তাঁর আইনজ্ঞের সফল পেশা ছেড়ে ১৯১০ সালে 'বম্বে ক্রনিকল' নামে একটি জাতীয়তাবাদি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। ১৯১৩ সালে তাঁর আমন্ত্রণে সেই পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যোগ দিলেন হর্নিম্যান। নতুন উদ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে তাঁর কাজ শুরু হল। তাঁর সম্পাদনায় এক তীব্র জাতীয়তাবাদী পত্রিকা হিসাবে আগুনঝরা বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে শুরু করল বম্বে ক্রনিকল।

ভারতীয়দের উপর শোষণ আর অত্যাচারের বিবরণ তাঁর লেখায় মাধ্যমে পৌঁছে যেতে লাগলো বিশ্বের দরবারে। ভাইসরয় থেকে শুরু করে বৃটিশ শাসণতন্ত্রের কাউকেই ছেড়ে কথা কইতেননা

হর্নিম্যান। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ আর কঠিন মন্তব্য লেখা হল বম্বে ক্রনিকল পত্রিকায়, তাতে সেদেশের ভারতীয়রা প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের সাহস পেল। গান্ধীজির দক্ষিণ আফ্রিকায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবার পেছনে জোর জুগিয়েছিল তা।

ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী সবরকম কাজকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য কুখ্যাত রাউলাট অ্যাক্ট পাশ করলেন ১৯১৯ সালে। এর বলে ব্রিটিশ রাজত্বে বসবাসকারী যে কোনো ভারতীয়কে বিনাকারণে, সন্দেহবশত হলেও আটক করা যেতে পারতো। আটক ব্যক্তি মুক্তির আবেদন করতে পারবে না, কোনো উকিল পাবেনা, কোনও বিচারও হবেনা তার। কারাবাস, ফাঁসি, দ্বীপান্তর যা খুশি সাজা হতে পারে।

এই মানবিক আইনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন হর্নিম্যান। এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন তাঁর পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধের মাধ্যমে। নিজেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অংশীদার হলেন। ইতিমধ্যে 'ইন্ডিয়ান থিয়সফিক্যাল সোসাইটির' প্রধান অ্যানি বেশান্ত 'হোম রুল লিগ' স্থাপন করলেন ১৯১৬ সালের ১১ই এপ্রিল। এই লিগের চরম লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বশাসন লাভে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করা। হর্নিম্যান এর সদস্য হয়ে গেলেন।

কিছুকাল পরের কথা। দিনটা ছিল ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল। সেদিন ঘটে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংশ হত্যাকান্ড। জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের নববর্ষের দিন ঘেরা মাঠে বৈশাখী উৎসবে সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর চলল বিনা প্ররোচনায় গুলি। সরকার তার খবর চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হত্যাকান্ডের কিছু ছবিসহ ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়ে গেল 'বম্বে ক্রনিকলে'। অগ্নিবর্ষী ভাষায় হর্নিম্যান আক্রমণ করলেন অত্যাচারী ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের। জেনারেল ডায়ারের নিষ্ঠুরতার খতিয়ান দিয়ে লিখলেন,'দ্য অ্যাগোনি অফ অমৃতসর' আর 'অমৃতসর এণ্ড আওয়ার ডিউটি টু ইণ্ডিয়া',নামে দুটি মর্মস্পর্শী প্রবন্ধ।

ভারতসহ সারা পৃথিবীতে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের সচিত্র বিবরণ। তাঁর লেখা বম্বের নাগরিকদের মনে স্বাধীনতা স্পৃহায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করলো। প্রতিবাদী আন্দোলন আর উত্তেজনা শুরু হল বম্বেতে। গর্জে উঠল সারা ভারত।

এই সময়ে গান্ধীজি দেশে এসেছেন। তিনিও ডাক দিলেন গণ- অসহযোগ আন্দোলনের। হর্নিম্যানও প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে অংশ নিলেন সহ- সভাপতি হিসাবে। যেখানেই সত্যাগ্রহের সমর্থনে সভা হতো, সেখানেই তিনি অংশ নিতেন আর বক্তৃতা দিতেন। তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী কাজকর্মের জন্য অনেকবার সরকার তাঁকে সতর্ক করেছে ,এমনকি কয়েকবার জরিমানাও দিতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কিছুই তাঁকে সত্যপথ থেকে নিরস্ত করতে পারেনি।

হর্নিম্যানের রিপোর্ট থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানবিক ঘটনার সত্য উন্মোচিত হ'লে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেবার পার্টি সোচ্চার হ'য়ে উঠলো। সাধারণ সুধী ব্রিটিশ নাগরিকরাও নিন্দায় সরব হ'ল। বিভিন্ন দেশের কাগজে. সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল । ব্রিটিশ সরকার অনুসন্ধান করে জানলেন সরকারীভাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের খবর লিপিবদ্ধ আর প্রকাশিত হওয়ার আগেই দুঁদে সাংবাদিক হর্নিম্যান তাঁর লোক মারফৎ ইংরেজদের কঠোর পাহারার মধ্যে থেকে ঘটনার টাটকা খবর ও নৃসংশ হত্যাদৃশ্যের বেশ কিছু ছবি চুরি করেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি ছেপে দিয়েছেন তাঁর কাগজে। এই খবর আর ছবি সংগ্রহের অপরাধে হর্নিম্যানের একজন বার্তাসংবাহক গোবর্ধন দাস গ্রেপ্তার হলেন, সেনা আদালতের বিচারে তাঁর তিন বছরের জেল হল।

হর্নিম্যানের লেখা অসংখ্য ব্রিটিশ- বিরোধী প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, বিভিন্ন সভায় ভারতীয়দের পক্ষে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা ব্রিটিশ সরকারের বিপদের কারণ হয়ে উঠছে দেখে তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন ।

সরকারী কাজের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছেন দেখে ,হর্নিম্যানকে ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেবার জন্য ভাইসরয় ‘সেক্রেটারি অফ স্টেটের’ কাছ চিঠি লিখে অনুমতি চাইলেন। তাঁর লেখা বিভিন্ন আর্টিকেলের নমুনা পাঠানো হল বিলেতের সদর অফিসে। বিলেতের কর্মকর্তারা সেইসব লেখাকে অত্যন্ত উত্তেজক, আর ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকর বিবেচনা করে হর্নিম্যানকে গ্রেপ্তার করে লন্ডনে ফেরৎ পাঠানোর অনুমতি দিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তিলমাত্র দেরি করলনা।

হর্নিম্যান তখন প্রবল জ্বরে বেহুঁশ। কিন্তু পুলিশ তাঁকে অসুস্থ বলে রেয়াৎ করলো না। টেনে হিঁচড়ে বিছানা থেকে তুলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আর অসুস্থ অবস্থায়ই তাঁকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন। সাময়িকভাবে বম্বে ক্রনিকল পত্রিকাটি কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখা হ’ল।

তবে আগুন কখনও ছাইচাপা দিয়ে নেভানো যায়না। হর্নিম্যানের দেহ লন্ডনে থাকলেও আত্মা পড়ে ছিল ভারতে। প্রায় প্রতিদিনই তিনি লণ্ডনের বিভিন্ন কলেজে যেতেন, ভারতীয় ছাত্রদের সাথে কথা বলতেন, তাদের শোনাতেন সে সময় ভারতের কঠিন অবস্থার কথা,সাধারণ ভারতীয়দের দুর্দশার কথা, জানতে চাইতেন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নিয়ে তাদের মতামত। বিদেশেই তাদের সংগঠিত করতে লাগলেন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য।

স্বদেশে ও বিদেশে থাকা সব ভারতীয় বুদ্ধিজীবী,আর শিক্ষিত মেধাকে সংগঠিত করতে ব্রিটেনে বসেই তিনি তাঁর সমস্ত জীবনিশক্তি নিয়োগ করলেন। লণ্ডনে বসেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় লিখতে লাগলেন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা। ভারতে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে ‘সাংবাদিকের ধর্মযুদ্ধ’ চালাতে লাগলেন। লন্ডনে নির্বাসিত থাকতেই ১৯২০ সালে লিখলেন ‘ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড দ্য অমৃতসর ম্যাসাকার’ নামে একটি বই ।

## আবার ভারতে নাটকীয়ভাবে ফিরে আসা

হর্নিম্যানের ফের ভারতে ফেরার কাহিনীটি রোমাঞ্চকর। কাউকে কিছু না জানিয়ে একদিন কলম্বোগামী একটি জাহাজের বার্থ বুক করে ফেললেন। বুকিং ক্লার্ক বাধা দিলেন, কারণ তাঁর ওপরে কড়া নির্দেশ ছিল হর্নিম্যান সংক্রান্ত যে কোনও খবর ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে জানাতে হবে। তিনি তাঁর কর্ম করলেন প্রাণ বাঁচাতে। হর্নিম্যান যথারীতি নির্বিকার। জাহাজ শ্রীলঙ্কা পৌঁছুলে হর্নিম্যান নেমে পড়লেন জাহাজ থেকে শ্রীলঙ্কার মাটিতে। সেখান থেকে একটি বোট- ট্রেনে করে পৌঁছুলেন ভারতে, সেখান থেকে একটি মেল- ট্রেনে চড়ে এসে নামলেন বম্বের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে। হর্নিম্যান প্লাটফর্মে নেমে কয়েক পা মাত্র এগিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ’ল।

পরের দিন তাঁকে আদালতে বিচারকের সামনে হাজির করা হল। শান্ত আর নির্বিকার মুখে তিনি বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে ততোধিক নির্ভীক আর প্রত্যয়ী স্বরে তাঁকে সম্বোধন করলেন হর্নিম্যান। কোর্টের কাজ শুরু হল। বিচারক সাহেব প্রশ্ন করলেন, তিনি কী কারণে ভারতে ফিরে এসেছেন? তাছাড়া তিনি ফিরে আসাতে তাঁকে লণ্ডনে নির্বাসনের যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সেই নিয়ম তিনি ভেঙেছেন। এজন্য তাঁর শাস্তি হতে পারে।

হর্নিম্যান তাঁর স্থৈর্য বজায় রেখেই উত্তর দিলেন, তিনি যে দেশকে নিজের দেশ বলে ভাবেন আর ভালোবাসেন সে দেশে ফিরে এসে তিনি কোনই অপরাধ করেননি। বরঞ্চ বিনা দোষে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশই অপরাধ করেছে। বিচারকসাহেব হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি কি আপনার নির্বাসনের আদেশলিপিটি পড়েন নি?”

সঙ্গে সঙ্গে হর্নিম্যান উত্তর দিলেন , “হ্যাঁ স্যার, পড়েছি তো। আদেশলিপিটিতে লেখা আছে যে, আমি ভারতবর্ষের কোনও জায়গায় ‘ল্যান্ড’ করতে পারবো না ;আর ইংরাজিতে ‘ল্যান্ড করা’ বলতে

বোঝায় জাহাজ থেকে বা বিমান থেকে সরাসরি কোনও দেশের মাটিতে পা রাখা। কিন্তু আমি তো এই দুটোর মধ্যে কোনটাই করিনি। আমি শ্রীলঙ্কা থেকে বোট- ট্রেনে করে ভারতে এসেছি, তারপর বম্বে পৌঁছেছি একটি মেল- ট্রেনে করে। কোনও মানুষ কি ট্রেন থেকে ল্যান্ড করতে পারে, ট্রেন তো ল্যান্ড করেনা,তাই ট্রেন থেকে ল্যাণ্ড করা হয় না ,অবতরণ করা হয়(গেট ডাউন)"।

এই অকাট্য যুক্তি শুনে বিচারকসাহেব তো 'থ'। এ যুক্তি তো ইংরাজি গ্রামার অনুযায়ী একেবারে ঠিক। হর্নিম্যান ছাড়া পেয়ে গেলেন, ভারতে থাকায় তাঁর আর কোন বাধা রইলো না। তিনি আবার বম্বে ক্রনিক্যাল পত্রিকার এডিটর পদে যোগ দিলেন ,আবার শুরু হল তাঁর ভারতের স্বাধীনতার জন্য কলমযুদ্ধ,ব্রিটিশ শাসকদের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তীক্ষ্ণ আক্রমণ।

বম্বে ক্রনিকল ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর লেখা থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই আগুনঝরা দিনগুলির ইতিহাস আর ভারতীয় রাজনীতির বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। তাঁর দেওয়া বক্তৃতাগুলিতেও রয়েছে সে সময়ের অনেক তথ্য।

স্বাধীন ভারতকে দেখার স্বপ্ন তাঁর সফল হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরের বছর ১৯৪৮ সালে এই সংগ্রামী সাংবাদিকের মৃত্যু হয়।

**বেঞ্জামিন গাই হর্নিম্যানের অন্যান্য কাজ---**

১৯২৯ সালে তিনি নিজে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল হেরাল্ড' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা আর 'উইকলি হেরাল্ড' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। বম্বে ক্রনিক্যাল পত্রিকা ছাড়ার পর 'বম্বে সেন্টিনেল' নামে একটি সান্ধ্যপত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এরপর ১৯৪১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি 'ব্লিৎজ পত্রিকা', ট্যাবলয়েড হিসাবে প্রকাশ করেন রুশি কানাজিয়া নামে বিখ্যাত পেপার ব্যারন আর দিনকর নাদকার্নি নামে সাংবাদিকের সঙ্গে।

'ট্যাবলয়েড নিউজ পেপার' এক নতুন দিগন্তের সন্ধানে যাত্রা করেছিল তাঁদের হাত ধরে। শোনা যায় যে কফির দোকানে বসে বি আর আম্বেদকর ভারতীয় সংবিধানের প্রথম খসড়া শুরু করেছিলেন , সেই কাফেতে বসেই তিন বন্ধুতে মিলে ব্লিৎজের পরিকল্পনা করেছিলেন চারের দশকে।

ভারতীয় স্বাধীনতাকামী আর সংগ্রামীদের কথা সবাই জানি, কিন্তু আমরা অনেকেই বোধ হয় হর্নিম্যানের ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গের কথা কিছুই জানিনা। একজন প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভারতবন্ধুকে এই লেখার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানালাম।

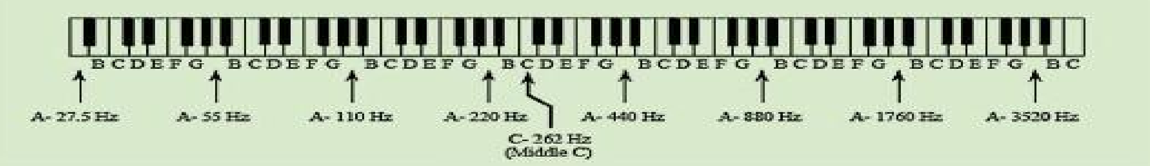


# সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug তোমাদের মত কয়েকজন ছেলেমেয়ে একটা দারুণ ভিউ- পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। সামনের অসামান্য সুন্দর দৃশ্য দেখে উচ্ছাসে এ ওর গায়ে পড়ে, হেসে, উদ্দাম নেচে দারুণ মজা করছে।

নরম রোদে স্নান করা সবুজ উপত্যকা, কার্পেটের মত করে সবজে মস্ বিছানো পাহাড়ের ঢাল, এঁকেবেকে চলা কাচের মত স্বচ্ছ পাহাড়ি নদীর তিরতির করে বয়ে চলা পান্না রংএর জল, শান্ত ধ্যানযোগী সিডার পাইনের সারি, ঢেউ খেলানো দিগন্তজোড়া নীল পাহাড়ের মাথায় সাদা মকুট আর নীলের চেয়েও বেশি নীল আকাশ।

কিন্তু তাদের টুকরো টুকরো ভেসে আসা কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে পাহাড় আর গাছ, মাঠ আর বন, মাটি আর আকাশ, পাহাড়ের সবুজ আর আকাশের নীল - এগুলোর কোনটাই তারা আলাদা করে চিনতে পারছে না - জানেই না একটার সাথে আর একটার কী তফাৎ- এমন আজব বোকা বোকা একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে, এমনটা ভাবাই প্রায় অসম্ভব - তাই না?

কিন্তু ঠিক এমনটাই ঘটে চলেছে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে।

সঙ্গীতের, অর্থাৎ গান, বাজনা, নাচের উপাদানগুলির বিভিন্নতা, সাম্য- বৈষম্য বা একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করে বোঝার ক্ষমতা না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গীতের মূল উপাদানগুলিকেই বোঝা সম্ভব নয়। এর কারণটা খুব সোজা কেন না শুধুমাত্র কোন একটিমাত্র শব্দ বা স্বর দিয়ে বা নাচের একটি মুদ্রা দিয়ে তো আর সঙ্গীত হয় না! আরও সহজ করে বললে, ধর, ' ক' আর ' খ', এই দুটো অক্ষরের তফাৎগুলো না জানলে ' কালি' আর ' খালি' এই দুটো কথাই তো একইরকম শোনাবে !

হেনরি এডওয়ার্ড ক্রেহ্বিয়েলের ' হাউ টু লিসন্ টু মিউজিক' পড়লে দেখবে ওঁর মতে যে সব সঙ্গীত শিল্পীর সঠিকভাবে সঙ্গীত শোনার, দেখার, বোঝার ক্ষমতাটাই নেই, তাদের গান, নাচ, বাজনায় যতটা না সঙ্গীত প্রতিভার প্রমাণ থাকে, তার চেয়ে ঢের বেশি থাকে তাদের মধ্যে যারা ঠিকমত সঙ্গীত বুঝতে পারে।

সঙ্গীতে দুটো সত্তা মিলেমিশে থাকে - একটা সত্তা জাগতিক, আর একটা পরমার্থিক বা আধ্যাত্মিক। জাগতিক সত্তাটা আমাদের চেতনায় পৌঁছয় কান, চোখ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে - আর সেই শোনা, দেখার তথ্যগুলো গৃহীত হয় আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে। সত্তার দ্বিতীয় অংশটির আবেদন আমাদের কল্পনার সাথে, আবেগের কাছে।

সঙ্গীত যতক্ষণ শুধুমাত্র কোরিওগ্রাফি (নাচের ক্ষেত্রে) বা সুললিত শব্দসজ্জা (গান- বাজনা)' র মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ তাকে অঙ্ক বা অনুশীলনের যোগফল দিয়ে বোঝা সম্ভব পুরোপুরি।

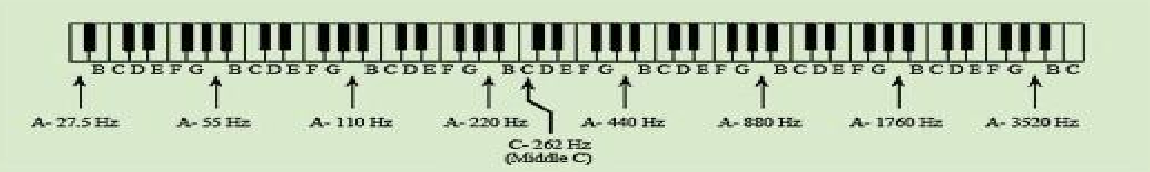


# সুর ঢাক

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

http://www.youtube.com/watch?v=scL927e4aug

কিন্তু সঙ্গীতের যে রূপসজ্জা আমাদের কল্পনা বা আবেগের দরজা দু- হাট করে খুলে দিতে পারে, তাকে বুঝতে হলে দেখা আর শোনাটা বুদ্ধিবৃত্তি আর সেই বিশ্ব- ছবি (the big picture)বা আধ্যাত্মিক চেতনা দিয়েই অনুভব করতে হবে।

পৃথিবীতে সঙ্গীতচর্চা হয় অন্যান্য সবকিছুর চেয়ে বেশি- আর সঙ্গীতের চর্চা বা সঙ্গীত নিয়ে ভাবনা হয় সবচাইতে কম। সঙ্গীত বড় মধুর রহস্যে মোড়া। সে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ধরিলে তো ধরা দেবে না গোছের।

স্যার এডুইন হেনরি ল্যান্ডসিয়ার মূলত পশু- প্রাণীর ছবি আঁকার জন্য বিখ্যাত। তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্যের মধ্যে অতি পরিচিত লন্ডনের ট্র্যাফাল্গার স্কোয়ারের সিংহ মূর্তি। এঁর একটা অন্য ছবি সম্পর্কে তাঁর এক দেহাতি সমালোচকের ভয়ানক আপত্তি ছিল এই যে শুয়োরগুলোর একটারও পা তাদের খাবারের পাত্রটার মধ্যে ছিল না! সেই শূকর- পালককে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ বাস্তবে প্রকৃতিতে সে এরকমটাই দেখে অভ্যস্ত।

পিগস্ অ্যাট দ্য ট্রফ্ (১৮৮৪)

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে এমন কোন আদর্শের নমুনা নেই যার থেকে সাধারণ মানুষ সঙ্গীত সমালোচনা করার বা বোঝার কোনরকম একটা মানদন্ড পেতে পারে। তাই বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োজন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে।

তোমাদের মধ্যে যাদের 'পষ্টো কথায় কষ্টো নেই' তারা হয়ত ভাবছ গান বাজনা শুনব, হয় ভাল লাগবে নয় লাগবে না। এর মধ্যে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ফিত্তির ঝামেলা কেন? ঝামেলা না থাকলে সত্যিই বড়ো ভালো হত। কিন্তু আমাদের ভালোলাগাটা কখন যে বিশ্ব বাজার ব্যবস্হার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে আমরা নিজেরাই জানি না। নইলে দেখ অসাধারণ গুণী তবলচিকেও আজ বাজারি গিমিকের প্রয়োজনে কয়েকশ ঢাকের কলরবে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়, বিরল প্রতিভার অধিকারী গায়ককে সুক্ষ রাগদারি ছেড়ে চটুল সিনেমার গান করে অস্তিত্বরক্ষা করতে হয়। তাই কোন ভালোলাগাটা সঙ্গীত ভালোলাগা আর কোনটা কলরব ভালোলাগা, সেই তফাৎটুকু বুঝতেও ওই বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন।

কিন্তু কতটা বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োজন সঙ্গীত বুঝতে? এ জন্য সবাইকে কি সঙ্গীতজ্ঞ হওয়ার মত শিক্ষিত হতে হবে? সহজ ও পরিষ্কার উত্তর - না। যারা সঙ্গীত ভালবাসে, তাদের পক্ষে সঙ্গীতের উপাদানগুলি আলাদা করে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য পন্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই বোধ সঙ্গীতপ্রেমীর কাছে স্বভাবগতভাবেই এসে যাবে।

সঙ্গীতের মধ্যে শুধু গান- বাজনার প্রেক্ষিতে বলা যায় কয়েকটি স্বর শুনে স্বরগুলোর নাম বা তালের নাম বলতে না পারলেও তাদের তীব্রতা আর সময়ের নিরিখে একের সাথের অপরের তফাৎ যারা বুঝতে পারে তাদের পক্ষে গান- বাজনার তিনটি মূল উপাদান - সুরেলা ধ্বনি(Melody), স্বর- সঙ্গতি(Harmony) ও ছন্দ(Rhythm) বোঝা কঠিন হবে না।

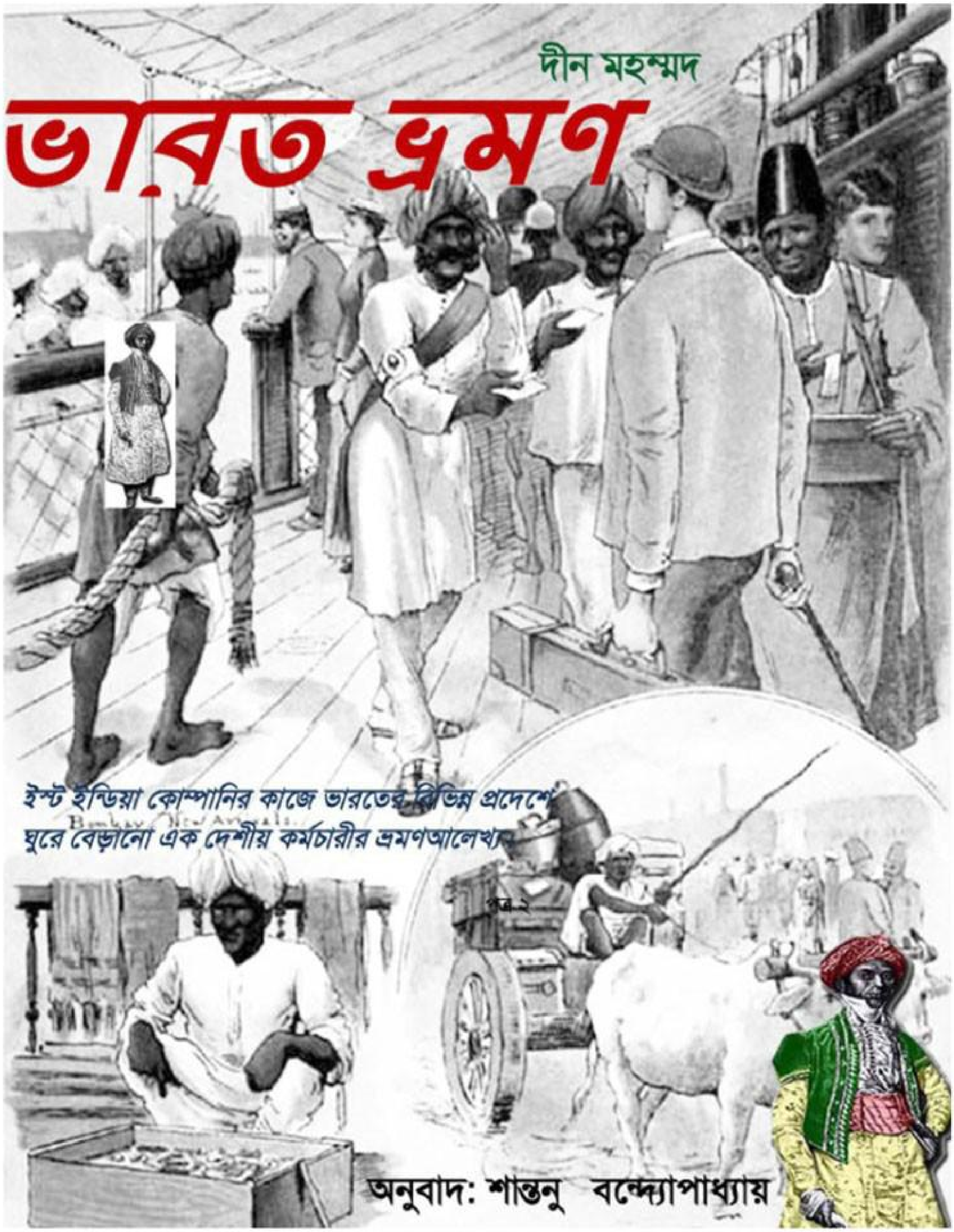


পত্র ৭

ফুলওয়ারা ছাড়ার ১৫ দিন বাদে কর্মনাশায় পৌঁছোলাম। গঙ্গার পাড়ে তাঁবু ফেলা হল। আমরা পৌঁছতে মোরাটরা পালিয়ে গেল। কর্মনাশা একটা খোলা সমতল জায়গা। একটা ছোটো নদী, গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। এখানকার শান্ত পরিবেশেই তাঁবু ফেলা হল।

চারপাশের গ্রামের শোভা দেখে দিন কেটে যাচ্ছিল দিব্যি। কয়েকমাস এখানে থাকার পর কর্নেল মরগ্যান আর গডার্ড এর কাছ থেকে আদেশ এল মুঙ্গেরের দিকে যেতে হবে। সৈন্যদলের

আগে ভোররাতেই সৈন্যবাহিনীর মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে মসিয়েঁ বেকার, স্কট আর বেসনার্ডকে। সঙ্গে গোলাবারুদের দায়িত্বে যিনি আছেন তাঁকেও।

সেটা ১৭৭১ সালের মাঝামাঝি সময়। মাসখানেক চলার পর মুঙ্গেরের কাছাকাছি, আন্দাজ ৩০ কিলোমিটার হবে, গঙ্গার মাঝবরাবর পাথরের ওপর বানানো একখানা চমৎকার পুরোনো বাড়ি নজর কেড়ে নিল। সেদিন সন্ধ্যায় কাছাকাছিই আস্তানা ফেলা হল। পরদিন সকালে মিস্টার বেকার, মিস্টার বেসনার্ড আর অন্যান্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে শিকারে গেলাম। দুপুর নাগাদ ফেরা হল। ঘোড়াগুলো নদীর কাছাকাছি এলে আমরা ওই একলা প্রাসাদটা আরো কাছ থেকে দেখে ঠিক করলাম নদী পেরোনো হবে।

ঘোড়াগুলোকে সহিসদের জিম্মায় রেখে আমরা মাছধরা নৌকোয় চেপে বসলাম ওপারে যাবো বলে। ফকিরের থানটাতে লোকজন বেশ বেড়াতে আসে। আমাদের কাছাকাছি আসতে দেখে ফকিরবাবা তাঁর ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পরনে পা অবধি গেরুয়া মসলিনের আলখাল্লা। ঢোলা হাতা। আর মাথায় মিটারখানেক সাদা মসলিন কাপড়ের পাগড়ি। বুক অবধি সাদা দাড়িতে বেশ সম্ভ্রমপূর্ণ তাঁর চেহারা। বয়েসের কারণে মাথার চুলেও পাক ধরেছে। এলোমেলো চুল কাঁধ অবধি এসে নেমেছে। কিন্তু তাঁর শরীর স্বাস্থ্য দেখবার মতো। বেশ একটা উৎফুল্ল ভাব তাঁর চেহারায়।

তাঁর ভেতরে মনের অদ্ভুত প্রশান্তি, মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ। আমাদের তিনি আতিথ্যগ্রহণ করতে বললেন। বললেন তাঁর যতটুকু সামর্থ তাই দিয়ে তিনি খুশি মনে আমাদের সেবা করবেন। কথা বলতে বলতে তাঁর চিন্তাচেতনায় ঈশ্বরের ভাবনা ঘুরে ঘুরে আসছিল। মাঝেমাঝেই তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইছিলেন। হাতে একটা লম্বা জপের মালা। কোমরে বাঁধা আরেকখানা। আমরা তাঁর আস্তানায় ঢুকলাম। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা আমি খুব কমই দেখেছি। চৌকো একফালি জায়গা, কোনাকুনি পাঁচ গজের মতো। বেশ উঁচু জায়গাটা, চার্চের মতো অনেকটা, ছাতটা সমতল আর পাঁচিলঘেরা। সেখানে ওঠার জন্য মই রয়েছে। দিনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে একখানা পশুচামড়ার ওপর টানটান হয়ে বসে ফকিরবাবা অত্যন্ত প্রফুল্লমনে কোনো লেখকের বই পড়েন। ঘরের এক কোণে আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। তিনদিকে ইঁট দিয়ে ঘিরে তাইতেই রান্না করেন উনি। রান্না বলতে স্রেফ ভাত  ফোটানো। তার সাথে গাছের ফলমূল। কিন্তু অতিথিদের জন্য দরজার বাইরে বড়ো উনুনে ব্যবস্থা করা। আমরা যখন কৌতূহলভরে তাঁর আস্তানা দেখছি, উনি আমাদের আম সহ অন্যান্য ফল এনে দিলেন। ফেরবার সময় তাঁর আতিথেয়তার প্রশংশা তো করা হলই পাশাপাশি তার আস্তানার পরিচ্ছন্নতার এবং ফলবাগানের সৌন্দর্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করা হল।

ফকিরের নৌকো চেপেই এপারে ফেরত এলাম আমরা। সকল মানুষদের পারাপারের জন্যই এই ব্যবস্থা। বদলে গ্রামবাসীরা ফকিরবাবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে আসেন।

সৈন্যদল পরদিন মুঙ্গেরে পৌঁছল। ইউরোপীয়রা একটা বড়োসড়ো খোলামেলা ব্যারাকে গিয়ে ঢুকল। স্থানীয় সেপাইরা দুর্গের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট আস্তানায়। দুর্গের পরিধি দু মাইল। গঙ্গার পাড়ে চৌকো করে তৈরি করা। দুর্গের সামনের আর পাশের দেওয়াল প্রায় জল থেকে উঠে আসা। গঙ্গার পাড় বরাবর দূর অবধি দেখা যায়।

অফিসারদের থাকার ব্যবস্থা সামনের দিকে। চমৎকার ভাবে তৈরি সেটা। সৈন্যদের থাকার জায়গাটা একলপ্তে একটা এলাকার মধ্যে, বাড়িগুলো দৃশ্যত বেশ কেতাদুরস্ত। মসৃণভাবে কাটা চকচকে পাথর দিয়ে সাজানো। দুর্গের ভেতরের অংশে মির কাশিম আলি খানের পুরোনো

প্রাসাদে কর্নেল গ্রান্টের জন্য ব্যবস্থা হল। সময় তখনো থাবা বসায়নি সে প্রাসাদে। চারটে চওড়া দরজা দিয়ে দুর্গে ঢোকা যায়। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বানানো সেগুলি। চারদিকে চারটে। ঢুকেই ব্যারাকের সামনের মাঠ। নবাবদের আমলে তৈরি হলেও কম্পানির হাতে আসার পর সেনাঘাঁটি হিসেবেই প্রকৃতপক্ষে এই দুর্গ ব্যবহৃত হতে থাকে। এমন আর দ্বিতীয়টি নেই এ তল্লাটে। মাইলটাক দূরে একসার জীর্ণ কুটীর (ভারতের যেকোনো প্রান্তেই সাধারণের বাসস্থান, যেমনটা দেখা যায় আর কি!)। এই বাসিন্দারা রেশম বানায়। আর খানিকটা দূরেই বাস করেন নানান জিনিসের উৎপাদনকারীরা। এখানকার লোকেদের বাসনকোসন বানানোর দক্ষতা এমন যে আশপাশের শহরগুলির বাজারে একচেটিয়া মাল সরবরাহে এদের জুড়ি নেই। এমনকি কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তেও। এখানকার মানুষদের সম্পর্কে কথিত যে এঁরা বংশপরম্পরায় এই বৃত্তিপালন করছেন এবং বাজারে জিনিসপত্র জোগান দিয়ে চলেছেন।

ক্রমশ

(সঙ্গে মুঙ্গের দুর্গের ছবিটি বিসকফের আঁকা)_

# সীমান্তের অন্তরালে

সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

*হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলন ও সম্পাদনা—শ্রীমতী স্বপ্না লাহিড়ী*

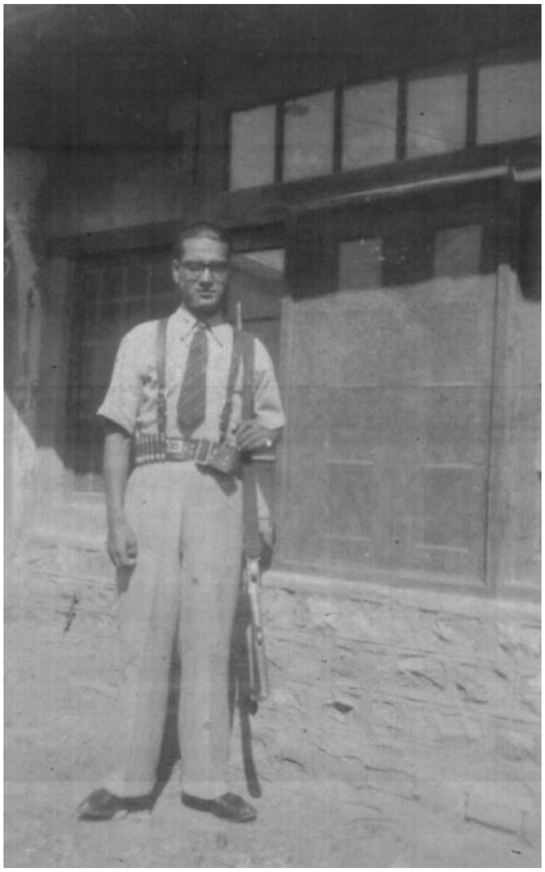

শ্রী সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী উত্তরপ্রদেশের লখনউ শহরের মকবুলগঞ্জে ১৯০৯ সালে দোসরা জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কেটেছিল রানিখেতের কাছে নাগপানিতে।

ছোটবেলা থেকেই অসম সাহসী এই বালকটি তার প্রিয় ঘোড়া রেবির পিঠে চড়ে ব্যাঘ্র অধ্যুষিত ঘন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো। গাছের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে গাদা বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করাও প্রায় পাঁচ ছ বছর বয়েস থেকে তার একটা খেলা ছিল। অ্যাডভেঞ্চার তাঁর রক্তে ছিল। অজানাকে জয় করার নেশা তাঁকে টানত।

অতুলনীয় মেধা ও স্মৃতি শক্তির অধিকারী লেখক বহুভাষাবিদ ছিলেন। মাতৃভাষা বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি ছাড়াও উর্দু ও কুমাউনি ভাষা তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষার মতোই ছিল। তিনি পাঞ্জাবী ও পুশতু বা পখতো ভাষাও(পাখতুনদের ভাষা) অনর্গল বলতে পারতেন। প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই বাংলা , ইংরাজি ও উর্দু সাহিত্যে তাঁর দখল ও লেখার শৈলী অনবদ্য ও আধুনিক ছিল। স্বাধীনচেতা এই মানুষটির , স্বাধীনতা প্রেমী জাতির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাই হয়তো তাঁকে পাখতুনদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে "সীমান্তের অন্তরালে" লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাংলা ভাষা লেখা, পড়া ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আনুরাগ তিনি তাঁর বিবাহের পরে , তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শান্তি লাহিড়ীর সাহচর্যে পেয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে প্রায় সব জায়গায় গিয়েছেন। পাখতুনিস্তানেও তিনি ফ্যামিলি স্টেশন পারাচিনার দুর্গে পুত্রকন্যা নিয়ে থাকতেন। সেখানে তাঁর নিজস্ব দুটি দেহরক্ষী থাকত, আর থাকত আত্মরক্ষার জন্য একটি বন্দুক। লেখক সেখানে সপ্তাহান্তে একবার যেতেন ।

লেখকের ইংরাজিতে " Pakhtoon " শীর্ষক লেখটি আনুমানিক ১৯৫৩- '৫৪ সালে Statesman পত্রিকাটিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বর্মা সীমান্তের লড়াইএর পর তিনি আর্মির মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস বিভাগে যুক্ত হন ও পুনে মিলিটারি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে AMIE পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ।

১৯৬৭ সালে তিনি Commander works engineers পদ থেকে অবসর নেন। চাকুরিকালে তিনি প্রাক স্বাধীনতার যুগে অবিভক্ত ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ , ও পরে গোটা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু পাহাড় জঙ্গল তাঁর অতিরিক্ত প্রিয় ছিল তাই শেষ জীবনটা তিনি পাহাড়ের কোলে দেরাদুনে, ফলফুলের বাগান ঘেরা ছবির মত কটেজ বাড়িতে কাটিয়েছিলেন।

"সীমান্তের অন্তরালে" লেখাটি তিনি ১৯৬১ সালে শুরু করেন ও খুব সম্ভবত ১৯৬৫ সালে শেষ করেন । ১৯৮৫ সালের ২রা ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।

## সংকলকের বক্তব্যঃ

আমরা ছোট থেকে বাবার কাছে তাঁর  অ্যাডভেঞ্চারাস জীবনের গল্পগুলি শুনে শুনে বড় হয়েছি । কখন পাখতুনিস্তান,   কখন বর্মা বর্ডারে যুদ্ধ আবার কখন বা রানিক্ষেত , নাগপানির ঘন জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে কাঁধে বন্দুক ও হাতে টিমটিম করে জলছে ছোট্ট একটা লন্ঠন নিয়ে পাকদণ্ডি ধরে একা বাড়ি ফেরা,   মাঝে মাঝেই দূরে শোনা যাচ্ছে বাঘের ডাক । এখনও মনে করে সেই রোমাঞ্চ  অনুভব করি। জয়ঢাকের পাঠকদের কাছে বাবার লেখা পাখতুনিস্তানে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরার যে সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত।

স্বপ্না লাহিড়ী
২৫.৯.২০১৪

বন্ধুবর শেখ আবদুল আজিজ বলতেন, "ভাইজান, চাকুরির সংকটময় পথে সচ্ছন্দে চলতে হলে মানুষের একটি বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক। সেই গুণ্টি যদি আয়ত্ত করতে পারো তাহলে দেখবে সমস্ত মুশকিল আসান হয়ে গেছে, চাকুরির চড়াই রাস্তায় তরতর করে এগিয়ে চলেছ। সে গুণটির নাম হল বৈগুণ।

নবাব বাদশাহদের দরবার সাধারণত রাতের বেলাতেই বসে। এমনি এক সন্ধের দরবারে নবাবসাহেব তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, "ওয়াজির সাহেব ম্যায়নে আজ বৈগণ কী সবজি খাঈ। বৈগণ এক বেহতরিন সবজি হৈ। ম্যায়নে তো ইতনা উমদা সবজি কভি খায়ি নহি। ওয়াজির সাহেব বৈগণ কে মুতল্লক আপকা ক্যায়া খয়াল হৈ?"

মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দিলেন, "জাঁহাপনা বেশক্ দুরস্ত ফরমাতে হৈ। জ্যায়সে হুজুর হম সব লোগোকে বাদশা হৈ, অয়সে বৈগুণ সারে সবজিওঁকা বাদশা গিণা যাতা। ইস্কা জিস্মকা রঙ ক্যায়সা চমকতা রহতা হৈ! বিমার ইসকো খায়ে তো তনদরুস্ত হো যাতে হৈ। হুজুর বৈগুণ তো এক শাহী সব্জী হৈ।"

কিছু দিন পরে, নবাব সাহেব আবার দরবারে বসে আছেন। আজ নবাব সাহেবের চেহারাটা বেশ ব্যাজার, মনে হয় কিঞ্চিত অসুস্থ আছেন , বেগুনের তরকারি কয়েকদিন সমানে খেয়ে তাঁর শরীর বেশ খারাপ।

তিনি মন্ত্রীকে বললেন "ওয়াজির সাহেব বৈগন কোই অচ্ছি চিজ নহি হৈ। ম্যায় তো আজ সারাদিন পেট কে দর্দ সে বেচৈন থা।"

ওয়াজির সাহেবের উত্তর "হুজুর বিলকুল দুরস্ত ফরমাতে হৈ , ইসমে ক্যায়া শক্ কি বৈগন বহতই খরাব চীজ হৈ । মুঝে তো ইসকা নাম সে হি নফরত হৈ । তন্দুরস্ত আদমি ইসে খানেসে বিমার হো যাতা, হুজুর বৈগুণ আপ হরগিজ ন খাইয়েগা।"

বাদশা বললেন, "মগর আপনে তো কল বৈগুণ কি বহুত তারিফ কি থি। মন্ত্রীর জবাব, "হুজুর ম্যায় তো হুজুর কা নৌকর হু বৈগুণ কা নহি।"

বাস ভাইজান, এহেন ওয়াজিরের চাকুরির আসন টলায় কে?

চাকুরি জীবনের প্রারম্ভে যদি শেখ আবদুল আজিজ সাহেবের সঙ্গে দেখা হত আর যদি বৈগুণ গুণটা সময়মতো রপ্ত করতে পারতাম তাহলে সারা চাকুরে জীবনটা হোঁচট খেতে খেতে চলতে হত না, দিব্যি গড়গড় করে এগিয়ে যেতাম।

ইংরাজি ১৯২১ সাল। আমি তখন লখনউতে চার্চ মিশন বার্কেট স্কুলে ক্লাশ সিক্সে পড়ি। সহপাঠীদের কাছে শুনলাম ইংরাজদের রাজত্ব আর খুব বেশিদিন নেই। মহাত্মা গান্ধী নামে এক মুকুটবিহীন রাজা ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কয়েকদিন পর লখনউ কংগ্রেস গ্রাউন্ডে বিরাট সভায় মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর দুই সহকর্মী মৌলানা মহম্মদ আলি ও শওকত আলি উপস্থিত হলেন।

গান্ধীকে দেখে মনটা দমে গেল। মাথায় মুকুট নেই, পরণে রাজবেশ নেই, কোমরে একখানা তলওয়ার পর্যন্ত নেই! ইতিমধ্যে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাও সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা খুব গরম গরম লেকচার দিলেন, বললেন আমরা যদি ইংরাজদের সঙ্গে নন কোঅপরেশন করি ও তাদের স্কুল ছেড়ে দিই, তাহলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একেবারে চট করে এসে যাবে। আমার প্রস্তাবটা খুব পছন্দ হল, কারণ স্কুলের তিনজন মাস্টার, উর্দুর মৌলবি সাহেব, অঙ্কের মাস্টারমশাই ও সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা খুব প্রীতিকর ছিল না। তাঁদের কথা মনে পড়তেই আর সব পড়ুয়াদের সাথে গোমতী নদীর জল স্পর্শ করে শপথ করে ফেললাম, যতদিন ভারত স্বাধীন না হয়, ততদিন আর স্কুলে যাব না। তখন এ বুদ্ধি ছিলনা যে বঙ্গসন্তানদের চাকুরি ছাড়া গতি নেই আর তার জন্যে নিদেন ম্যাট্রিক পাশ না করলে কেরানিগিরির পথও বন্ধ। খোলা থাকলো শুধু কায়িক শ্রমের রাস্তা যা তখনকার মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার মনে করতেও লজ্জা পেতেন ।

এরপর কিছুকালের জন্যে চলল আপাত মধুর বেপরোয়া অবসর আর তারই মধ্যে ঘটনা চক্রে গিয়ে পৌঁছলাম প্রকৃতির লীলাভূমি কুমাউন পর্বতাঞ্চলের ছোট্ট পাহাড়ি শহর রানিখেতে। এখানে একটা চাকুরি জুটে গেল রানিখেত ক্যান্টনমেন্টের ওয়াটার ওয়ার্কস্- এ। এই ওয়াটার ওয়ার্কসটি শহর থেকে বেশ দূরে, পগডণ্ডি দিয়ে ছ'মাইল আর গাড়ির রাস্তায় নয় মাইল। গাড়ির রাস্তাটি অবশ্য ওয়াটার ওয়ার্কস্ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। শেষের মাইল তিনেক পায়ে হাঁটা পগডণ্ডি।

রানিখেত থেকে পগডণ্ডি দিয়ে তিন মাইল রাস্তায় প্রায় দু হাজার ফিট উঠে আর একটি পাহাড়ের মাথায় চৌবাটিয়ার গোরা ব্যারাক । সেখান থেকে ফার ও ওক গাছের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে তিন মাইল পগডণ্ডি রাস্তা দিয়ে আবার প্রায় ছ হাজার ফুট নেমে গেলে ওয়াটার ওয়ার্কস্- এ পৌঁছনো যায়।

পাহাড়ের গায়ে পাইন আর রডোডেনড্রন (কুমাউনি ভাষায় বুরানাঞ্চ) বনের মধ্যে ওয়াটার ওয়ার্কস্, তার প্রায় দুশো গজ দূরে একখানি ছোট্ট বাংলো ধরনের বাড়ি আর পঁচিশ গজ দূরে খান বারো ছোট ছোট এক ঘরের কোয়ার্টার, ড্রাইভার, ফ্যায়ারম্যান দের জন্যে।

বাংলো বাড়িটি ছোট হলেও আমার বেশ ভাল লেগেছিল, কারণ আমার শোবার ঘরের জানলা থেকে হিমালায়ের ধবধবে সাদা তিনটি শৃঙ্গ সব সময়েই দেখতে পাওয়া যেতো। ওয়াটার ওয়ার্কস্ থেকে রানিখেত ও চৌবাটিয়া ক্যান্টনমেন্টে জল পাম্প করা হতো স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে আর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হতো পাইন রডোডেনড্রন , ওক প্রভৃতি গাছের কাঠ। বয়লারের রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হাজার হাজার মণ কাঠের যোগান দিত গভর্নমেন্টের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট।

কাঠ বইবার জন্যে মজুর আসত সুদূর নেপালের করদ রাজ্য বজাং থেকে। এরা বজাং কে বলে ডোটি আর নিজেদেরকে বলে ডোটিয়াল। এরা জঙ্গলের মধ্যেই গাছপালা কেটে নিজেদের জন্যে কুঁড়েঘর তৈরি করে নেয় আর পাতা দিয়ে বানিয়ে নেয় ছাদ যা ছাদ না বলে ছাদের প্রহসন বলা ভাল।

জাগদেওর জঙ্গল থেকে পায়ে হাঁটা একটি সরু পথ চলে গেছে নাগপানির ওয়াটার ওয়ার্কস্ পর্যন্ত। সেই সরু পাথ ধরে ডোটিয়ালরা পিঠে আড়াই থেকে তিন মণ বোঝা নিয়ে , হাতে একটা লাঠি , একেবারে নুয়ে পড়ে পাহাড়ি নদীনালা পেরিয়ে পৌঁছত নাগপানিতে, মজুরি মণপিছু আড়াই আনা। বড় গরিব ছিল ওরা।

রানিখেত ক্যান্টনমেন্টের বাড়তি জলের চাহিদা মেটাবার জন্যে নাগপানি ওয়াটার ওয়ার্কস্ থেকে তিন মাইল দূরে ভালুখডের ছোট্ট পাহাড়ি নদিতে একটা বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের ওপরওয়ালা বড়োসাহেব এলেন বাঁধ উদ্বোধন করতে। বাঁধের জল পরিষ্কার রাখার জন্যে বড় সাহেব আমাকে হুকুম করলেন বড় কিছু মাছের পোনা জোগাড় করে জলে ফেলতে। হুকুম শুনে আমার তো মাথায় হাত। সাহেব যদি গোটাকতক বাঘের ছানা জোগাড় করতে বলতেন, সে কাজটা বরং অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হত। কুমাউনের জঙ্গলে বাঘের অভাব নেই, জিম করবেট তাঁর 'ম্যান ইটার্স অফ কুমাউন' বইটিতে কুমাউনের ব্যাঘ্রকূলকে অমর করে রেখে গেছেন। কিন্তু ছোট ছোট পাহাড়ি নদীতে বড়োজাতের মাছ হয় বলে শুনিনি।

তবে বড়োসাহেবের কথা! এই অসাধ্যসাধন কী করে করা যায় তাই চিন্তা করতে লাগলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই মাছ জোগাড়ের একটা সুরাহাও হয়ে গেল। গভর্নমেন্টের এক ভূতপূর্ব ঠিকাদার ও অধুনা কংগ্রেসের পাণ্ডার ছোট ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রী যাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। বিবাহ হবে পঁচিশ মাইল দূরে খয়েরনারের কাছে। একমাত্র পায়ে হাঁটা পগ ডণ্ডি ছাড়া সিমলি গ্রাম থেকে খয়েরনা যাবার অন্য কোন পথও নেই। বেলা একটা নাগাদ বরযাত্রী দলের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম। সব চাইতে আগে একটা বিরাট হলদে রঙের নিশান, তার সঙ্গে নাকাড়া , রামশিঙা ও তার পিছনে হুড়কানি নর্তকদের দল। এদের পিছনে ডান্ডিতে চড়ে বর ও তার পর চলল বরযাত্রীর দল।

সঙ্গে ছিল দুটি ভুটিয়া ঘোড়া। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে চড়াই উতরাই পথে ঘোড়ার সওয়ারি করাটা বিশেষ নিরাপদ বলে মনে হল না। কাজেই আমিও সবাইকার সঙ্গে হেঁটেই চললাম । গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে বরও হেঁটেই চলল। পাহাড়ি চড়াই উতরাই ধরে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। প্রচুর লাল রঙের গোছা গোছা রডোডেনড্রন, জংলি গোলাপ ও বন্য চেরি ফুলে তখন গোটা জঙ্গলটা আলো করে রেখেছে।

পথে দু জায়গায় বিশ্রাম নিয়ে আমরা শের কা ডাঁড়া নামক ব্যাঘ্রসংকূল পাহাড়টিতে যখন পৌঁছেছি তখন সূর্য ডুবুডুবু। পিছনে বহু দূরে দু'সারি বেগনি রঙের পাহাড়ের মাঝখানে হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তখন টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে। হাঁটার পরিশ্রমে আমরা সবাই ক্লান্ত, কিন্তু শের কা ডাঁড়া পেরিয়ে যেতে হবে অন্ধকার হবার আগেই। কাজেই আর বিশ্রাম করা হল না। পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে আরম্ভ করলাম।

সন্ধ্যার আলোআধাঁরিতে কনের বাড়িতে পৌঁছলাম আমরা। কনেপক্ষের কয়েকজনের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। পরের দিন বর ও বরপক্ষ বিদায় নেবার সময় ওরা আমাকে একদিন থেকে যেতে নিমন্ত্রণ করলো। বলল "আপনি বাঙালি, মাছ খেতে নিশ্চয় ভালবাসেন। এখানে কোশী নদীতে বড়ো বড়ো মাছ পাওয়া যায়, আপনার জন্যে মাছ ধরার ব্যবস্থা করে দেবো।"

শুনে আমি তো লাফিয়ে উঠলাম। মাছ খাবার লোভে নয়, ভালু খড়ের বাঁধের বড়ো মাছের পোনা পাবার আশায়। গ্রামের লোক লাগিয়ে বড়ো মাছের পোনা ধরা হল ও পরের দিন সেগুলি নিয়ে এসে ভালু খড়ের বাঁধের জলে ছেড়ে দেওয়া হল ।

( ৩)

ঢিমে তেতালায় চাকুরি জীবনের কয়েকবছর এমনি করে কেটে গেল। ইতিমধ্যে বদলি হয়ে রানিখেত থেকে বেরিলি ও সেখান থেকে গাড়োয়াল অঞ্চলের পার্বত্য সেনানিবাস ল্যান্সডাউনে এসে পৌঁছেছি। সেখানে আমাদের নতুন বড়োকর্তা আমার কাছে নতুন হলেও পূর্ববর্তী সাহেবের মতো মাত্র পাঁচ বছরের ট্যুরে বিলেত থেকে আসেন নি, ইনি ইন্ডিয়াতে কাজ করে মাথার চুল পাকিয়েছেন। কাজেই ঝানু পাক্কা সাহেবের মতো তাঁর ব্যবহার।

বেলা দশটার সময় সাহেবের অফিস কম্পাউন্ডে ঘোড়া নিয়ে সার দিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমার সহকর্মীদের ঘোড়া ছিলোনা কিন্তু ঘোড়ার অস্তিত্বের সার্টিফিকেট দিয়ে তাঁরা প্রতিমাসে ভাতা নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘোড়ার পরিবর্তে তাঁরা নিজেরাই সার বেঁধে দাঁড়ালেন। আমি আমার ঘোড়াটিতে যখন সেখানে পৌঁছলাম তখনই সাহেবও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

আমার ঘোড়াবিহীন সহকর্মীরা কোমর থেকে শরীরটা নুইয়ে সেলাম করে বললেন, "গুড মর্নিং।"

আমি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে নির্বোধের মত টুপিটা সামান্য তুলে "গুডমর্নিং সার" বললাম।

তিনি তার উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন। পরে শুনলাম সাহেবের সামনে, আমার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামা ও টুপি তুলে অভিবাদন করাটা বেয়াদপি। বিলাতি সাহেবের পক্ষে এরকম অভিবাদন চলে কিন্তু কালা আদমিরা মাথা নিচু করে সব কিছু সহ্য করবে সেটাই তিনি প্রত্যাশা করেন।

বৈগুণ গুণটি রপ্ত না থাকায় এ বিড়ম্বনার হাত এড়াতে পারলাম না। সাহেবের সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটিও হয়ে গেল। এরপর সাহেব ঘন ঘন ল্যান্সডাউনে আসতে থাকলেন ও আমার বিরুদ্ধে অযোগ্যতার প্রমাণ বাড়তে থাকল।

বুঝলাম সাহেব আমার চাকরিটি খতম করতে বদ্ধপরিকর। সেই সময় জানতে পারলাম যে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ( North West Frontier ) যাবার জন্যে ভলান্টিয়ার খোঁজ করা হচ্ছে। শুনলাম সে অত্যন্ত বিপদসংকুল জায়গা, সেখানে গেলে নাকি প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা খুবই ভাগ্যের কথা। কিন্তু চাকরি যখন যেতে বসেছে তখন প্রাণের মায়া করে আর কী হবে। ওখানে চলে যেতে

পারলে সাহেবের হাত থেকে চাকরিটা অন্তত রক্ষা পাবে। কাজেই সীমান্তে বদলির জন্যে দরখাস্ত করলাম আর সেটা মঞ্জুরও হয়ে গেল।

প্রাক- স্বাধীন ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এক ফালি অনুর্বর জায়গা। সেখানকার পাঠান বাসিন্দারা সে দেশটাকে বলে পাখতুনিস্তান, আর নিজেদের বলে পাখতুন জাতি। কীই বা হয় সে দেশের মাটিতে! শুধু গাছপালাবিহীন পাহাড়ের সারি। উপত্যকাগুলিতে সামান্য ধানের ফসল। মাঝে মাঝে দ্রাক্ষাকুঞ্জ , আখরোট, আপেল প্রভৃতির ছোট ছোট বাগান। এই ফসলে পাখতুন জাতির বছরে দু মাসেরও অন্ন সংস্থান হয় কিনা সন্দেহ। সে দেশে গরমের সময় মনে হয় সূর্য তার সমস্ত উত্তাপ ঢেলে দেবার জন্যে এই দেশটাকে বেছে নিয়েছে। শীতকালে তেমনই ঠাণ্ডায় গোটা দেশটা জমে যায়। বসন্ত তার কিরণমাখা পাখা মেলে দেশকে নতুন ফুলে ভরিয়ে দেয় না, বসন্তের পাখি মধুর সুরে গান গেয়ে ঋতুকে আহ্বান জানায় না।

পাঠান দেশের টুকিটাকি খবর পড়ে মনে মনে বাসনাও ছিল ঐ দেশটা দেখবার ও জানবার। অতএব এইভাবে সুযোগটা পেয়ে সে দেশে গিয়ে পৌঁছোলাম ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে। পাঠান বলতে ভারতের এখানে সেখানে হিং ফিরি করা কাবুলিওয়ালাদেরই দেখেছিলাম। এদের পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের ঢিলে কামিজ, ঢিলে সলওয়ার , জরির কাজ করা মখমালের ওয়েস্টকোট, জরির কুল্লার ওপর পাগড়ি আর চোখের কোলে সুরমা। শৌখিন বেশভূষা আর চেহারা দেখে মনে হত, যে দেশে গুলবাগিচায় বুলবুলিরা সারা দিন গান গায়, যে দেশে ফুলের সৌরভ আকাশ- বাতাস মাতোয়ারা করে রাখে, এমনই কোন দেশের লোক বোধ হয় পাঠানরা।

কোহাটে পৌঁছে দেখি পাখতুনিস্তানের রুক্ষ নির্মম ও কঠোর আবহাওয়ায় পালিত পাঠান তার দেশের মতোই রুক্ষ, নির্মম ও কঠোর। চারদিকে গাছপালাবিহীন অজস্র রুক্ষ পাহাড় দিয়ে ঘেরা কোহাট শহর আর ক্যান্টনমেন্ট। দূরে একটা পাহাড়ের বুক থেকে নেমে এসেছে একটি বড়ো ঝর্না। তারই দৌলতে শহরটি সবুজ। ক্যান্টনমেন্টে বৃটিশ সৈন্য মোতায়েন আর চারদিকে বৃটিশ সাঁজোয়া গাড়ি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আশেপাশের পাহাড়গুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বৃটিশ পিকেট সর্বদা সজাগ দৃষ্টিতে পাহারা দিচ্ছে, যাতে আফ্রিদিরা অতর্কিতে হানা দিয়ে কোহাট ক্যান্টনমেন্ট তছনছ না করে দিয়ে যায়।

দেখলাম ট্রেনের সঙ্গেই দু'খানা ছাত খোলা মালগাড়ি লাগানো, মালগাড়ির ভিতর এক সারি বস্তা সাজিয়ে বুলেট প্রুফ করা আর তার মধ্যে মেশিনগান ও রাইফেল সজ্জিত ফ্রন্টিয়ার কনস্টিবিউলারির দুটি ট্রেনরক্ষিদল। ট্রেন রক্ষার এই তোড়জোড় দেখে মনে হল চাকরির মায়া না করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই ।

এই কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ জানলার বাইরে চেয়ে দেখি, কোহাটের সবুজ বাগবাগিচা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আর রেল লাইনের দু ধারে দু তিনশ গজ অন্তর একজন করে পাঠান দাঁড়িয়ে। হাতে তাদের রাইফেল, কোমরে কার্তুজের বেল্ট। বুকটা ধ্বক করে উঠলো। ভাবলাম পাঠানের দল ট্রেন লুটতে এসে পড়েছে। আমার ভয়টা বোধহয় চোখে মুখে ফুটে উঠেছিলো, কারণ সহযাত্রী এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "ভাইসাব আপনি বোধহয় এদেশে এই প্রথম আসছেন। ঘাবড়াবেন না। এই পাঠানরা গভর্মেন্টের মাইনে করা খাসাদার। এরা নিজেদের এলাকার মধ্যে অন্য উপজাতিদের আক্রমণ থেকে ট্রেন রক্ষা করার জন্য ট্রেনের সময় লাইনের ধারে এসে দাঁড়ায়। অবশ্য এরা নিজেরাও যে ট্রেন লুট না করে কখনও তা নয়, তবে তেমন ঘটনা বিরল।"

ট্রেন চলেছে এঁকে বেঁকে, ধীরে ধীরে, বাদামি রঙের গাছপালাবিহীন ছোটো ছোটো পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু একটার পর একটা পাহাড় , এর বুঝি আর শেষ নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় মাঝারি গাছের ঝোপ আর তার আশেপাশে দুম্বা ভেড়ার দল নিয়ে রাইফেল কাঁধে পাঠান বালক।

আমার সহযাত্রী পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি নিজের কথার খেই ধরে বললেন, "সবসময়েই যে ট্রেনরক্ষার এমন জবর ব্যবস্থা থাকে তা নয়। আজকাল তিরাহ এর উপজাতি পাঠানরা গভর্নমেন্টের ওপর ভীষণ খাপ্পা , তাই এই ব্যবস্থা। স্বাভাবিক অবস্থায় ট্রেনের সঙ্গে রক্ষিদল থাকে না, শুধু পিকেট পোস্টের সেপাইরাই ট্রেনের নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট। ওই যে দূরে পাহাড়ের মাথায় একটা ছোট্ট বাড়ি দেখছেন ওটি হল রেললাইন আর মোটরের রাস্তার নিরাপত্তার জন্য ফ্রন্টিয়ার কন্সটিবিউলারির পিকেট। এ'রকম পিকেট পোস্ট কয়েক মাইল অন্তর পাহাড়ের মাথায় দেখতে পাবেন। মাঝে মাঝে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে শুকনো নালা নেমে এসেছে, ওই নালাগুলোই বিপজ্জনক স্থান। উপজাতীয় পাঠানরা এই সব নালাগুলিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকে আর সুবিধে পেলেই ট্রেন কিম্বা মোটরগাড়ি বা বাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটপাট আর খুনখারাপি করে নালার মধ্যে গা ঢাকা দেয়। পিকেট পোস্টের সেপাইরা উদয়াস্ত চোখে দুরবিন লাগিয়ে নালাগুলির ওপর নজর রাখে আর এদের মেশিনগান সব সময় প্রস্তুত থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবৃষ্টি করার জন্যে।"

কুরাম গিরিবর্তের মুখেই থাল ফোর্ট। আধুনিক ধরণের একটি বিরাট দুর্গ, পুরো এক ব্রিগেড বৃটিশ আর ভারতীয় সৈন্য থাকে এই দুর্গটির ভিতরে। দুর্গের উঁচু ও প্রশস্ত দেওয়ালের ওপর প্রায় পঞ্চাশ গজ অন্তর একটি করে ওয়াচ টাওয়ার, সেখান থেকে 'নো ম্যান্স ল্যান্ডের' ওপর নজর রাখছে সোলজাররা।

মেশিনগান ও কামান, গান এমপ্লেসমেন্টগুলিতে সব সময় প্রস্তুত। এ ছাড়াও দূরদুরান্তের বৃটিশ ঘাঁটিগুলির সঙ্গে হিলিওগ্রাফে খবর আদান প্রদান করা হয় ঐ সব ওয়াচটাওয়ার থেকে।

(হিলিওগ্রাফ—বড়ো বড়ো আয়নায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে সেই দিয়ে খবর আদানপ্রদানের পুরোনো পদ্ধতি—সম্পাঃ)

কুরাম গিরিবর্তের পাহাড়গুলির এখানে সেখানে বৃটিশ ঘাঁটি ছড়িয়ে আছে ডুরান্ড লাইন (ভারত আফগান সীমান্ত) পর্যন্ত। ঘাঁটিগুলির মধ্যে সম্পর্কসাধনও হয় সাধারণত এইসব হিলিওগ্রাফের মাধ্যমে। কারণ বৃটিশ কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ এই সব ঘাঁটিগুলির চার দেওয়ালের মধ্যে। এর বাইরে সব 'নো ম্যান্স ল্যান্ড', অর্থাৎ পাখতুন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ও সেখানে তাদেরই আধিপত্য।

কুরাম অঞ্চলকে বৃটিশ গভর্মেন্ট প্রথমে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি কিন্তু ১৯১৯ সালের যুদ্ধের পর তাঁরা এ অঞ্চলে জায়গায় জায়গায় নিজেদের ঘাঁটি গড়তে শুরু করলেন। থাল স্টেশনটি ঐ অঞ্চলের অন্যান্য স্টেশনের মতো ছোটোখাটো একটি দুর্গের মতো করে গড়া। মোটা লোহার পাত দিয়ে তৈরি একটি মাত্র কপাট নিরেট পাথরের ইমারতের সঙ্গে গাঁথা। কপাটটিতে ছোটো ছোটো ঘুলঘুলি, তার মধ্যে দিয়ে স্টেশনরক্ষি সেপাইদের রাইফেলের নল উঁকি মারছে। ট্রেন এলে কপাটটি খোলা হয় আর ট্রেনটি চলে গেলেই সেদিনকার মতো বন্ধ করে দেয়া হয়।

মাইল খানেক দূরে পাহাড়ের নিচে থাল গ্রাম। নদীর ধারে ধারে আখরোট আর আঙুরের বাগান। গ্রামটিতে প্রায় এক হাজার কুরাম উপজাতি পাখতুনদের বাস, কয়েকঘর হিন্দু ছাড়া বাদবাকি সবাই মুসলমান ধর্মাবলম্বী।

গ্রামে ঢুকতে প্রথমেই চোখে পড়ে বড়ো। উঁচু দাওয়ার ওপর খড়ের ছাদের আস্তানা। তার নিচে বসে রেস্তোরাঁর মালিক। কোমরে কার্তুজের বেল্ট আর নাগালের মধ্যে রাখা রাইফেল। এমন দেশ যে রেস্তোরাঁর ব্যবসায়ের সময়েও রাইফেলের প্রয়োজন হতে পারে। সামনে একটি বড় সামোভারে সবুজ চা তৈরি হচ্ছে আর কতকগুলি বিরাটকায় থালায় সাজানো বিরাট কলেবরের তন্দুরি রুটি , মুর্গি রোস্ট, দুম্বা রোস্ট আর বিরিয়ানি। একটি চোঙাদার গ্রামাফোনে বাজছে "ইয়ে কুরবা আ আ আন"।

বড়োর সম্বল বোধহয় মাত্র ওই একখানাই রেকর্ড , তারই পুণরাবৃত্তি হয়ে চলেছে বার বার। দাওয়ার নীচে রাস্তার ধারে খানদুই কাঠের বেঞ্চি পাতা, সেই বেঞ্চিতে বসে আফগানিস্তান থেকে আগত সদাগরেরা চা মাংস রুটি খাচ্ছে আর মাথা নেড়ে নেড়ে ইয়ে কুরব আ আ আন উপভোগ করছে।

গ্রামে ঢুকবার যে চারটি পথ আছে সেগুলির প্রত্যেকটির মুখেই এই একই ধরণের রেস্তোরাঁ আর সেখানে উদয়াস্ত বেজে চলেছে ঐ একই ধরণের গান ।

কাবুল আর জালালাবাদের দিক থেকে যে সব সদাগরেরা আসে, তারা খাইবার পাস দিয়ে সোজা পেশওয়ার যায়, কিন্তু গজনির দিক থেকে যারা আসে, তারা পেওয়াড় পাস অতিক্রম করে ওয়াজিরিস্তানের কুরাম উপত্যকা হয়ে কোহাট আর সেখান থেকে দর্রা গিরিবর্ত্ম হয়ে পেশওয়ার যায়। গজনির সদাগরেরা তাদের কাফিলা নিয়ে পেশওয়ার যাবার পথে কয়েক দিন থাল গ্রামে থেকে যায়। এখানে তাদের পণ্য বিশেষ বিক্রি হয় না, খান কয়েক পার্শিয়ান কার্পেট, পোস্তিন (ভেড়ার ছালের কোট ), আর বড় বড় দু চার বস্তা হিং বা শুকনো ফল হয়ত বিক্রি হয়। থাল গ্রামে ডেরা করে এরা সাধারণত পথশ্রান্তি দূর করা এবং মুদ্রা বিনিময়ের জন্য। ভারতে ঢুকবার পথে থাল গ্রাম থেকে তারা বৃটিশ ভারতীয় টাকা নিয়ে নেয় আফগানি টাকার বিনিময়ে। এই টাকা বিনিময়ের লাভজনক ব্যাবসা সম্পূর্ণভাবে থাকত গ্রামের হিন্দুদের হাতে। মুসলমান পাখতুনরা চা রুটি আর গোস্ত বিক্রি করেই সন্তুষ্ট থাকত।

ক্রমশ<br>ছবিঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য<br>ফটোগ্রাফঃ সংকলকের সৌজন্যে ও অনুমতিক্রমে।

।১৯।

দুটো কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল আমার। জোরাকে খুঁজেপেতে বের করা, আর কুমল সিং-এর হুন্ডিগুলোর একটা সদগতি করা। প্রথমটার ব্যাপারে আমার বিশেষ আশা ছিল না। তাদের বাড়ির সামনে সবসময়ের জন্য আমি একজন চর লাগিয়ে রেখেছিলাম। নিজেও মধ্যেমধ্যেই সেদিকে পাক মেরে এসেছি। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। সে নিয়ে আমার মনের মধ্যে দুঃখ ছিল খুব, কিন্তু কাজকর্মের উত্তেজনায় সে দুঃখ খুব বেশি ভারি ঠেকছিল না আমার কাছে।

সরফরাজদের উদ্ধারের পরদিন দলের মাথারা মিলে একটা আলোচনা করে ঠিক করা হল, তার পরের দু'তিনদিন ধরে গোটা দলটা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে শহর ছেড়ে বিসর-এর রাস্তা ধরবে।পথে পুটুনচেরুতে গিয়ে সবাই ফের একত্র হওয়া যাবে।

আমার হাতে সময় খুব কমই ছিল। অতএব পরদিন দুপুরে বদ্রীনাথ আর আমি দুজনে মিলে হুন্ডিগুলো নিয়ে চারমিনারের চত্বরে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি আগের রাতের দুঃসাহসিক ডাকাতি নিয়ে গোটা শহরে গুজবের বন্যা চলছে। ডাকাতির বহু সাক্ষি হাজির হয়ে রোমহর্ষক সব বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। তার কোনোটার সঙ্গে কোনোটার কোন মিল নেই। সেই নিয়ে মজা হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু আমাদের হাতে তখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই বেশি। একটা ভিখিরির মত দেখতে লোক পাগড়িতে কলম আর কোমরে কালির দোয়াত নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, তাকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "গুজরাটি পড়তে পারো?"

"পারি মানে হুজুর? ও তো আমার নিজের ভাষা। লিখতেও পারি। হুকুম করুন।"

"এই হুন্ডিটা পড়ে দাও দেখি,"বলে আমি একটা হুন্ডি তার দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

সে কাগজটা পড়েটড়ে বলল, "এ হুজুর আপনার নামে, মানে কুমল খানের নামে নান্দের-এর বিহারি মলের দস্তখত করা হুন্ডি। বেগম বাজারের গোপালচাঁদ-বিষ্ণুচাঁদের গদিতে গেলে টাকা পেয়ে যাবেন। চারশো টাকা।"

"কাগজটা ঠিকঠাক আছে তো?"

সে আবার সবটা উল্টেপাল্টে দেখে বলে, "মনে তো হয়।তা হুজুরের কি কোন সন্দেহ হচ্ছে?"

"ভগবানের দোহাই, এমন কথাটি বোল না। আমার কাছে এরকম আরো বেশ কিছু হুন্ডি আছে। জাল বেরোলে আমরা বেঘোরে মারা পড়ব," আমি উত্তেজিত গলায় বললাম।

"এটা তো ঠিকই আছে, কই বাকিগুলো দেখান দেখি।"

সবকটা হুন্ডি উল্টেপাল্টে দেখে সে মাথা নেড়ে বলল, "নাঃ ঠিকই আছে সব। আপনার চিন্তা নেই। গিয়ে দেখালেই টাকা পেয়ে যাবেন।"

"যে গদির নামে কাটা সেটা কি সবাই চেনেজানে?"

"হ্যাঁ। বড়ো বড়ো গদির মত অত নামডাক না হলেও হুন্ডির বাজারে এদের বেশ নামডাক আছে। তা হুজুর কি সেখানে যাবেন? আমি নিয়ে যেতে পারি।"

"হ্যাঁ। চলো। কাজ হয়ে গেলে ভালো বখশিস পাবে।"

চারমিনার থেকে দিল্লি গেট দিয়ে বের হয়ে আমরা মূল শহরের বাইরে এসে পড়লাম। তারপর নদী পার হয়ে যে জায়গাটায় এলাম সেটা বেশ সম্পন্ন শহরতলী এলাকা। গোপালচাঁদ-বিষ্ণুচাঁদের গদিটা এইখানেই। গোটা রাস্তাটায় শুধু বড়ো বড়ো শস্যের বস্তা আর মাল বওয়া গরুর গাড়ির ভিড়।

মালপত্র ওজন করবার হাঁকডাক, জন্তুদের আওয়াজ, আরো হাজারো শব্দে গোটা এলাকাটা সরগরম। সেই ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে কোনোমতে আমরা

গোপালচাঁদ-বিষ্ণুচাঁদের গদিতে এসে পৌঁছোলাম। বাড়িটা বেশ বড়োসড়ো। রঙঢঙ দেখে বোঝা যায় মালিকের পয়সা আছে। ভেতরে গিয়ে গদির দুই অংশীদারের মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি তার সামনে একখানা হুন্ডি ধরে দিলাম। সে পাগড়ির থেকে একটা চশমা বের করে এনে খুব খুঁটিয়ে হুন্ডিটা বারংবার দেখল। দেখতে দেখতে মাঝেমাঝেই চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকেও সন্দেহের চোখে দেখে নিচ্ছিল সে। একা থাকলে হয়ত এতে আমার খানিক অস্বস্তি হতে পারতো। কিন্তু

আমার সঙ্গে তখন দুজন লোক। সাথে অস্ত্রও আছে। অতএব ওসব তাকানোটাকানোতে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিলাম না। খানিক বাদে সাহুকার বলে, "পাশের ঘরে আসুন একবার। আপনার সঙ্গে ক'টা কথা ছিল।"

পাশের ঘরে যেতেই সে উত্তেজিত গলায় আমায় জিজ্ঞাসা করল, "এই হুন্ডি তুমি কোথায় পেলে? তুমি কে?"

"তাতে আপনার দরকার কী বলুন তো?হুন্ডিটা যে নকল নয় সে তো দেখেছেন। এরকম আরো অনেকগুলো আছে আমার কাছে। এই দেখুন," বলে আমি তাঁকে বাকি হুন্ডিগুলো বের করে দেখিয়ে বললাম, "এখন আপনার কাজ হুন্ডি নিয়ে আমার টাকা আমায় বুঝিয়ে দেয়া। সেটাই করুন দেখি!"

"আশ্চর্য ব্যাপার। এ হুন্ডি অন্য লোকের হাতে এল কী করে? ওহে ছোকরা, এ হুন্ডি ভাঙাবার এখতিয়ার তোমায় দিল কে?"

"যাঁর নামে হুন্ডি কাটা হয়েছে তিনিই দিয়েছেন।"

"তাঁর নাম কী? যে সাহুকার হুন্ডি কেটেছে তার নাম কী?"

"সৈয়দ মুহম্মদ আলি, ওরফে কুমল খান। সাহুকারের নাম বিহারীমল।"

"সে নাম তো তুমি যে কারো থেকে জেনে যেতেই পারো। তুমি যে জোচ্চোর নও সে কথা আমি বুঝবো কী করে বলো তো?"

"এই আংটিটা থেকে বোধ হয় আপনার কাছে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হবে। পরিচয় হিসেবে ওঁর শিলমোহরের আংটিটা সৈয়দসাহেব আমার হাতে পাঠিয়েছেন," বলতে বলতে আমি সৈয়দের আঙুল থেকে খুলে আনা সেই আংটিটা বের করে সাহুকারের হাতে দিলাম।

আংটিটা ভালো করে দেখে নিয়ে সাহুকার ভেতরে গিয়ে একগোছা কাগজ নিয়ে ফিরে এলো। তারপর তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে একজায়গায় থেমে গিয়ে বলে, "পেয়েছি। সৈয়দ মহম্মদ আলির শিলমোহর। এখনো ভেবে বলো, তোমার এই আংটিটার ছাপ নিয়ে মেলাবো, না মানে মানে কেটে পড়বে? যদি না মেলে তাহলে তো বুঝতেই পারছো!"

শিলমোহরের ছাপটা একঝলক দেখেই আমার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গিয়েছিলো। আংটির নকশাটা আমি আগেও খুঁটিয়ে দেখেছি। কাগজের শিলমোহরের ছাপটা তার সঙ্গে একেবারে একরকম। আমি বেশ সাহসী গলায় বললাম, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। ছাপ মেরে দেখে নিন ভালো করে।"

কাগজের ওপরে আংটিটা দিয়ে ছাপ মেরে ভালো করে মিলিয়ে দেখে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সাহুকারের। বলে, "নাঃ ঠিক মোহর নিয়েই এসছো তুমি। সৈয়দ সাহেবের আসল আর ছদ্মনাম দুটোও ঠিকঠাক বলেছো। কিন্তু এই হুন্ডি তো ওঁর নিজের হাতে এসে ভাঙানোর কথা। নিজে না এসে তোমায় পাঠালেন যে?"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, "সৈয়দ সাহেবকে আপনি ভালোই চেনে বোঝা যাচ্ছে। কাজেই তিনি কেন আসতে সশরীরে পারছেন না সেটাও আপনার বোঝা উচিৎ। উপস্থিত তিনি আত্মগোপন করে আছেন। নিরমূলের খাজনা নিয়ে সরকারী ঝামেলা কেটে গেলে নিজেই ফিরে আসবেন। আমি ওঁর গোপন দূত।"

"সৈয়দসাহেব এখন আছেন কোথায়?"

আমি মাথা নাড়লাম, "সে কথা আমি জানাতে বাধ্য নই। এবারে টাকা দিতে হলে দিন, নাহলে কাগজে লিখে দিন টাকা দিতে পারবেন না। আমি সৈয়দহসাহেবকে গিয়ে দেখিয়ে দেবো।"

"আরে ছি ছি, তাই কি বলেছি?" সাহুকার মাথা নাড়ল, "টাকা আমি এক্ষুনি দিচ্ছি," এই বলে একজন কেরানিকে ডাকিয়ে কাগজপত্রের সব কাজ তাড়াতাড়ি মিটিয়ে আমায় সব টাকা বুঝিয়ে দিল সাহুকার।

ফেরার পথে আমরা তিনজন টাকার থলেগুলো ভাগভাগ করে বয়ে আনছিলাম। যে লোকটা আমাদের সাহুকারের গদিতে নিয়ে গিয়েছিলো, সে-ও একটু বেশি বখশিসের লোভে হাজার দুয়েক টাকার একটা থলে নিজে বইছিল আমাদের সঙ্গে। খানিকদূর এসে আমি বদ্রীনাথকে রামাসি (ঠগিদের নিজস্ব ভাষা) তে বললাম, "সাহুকার ব্যবসায়ী মানুষ। সে কাউকে কিছু বলবে না। কিন্তু এই লোকটা একজন সাক্ষি হিসেবে থেকে যাওয়াটা ভালো ব্যাপার নয়।"

"ঠিক আছে," বদ্রীনাথ বলল, "খানিক এগিয়ে একটা গভীর কুয়ো আছে। সকালে ওখানে আমি স্নানও করেছি। মেরে ওতে ফেলে দিলেই হবে।"

বললাম, "তুমি তাহলে ঠিক জায়গায় এলে ঝিরনিটা দিয়ে দিও।"

কাঁধে টাকার থলে থাকায় লোকটার গলায় রুমাল জড়াতে একটু অসুবিধে হয়েছিল আমার। ফলে সঙ্গে সঙ্গে না মরে সে একটু ঝটাপটিও করেছিল। কিন্তু শেষমেষ মারাই পড়ল সে। একটা বড়ো পাথর তার কাপড়ের সাথে বেঁধে আমরা শরীরটাকে কুয়োয় ফেলে দিয়ে ফিরে এলাম। মজার ব্যাপার হল, লোকটা যতই নিজেকে গরিব টরিব বলুক, তার গেঁজে থেকে আমরা তেতাল্লিশ টাকা পেয়েছিলাম।

ঘাঁটিতে ফিরে বাবার হাতে টাকাগুলো দিতে সে এত খুশি হল যে তক্ষুণি তার থেকে পাঁচশ টাকা বের করে আমায় পুরস্কার দিয়ে দিল।

টাকাটা হাতে পেয়ে আমি ভাবলাম একবার জোরাদের বাড়ির দিকে ঘুরে আসা যাক। শহর ছেড়ে যাবার আগে একটা শেষ চেষ্টা করা্। যদি কোন ফল হয়।

জোরাদের বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি বাড়ির দরজা খোলা। দেখে আমি সটান কাউকে কিছু না বলে ভেতরে ঢুকে এলাম। ঢুকে দেখি জিনত আর তার মা বসে আছে। জোরার দেখা নেই। আমায় ঢুকে আসতে এখে সে বুড়ি তড়িঘড়ি উঠে এসে আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, "এই যে, সেই মহরমের রাতের পরে আর দেখা নেই যে বড়ো!"

আমি এত অবাক হয়ে গেলাম যে খানিকক্ষণ মুখে কথা সরল না আমার। তারপর একটু ইতস্তত করে বলে ফেললাম, "না মানে শহরের বাইরে একটু কাজ পড়ে গেছিল। তা জোরাকে দেখছিনা তো--"

"এই দেখো বোকা ছেলে। এখনো সেই জোরার ভূত তোমার মাথা থেকে নামল না," বুড়ি একগাল হেসে বলল, তারপর বলে, "কেন, এই যে আমার জিনত! এ কি কম সুন্দরী নাকি?তার ওপর তোমার প্রেমে সেদিন রাত থেকেই একেবারে পাগল হয়ে আছে বেচারা। ওই বা আমার কম কিসে?"

বললাম, "দেখুন বুড়িমা, জিনত আমায় ভালোবাসে সেতো আমার পক্ষে ভারি সম্মানের কথা। কিন্তু আমি তো জোরাকে বিয়ে করতে চাই, তাই বলছিলাম--"

“বুঝলাম।তুমি কোন ছমবেশী রাজপুত্র-টুত্রই হবে।জোরার দিকে নজর পড়েছে, তাকে যে কোন মূল্যে আদায় করে নিতেই এসেছ। তোমায় পরীক্ষা করেছিলাম বাবা সেদিন। কিছু মনে কোর না। তা কত খরচ করতে পারবে তুমি আমার জোরার জন্য?”

বললাম, “নগদ পাঁচশো টাকা দেবো। রাজি থাকেন তো আমি এক্ষুনি গিয়ে টাকা আর মৌলবি দু-ই নিয়ে আসি গিয়ে।”

শুইনে বুড়ি আর তার মেয়ে হেসেই কূল পায়না। বলে, “এ ছোকরা পাগল না মাতাল?”

আমি রেগে গিয়ে বললাম, “ওসব বাজে কথা বোলনা বলছি।”

তাতে তারা আরো জোরে জোরে হেসে বলল, “পাগল বা মাতাল না হলে কেউ পাঁচশো টাকা দিয়ে জোরার মত সুন্দরীকে বিয়ে করতে চায়?ওর দশগুণের দশগুণ দাম দিলেও তো ওই রূপের জন্য কম পড়বে। সে টাকা আছে তোমার কাছে?”

এইবারে আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। বললাম, “তোরা দেখছি দুটো সাক্ষাত শয়তানের বাচ্চা! মেয়েটাকে আমি কত কষ্ট করে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনলাম। তার বদলে সেদিন আমায় কুকুরের মত তাড়ালি, আর আজ আমায় নিয়ে রঙ্গরসিকতা করছিস?”

বুড়ি উল্টো রাগ দেখিয়ে বলে, “বেশ করেছি তাড়িয়েছি। আবার তাড়াচ্ছি এখন। ভালো কথায় ভাগ এখান থেকে নইলে লোক ডেকে এমন মার খাওয়াবো যে জন্মে ভুলবি না। ব্যাটা কুকুরের বাচ্চা কুকুর! ”

আমি আঙুল তুলে বললাম, “খবরদার আমার বাবার নামে কিছু বলবে না।”

“বলব না মানে? সে পোড়ারমুখোর মুখে আগুন।”

আমি আর থাকতে না পেরে দৌড়ে গিয়ে আমার চপ্পলটা হাতে তুলে এনে বললাম, “আর একটা কথা বললে জুতোপেটা করব কিন্তু- - ”

জবাবে বুড়ির গালাগালি আরো বেড়ে গেল। এইবারে বেজায় রেগে গিয়ে আমি তার চুলের মুঠি ধরে মুখে থুতু দিয়ে দু গালে বেশ গোটাকয় জুতোর ঘা মারলাম। তাই দেখে জিনত গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করে দিল। বলে, “কাসিম ভাই, মহম্মদ আলি তোমরা কোথায় গেলে গো! বাড়িতে চোর ঢুকেছে। খুন খুন—তলোয়ার নিয়ে এসো—বাঁচাও—বাঁচাও- ”

বুড়িকে বেশ করে জুতোপেটা করে আমার মাথাটা একটু ঠান্ডা হয়েছিলো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়েই দেখি খোলা তলোয়ার হাতে একটা লোক এগিয়ে আসছে সেদিকে। আমায় দেখেই তলোয়ার উঁচিয়ে সে কোপ মারবার তাল করল। আমি সটান তার হাতটা চেপে ধরে ছুঁড়ে নিচের দিকে ফেলে দিলাম। তারপর তার ওপর দিয়েই বিরাট একটা লাফ মেরে রাস্তায় এসে নেমে ছুট দিলাম। যেতে যেতে আপনমনেই হাসছিলাম আমি। জোরাকে পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু বদ্রীনাথকে বলবার মত মোক্ষম একটা গল্প তো পাওয়া গেল। জুতোপেটার গল্প শুনে বদ্রীনাথ কেমন হাসবে সেটা আমি মনশ্চক্ষে সেখান থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম।

ফেরার পথে একটা বড়ো বাড়ির সদর দরজার পাশ দিয়ে আসছি এমন সময় হঠাৎ শুনি একটি মেয়ে ভারি মিঠে গলায় ডাকছে, "ভগবানের দোহাই, আমার মালকিনকে বাঁচান।"

"এ দেখি নতুন অভিযান শুরু হল," মনে মনে এই ভেবে আমি তার দিকে ফিরে বললাম, "তুমি কে?"

"আমি যেই হই তাতে আপনার দরকার নেই। এখান দিয়ে আপনি আপনার দুই বন্ধুকে নিয়ে একবার হেঁটে যাচ্ছিলেন, না? তখন বিকেল বিকেল হবে।"

"হ্যাঁ। তাতে হল কী?"

"আমার চাঁদের চেয়েও সুন্দরী মালকিন সে সময় আপনাকে দেখে ইস্তক একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে।"

"তা আমি তার কী করতে পারি?"

"পারেন। আপনিই পারেন। চলুন তারে সঙ্গে দেখা করবেন। আমি আপনাকে নিয়ে যাব।"

আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। শহরেবাজারে এজাতীয় ঠগ-জোচ্চোরের অভাব নেই। সুযোগ পেলে সর্বস্বান্ত করে দেবে। কিন্তু তারপর নিজেকেই বললাম, একটু সাহস করে ব্যাপারটা দেখলে দোষ কী? কপাল হঠাৎ করে খুলেও যেতে তো পারে! মেয়েটাকে বললাম, "শোন হে। এই আমার সঙ্গের হাতিয়ার দেখছো তো? কোন বদ মতলবে আমায় ফাঁসাবার ফন্দি করে থাকো যদি তাতে তোমারই বিপদ হবে এই বলে রাখলাম।"

"কোন ভয় নেই। বাড়ির মালিক সব লোকজন নিয়ে বাইরে গিয়েছেন। বাড়িতে মালকিনের সঙ্গে আমরা কয়েকজন দাসী আর দুতিনটে বুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই। "

"চলো দেখি তবে, " বলে আমি তার পিছুপিছু চললাম।

সদর পেরিয়ে একটা উঠোনের অন্যপাড়ে সে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা মেয়ে বসে ছিল। তার সাথে বসেছিল এক বুড়ি। মেয়েটার গায়ে দামি পোশাক। দেখতেও ভারি সুন্দর। কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেখেই সে তাড়াতাড়ি নিজের মুখখানা ঢেকে ফেলে বলল, "ইনিই কি সেই?"

"হ্যাঁ।" আমি জবাব দিলাম, "আপনি একবার মুখের ওড়নাটা সরিয়ে আমায় আর একবার দেখতে দেন তো আমার জীবন ধন্য হয়।"

শুনে সে লজ্জা পেয়ে মৃদু বলে, "আ-আপনি চলে যান--"

"বলছেন যখন তখন চলে তো যাবোই, কিন্তু তার আগে যদি আর মাত্র একবার ওই মুখটা দেখতে দিতেন তাহলে--"

বুড়ি দেখি আমায় ইশারায় মেয়েটার মুখের ওড়না সরিয়ে দিতে বলছে।আমি উৎসাহ পেয়ে এগিয়ে এসে তার মুখ থেকে ওড়নাটা সরিয়ে নিলাম। সে বিশেষ বাধা দিল না। ওড়না সরিয়ে নিতে হরিণের চোখের মত দুটি বড়োবড়ো ভীরু চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি এগিয়ে এসে তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলাম।

বুড়ি তাই দেখে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে আড়ালে চলে যাচ্ছিল। তাই দেখে মেয়েটা একটু ভয় পেয়েছে মনে হল। তার কাছে এসে বসে বললাম, “আমাকে ভয় পেয়োনা।”

মেয়েটা তখন আস্তে আস্তে বলে, “বিকেলে আপনাকে প্রথম দেখেই আমার খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। বুড়ি দাই আমার দশা দেখে বলল আপনার জন্য নজর রাখবে। ঈশ্বরের অসীম দয়া যে সে আপনাকে খুঁজে আনতে পেরেছে।”

আমি জবাব দিলাম, “আমি তোমার দাস। বলো তোমার জন্য কী করতে পারি?”

সে বলল, “আমি গরিব ঘরের মেয়ে। রূপ দেখে আমায় আমার বর কিনে এনে বিবি বানিয়েছিল। লোকটা বুড়ো। হৃদয়হীন। মাঝেমাঝেই আমায় ধরে জুতোপেটা করে। আর সহ্য করতে না পেরে আমি আজ ঠিক করেছিলাম যে ওর বাড়ি ছেড়ে পালাব। তখনই ঈশ্বর আপনাকে দেখিয়ে দিলেন। এবার বলুন, আমাকে আপনি উদ্ধার করবেন

তো? না করলে কালকের সূর্য আমার মৃতদেহ দেখবে।”

দেখলাম এই সুযোগ। তার হাত ধরে বললাম, “আমার সঙ্গে এক্ষুণি পালাতে পারবে? তোমায় আমি বহু দূরের দেশে নিয়ে চলে যাবো। রাজি?”

“এ- এক্ষুণি?”

“হ্যাঁ। রাজি থাকলে বল।”

“আমার ভয় লাগে হুজুর। যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে এমন ব্যাপারে মেয়েমানুষের কপালে যে কী দুর্ভোগ হয় সে তো আপনি জানেন! ”

“তাহলে আমি আর কী করতে পারি বলো? এ শহরে আমি নতুন। অন্য কোন বুদ্ধি আমি তোমাকে দেব কী করে?”

সে একটু ভেবে মাথা নেড়ে বলল, “কুলুকে ডাকি। যা ভালো বোঝে সেইমত বন্দোবস্ত করুক।” তারপর মুখ ঘুরিয়ে ডাকল, “কুলু?”

তার বুড়ি ধাই কাছাকাছিই কোথাও লুকিয়ে ছিল বোধ হয়। ডাকতে না ডাকতেই দেখি চলে এসেছে। বলে, "হুকুম করুন।"

বললাম, "শোনো। আমি এ শহরে নতুন। আজই আমার শহর ছেড়ে হিন্দোস্তানে ফিরে যাবার কথা। তোমার মালকিনকে আমি উদ্ধার করে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।"

"সেকী? আজিমা তুমি কি পাগল হলে? চেনা নেই, শোনা নেই কোথাকার কে একটা লোক, আমি ভেবেছিলাম তার সাথে দুটি মিঠে কথা বলে এই পাষাণপুরীতে তোমার প্রাণ জুড়োবে, তাই ডেকে এনে জুটিয়ে দিলাম। কিন্তু তাই বলে—না। এ আমি পারবো না। আমার মত নেই।"

আমি বুড়ির দিকে ঘুরে বললাম, "শুনুন মা। আমি ঠগ জোচ্চোর নই। আমার বাবা ব্যবসাদার। টাকাপয়সা ভালোই আছে। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে। কাল আমরা এখান থেকে চলে দেশে ফিরে যাবো। আপনার মালকিনকে আমি সুখে রাখবো, কথা দিলাম। আপনি সব ব্যবস্থা করে দিন, আমি আপনাকে একশো টাকা পুরস্কার দেবো।"

আজিমা হঠাৎ উঠে বুড়ির পা জড়িয়ে ধরল। বলে, "তুমি তো আমায় ছোটোবেলা থেকে দেখছ কুলু। আমায় প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসো। বদমাশটা আমায় যখন জুতোপেটা করে তুমি দেখনি? যখন বললাম এ বাড়ি থেকে চলে যাবো, তুমি আমায় সাহায্য করবে বলে কসম খাও নি?"

"কিন্তু আমি বুড়ি মানুষ, আমি কী করে- - "

হঠাৎ আজিমা বলল, "আচ্ছা কুলু, গেলবার যখন আমার অসুখ হয়েছিল, তখন তুমি হুসেন শা ওয়ালির দরগায় নজরানা দেবার মানত করেছিলে না?"

বুড়ির চোখ ঝলসে উঠল। বলে, "ঠিক ঠিক। ভুলেই গিয়েছিলাম। এই তো রাস্তা বেরিয়েছে। সাহেব, আপনি কাল দুপুরে ওই দরগায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?"

বললাম, "পারবো। সব যদি ঠিকঠাকভাবে হয় তাহলে, একশো বলেছিলাম, তার বদলে দেড়শো টাকা নজরানা দেবো আমি আপনাকে মা।"

"ঈশ্বর তোমার ভালো করুন বাবা। তাঁর ইচ্ছাতে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো, " বুড়ি জবাব দিল।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, "আজ তবে আমি যাই। নইলে বাবা দুশ্চিন্তা করবেন। আর একটা দিন কষ্ট করো আজিমা। তারপর ঈশ্বর চাইলে তোমায় দুনিয়ার সমস্ত সুখ এনে দেবার জিম্মা নিলাম আমি।"

হঠাৎ আজিমা শান্ত গলায় বলল, "কাল আপনি ঠিক আসবেন তো? নাহলে কিন্তু আমি বিষ খেয়ে- "

বুড়ি তাকে তাড়াতাড়ি চুপ করিয়ে দিয়ে বলে, "সব ঠিক হয়ে যাবে, " তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "নার্গিস বিশ্বস্ত মানুষ। সে জেগে আছে। বাকিরা ঘুমিয়ে। তোমার আসার খবর তারা কেউ পায়নি। নার্গিস তোমাকে পথ দেখিয়ে বাইরে পৌঁছে দেবে এখন।"

বুড়ির ডাক শুনে যে মেয়েটা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সে-ই আবার এসে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে বাইরে রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে এল। চলে যাবার সময়

মিনতিভরা গলায় বলে, "তোমার বাপমায়ের কিরে সাহেব, আমার মালকিনকে তুমি ভালো রেখো।"

"ভেবো না বহিন। তোমার মালকিন এখন থেকে আমারও জানমালের মালকিন হয়ে রাজত্ব করবে," এই বলে তাকে নিশ্চিন্ত করে আমি ফেরার পথ ধরলাম।

ফিরে এসে দেখি বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও তার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এলে তো! বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে সময় কাটতে লাগলো আমার। বারবার মনে হয়, কেন আজিমাকে রেখে এলাম এইভাবে। কেন আজ রাত্রেই সঙ্গে করে নিয়ে চলে এলাম না। যদি তার বর রাত্রে ফিরে আসে—যদি—

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে চোখদুটো একটু লেগে এসেছিলো এমন সময় বাবার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি বলছে, "তোর ব্যাপারটা কী আমীর? ঘুমের মধ্যে ছটফট করছিস। মধ্যে মধ্যে আজিমা আজিমা বলে চিৎকার করে উঠছিস! আজিমাটা কে? কোন বুনিজ পেয়েছিলি নাকি কাল রাতে?"

আমাদের রামাসি ভাষায় ঠগির শিকারকে বলে বুনিজ। আজিমা আমার বুনিজ হয়েছে ব্যাপারটা ভাবতেই গা শিউরে উঠল আমার। বললাম, "না না। ওসব কথা থাক এখন। আমি আগে গিয়ে নামাজ পড়ে নিই। দেরি হয়ে গেছে। তারপর সব কথা তোমায় গুছিয়ে বলব।"

নামাজটামাজ পড়া হলে আমি জোরার মাকে জুতোপেটা করবার গল্পটা বাবাকে বেশ গুছিয়ে বললাম প্রথমে। শুনে বাবা বেজায় আনন্দ পেলো। বলে, "ঠিক করেছিস। ওর ওই শাস্তি পাওয়াটাই উচিৎ ছিল।" কিন্তু তারপর আমি যখন আজিমার কথাটা খুলে বললাম, তখন দেখি বাবার মুখের ভাবের বদল হয়ে গেছে। সব কথা বলে আমি বাবার পায়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, "তুমি আপত্তি কোরোনা বাবা।"

বাবা মাথা নেড়ে চিন্তিত গলায় বলল, "যদ্দূর এগিয়েছিস তাতে পিছিয়ে আসার প্রশ্ন নেই। মেয়েটা তাহলে নির্ঘাৎ বিষ খাবে। সেইজন্যে আমি তোর এই কাজে সম্মতি দিলাম। আমার আর বেশিদিন নেই। মরার আগে তোকে সংসারী করে রেখে যেতে পারলে আমার আর কোন দুঃখ থাকবে না। হিন্দুস্তান ছাড়ার আগে সে চেষ্টা আমি করেছিলাম একবার, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। তুই মেয়েটাকে নিয়েই আয়। মেয়েটা তো খুব সুন্দরী বলছিস! ভালো। আর তার বুড়ি ধাইকে যত দিবি বলেছিস তার ওপরে আমার তরফে আরো পঞ্চাশটা টাকা দিস। সঙ্গে কিছু সোনা নিয়ে যা।"

"ঠিক আছে বাবা। তোমরা তো শহর ছেড়ে রওনা হয়ে যাচ্ছো। তাহলে আজ সন্ধেবেলা আমরা একেবারে পুটুনচেরুতে তোমার সঙ্গে এসে মিলবো।"

"ঠিক আছে। সঙ্গে কয়েকটা লোক নিয়ে যা বরং। কখন কী বিপদ আপদ হয়!"

"সে তো নিয়ে যাবোই। আমার ভরসার লোক কয়েকজন ঠিক করেই রেখেছি," বলতে বলতে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

খানিকক্ষণের মধ্যেই আমি আর আমার লোকজন তৈরি হয়ে নিলাম। আজিমার জন্য একটা বন্দোবস্ত করা দরকার ছিল। জোরাকে যদি পেয়ে যাই সেই আশায় আমি আগে থেকেই প্রতিবেশী এক গাড়িওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রেখে গাড়িটা বিদর অবধি ভাড়া নিয়েই রেখেছিলাম। গিয়ে তাকে ডেকে বললাম, "চলো ফজিল। সময় হয়েছে।"

সে মুচকি হেসে বলে, "মেয়েটা?"

"সে-ও তৈরি। এখন তাড়াতাড়ি চলো। নষ্ট করবার মত সময় একেবারে নেই হাতে।"

"কুড়িটা টাকা দেবেন। মায়ের হাতে দিয়ে যাব। গাড়ির মধ্যে গদিটদিগুলো ঝেরেঝুরে নিয়েই আমি আসছি। "

তার হাতে টাকাটা গুঁজে দিয়ে বললাম, "এইবারে তাড়াতাড়ি করো। আর দেরি নয়।"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ি তৈরি করে নিয়ে ফজিল বের হয়ে এসে বলে, "কোথায় যেতে হবে? শহরের মধ্যে কোথাও?" আমি বললাম, "না। হুসেন শা ওয়ালির দরগায় চলো তাড়াতাড়ি। আমরা ঘোড়ায় তোমার পেছন পেছন আসছি। জায়গাটা কি বেগমবাজার বা কারোয়ান হয়ে যেতে হয়?"

গাড়িতে উঠতে উঠতে সে জবাব দিলো, "দুটো জায়গাই পার হয়ে যেতে হবে আমাদের।"

"ওগুলো এড়িয়ে আর কোনো রাস্তা আছে?"

"আছে। তবে অনেকটা ঘুরপথ হবে কিন্তু। গোরাদের থাকবার জায়গার পাশ দিয়ে গিয়ে গোঁসা মহল পেরিয়ে যেতে হবে।"

"ও দিক দিয়েই চলো তবে।"

"বিসমিল্লা—"বলে হাঁক দিয়ে ফজিল তার বলদদুটোর লেজ মুড়িয়ে দিতেই তারা খটাখট করে দৌড় লাগালো গাড়ি নিয়ে।

ক্রমশ

ছবিঃ মৌসুমী

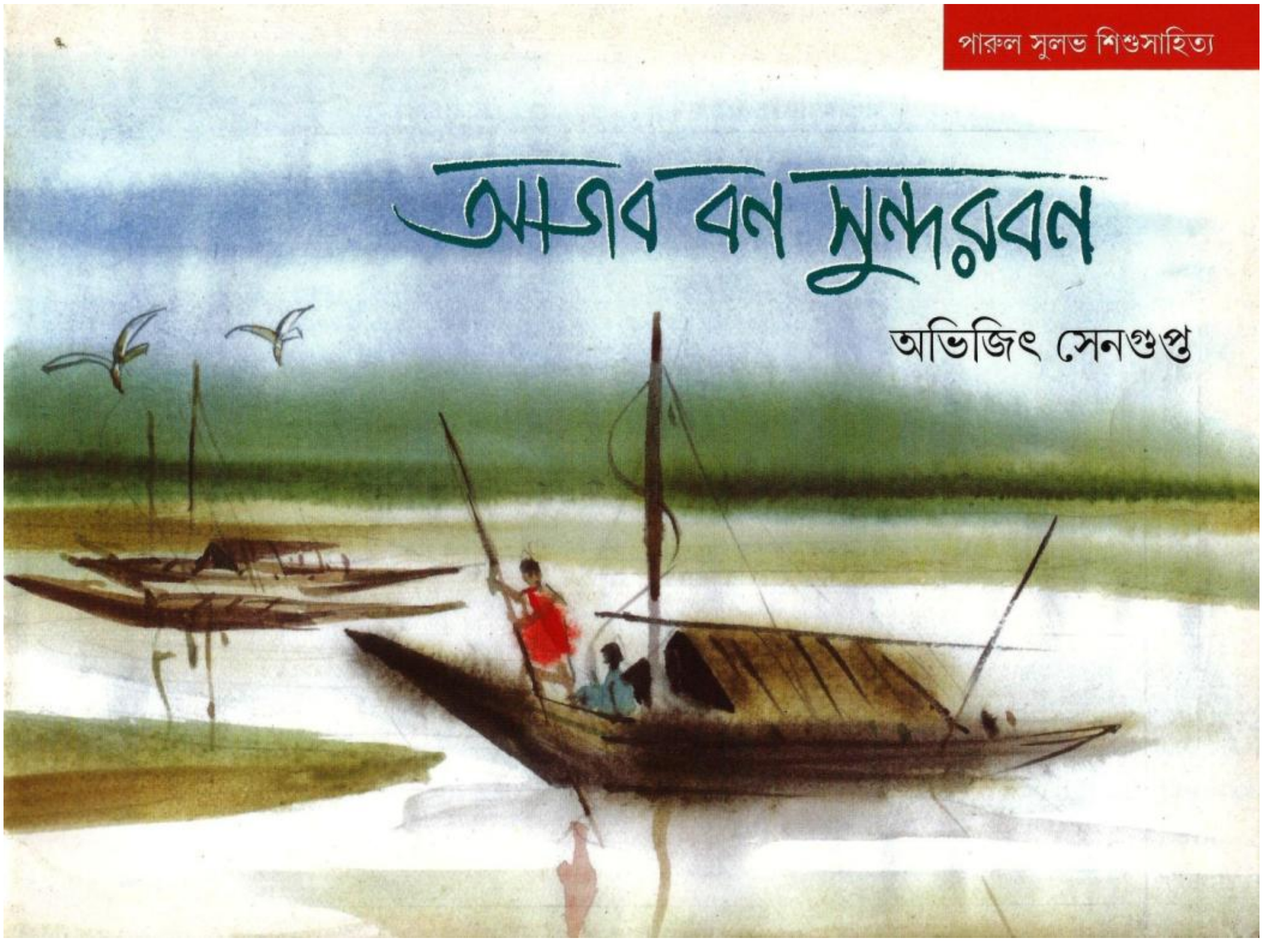


বছর দুই আগে লঞ্চ ভাড়া করে তিরিশজন মিলে হৈ হৈ করে বেড়াতে গেছিলাম সুন্দরবন। ক্যানিং থেকে রওনা দিয়ে, তিনদিন ধরে নদীর জল তোলপাড় করে ঘুরে, সকালে বিকেলে এলাহি খাওয়াদাওয়া করে গোসাবা, পাখিরালয়, ঝড়খালি, সজনেখালি, দোবাঁকি ইত্যাদি সুন্দরবনের নামকরা জায়গাগুলো সবই ঘুরে ফেললাম। বাঘ কি দেখেছিলাম? নাহ্। সবাই মিলে এত হৈচৈ করেছিলাম যে বাঘ কেন, ডাইনোসর থাকলে তারাও ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। বাঘ নয় নাই দেখলাম, সে আর ক'জনের ভাগ্যে থাকে, কিন্তু সুন্দরবন কি দেখেছিলাম? উত্তর হল – 'কচুপোড়া'।

সুন্দরবনের কিছুই যে দেখিনি, কিছুই যে বুঝিনি, সেটা বুঝতে পারলাম ক'দিন পরে কলকাতা বইমেলা থেকে কেনা শ্রী অভিজিৎ সেনগুপ্তের লেখা 'আজব বন সুন্দরবন' বইটি পড়ে।

'সুন্দরবন বলতে আমরা সাধারণত বুঝি লোনাজল, খাঁড়ি, বাদাবন, বাঘ, কুমির আর যারা মধু ভাঙে, কাঠ কাটে তাদেরই। কিন্তু সুন্দরবন তো আর এটুকুই শুধু নয়, এর বাইরেও রয়ে গেছে এক অন্য সুন্দরবন যে- সুন্দরবন আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। সেখানে কতরকমের মানুষ, কত বিচিত্র কাণ্ড, ছোটোখাটো কত বিস্ময় –'

এ বইটা না পড়লে কল্পনাই করতে পারতাম না সেই মেয়েটির কথা, যে দড়ি দিয়ে বাঁধা ডালপালা আর পাতার বোঝা ভাসিয়ে শেষ কার্তিকের সন্ধ্যের অন্ধকারে ভয়ঙ্কর কুমির- কামটে ভরা  হিমঠান্ডা খাঁড়ি সাঁতরে নির্জন কাঁকড়ামারির চর থেকে অন্যপারে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

ডালপালা নিয়ে চলেছে কেন?

ওই দিয়ে যে ওদের রাতের রান্না হবে। ওদের তো কেরোসিন কেনার পয়সা নেই।

রাতের অন্ধকারে জোয়ারের জল ঠেলে কেন? দিনের বেলা কী করছিল?

বনবিভাগের আইন অনুযায়ী এই জঙ্গল থেকে ডালপালা বা কাঠ কাটা যে বারণ। যদি সরকারি লোকেদের নজরে পড়ে যায়! গাছ কাটলে মাটি আলগা হয়ে ধ্বসে যাবে, চর ডুবে যাবে।

কিন্তু, ডালপালার বোঝার ওপরে একটা দলামোচড়া করা কাপড় কিসের?

ওটা ওর পরনের কাপড়। ওর তো এই একটাই কাপড়। জলে ভিজে গেলে এই শীতের রাতে বেচারি পরবে কী?

বইটির পাতায় পাতায় এভাবেই পরিচয় হয় সুন্দরবনের এই অভাগা মানুষগুলোর সঙ্গে, আর তার ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে, যারা একে অপরকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছে এক অমোঘ বিপর্যয়ের দিকে।

জলের একেবারে ধার ঘেঁষে ঘেঁষে ঈষৎ বেগুনি রঙের আভা মেশানো সবুজ ঝোপগুলি দেখতে পাচ্ছ? কেমন মৌরিদানার মতো মোটা টসটসে পাতা। দেখলে মনে হয় বেশ রসালো পাতাগুলো। একে বলে লোনাশাক। দাঁত দিয়ে কাটলে লোনা রস বেরোয়। এই শাক রান্না করে খায় গ্রামের লোকেরা।

কেন? খেতে ভালো বলে?

খেতে ভালো বলে খায় তা নয়। কিন্তু কিছু খেয়ে তো এদের বাঁচতে হবে। এদের অনেকেরই না আছে কোনও জমিজমা, না জানে এরা কোনও হাতের কাজ। থাকার মধ্যে আছে দু'একটা খ্যাপলা জাল। মাছ না হয় নদীতে জাল দিয়ে ধরল, কিন্তু সে মাছ কী দিয়ে খাবে তারা? ভাতের জন্য তো চাল লাগবে, আর চাল কেনার পয়সা এদের নেই। অগত্যা ভাতের বিকল্প হিসেবে ওই লোনা শাকই ভাতের মতো ফুটিয়ে খায় তারা। দেখতে দেখতে নদীর পারে পারে লোনাশাকের ঝোপ সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। পেটের দায়ে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারছে এরা।

কেন? লোনাশাকের ঝোপ শেষ হয়ে গেলে কী হবে?

এই ছোটো লোনাগাছ, ধানীঘাস বা তোরার জঙ্গল জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে। নদীর জলের সঙ্গে নানা রকমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উদ্ভিদকণা বা প্রাণীকণা ভেসে এসে এসব ঝোপঝাড়ে জড়ো হয়। তার টানে আসে নানা জলজ পোকামাকড়, তার টানে নানারকম মাছ। সমুদ্রের বাগদা চিংড়ি এসব ঝোপঝাড়ে এসেই ডিম ছাড়ে, ডিম ফুটে বেরোয় ছোট ছোট বাচ্চা যাকে এদেশে বলে 'মীন'। এই মীন ধরে ভেড়িতে চালান দেওয়াও এখানকার মানুষের একটা জীবিকা। তাই, লোনাশাকের ঝোপ লোপ পেলে বাগদা চিংড়ি ডিম পাড়বে কোথায়? মাছেরাই বা তাদের খাবার পাবে কোথায়। তাদের সংখ্যাও তাই কমতে থাকবে।

এমনই কত কত অবাক করে দেওয়া তথ্য, ঘটনা, কতরকম মানুষ, কতরকম তাঁদের বেঁচে থাকা। আসন্ন শীতের পড়ন্ত বেলার নরম রোদে বিস্তীর্ণ নদীতে অলসভাবে ভেসে চলা নৌকোর মত অভিজিৎবাবুর শান্ত, স্নিগ্ধ গদ্যে লেখা এ বই পড়া এক অসাধারণ পাঠ- অভিজ্ঞতা। সঙ্গে শিল্পী যুধাজিৎ সেনগুপ্তের আঁকা পাতাজোড়া সব ছবি। যেখান থেকে পারো জোগাড় করে পড়ে ফেল। ঠকবে না।

তাপস মৌলিক

বইঃ আজব বন সুন্দরবন

লেখকঃ অভিজিৎ সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠাসংখ্যাঃ ৪৮

প্রকাশকঃ পারুল প্রকাশনী, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

দামঃ ৩০ টাকা

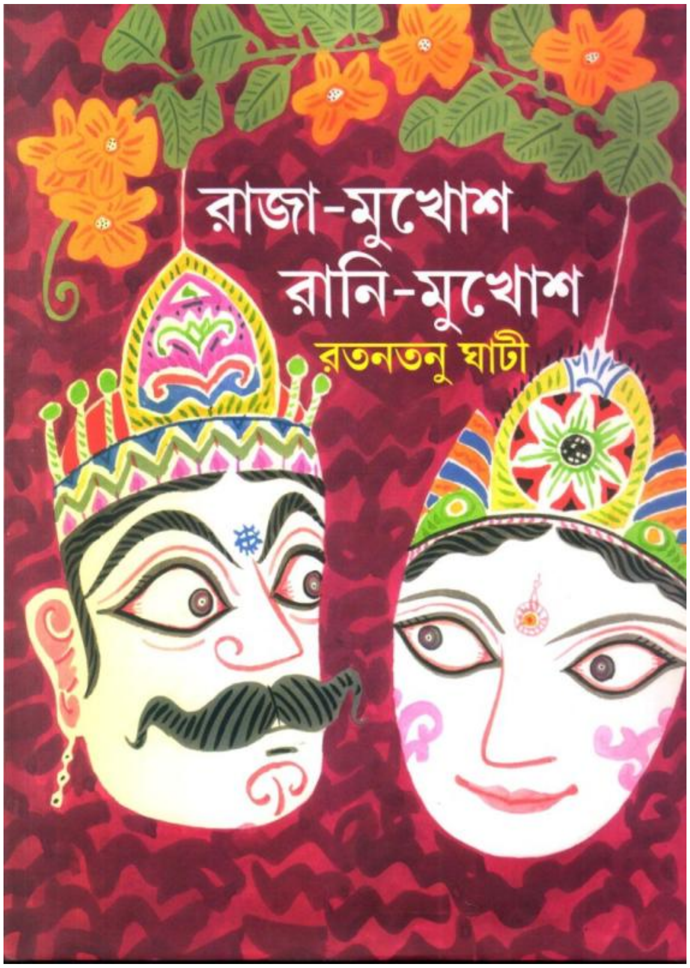


সে ছিল এক রাজা মুখোশ আর তার রানি মুখোশ। পাত্রমিত্র বাঘ- সিংহ- রাক্ষস- অসুর মুখোশদের নিয়ে তার বাস এক মুখোশ মিউজিয়ামে। একদিন রাজা খবর পেল একজন ছোট্ট মানুষ তাদের ছবি আঁকবে বসে আঁকো কম্পিটিশানে--

তারপর? গল্প বয়ে যায় তরতরিয়ে। গল্প? নাকি সত্যি গল্প? তবে কেমন বেশ একটা "*গল্প গল্প গন্ধ ভেসে আসছে যেন? ঠিক যেন বসন্তকালে লিচু ফুলের গন্ধের মতো*"।

এর মুখোশ, তার মুখোশ ছোটোদের মুখে বড়োদের মুখে নানান মুখোশের গল্প চলতে চলতেই মুখোশগুলো কেমন যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে পাতায় পাতায়—মুখোশেরা সুখদুঃখের কথার মধ্যেই কখনো বলে ওঠে, "*আর ওই লাল ফড়িংটা?ও একা অমন রঙ মেখে বাড়ি ফিরতে পারবে তো? নাকি পথ হারিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবে?ওকে আমাদের কেউ গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলে হত না?*"

গল্প চলতে চলতে ধীরে ধীরে খুলে যায় মুখোশদের বুকের কপাট। সেখানে বড়ো দুঃখ—মানুষেরা মিথ্যে মুখোশ পরে কেন তাদের অপমান করবে?

তারপর-- ?

জানতে হলে এক্ষুণি পড়ে ফেলতে হবে রতনতনু ঘাটীর লেখা একুশ শতকের রূপকথা—"রাজা- মুখোশ রানি- মুখোশ।"

একবার হাতে ধরলে আর ছাড়তে পারবে না। প্রমিস।

বইঃ রাজা- মুখোশ রানি- মুখোশ
লেখকঃ রতনতনু ঘাটী
প্রকাশকঃ উদয়ারুণ
৬ যদুভট্ট সরণি, কল- ৯
দামঃ ২৫০ টাকা

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

**পর্ব ১**

অনুবাদঃ মহাশ্বেতা

সে অনেককাল আগের কথা। এক বুড়ি আর তার নাতি মিলে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকত। দুনিয়ায় ওই এক নাতি ছাড়া কেউ ছিল না তার। কিন্তু বুড়ির বয়স হয়েছিল, আগের মত কাজ টাজ করতে পারত না আর সে। তাই তারা ছিলও বড় গরিব। এতই গরিব যে পরার মত ভাল কোন জামাকাপড়ও ছিল না তাদের কাছে। ছেলেটার গায়ের জামা বানানো হত তাদের হাতে বানানো ফাঁদে ধরা দেওয়া পাখির ছাল দিয়ে। তাই খেলতে বেরোলেই ছেলেটাকে দেখে অন্য বাচ্চারা চিৎকার করে উঠত, ওই পাখি এসে গেছে। এ পাখি তুই উড়ে যা! এই বলে তার জামা নিয়ে টানাটানি করত। বড়োরাও তখন তাকে নিয়ে হাসত।

খালি একজন লোকই ছেলেটার সাথে ভাল ব্যবহার করত আর অন্যদের হাসিঠাট্টার থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করত। সেই লোকটার নাম ছিল কিভ-ই-উং। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন লাভ হত না। হাসি ঠাট্টা চলতেই থাকত। ছেলেটা অনেক সময় কাঁদতে কাঁদতে তার ঠাকুমার কাছে ফিরে আসত। ঠাকুমা তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত তাকে সে আরও ছাল পেলেই আরেকটা নতুন জামা বানিয়ে দেবে।

নিজে বাইরে বেরোলে বুড়ি গ্রামের ছোটোবড়ো সবাইকে অনুরোধ করত যাতে তারা ছেলেটাকে ও'রকমভাবে না ক্ষেপায়। কিন্তু তাতে তারা বুড়িকে নিয়েই হাসাহাসি

শুরু করত। একদিন ব্যাপারটা বুড়ির সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে গেল। সে বাড়ি ফিরে নাতিকে বলল, "তোকে যারা ক্ষেপায়, আমি তাদের উচিৎ শাস্তি দেব, দেখবি। আমি এমন একটা জাদু করব না!" বুড়ির জাদু করবার ক্ষমতা ছিল কিন্তু সে কথা সে আর নাতি ছাড়া আর কেউ জানত না।

বাড়ির মেঝেয় বুড়ি একটুখানি জল ফেলে নাতিকে বলল, "এই জলটায় এসে দাঁড়িয়ে থাকো দাদুভাই। আর যতই ভয় লাগুক, এখান থেকে নড়বে না, কেমন?"

নাতি জলটায় এসে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা জায়গাটা ভয়ঙ্করভাবে কাঁপতে লাগল আর আস্তে আস্তে ছেলেটার পায়ের তলার মাটি ফেটে দু' ভাগ হয়ে গেল। আর সে সেই গর্তে পড়ে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই সে একটা সিল মাছ হয়ে গ্রামের কাছে সমুদ্র থেকে উঠে এল পাড়ে।

সমুদ্রতটে ওই সিল মাছটাকে কিছু লোক দেখতে পেল। ওরকম সুন্দর সিল মাছ এর আগে কেউ দেখে নি। চকচকে, টানটান চামড়া, গভীর দিঘীর মত দুটো চোখ। লোকগুলো অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল। তাদের ডাক শুনে গ্রামের সবাই এসে একত্র হল সেখানে। তারপর তাকে ধরতে যে যার নৌকো বেয়ে জড়ো হল সিলমাছটার চারধারে। কিন্তু মাছরূপী ছেলেটা ক্রমশ সাঁতরে পালাতে লাগল, ঠিক যেমনটা তার ঠাকুমা তাকে শিখিয়েছিল। আর লোকগুলোরও জেদ চেপে গেল। তারা তাকে অনুসরণ করতে থাকল। যখনই তাদের গতি একটু কমে যেত, বা তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ত, সিলমাছটা সাঁতরে নৌকোগুলোর তলা দিয়ে গিয়ে তাদের পেছনে ভেসে উঠে ঝাঁপাঝাঁপি করে জল ছেটাত। তাকে এত কাছে দেখে নৌকারোহীদের ক্লান্তি কেটে যেত, তাদের মনে হত এই যেন মাছটাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু যেই না ভাবা ওমনি সিলমাছ সাঁতরে গিয়ে তাদের সামনে অনেক দূরে গিয়ে মাথা তুলত। লোভে পড়ে লোকগুলোও থামত না, তার পিছু পিছু যেতেই থাকত। এরকম করতে করতে লোভের বশে তারা যে কখন গভীর সমুদ্রে চলে এল তা তাদের খেয়ালই রইল না। সমুদ্রতট আর সেখান থেকে দেখা যায় না। চারদিকে শুধু গাঢ় নীল জল।

এইবার ঠাকুমা শুরু করল তার জাদু। হঠাৎ করেই একটা ভীষণ দাপুটে ঠান্ডা হাওয়া বইতে লাগল। সমুদ্র গর্জে উঠল, বিশাল বড়ো বড়ো ঢেউ উঠতে লাগল। চারদিকে বাজ, বিদ্যুৎ। ঢেউয়ের ধাক্কাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাতলা কাঠের হালকা নৌকো উলটে গেল আর মানুষগুলো এক এক করে সব তলিয়ে গেল সমুদ্রের জলে। তাদের একজনও আর বেঁচে রইল না।

তাদের ডুবে যাওয়া মাত্রই ছেলেটা সিলমাছ থেকে আবার মানুষে পরিণত হল, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সে তীরে ফিরল সমুদ্রের জলের ওপর হেঁটে হেঁটে, অথচ তার পায়ের একটা আঙুলও ভিজল না। গ্রামে তখন তাকে বিরক্ত করার জন্য আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। সবাই প্রাণ দিয়েছিল মাঝসমুদ্রে।

কিভ-ই-উং, যে ছেলেটাকে কখনো জ্বালায়নি, সেও কিন্তু নৌকো চড়ে গেছিল সিল মাছ ধরতে, কিন্তু তার নৌকো সেই বীভৎস ঝড়েও উলটে পড়েনি। সে পাগলের মত দাঁড় বেয়ে, হাত পা ছুঁড়ে কোনও মতে ঠাকুমার জাদুর এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল, তাই প্রাণে বেঁচে গেছিল নয়তো অন্যদের সাথে সাথে তারও সলিলসমাধি হয়ে যেত।

*পরের সংখ্যায়- কিভ ই উং- এর অ্যাডভেঞ্চার*

*ইন্যুইটদের লোককথা*

বিশ্বের জানালা

# পামারস্টোন দ্বীপের কাহিনী

উমা ভট্টাচার্য

ইনি হলেন উইলিয়ম মার্স্টার্স। আর এই হ'ল পামারস্টোন দ্বীপ। অসীম, অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে, নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঝঞ্ঝাবহুল এলাকার মাঝখানে,এই দ্বীপটি মনে হয় পৃথিবীর শেষপ্রান্তে অবস্থিত। একমাত্র জলপথেই এখানে আসা যায়।

এই দ্বীপের কাহিনি শুরু করতে গেলে তাই এঁর গল্প দিয়েই শুরু করতে হবে। এই দুঃসাহসী, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষটি তাঁর পলিনেশিয়ান স্ত্রী, আর স্ত্রীর দুই বোনকে সঙ্গে নিয়ে পলিনেশিয়ার ম্যানোয়া দ্বীপ থেকে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুলাই এসে উঠেছিলেন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এই প্রত্যন্ত আর ক্ষুদ্র দ্বীপ পামারস্টোন- এ।

প্রায় হীরকাকৃতির এক প্রবাল প্রাচীরের উপরে অবস্থিত ৬টি ছোট দ্বীপের মধ্যে একটি হল পামারস্টোন। সবগুলি দ্বীপই মনুষ্যহীন, নির্জন ছিল। এখন একমাত্র পামারস্টোন দ্বীপেই আছে মনুষ্যবসতি, আর বসতি স্থাপনের পুরো কৃতিত্বটাই এই উইলিয়াম মার্স্টার্স- এর। তাঁর গল্প শুনতে শুনতেই জানা হয়ে যাবে নিঃসঙ্গ এই দ্বীপের ইতিহাস আর ভূগোল।

সভ্য জগতের স্পর্শ থেকে অনেক অনেক মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত সাদার্ন কুক আইল্যান্ডের নয়টি দ্বীপের মধ্যে একটি হচ্ছে পামারস্টোন,যেটি অপেক্ষাকৃত উন্নত দ্বীপ রারোটোঙ্গা্র ৩১০ মাইল উত্তর- পশ্চিমে অবস্থিত। ক্যাপ্টেন কুক ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় সমুদ্রাভিযানের সময় প্রথমে দ্বীপটি দেখতে পান। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তৃতীয়বারের অভিযানের সময় তিনি দ্বীপের কিছুটা কাছে যান, আর ব্রিটিশ নৌবিভাগের লর্ড পামারস্টোনের নামে দ্বীপটির নামকরণ করেন।

বিপদসঙ্কুল দ্বীপটির চারিপাশের উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জলরাশি দেখে কুক নিজে যে দ্বীপে কখনো পদার্পণ করেননি,  আর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত মানচিত্রে যে দ্বীপের সঠিক স্থানও চিহ্নিত হয়নি, সেই দ্বীপে এসে উঠলেন উইলিয়াম মার্সটার্স,তাও আবার তিন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে। তাহিতি দ্বীপ থেকে নৌকায় সে দ্বীপে আসতে তখন লাগতো ৮ থেকে ৯ দিন।

উইলিয়ামের মার্সটার্সের জন্ম ১৮৩১ সালের ৬ই নভেম্বর  ইংল্যান্ডের লিচেস্টারশায়ারে,বড় হয়ে ওঠা মিডল্যাণ্ডসে। সেখানকার স্থানীয় উচ্চারণে উইলিয়াম 'মাস্টার্স' হয়ে যান, উইলিয়াম 'মার্সটার্স'। শোনা যায় ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের সঙ্গেও নাকি তাঁর পরিবারের রক্তের সম্পর্ক ছিল। তাই বোধ হয়, তাঁর স্বভূমি ইংল্যান্ড থেকে বারো হাজার মাইল দূরে বাস করেও নিজের ভাষার ঐতিহ্য ভুলতে চাননি। উইলিয়াম মার্সটার্স তাঁর প্রথম জীবনে শেখা পুরনো চালের ইংরেজি  ভাষাতেই  কথা বলে গেছেন আমৃত্যু, আর পরিবারের সকল সদস্যদেরও শিখিয়েছেন সেই ভাষাতেই কথা বলতে। যৌবনে দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় জন্মভূমি ছেড়ে আসা  মানুষটি হয়তো এভাবেই স্মরণ করেছেন মাতৃভূমিকে। আজ প্রায় ১৫০ বছর পরেও দ্বীপের বাসিন্দারা সেই ভাষাতেই কথা বলে,  যদিও সময়ের প্রয়োজনে অন্য ভাষাও তারা শিখছে।

একজন ইংরেজ অভিযাত্রী হিসাবেই পরিচিত এই ব্যতিক্রমী আর সাহসী মানুষটি ঘর ছেড়েছিলেন তিমি শিকারী হবেন বলে। জাহাজে মাছ শিকারের সঙ্গে করতেন নাবিকের কাজ, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, কাঠের নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ব্যারেল ইত্যাদি তৈরি করতেন, আবার জাহাজ কোনও বন্দরে ভিড়লে ব্যাবসাও করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর চারের দশকে  'ক্যালিফোর্ণিয়া গোল্ড রাশে'র  সময় সোনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে। কিছুকাল  পরে সেখান থেকে পাল তুলে দেন অচেনা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের  উদ্দেশ্যে। ১৮৫৬ সালে সেখানে পৌঁছে থাকতে শুরু করেন কুক আইল্যান্ডের অন্তর্গত 'পেনরিন' দ্বীপে। সেখানেই পলিনেশিয়ান এক রাজকর্মচারীর (প্রধানের) কন্যা আকাকাইনাগারু- কে বিয়ে করেন। ১৮৬২ সালে ম্যানোয়া দ্বীপে গিয়ে সংসার পাতেন।

এই সময় উইলিয়ামের পরিচিত, 'ব্রানডেনার' নামে এক ব্যবসায়ী তাহিতি ছেড়ে দেশে  ফিরে যাবেন বলে স্থির করেন। তাঁর নজরে ছিল 'এক টুকরো স্বর্গের মত' দ্বীপ  জনবিহীন পামারস্টোন। দ্বীপটির দেখভালের জন্য একজন কেয়ারটেকার খুঁজছিলেন। সে কাজ করতে রাজি হয়ে গেলেন উইলিয়াম মারর্স্টার্স।

উইলিয়াম আগেও জাহাজে ছুতোরের কাজ করেছেন। নানা কাঠের জিনিস তৈরি করতে দক্ষ ছিলেন। নিঃসঙ্গ দ্বীপে পৌঁছে ডুবন্ত প্রবাল প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা লেগে ডুবে যাওয়া এক ভাঙ্গা জাহাজের কাঠামোর কাঠ, লোহা সংগ্রহ করে সেগুলি দিয়ে বানালেন কুড়ি  ফুট উঁচু এক ঘর, যা সুনামিতেও ভাঙতে পারেনি। এই  বাড়িটি এখনও  শস্যের গুদাম আর সাইক্লোনের সময়ের নিরাপদ আশ্রয়স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দ্বীপের সীমানার এলাকার  ভিতরের দিকে বৃত্তাকারে পাম আর নারকেল গাছের চারা লাগালেন। বোধ হয় জীবিকার উপায় করার জন্য গাছের চারাগুলি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল,  শর্ত ছিল তেল উৎপাদন করবেন তিনি, মাসে মাসে ব্রানডেনারের জাহাজ এসে সেই তেল  কিনে নেবে আর পরিবর্তে দিয়ে যাবে দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় রসদ।

তবে কিছুদিন বাদেই সেই  জাহাজের আসা কমতে লাগল, পরে জাহাজের আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁরা তখন নিজেদের প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন করে আর মাছ ধরে খাদ্যের

অভাব মেটাতে লাগলেন। আর অন্যান্য উৎপাদিত জিনিস নিয়ে, তার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেতে অপেক্ষা করতেন কবে দ্বীপের কাছ দিয়ে চলমান কোন জাহাজকে দেখতে পাবেন। তাছাড়া কবে দ্বীপের পাশে ডুবন্ত প্রবাল প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা লেগে জাহাজডুবি হয়, তার জন্যও অপেক্ষায় থাকতেন তিনি। ওতে প্রয়োজনীয় বহু জিনিস তিনি হাতের কাছে পেয়ে যেতেন। ততদিনে তাঁর সংসার আয়তনে বেড়েছে। মোট তিনজন স্ত্রী তাঁর। পারিবারিক বিরোধ এড়াতে প্রবাল প্রাচীরসহ সম্পূর্ণ দ্বীপটিকে তিনভাগে ভাগ করে দিয়েছেন তাঁর তিন স্ত্রীর আর তাঁদের সন্তানদের মধ্যে।

ক্রমে এক বিশাল পরিবার হল তাঁর। সবাই মিলে মিশে থাকতেন, কারো ঘরে কিছু না থাকলে অন্য ঘর থেকে সাহায্য নিয়ে প্রয়োজন মেটাতেন তাঁরা। ক্রমে দ্বীপে যত মানুষ হল তাদের সবাই রক্তের

সম্পর্কে উইলিয়াম মার্সটার্সের উত্তরপুরুষ।

ক্রমে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য ছোট্ট একটি স্কুল করলেন তিনি। প্রথমে নিজেই পড়াতেন। তারপর একটি চার্চবাড়ি স্থাপন করলেন সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য। এদের পরিবারের লোকজনদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলি কঠোরভাবে মানতে শিখিয়েছিলেন উইলিয়াম।পরের প্রজন্মের দ্বীপবাসীরা সেই অনুশাসন এখনও একই ভাবে মেনে চলে। উপাসনা প্রতিদিন হত আর রবিবারে অনেকবার তাদের উপাসনায় যোগ দিতে হত,যা আজও চলে আসছে। সেদিন সকলে  সুন্দর পোশাক পরে আর সারাদিন একসাথে কাটায়। উইলিয়াম লেখাপড়ার সঙ্গে  ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক করলেন। প্রবাল প্রাচীরের ঘেরার মধ্যে অবস্থিত স্বচ্ছ নীল জলের লেগুনে তারা সাঁতার কাটত, মাছ ধরত। যদিও বড়োরা বহিঃসমুদ্রের জলে মাছ ধরতে যেতেন আর বিদেশী জাহাজের সঙ্গে ব্যাবসা করতেন ।

উইলিয়াম লেগুনের ধারে মাটিতে উৎপাদিত শশা আর মাছ বিক্রি করতেন চীনা ব্যবসায়ীদের কাছে। বাইরের জগতের খোঁজখবর জানতে আর নতুন মানুষদের সঙ্গ পেতে উইলিয়াম চালু করেছিলেন দ্বীপের পাশ দিয়ে চলমান জাহাজের মানুষদের দ্বীপে আমন্ত্রণ করে আনা, অতিথি সৎকার করা।আবার তাদের ছোট নৌকায় করে জাহাজে পৌঁছে দেওয়া। সেই ঐতিহ্য এখনো দ্বীপবাসীরা পালন করে আসছে। তাঁর জীবিতাবস্থায়ই তাঁর অনেক সন্তান ও নাতি নাতনি মারা গিয়েছিল। শোনা যায় ১৮৯৯ সালে ৭৮ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর পরিবারে ছিল নিজের ১৭জন সন্তান আর ৫৪ জন নাতি নাতনি।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বাস করছে তাঁর বংশধরেরা। বেশির ভাগ আছে রারোটোঙ্গা দ্বীপে। এছাড়া আছে অষ্ট্রেলিয়া , নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, তাহিতিতে ।১৯৭৩ সালেও এই পরিবারের প্রায় হাজার খানেক সদস্য বাস করতেন রারোটোঙ্গা দ্বীপে। বর্তমানে পামারস্টোনে বাস করেন প্রায় ৬০/৬২ জন সদস্য। ১৮৯১ সালে ইংল্যান্ড দ্বীপটি নিজেদের দখলে নেয়। দ্বীপের অধিকার নিয়ে উইলিয়ামের সঙ্গে দীর্ঘ বাদানুবাদের পর রানি নিজেদের দেশের এই মানুষটিকেই ২১ বছরের জন্য লিজ দে্ন দ্বীপটি। উইলিয়াম মার্স্টার্স- এর মৃত্যুর পরে ১৯৫৪ সালে নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টের পাশ করা এক আইনের বলে উইলিয়াম মার্স্টার্সের উত্তরসূরিরাই পামারস্টোন দ্বীপের পূর্ণ অধিকার লাভ করে।

**এক নজরে পামারস্টোনের কিছু তথ্যঃ–**

**অবস্থান**

সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রায় ৪ হাজার মিটার ( ১৩,১২৩ফুট )উঁচু এক আগ্নেয় পাহাড়ের চূড়ায় গড়ে ওঠা একটি অ্যাটল হচ্ছে পামারস্টোন দ্বীপ। এই অ্যাটলের সবচেয়ে উঁচু স্থানটি সমুদ্রের জলের উপরে ৪মিটার মত জেগে থাকে। চারদিকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের জন্য খুব কাছে না গেলে দ্বীপটি সহজে নজরে আসেনা। ঝড়জলের সময় তো নয়ই।

**জলবায়ু**

নিরক্ষীয় অঞ্চলে উত্তর- পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর প্রবাহ বলয়ের মাঝে অবস্থিত দ্বীপটির জলবায়ু নিরক্ষীয় প্রকৃতির। দুটি ঋতু- বর্ষাকাল চলে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চলে শুষ্ক সময়- শীতকাল। শীতের সময় তাপমাত্রা ১৫- ১৬ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত থাকে,আর বর্ষার সময় তাপমাত্রা থাকে মোটামুটি ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। সমুদ্র দিয়ে বেষ্টিত হওয়াতে সারা বছরই আরামপ্রদ সমুদ্রবায়ু বয়, আর্দ্রতা মোটামুটি ৯০% থাকে। তবে স্থলকুলহীন সমুদ্রের মাঝে অবস্থানের জন্য বারেবারেই দ্বীপের মানুষদের সাইক্লোনের তাণ্ডবের সম্মুখীন হতে হয়। ঘরগুলি তারা পিছনের

গাছের সঙ্গে রশি দিয়ে বেধে রাখে। ১৮৮৩ সাল থেকে ২০০5 পর্যন্ত ৯১০টি সাইক্লোনের ধাক্কা সামলে টিঁকে আছে দ্বীপবাসীরা।

**খাদ্য**

মাছ এঁদের প্রধান খাদ্য। এছাড়া চিকেন,অ্যারোরুট আর নারকেল দিয়ে তৈরি একটি সুস্বাদু পদ এরা ভালোবাসেন। পেঁপে একটি নিত্য খাদ্যের তালিকাভুক্ত। নারকেল,পেঁপে আর প্যান্ডামাস নামে এক প্রকার ফল প্রচুর উৎপাদিত হয়। সবই হয় প্রবাল প্রাচীরের ভিতরের দিকে নীল জলে ভরা লেগুনের চারপাশ ঘিরে জমিতে। এই জমিতে আজকাল প্রচুর মিষ্টিকুমড়োও ফলানো হয়।

**আয়রোজগার**

মাছ এঁদের প্রধান অর্থাগমের উপায়। প্রচুর পরিমাণে প্যারট ফিশ ধরে সেগুলিকে ঠান্ডায় জমিয়ে রাখেন আর সেগুলির বিনিময়ে বিদেশি বণিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে চাল, জ্বালানি আর অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য। আর প্রবাল প্রাচীরের বাইরের দিকে ধার ঘেঁষে হাঁটতে থাকলে বা ডিঙি করে চলতে থাকলে পাওয়া যায়  প্রচুর স্কুইরেল ফিশ, আর শেল ফিশ। রারোটোঙ্গাতেই সবচেয়ে বেশি মাছ রপ্তানি হয়, ফলে মাছ বিক্রি থেকে বেশির ভাগ অর্থাগম হয়। মাছের চাহিদা মাঝে মাঝেই যোগানের থেকে বেশি হয় ,তাই দামও ভালো পাওয়া যায়।
প্রবালপ্রাচীরের বাইরের দিকের রূপালী চকচকে বালুকাবেলায় আছে নানা জাতের গাছ, দীর্ঘ মেহগনি গাছের অরণ্য। এঁরা নারকেলের ছোবরা থেকে নানা সুদৃশ্য সামগ্রী , হ্যান্ডব্যাগ এসব তৈরি করে বিদেশি ক্রেতাদের বিক্রি করেও অর্থাগম করেন।

**শিক্ষা**

মার্স্টার্স প্রথমেই সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য যে স্কুলটি স্থাপন করে শিক্ষার সূচনা করেছিলেন, সেটি আজ আর নেই। ১৯৪০ এর প্রথমে স্থাপিত হয় ‘পামারস্টোন লাকি স্কুল’। সেটি পুড়ে

যাওয়ায় সেখানে ২০০১ সালে একেবারে আধুনিক আর একটি স্কুলবাড়ি তৈরি হয়েছে। নিকটবর্তী রারোটোঙ্গা দ্বীপ থেকে শিক্ষক নিয়ে আসা হয় , এছাড়া দ্বীপবাসীদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাঁরাও উইলিয়াম মার্সটার্সের উত্তরসূরিদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেন শ্রদ্ধার সঙ্গে। পামারস্টোনের বর্তমানে প্রবাসী নাগরিকরা, আর টুরিস্টরা স্কুলের ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় বইপত্র, স্টেশনারি সামগ্রী, পোশাক এসব জিনিসের যোগান দেন। পাঠ্য বিষয়গুলি হ'ল ইংরাজি, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গণিত ,শব্দগঠন আর বানান শিক্ষা। বর্তমানে স্কুলে ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী ২৫ জন পড়ুয়ার সকলেই সাহিত্য আর গণিতে খুবই দক্ষ। পারিবারিক জীবনের মত এখানেও পারস্পরিক সহযোগিতা আর আতিথেয়তার পাঠ নিতে হয় ভাবী নাগরিকদের।কারণ নিঃসঙ্গ দ্বীপে বাণিজ্য তরণীর আসা একটা আশীর্বাদ।

**আতিথেয়তা**

দূরদর্শী উইলিয়ামের সময় থেকেই আতিথেয়তার ঐতিহ্য চলে এসেছে এই দ্বীপে। ছোট ছোট নৌকা নিয়ে এঁরা অ্যাটলের বাইরের সমুদ্রে মাছ ধরেন আর অপেক্ষা করেন ভিনদেশী জাহাজের জন্য । অথই সমুদ্রে কোনও জাহাজ দেখতে পেলেই এগিয়ে যান জাহাজের দিকে, জাহাজের আরোহীদের অভ্যর্থনা জানান, তাঁদের দ্বীপের অতিথি করে নিয়ে যান।

নৌকা করে তাদের নিয়ে আসেন নিজেদের বাড়িতে, বিশ্রাম আর আহারের ব্যবস্থা করেন, আনন্দের জন্য মায়াবী নীল লেগুনের জলে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা করেন, খেলাধুলা হয়। তাছাড়া পরমপ্রাপ্তি হয় সুদূরের উন্নত আর সভ্য আধুনিক সমাজের আলোকস্পর্শ পাওয়া, বিভিন্ন দেশের মানুষদের সঙ্গে পরিচয় হয় আর নানা বিষয়ে জানা যায়। তাঁদের সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর জন্য অতিথিদের তাঁরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেও ভোলেন না। এছাড়া কেনাবেচা তো হয়ই।

**বন্যপ্রাণী**

এখানে কুক আইল্যান্ডের মত কিছু ফ্লাইং ফক্স আছে বলে শোনা যায়। ৫/৬ রকমের স্থানীয় পাখি আছে। কিছু সামুদ্রিক পাখিও দেখা যায়। একমাত্র স্তন্যপায়ীর মধ্যে আছে একশ্রেণীর বাদুড়। কিছু সবুজ কচ্ছপও পাওয়া যায়।

**জনসংখ্যা, শাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য আধুনিক সুবিধা**

বর্তমানে এখানে উইলিয়ামের তিন স্ত্রীর বংশের তিনটি পরিবারের বাস- আকাকাইনাগারু পরিবার,মাটাভিয়া পরিবার,আর তে পউ পরিবারের - মোট ৬০/৬২ জন মানুষ বাস করেন। উইলিয়াম মার্সটার্সের মৃত্যুর পর এঁদের সকল পরিবারের প্রধান হয়েছিলেন বব মার্সটার্স। পরিবারের অধিকাংশ মানুষই এখন শিক্ষা ও চাকরির জন্য বাস করেন রারোটোঙ্গা দ্বীপে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব বড়ো বড়ো দেশেই আছেন মার্সটার্সের বংশধর পামারস্টোনের নাগরিকরা। কিন্তু দেশকে তাঁরা ভোলেন নি।

সরকারীভাবে দ্বীপটি নিউজিল্যান্ডের প্রোটেক্টরেট। বর্তমানে এখানকার শাসনব্যবস্থা চলে একটি পারিবারিক কাউন্সিলের মাধ্যমে। তিনটি পরিবার থেকে পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা কাউন্সিলার নিযুক্ত হন, তাঁদের মধ্যেই একজন 'মেয়র' নির্বাচিত হন চার বছরের জন্য। এছাড়া সকল পরিবারের সম্মিলিত পছন্দের একজন চতুর্থ সদস্যও নির্বাচিত হন যে কোনও একটি পরিবার থেকে। চার বছর পরপর কাউন্সিলের নির্বাচনে তিন পরিবার থেকেই পর্যায়ক্রমে একজন করে 'মেয়র' নির্বাচিত হ'ন।

বর্তমানে এখানে একটি টেলিফোন স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হয়েছে টেলিফোন। বছরে কয়েকবার বিদেশী জাহাজ আসে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর যোগান নিয়ে।ইন্টারনেট পরিষেবাও চালু হয়েছে দিনে চার ঘন্টার জন্য। আগে জেনারেটারের সাহায্যে দিনে কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যেত। এখন দ্বীপে আছে একটি প্রধান জেনারেটার। আর ঘরে ঘরে আছে হোম জেনারেটার,যা মাছ জমিয়ে রাখবার ঠান্ডাযন্ত্র চালাবার  কাজে লাগে। সব বাড়িতেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা, ফ্রিজ, টিভি আছে।  ছোট ছোট টুরিস্ট নৌকো আসে, তারাও ফেরার সময় অনেক দরকারি জিনিস দিয়ে যায়। মজার খবর হল, দক্ষিণ গোলার্ধে মাথাপিছু সবচেয়ে বেশিসংখ্যায় ফ্রিজ ব্যবহারকারীর সংখ্যা পামারস্টোনেই সর্বোচ্চ।

প্রায় ১৫০ বছরের আগে যে মানুষটি এক অজানা, জনমানবহীন দ্বীপে উপনিবেশ গড়েছিলেন আজ তা পৃথিবীতে রীতিমত বিখ্যাত, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তাঁর উত্তরপুরুষেরা নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখে।

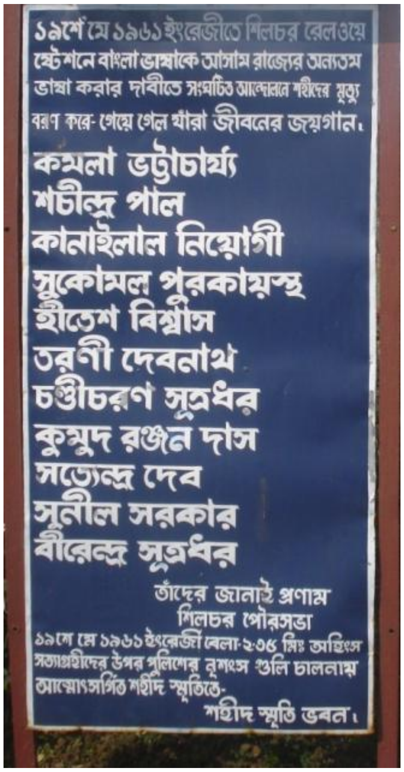


*"পৃথিবীর প্রথম মহিলা বাংলাভাষা শহীদ , যাঁকে আজ ভুলে গেছি আমরা, বেঁচে আছে শুধু তামার ফলকে তাঁর ছবি , বরাক উপত্যকায়"*

# কমলা ভট্টাচার্যের কথা

উমা ভট্টাচার্য

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি !"

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের সম্মানে কবি আব্দুল গফফর চৌধুরির লেখা কবিতার লাইন দুটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত।

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের শহিদদের উদ্দেশ্যে গীত এই বিখ্যাত দুটি লাইন পৃথিবীর যেখানে যত বাঙালি আছে সবাই স্মরণ করে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটিতে। সরকারী ভাষা হিসাবে মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতির দাবিতে সেদিন হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে আপামর বাংলাদেশী যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁদের সম্মান জানাতে ইউনেস্কো সেই দিনটিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে ১৯৯৯সালে।

বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাঙালিরা, এমনকি প্রবাসী সব বাঙলাভাষী মানুষ নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেই দিনের শহীদদের স্মৃতিতর্পন করে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের "দ্বিতীয় বাংলা ভাষা আন্দোলনের" দিনটির কথা তেমনভাবে জানো কি সবাই? ১৯৬১ সালের ১৯শে মে- র ভাষা আন্দোলনে অংশ নিতে তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন আসামের শিলচর স্টেশনে। শান্তভাবে অবরোধ অবস্থানের শরিক হয়েছিলেন অসমীয়ার জায়গায় বাংলাকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে ধরে রাখবার দাবিতে। এই প্রতিবাদের অপরাধে ১১টি তাজা প্রাণ পুলিশের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে ঝরে গিয়েছিল ধরিত্রীর বুক থেকে। তাঁদের আত্মদানের দিনটিকে কি আমরা তেমনভাবে স্মরণ করি?

সেদিনের সেই ভাষা শহীদদের মধ্যে ছিলেন ষোল বছরের কিশোরী কমলা- কমলা ভট্টাচার্য, তাঁর কথাই লিখছি এই পর্বে। আসামের শিলচরের পাবলিক স্কুলের গা ঘেঁষে শহীদ কমলা ভট্টাচার্য রোড নামে একটি রাস্তা আছে তাঁর নামে। এই রাস্তার পাশেই ভাড়াবাড়িতে থাকতো কমলাদের উদ্বাস্তু পরিবার।

কমলা ছিল অবিভক্ত বাংলার শ্রীহট্টের, অর্থাৎ সিলেটের মেয়ে। জন্ম ১৯৪৫ সালে। ১৯৫০ সালে স্বাধীন খন্ডিত ভারতের মাটিতে পা রেখেছিল কমলারা। বিধবা মা আর ছয়

ভাইবোনের সঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে শিলচরে ভাড়া বাড়িতে এসে উঠেছিল যখন, তখন কমলার বয়স মাত্র ৫ বছর।

শ্রীহট্টে পূর্বপুরুষের ভিটেতেই স্বামী রামরমণ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পরে সুপ্রবাসিনী দেবী সাতটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে চলে আসেন ভারতের মাটিতে। অনাথা বিধবা পশ্চিমবঙ্গে না এসেগিয়েছিলেন পূর্বভারতের শিলচরে, যেখানকার মাটির গন্ধ, প্রকৃতির গন্ধ আর পরিবেশ ছিল তাঁদের আশৈশব চেনা। কারণ শিলচর ছিল প্রাচীন অবিভক্ত বাংলার সিলেট বা শ্রীহট্টেরই অংশ। ব্রিটিশ আমলে পুর্ববাংলার যে অঞ্চল সুর্মা উপত্যকা বা সুর্মা ডিভিশন বলে পরিচিত ছিল, সেখানকার মানুষ এক শতাব্দীর মধ্যে দু'বার রাজনৈতিক বিভাজন হতে দেখেছে তাদের সাধের জন্মভূমির। সেও এক বঞ্চনার আর বিচ্ছেদের করুণ ইতিহাস। প্রথমবার শাসণকার্যের সুবিধার অজুহাতে ব্রিটিশ শাসকেরা জোর করে তাদের জন্মস্থানকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করেছে। যে বিভাজনের ফলে সেই মানুষেরা গঙ্গাবিধৌত বঙ্গের সঙ্গে তাদের সুপ্রাচীন নাড়ির যোগ ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের মূল্য দিয়েছে এই জায়গাটি আর একবার বিভাজনের শিকার হয়ে। এবার পূর্বপাকিস্তান তৈরির সময় এই উপত্যকাকে ছেঁটে ছোট করে সিলেট বা শ্রীহট্ট জেলার পাঁচটি সাবডিভিশনের মধ্যে চারটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যোগ করা হয়েছিল পূর্বপাকিস্তানের(এখনকার বাংলাদেশের) সঙ্গে। ফলে সুর্মা ডিভিশন বিলুপ্ত হল, আর হাইলাকান্দি, কাছাড়, আর করিমগঞ্জ নামে তিনটি জেলা নিয়ে সৃষ্টি হল 'বরাক উপত্যকার'। স্বাধীনতার পর থেকে শিলচর আসামের অংশ হয়ে গেল ।

বিভাজনের ফলে যারা বরাক উপত্যকার বাসিন্দা রইলো যারা, তারা আশৈশব অনুভূত পরিবেশকে পেল। এদিকে হিন্দু বিতারণের জন্য ১৯৫০ সালের পুর্বপাকিস্তানে কুখ্যাত নরমেধ যজ্ঞের আহুতি হল সিলেটের শয়ে শয়ে হিন্দু বাঙালি। প্রাণ বাঁচাতে আরও অনেক হিন্দু পরিবার পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে চলে আসতে লাগলো বরাক উপত্যকায়। এরা এলো বাস্তুহারার তকমা নিয়ে।

এই নতুন দেশান্তরী মানুষেরা দুরতিক্রম্য অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হল, এক ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে, চরম দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম হল তাদের সাথী। তাদের অনেক নিকট আত্মীয় যারা রয়ে গেল আইনত অনতিক্রমণীয় এক আন্তর্জাতিক সীমারেখার ওপারে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্যাকুল হত তারা , কিন্তু তারা নিরুপায়। এই বেদনা স্পর্শ করেছিল উদ্বাস্তু হয়ে শিলচরে আসা ৫/৬ বছরের কমলাকেও। কত খেলার সাথীকে হারিয়েছিল সে সেদিন।

সংখ্যাগুরু বাঙলা ভাষাভাষী অধ্যূষিত পূর্বপাকিস্তান আর বরাক উপত্যকার বাঙালিদের মনে নানা বিষয় নিয়ে যে ক্ষোভ জমছিল তার প্রথম সংঘবদ্ধ প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৫২ সালের পুর্বপাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই আন্দোলনের আট বছর পরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন শুরু করলো ভারতের আসামের বরাকবাসী বাঙালিরা।

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে "আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি" অসমীয়া ভাষাকে আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব রাখল। আসামে তখন বাংলাভাষীর সংখ্যা বিপুল। এই প্রস্তাবে বরাক উপত্যকার সংখ্যাগুরু বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। পারস্পরিক আসূয়া বাড়তে আসাম থেকে বাঙালি খেদানো শুরু হল। শুরু হল জাতিদাঙ্গা। দাঙ্গা পরবর্তী এক সরকারি রিপোর্টে দেখা গেল ওই বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কামরূপ জেলাতেই বাঙালি হিন্দুদের ৪০১৯টি কুঁড়েঘর আর ৫৮টি বাড়ি পুড়িয়ে আর ভেঙে দেয়া হয়েছে, ৫০, ০০০ বাঙালি পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে গেছে, ৯, ০০০ বাঙালি উত্তর- পূর্ব ভারতের অন্য রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ২৫টি গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, ৯জন বাঙালি হিন্দু নিহত হয়েছে আর একশরও বেশি জন আহত হয়েছে।

এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যেই ১০ই অক্টোবর আসামের মুখ্যমন্ত্রী অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যের প্রধান ও একমাত্র সরকারী ভাষা করার প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় একটি বিল আনলেন। অনেক প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই বিল পাশ হয়ে গেল ২৪শে অক্টোবর। আসামের জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ মানুষের মাতৃভাষা অসমীয়া ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল তিন ভাগের দুই ভাগ (সংখ্যাগরিষ্ঠ) বাংলাভাষী মানুষের উপর।

এই পরিস্থিতির সব খবরই রাখতো বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা।এদেরই একজন ছিল কমলা ভট্টাচার্য। কমলা তখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। অভাব অনটনের সংসার, দিনরাত দেখেছে দিদি-দাদাদের আর মায়ের অবিরাম অভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মনে মনে শক্ত আর লড়াকু হয়ে উঠছে সে। ইচ্ছা তার গ্রাজুয়েট সে হবেই, আর চাকরি করে সংসারের কষ্ট দূর করে দেবে। স্বপ্ন দেখে মাধ্যমিক দিয়েই সে শিখে নেবে টাইপরাইটিং, কেরানির চাকরি একটা অন্তত জুটে যেতে পারে এই বিদ্যেটা জানা থাকলে। খিদে পেলে খাবার না পেলেও খিদে চেপে রাখে, পাছে মা আর

দিদিদের কষ্ট হয় তাদের মুখে যথেষ্ট খাবার তুলে না দিতে পারার জন্য। বই নেই, তাতে ক্ষতি নেই। অন্য সহপাঠীদের কাছ থেকে বই চেয়ে লিখে নিয়ে পড়ে সে। একমাত্র চেষ্টা কী করে সংসারের ভালো করবে। কিন্তু মনে মনে বিপ্লবী হয়ে উঠছিল সে সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে।

সরকারী ভাষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১৯৬১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি শিলচরে স্থাপিত হল 'কাছাড় গণ-সংগ্রাম পরিষদ'। তখন সামনেই কমলার মাধ্যমিক পরীক্ষা। পড়াশোনার ফাঁকেই খবর রাখে সদ্য গড়ে ওঠা ভাষা আন্দোলনের নানা খবর। শোনে নেতা নেতৃদের বক্তৃতা, মনে মনে আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ওঠে সে। ১৪ই এপ্রিল বরাকের মানুষ এক 'সঙ্কল্প দিবস' উদ্‌যাপন করে অহিংস প্রতিবাদ জানাল সরকারি ভাষা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। তাতেও অংশ নিলো সে।

২৪শে এপ্রিল পরিষদ ভাষা আন্দোলনের পক্ষে গনসচেতনা বাড়িয়ে জনমত গড়ে তোলার জন্য ১৫দিন ধরে এক পদযাত্রা শুরু করে বরাক উপত্যকার জেলাগুলি ঘিরে। ২০০ মাইল পথ পরিক্রমার পরে সত্যাগ্রহীরা ২রা মে পৌঁছায় শিলচরে। ১৩ই এপ্রিলের মধ্যে ভাষা-বিল প্রত্যাহার না হলে ১৯শে মে ২৪ ঘণ্টা হরতালের কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন আন্দোলনের নেতারা। ততদিনে কল্পনার মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ। নিশ্চিন্তে ধর্ণা, পিকেটিং-এ অংশ নিতে আর বাধা নেই। মা সবই জানেন। বাধা দেননা, কারণ পৃথিবীতে বাঁচতে হলে তাঁর ছেলেমেয়েদের সংগ্রাম করেই বাঁচতে হবে একথা জানেন কমলার লড়াকু, সাহসী মা।

কমলার কাছে মায়ের দুঃখের সঙ্গে ভাষা জননীর অবমাননার দুঃখও সমান। আসাম গভর্ণমেন্ট বিল পাশ করে ভুলিয়ে দিতে চাইছে মাতৃভাষা বাংলাকে, আর চাপিয়ে দিতে অসমীয়া ভাষা, সে বিষয় নিয়ে তার মনে যথেশ্ঠ ক্ষোভ। যে ভাষায় প্রানের আনন্দ, আবেগ, দুঃখ কিছুই সঠিক প্রকাশ করা যাবেনা, সেই ভাষা কেমন করে তার নিজের ভাষা হবে? সে বুঝেছে এর প্রতিবাদ করতেই হবে, তারা নিজেদের দেশ ছেড়ে দিয়েছে রাজনীতির শিকার হয়ে, অনেক অভাব আর কষ্টের মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছে তারা, এখন মুখের প্রিয় ভাষাটাও ছাড়তে হবে কেন? তাই বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রাখার জন্য, আর সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে যখন অবস্থান সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন নেতারা, কিশোরী কমলাও তাতে সামিল হল।

বরাক উপত্যকার বিখ্যাত আর প্রভাবশালী চন্দ পরিবারের শিক্ষিতা, সমাজ সচেতন মহিলা জ্যোৎস্না চন্দের ডাকে সাড়া দিয়ে অবস্থান সত্যাগ্রহের দিন কমলা আরও ২০/২২ জন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলল শিলচর স্টেশনে পিকেটিং-এ যোগ দিতে। সঙ্গে নিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ১১ বছরের বোন মঙ্গলাকে। আধপেটা খাওয়া শীর্ণ ছোটখাটো চেহারার শরীরের মেয়েটি পিকেটিং-এ যাবার সময় কিছু খেতে চেয়েছিল, কিন্তু ঘরে ছিল না কিছুই। দিন আনি দিন খাই অবস্থা তাদের। খালি পেট জল খেয়ে ভরে সে চলল স্টেশনের দিকে।

সেজদি প্রতিভা ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা, যাঁর আয়ে সংসারটা টেনেটুনে চলে। দিদির স্কুলে যাবার জন্য রাখা শাড়ি-ব্লাউজ পরেই কমলা চলল পিকেটিং-এ। মার কাছ থেকে চেয়ে নিল এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়, 'কাঁদুনে গ্যাস' ছুঁড়লে সেই কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে নাকেমুখে চাপা দেবার জন্য। সে কি তখন বুঝতে পেরেছিল যে আজ তার শহীদ হবার দিন? মায়ের মন হয়ত

আশঙ্কা করেছিল কিছু , তাই একবার দুপুরে স্টেশনে এসেছিলেন মেয়েদের দেখে যেতে। সঙ্গে ছিল কমলার ভাই বকুল আর বিধবা বড়দির ছেলে বাপ্পা। কমলা তাদের নিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি যেতে বলল মাকে।

এর একটু পরেই দুপুর ২টো নাগাদ পিকেটিং করতে আসা সত্যাগ্রহীদের স্টেশন থেকে তুলে দেবার জন্য এল পুলিশ। তার আগের দিন ১৮ই মে আন্দোলনের তিনজন বিখ্যাত নেতা- নলিনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ সেন, আর 'সাপ্তাহিক যুগশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক বিধুভূষণ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সেদিন তাই বিভিন্ন সরকারী অফিস, কোর্ট, রেলস্টেশনের সামনে পিকেটিং করছিল সত্যাগ্রহী আন্দোলনকারীরা। সেদিন শিলচর স্টেশন দিয়ে একটি ট্রেনও পাস করেনি, একটিও টিকিট বিক্রি হয়নি স্টেশনের কাউন্টারে।

দুপুরের পরেই আসাম রাইফেল বাহিনীর সেনারা হাজির হল স্টেশনে। ট্রাকে বোঝাই করে নেতাদের বন্দি করে নিয়ে যাবার কাজ শুরু হল। জনতা ট্রাক অবরোধ করে নেতাদের নামিয়ে নিতে চেষ্টা করলে শুরু হল আধা- সামরিক বাহিনীর এলোপাথারি লাঠিচার্জ।

ছোটবোন মঙ্গলাকে লাঠির ঘা থেকে বাঁচাতে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আড়াল করছিল কমলা। লাঠিচার্য চলাকালীন , পুলিশ গুলি করতে শুরু করল জনতাকে লক্ষ করে। বিনা প্ররোচনায় ১৭ রাউন্ড গুলি চলল। সকলের মুখে স্লোগান, "বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ, মাতৃভাষা জিন্দাবাদ"।

দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট নাগাদ সাত মিনিট ধরে রাইফেলের গুলিবর্ষণ চলল ছাত্র, যুবক, জনতাকে লক্ষ করে। লুটিয়ে পড়লো অনেকগুলি তাজা প্রাণ। ১১ জন সেইখানেই মারা গেলেন।

এই এগারো জনের একজন ছিলেন ১৬ বছরের কিশোরী কমলা। একটি গুলি তার চোখ দিয়ে ঢুকে মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। লুটিয়ে পড়ে রইল তার রক্তাক্ত শরীর,আহত বোন মঙ্গলার পাশে।

স্বাধীন ভারতের মাটিতে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির আন্দোলনে শহীদ হল স্বাধীন ভারতেরই একটি রাজ্যের বাসিন্দা সুন্দর , স্বচ্ছল জীবনের স্বপ্ন দেখা কিশোরীটি । মাতৃভাষার জন্য "জান দেব, জবান দেবনা" এই স্লোগানকে সত্য করে তুলল ছোট্ট মেয়েটি। সে হয়ে

গেল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশ্বের প্রথম মহিলা ভাষা- শহীদ।[যেমন সাহসিকতার কাজ করেছে এই একবিংশ শতাব্দিতে (মেয়েদের শিক্ষার দাবিতে) পাকিস্তানের এক সাহসী কিশোরী 'মালালা ইউসুফযাই' । যদিও সে বেঁচে আছে আরও প্রতিবাদী হয়ে]।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ১৯শে মে এক রক্তাক্ত দিন হিসাবে চিহ্নিত হল। রচিত হল "এগারো শহীদের আখ্যান"। অমর হয়ে রইলেন কমলা ভট্টাচার্য।

এই আত্মদান বৃথা যায়নি, তাদের প্রাণদান আসামে বাংলাভাষাকে স্বীকৃত সরকারী ভাষার সম্মান এনে দিল। আর এই দুঃস্বপ্নের ঘটনার সাক্ষী কমলার বোন মঙ্গলা চিরদিনের জন্য হয়ে গেলেন অপ্রকৃতিস্থ।

চাকরি করা আর তার হলনা কমলার। মাধ্যমিক পাশ করেছিল সে দ্বিতীয় বিভাগে। সে রেজাল্ট বুকে নিয়ে তার মা নাকি চীৎকার করে কেঁদেছিলেন আর অভিশাপ দিয়েছিলেন স্বাধীন দেশের রাজা- ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে-- "আমার মেয়ের মত স্বাধীন দেশের মানুষের হাতেই প্রাণ যাবে গো তোমার সন্তানের।"

কল্পনা সহ এগারো শহীদের আবক্ষ মূর্তিসহ একটি ব্রোঞ্জ ফলক লাগানো আছে শিলচরের এক শহীদ বেদির উপর। আজকাল আসামসহ অন্য জায়গার কিছু বাঙালিরা স্মরণ করছে তাঁদের এই আত্মদানের দিনটিকে। আসামে শহীদ কমলা ভট্টাচার্য মুর্তিস্থাপন কমিটির উদ্যোগে শিলচরে কমলার প্রথম স্কুল, 'ছোটেলাল শেঠ ইনস্টিটিউট', প্রাঙ্গণে ২০১১ সালে তাঁর একটি আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

ভাষার জন্য শহীদ কিশোরী কমলা ভট্টাচার্যকে এই লেখার মাধ্যমে জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা।

*সম্পাদকীয় সংযোজন—*

*শিলচরের সেই শহিদমন্দিরে কমলা ভট্টাচার্যের সমাধিফলকে ফুল দিয়ে আসবার সৌভাগ্য হয়েছিল জয়ঢাকের সম্পাদকের। সঙ্গে সেইছবিগুলো রইল-- সম্পাঃ*

# ফেলে আসা কলকাতা

সুজয় রায়

সেদিন পর্যন্ত একটা প্রচলিত ধারণা ছিল যে জোব চার্নক প্রথম বিদেশি সওদাগর কোলকাতায় এসেছিল স্থায়ীভাবে। কিন্তু কোলকাতার আদি ইতিহাস ইংরেজদের কীর্তি নয়। এর অনেক আগেই আর্মেনিয়ান জাতি অর্ন্তদেশীয় বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিল আগ্রা, সুরাট, মুম্বাই, কানপুর চুঁচুড়া, চন্দননগর, কোলকাতা, চেন্নাই, গোয়ালিয়র, লাহোর, ঢাকা, কাবুলে। এদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে "মারচেন্ট প্রিন্স অফ্ ইন্ডিয়া"।

আজ আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, আর্মেনিয়ান গির্জা, আর্মেনিয়ান ঘাট, আর্মেনিয়ান কলেজ, আমাদের এই শহরে বিদেশী বণিকের প্রবীণতম সাক্ষ্য বহন করছে। বড়বাজারে অবস্থিত আর্মেনিয়ান চার্চ অফ্ দ্যা হোলি নাজারেথ তৈরি হয়েছিল ১৬৮৮ সালে, কিন্তু তা আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৭২৪ সালে পুনর্নির্মাণ হয়েছিল সেই গির্জা। ১৬৩০ সালে, অর্থাৎ জোব চার্নক এই শহরে পা দেওয়ার আগে কোলকাতায় সুকিয়া সাহেবের স্ত্রী দেহরক্ষা করেছিলেন। দয়াশীল আর্মেনিয় সুকিয়া সাহেবের স্মৃতিতে রাসেল স্ট্রিটের পাশে আজকের সুকিয়া স্ট্রিট সেদিনের ইতিহাসের একটি পাতা।

১৬৯০ সালে চার্নক এলেন। এখানে ব্যাবসা করতে গেলে দরকার ফ্যাক্টরি ও দুর্গ। কেবল নৌকা চেপে আর গাছের তলায় হুঁকো খেলে বেশিদিন স্থায়ী হওয়া যাবে না। কিন্তু দুর্গটুর্গের জন্য প্রয়োজন দিল্লিতে মুঘল বাদশাহের অনুমতি। অতএব ইংরেজ শরণাপন্ন হল এক আর্মেনিয়ান খোজা ইসরায়েল সারহেদের। সারহেদ ছিলেন হুগলির ধনী ব্যবসায়ী। ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেবের নাতি আজি-উন-সান এলেন বাংলার সুবেদার হয়ে। সারহেদ ইংরেজদের দরখাস্ত নিয়ে গেলেন উন-সানের কাছে। আকবরের জীবনকাল থেকে মুঘল দরবারে আরমেনিয়ানদের খাতির। উন-সেনের জন্য সারহেদ নিয়ে গেলেন নানা উপহার, আর তার সন্তানের জন্য কিছু খেলনা।

আজিমের ছেলে সেই সময় চোদ্দ বছরের কিশোর। খুশি হয়ে আজিম মঞ্জুর করে দিলেন সেই দরখাস্ত। তার দরুন ইংরেজরা তিনটে গ্রামের স্বত্ব পেল। সুতানুটি, কোলকাতা, গোবিন্দপুর। সেটা ১৬৯৮ সাল। এর দরুন তারা স্থানীয় দেশি জমিদারের কাছ থেকে এই তিনটি গ্রাম ১৩০০ টাকা মূল্যে কিনে নিল। মুঘল দরবারে ধার্য হল বার্ষিক ১১৯৫ টাকা খাজনা। কোলকাতা মহানগরীর সূত্রপাত হয়েছিল এইভাবে।

কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলার নবাব জাফর খান রুষ্ট হলেন ইংরেজ বণিকদের উপর। জাফর খান চাইলেন ইংরেজদের এই সকল অধিকার নাকচ করতে। ইংরেজ কোম্পানি দিল্লীতে মুঘল সম্রাটের কাছে দ্বিতীয়বার দরবার করবার প্রয়োজন বোধ করল। স্থির হল ইংরেজ দূতেদের সঙ্গে খোজা সারহেদ যাবেন দিল্লীতে। যেতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে যাতে জাফর খানের কাছ থেকে কোন উপদ্রব না আসে সেই উদ্দেশ্যে আরেকজন আর্মেনিয়ান, খোজা মানুর সাহিব, দিল্লীতে সম্রাটের কাছে বলেকয়ে হুকুমনামা জারি করালেন যেন ইংরেজ দূতদের কোন বিপদ সৃষ্টি করা না হয়। সারহেদ সম্রাট ফারুক শিয়রের বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি এদেশি ভাষা রপ্ত করেছিলেন। সেই কারণে সারহেদ দূতবাহিনীতে অপরিহার্য ছিলেন।

ইংরেজদের উদ্দেশ্যে সফল হল। ১৭১৭ সালে মহামান্য ফারুক শিয়রের কাছ থেকে ইংরেজরা ফরমান পেল। সেই সুবাদে ইংরেজরা পূর্বের সব অধিকার ফিরে পেয়েছিল। উপরন্তু ফারুক শিয়র তাদের অনুমতি দিলেন হুগলি নদীর দুই তীরে ১০ মাইল পর্যন্ত ৩৮ খানা গ্রাম কিনে নেওয়ার। এর ফলে বাংলায় কোম্পানির ভবিষ্যৎ স্থায়ী ভিত পাকা হল।

সারহেদের এই ভূমিকা ঐতিহাসিকরা প্রাধান্য দেননি। তাঁরা অন্য এক কাহিনি লিখেছেন। দূত বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন ইংরেজ ডাক্তার হ্যামিলটন। বলা হয়েছে হ্যামিলটন মুঘল বাদশার অসুখ নিরাময় করে পারিতোষিকস্বরূপ আদায় করেছিলেন ফরমান। কোলকাতার সেন্ট জন চার্চের সমাধিতে হ্যামিলটনের কীর্তির কথা লেখা আছে।

আর্মেনিয়ানদের কাহিনী এখানেই কিন্তু শেষ নয়। ১৭৫৬ সালে সিরাজদৌল্লা কোলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ামে সিরাজ হানা দিলেন। ড্রেকের নেতৃত্বে ইংরেজ অধিবাসী সকলে পালিয়ে আশ্রয় নিল ফলতায়। কোলকাতার নতুন নামকরণ হল আলিনগর।( সিরাজের পিতামহের নাম) । ফলতার ইংরেজ রিফিউজি ক্যাম্পে নবাব সিরাজদৌল্লা খাদ্য সরবরাহ নিষিদ্ধ করলেন।

ইংরেজের সেই দুর্দিনে শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের মত দুই একজন অনুগত বাঙালি ব্যতিত আর্মেনিয়ান ব্যবসাদার খোজা পেটারস আরাটন গোপনে ইংরেজ শিবিরে খাবার সরবরাহ করছিলেন।

পেটারস চিঠি লিখেছিলেন মাণিকচাঁদের কাছে। উমিচাঁদ ও জগত শেঠের সাথে পরামর্শ করেছিলেন। এই ভাবে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাইভ এসে পড়া পর্যন্ত ফলতার উদ্‌বাস্তুদের বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

ক্লাইভ কোলকাতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। পেটারস ক্লাইভের সঙ্গে শলা করে সিরাজের পতনে সাহায্য করেছিলেন। এর পরে মিরজাফরকে সরানো, মিরকাশিমকে ঘায়েল করার কাজে পেটারস ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন।

কিন্তু পেটারসকে পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের চক্রান্তের শিকার হতে হল। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের পুরস্কার পাওয়া গেল না। উপরন্তু তারা পেটারসকে গুপ্তচর সন্দেহে শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। পেটারস ইংল্যান্ডে কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত লিখে তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন যে বিপদের সময় তাঁর সাহায্যের কোনো স্বীকৃতি ইংরেজ বণিকেরা দিল না। বোধ করি যে ব্যক্তি ষড়যন্ত্রকারী সে নিজেও ষড়যন্ত্রের বলি হয়। এই মত দিয়ে একাধিক ঐতিহাসিক বলেছেন যে, আর্মেনিয়ানরা বাংলায় ইংরেজদের "পলিটিকাল স্টেপিং স্টোন।"

# বিতানের কলাকুকি

ইন্দ্রশেখর

বিতানের বাবার ভুলো মন নিয়ে যা কান্ড ঘটে এক একখানা সে আর বলবার নয়। সেবার সেই বাজারে গিয়ে কার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে ভেটকি মাছের ফিলে বানিয়ে দামটাম দিয়ে তারপর পটলের দোকানে ফেলে রেখে চলে এসেছিল। অফিস চলে যাবার পর দুপুরবেলা বাড়ির দোরে কলিং বেল বাজল। সুতিদিদি তাই শুনে কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখে একটা মুশকো লোক হাতে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতে সে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে , বাবু আমার দোকানে মাছ ফেলে এসেছিলেন। দিয়ে গেলাম। সুতিদিদি লোকটাকে চা বিস্কুট খাইয়ে দিল আর তারপর মার অফিসে ফোন করে সব বলে দিল।

এমন ভুলো লোককে নিয়ে যে মাঝেমাঝেই নানান কান্ড ঘটবে সে আর আশ্চর্য কী?

সেদিন রাতের বেলা বাবা বাড়ি ফিরতে বাধল আরেক গন্ডগোল। মা বাবাকে পইপই করে বলে দিয়েছিল বিতানের টিফিনের জন্যে কিছুমিছু নিয়ে আসতে। বাবা যথারীতি বাড়িতে ঢুকেই এই অ্যাত্তোবড়ো জিভ বের করে ঘোষণা করে দিল, "এক্কেবারে ভুলে গেছি।"

মা কটমট করে তাকিয়ে বলে, "তাহলে ও কাল টিফিনে নিয়ে যাবেটা কী? আমি এখন কিচ্ছু বানাতে পারব না সে আগেই বলে দিলাম। সারাদিন খেটেখুটে এসেছি।"

বাবা টেবিলের ওপরটা একনজর তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, "কেন? ওই তো পুরুষ্টু মর্তমান কলা দেখা যাচ্ছে একছড়া। যা বাঁদর ছেলে! দুটো কলা নিয়ে চলে যাক না! ভালো খাবে।"

বিতানের খুব রাগ হয়ে গেল। বাঁদররা কি অংকে দশে নয় পায়? তোমরাই বলো? তার ওপর মা- ও ঘোষণা করে দিয়েছে যে কিচ্ছু বানাতে পারবে না।

রাগ করে বিতান বলল, "ঠিক আছে। কলাই সই। ও বেগুনীমাসী, তুমি আমায় একটু সাহায্য কর তো!"

এই বলে বিতান দৌড়ে দিদিভাইয়ের ঘরে ঢুকে কমপিউটারটা চালিয়ে দিলো। ইন্টারনেটে অনেক রেসিপি পাওয়া যায়। বিতান কি কারো ধার ধারে নাকি?

ছোটোখাটো ক'টা জিনিসের দরকার ছিলো। মাসী সেগুলো জোগাড় করে আনল। জিনিসগুলো হল, গোটা দুই পাকাকলা, একটু মাখন, খানিক ময়দা, খানিক নারকেল কোরা, চিনি, খানিক রোল করা ওট (ওটা দিদিভাইয়ের জিনিস। ওই দিয়ে সে একটা দারুণ খাবার বানায়। সে গল্প পরে কখনো হবে।)

মিক্সিতে প্রথমে মাখন আর চিনি মিশিয়ে খানিক ঘেঁটে নিয়ে কলাটা চটকে তার মধ্যে দিয়ে দিল বিতান। তারপর সেটাকে বেশ জোরে জোরে চালাল বেশ খানিকক্ষণ। শব্দ শুনে বাবা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে, "কী বানাচ্ছো? বিতানের টিফিন?"

বিতান মিক্সির মাথাটা চেপে ধরে রেখেই জবাব দিল, "আমি নিজেই বানাচ্ছি। কলা নিতে বলেছিলে, কলা দিয়েই টিফিন বানাচ্ছি। ও বেগুনীমাসী মাইক্রোওয়েভটা চালিয়ে দাও তো! ২৩০ ডিগ্রিতে গরম দেবে কিন্তু।"

"ওরে ব্বাবা। তুই এসবও জানিস? আমি তো কিচ্ছুই জানি না," বলতে বলতে বাবা টিভি দেখতে বসল গিয়ে। কথাটা অবশ্য সত্যি। বাবা নিজের জন্যে এক কাপ চা- ও বানাতে পারে না।

ওভেনের একটা ট্রে নিয়ে তাতে একফোঁটা মাখন বুলিয়ে নিল বিতান। তারপর সেটাকে রেখে দিয়ে মিক্সিতে রাখা কলাবাটাটার সঙ্গে ময়দা, নারকেল কোরা আর ওট মিশিয়ে ফের খানিক ঘরঘর করে সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেশ একটা মন্ড বানিয়ে ফেলল। এইবারে চামচে দিয়ে তার ছোট ছোট দলা করে ট্রের ওপর বেশ ফাঁকফাঁক করে সাজিয়ে ফেলল সে।

"নাও, তোমার ওভেন রেডি। কী করবে করো," বেগুনীমাসী হাঁক পাড়ছিলো। বিতান ট্রেটা নিয়ে সেখানে গিয়ে বেগুনীমাসীকে বলল, "দাও, এই ট্রেটা ওভেনে ঢুকিয়ে দাও দেখি।"

দশ মিনিটের টাইমার সেট করে দিয়ে টিভি দেখতে চলে গেলো বিতান। দশ মিনিট পরে ওভেন যে পিঁই করে ডাক দিলো, ওমনি দৌড়ে গিয়ে সেটা খুলে ট্রেটা বের করে আনতে দেখে তার ওপরে কী সুন্দর সুন্দর সুগন্ধী একরাশ কুকি।

টিভির ঘরে গন্ধটা যেতে বাবা উঠে এসে সেই দেখে তো জিভ দিয়ে জল পড়বার অবস্থা। বলে, “একটা দে না!”

বিতান একটা গরমগরম কুকি হাতে নিয়ে মুখে ঢোকাবার আগে ফুঁ দিতে দিতে বলল, “উঁহু।”

# নীলকর বিরোধী দরিদ্রবন্ধু বিশ্বনাথ সর্দার

উমা ভট্টাচার্য

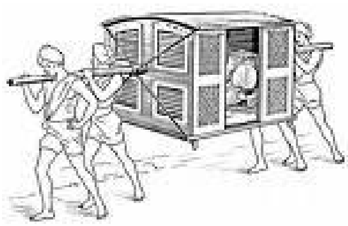

উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধ এ দেশের ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাধছে তখন সমাজের নানা স্তরে আর বিদ্রোহীদের সমর্থনে গড়ে উঠছে নানা সংগঠন। বিভিন্ন প্রতিবাদী পত্র- পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করেছেন কিছু সমাজ সচেতন মানুষ।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই শুরু হয়েছিল বাংলার বুকে ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণ, ফলে বাংলার বুকে ঘটেছিল 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (ইং ১৭৮৭, বাংলা ১১৭৬সাল)।' প্রায় এক কোটি বাঙালির মৃত্যু হয়েছিল দুর্ভিক্ষে। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই হিসেব করে দেখা গেল, পলাশীর যুদ্ধে বাংলাদেশ দখলের পর থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যেই ভারতের মানুষকে শোষণ করে প্রায় এক হাজার পঁচাশি কোটি টাকা চলে গেছে বিলেতের ভাঁড়ারে। বাংলার চাষি হয়েছে হতদরিদ্র, ভিক্ষুকের সমগোত্রীয়।

উত্তর ২৪ পরগনার উর্বর জমিতে ধানের বদলে নীলচাষ করার জন্য চাষিদের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেছিল ইংরেজরা। বাংলার উৎপাদিত যেসব জিনিসের ব্যাবসা করে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বিপুল লাভ করত ,তার মধ্যে নীল ছিল অন্যতম প্রধান।

সর্বনাশের সূত্রপাত ঘটান 'লুই বন্নো' নামে একজন ফরাসি। তিনি ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলাদেশে নীলের চাষ শুরু করলেন। সেই হল বাংলার চাষিদের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত। পরের বছরেই ক্যারেল ব্লুম নামে একজন ইংরেজ সাহেব একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন ও নীলের চাষ শুরু করেন। নীলচাষে লাভের মোটা অঙ্ক দেখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে জানালেন তিনি। আর ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ব্যাপকভাবে নীলচাষ আরম্ভ হ'ল বাংলার ধানের ক্ষেতে।

প্রয়োজনীয় শস্যের উৎপাদনের ভরাডুবি হল, আকালের দিন দেখল চাষি আর অগণিত দরিদ্র মানুষ। নীলকর সাহেব নামে এক দস্যুশ্রেণী সৃষ্টি হল, তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন বাংলার জমিদারেরা। ব্যাপকভাবে নীল চাষ শুরু হ'ল নদীয়া, খুলনা, যশোহর, উত্তর চব্বিশ পরগনায় বিস্তীর্ণ উর্বর ধানক্ষেত,ও অন্যান্য ফসলের ক্ষেতগুলি দখল করে।

নীলচাষে জমিদাররা ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী। নীলকর সাহেবরা জমির পত্তনি নিতেন জমিদারদের কাছ থেকে,জমিদার টাকা পেয়ে যেতেন। নীলকররা চাষীদের চাষের জন্য আগাম টাকা ধার দিতেন আর চুক্তিবদ্ধ করাতেন। চাষের পুরো দায়িত্ব থাকত চাষীর হাতে, ফসল উঠলে সাহেবরা চুক্তিমত হিসাব বুঝে নিতেন। খরা ,বন্যা প্রভৃতি যে কোনও কারণে উৎপাদন কম হলেও চাষীদের চুক্তিমত হিসাব মেটাতে হত, না হলে কপালে জুটত ভয়ঙ্কর অত্যাচার। চাষির হাতে নিজেদের আর পরিবারের ভরণপোষণের টাকাও থাকতো না। থাকত দাদন শোধের চিন্তা, আবার পরের দফার নীল চাষের চিন্তা। উপরি পাওনা ছিল জমিদারের রাজস্ব দেবার দায়।

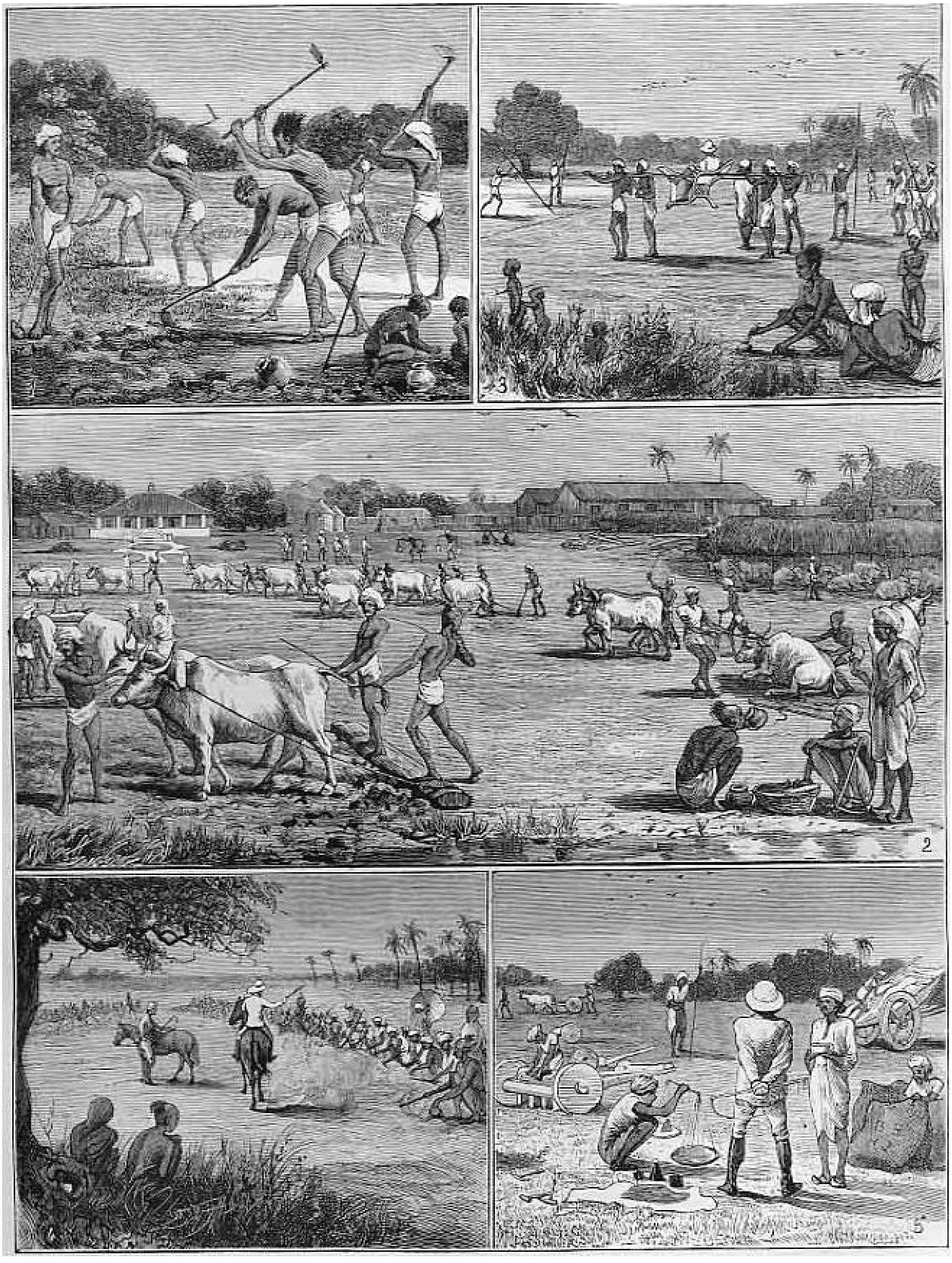



**বাংলায় নীল চাষ—উনিশ শতকের ছবি থেকে**

কপর্দকশূণ্য চাষিরা দুই তরফের সাঁড়াশি আক্রমণে মৃতপ্রায় হলেও অত্যাচার বন্ধ হত না। বহু চাষি দেনার দায়ে আর খাজনা দিতে অক্ষম হয়ে জমি হারাত। নীল চাষে আপত্তি করলে চলত শারীরিক নির্যাতন, কারাবাস, স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া। নীল চাষের চুক্তিপত্রে সই করা ছিল আজীবনের দাসখত লিখে দেওয়া।

প্রথম দিকের হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে উঠে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কৃষকরা শুরু করে পাল্টা আক্রমণ। ইংরেজ লুন্ঠনকারীদের সমান্তরালে বাংলার গ্রামে গ্রামে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এক ডাকাতশ্রেণী। এইসব ডাকাতদের অনেকেই ছিল আবার স্থানীয় জমিদারদের পোষা, তাদের লেঠেল, পাইক। বেশির ভাগই ছিল বাগ্‌দি সম্প্রদায়ের শক্তিশালী লেঠেল, যারা পাইকের কাজ, পালকির বেহারার কাজ করত।

চাষিরা সেই ডাকাতদের নেতৃত্বে এইবার পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে লাগলো নীলকুঠিতে। সেই ডাকাতদেরই একজন বিশ্বনাথ সর্দার ওরফে 'বিশে ডাকাতের' গল্প লিখছি এবারে।

এইসব ডাকাতদের মধ্যে কিছু ডাকাত ছিল যারা নিজেদের ভরণপোষণের অর্থের জন্য ডাকাতি করত। জমি হারানো নিরুপায় মানুষ ছিল এরা। আবার এদের মধ্যেই কয়েকজন ছিল রবিনহুডের মত ডাকাত- যারা দুষ্টের সম্পত্তি লুট করে, জমিদার আর নীলকরদের অত্যাচার করে,অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ আর চাষিদের বন্ধু,পরিত্রাতা হয়ে উঠেছিল।

জমিদারদের বেশির ভাগই নীলকরদের সমর্থন করেছিল। ব্যতিক্রমী ছিলেন শ্রীরামপুরের তালুকদার শিবনাথ ঘোষ, চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস আর দিগম্বর বিশ্বাস প্রমুখ অল্পসংখ্যক জমিদার,তালুকদার আর দেওয়ান। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কম ছিল। জানা যায়,স্বয়ং রামমোহন রায়, জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুররাও নীলকরদের এদেশে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৮৩৩ খ্রিঃ থেকে নীলকরদের এদেশে জমি কেনার অধিকার দেওয়া হলে, ফলে অনেক নীলকর জমিদারের সৃষ্টি হয়।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, আর বিভিন্ন সংগঠন নীলসন্ত্রাসের বিরোধিতা শুরু করার অনেক আগেই নদীয়ায় প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন 'বিশে ডাকাত',যাঁকে যমের মত ভয় পেত জমিদার, মহাজন আর নীলকর সাহেবরা। তাঁকে ডাকাত নাম দিয়ে কুখ্যাত করে দিয়েছিলেন সমাজের তথাকথিত উঁচুতলার লোকেরা।

অনেক গল্পকার আর লেখকেরা বাংলার ডাকাতদের নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন, যাতে বিশে ডাকাতের নৃশংসতার বিবরণ আর ডাকাতির গল্প সবাই মজা করে পড়ে। কিন্তু এই ডাকাতের মানবদরদি দিকটি প্রথম মানুষের সামনে আসে আনন্দবাজার ও বসুমতী পত্রিকায় (বাংলা ১৩৬৮ ১০ই বৈশাখ,আর ১৩৬৯ আষাঢ় সংখ্যায়) লেখা 'বিদ্রোহী বিশ্বনাথ' নামক প্রবন্ধর মাধ্যমে, লিখেছিলেন তাঁর জীবনীকার হারাধন দত্ত।

প্রবন্ধকার লিখেছেন,"নীলকরদের অত্যাচারে সেকালের বাংলাদেশ ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।........বিশ্বনাথের উত্থান- ভুমিতে, বিশেষ করে চূর্নী নদীর তীরে তীরে– হাঁসখালি, মন্নুরহাট, কৃষ্ণপুর, রানীনগর, চন্দননগর, চৌগাছা,খালবেলিয়া,গোবিন্দপুর, আসাননগর,প্রভৃতি গ্রামে সুবৃহৎ অট্টালিকাময় নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ আজও চোখে পড়ে......।এই নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত কেউই সেখানে ছিল না। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের অস্তিত্বই সেখানে ছিল না।

"বিশ্বনাথ সর্দারকে বাংলাদেশে নীল- আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও পথিকৃৎ বলে আমি অভিহিত করতে চাই। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশক। সেকালে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এক প্রকার অবাস্তব ছিল। বিশ্বনাথ এককভাবে সেকালের এই দুর্ধর্ষ অপ্রতিহত নীলকরদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করে 'নীল আন্দোলনের' প্রথম শহীদ হন...ডাকাত হিসাবে যে বিশ্বনাথের গল্প আমরা

শুনে এসেছি,উনিশ শতকের প্রথম দশকেই তিনি নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের লাঞ্ছিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ইংরেজ সরকারকে নানাভাবে ব্যতিবস্ত করে তোলেন। বিশ্বনাথ বাংলার নীল আন্দোলনের অগ্রপথিক—এ বিষয়ে মতান্তর হওয়ার অবকাশ নেই। বিশ্বনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি— বিশ্বনাথ বিদ্রোহী"।

বিশে ডাকাতের শুরু করা এই প্রতিবাদের ধারা বিদ্রোহের অভ্যুত্থানে পর্যবসিত হয়েছিল আরও কিছুকাল পরে । চাষিদের বিক্ষোভ ১৮৬০ সালে 'নীলবিদ্রোহে' পরিণত হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে নদীয়া জেলা, তথা সারা বাংলাদেশ থেকে নীলকুঠি বিলুপ্ত হতে থাকে।

জাতিতে বাগ্‌দি বিশ্বনাথের জন্মস্থান নদীয়া জেলার ছাপরা থানার গাদড়া- ভাতছালা নামে এক গ্রাম। হীনজাতি বলে সমাজে তাঁদের স্থান নীচেই ছিল ,বাবা- ঠাকুর্দার জীবিকা ছিল প্রধানত চাষবাস। লাঠিখেলার এই জাতি খুব দক্ষ বলে জমিদারের লেঠেল বা পাইক হিসাবেও মাঝে মাঝে কাজ জুটতো। অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণ চাষিদের মতই ছিল, সামাজিক অত্যাচার, জমিদারের শোষণও ছিল ,তার ওপরে শুরু হয়েছিল নীলবাঁদরের অত্যাচার। বিশ্বনাথ ছোট থেকেই এসব তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই বড়ো হয়ে উঠছিলেন। চাষির সন্তান, সহজেই বুঝতেন দরিদ্রের কষ্ট, তাঁর মন কাঁদতো গরিবের জন্য।

চাষের জীবিকা তাঁর পছন্দ হল না। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারী হতে গিয়ে হয়ে উঠলেন ডাকাত- ডাকাত সর্দার। কাজ হল ডাকাতির উপার্জন থেকে অকাতরে গরিব মানুষকে সাহায্য করা। লুটের মাল এনে লুণ্ঠিতদের মধ্যে বিতরণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ক্রমে কৃপণ, অনুদার জমিদারদের তিনি হয়ে উঠলেন যম। জমিদারের বা ধনীর গৃহে ডাকাতির অর্থে তাঁর কাজের বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু না খেতে পাওয়া পরিবারের মুখের অন্ন জুটেছে দিনের পর দিন, কত যে কপর্দকহীন মানুষের মেয়ের বিয়ে হয়েছে তাঁর সংখ্যা অগুণতি।

বিশ্বনাথের চেহারাও ছিল সুন্দর, বুদ্ধি আর দেহের শক্তি ছিল অসাধারণ। উদার স্বভাব, বীরের মত সুন্দর গঠন আর অকৃপণ দানের জন্য লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল 'বাবু বিশ্বনাথ'। তবে জমিদার, মহাজন, আর ইংরেজদের কাছে তাঁর পরিচয় ছিল কুখ্যাত 'বিশে ডাকাত'। প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল কোনও জমিদার বা ধনীর বাড়ি তিনি আক্রমণ করতেন না।

বিশ্বনাথের নিজের চালচলন ছিল বাবুর মতই । তাঁকে বহনের জন্য পালকি ছিল, যদিও রণপা- য় যাতায়াতে অত্যন্ত দ্রুতগতি ছিল তাঁর। এক রাতে বিশ ক্রোশ পথ গিয়ে আবার ফিরে আসতেন রণপা- য়। দক্ষ ছিলেন তরোয়াল আর লাঠিচালনায়।

অকস্মাৎ কারও বাড়ি আক্রমণ করা ছিল তাঁর রীতি বিরুদ্ধ। আগে থেকে চিঠি দিয়ে দিনক্ষণ জানিয়ে তবে ডাকাতি করতে যেতেন,এতটাই ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস। তবে চিঠিতে স্পষ্ট নির্দেশ থাকতো কোতোয়ালিতে না জানাতে। এর অন্যথা হলে নৃশংসতায় যে কতখানি হৃদয়হীন ছিলেন তা প্রকাশ হত তাঁর প্রতিশোধ নেবার কঠোরতা থেকে। ডাকাতি করতে গেলে গৃহস্বামী তাঁকে নির্বিবাদে প্রার্থিত অর্থ ও সামগ্রী দিয়ে দিলে বাড়ির কারও গায়ে একটি আঁচড়ও কাটতো না তাঁর দল। কোনও গরিব মানুষ বা পথচারীর উপর তিনি কখনো অত্যাচার করেননি । তাঁর দলে হাজারখানেক শক্তপোক্ত ডাকাত যুবক ছিল। প্রত্যেকে লাঠি, তরোয়াল চালানোয় দক্ষ ছিল।

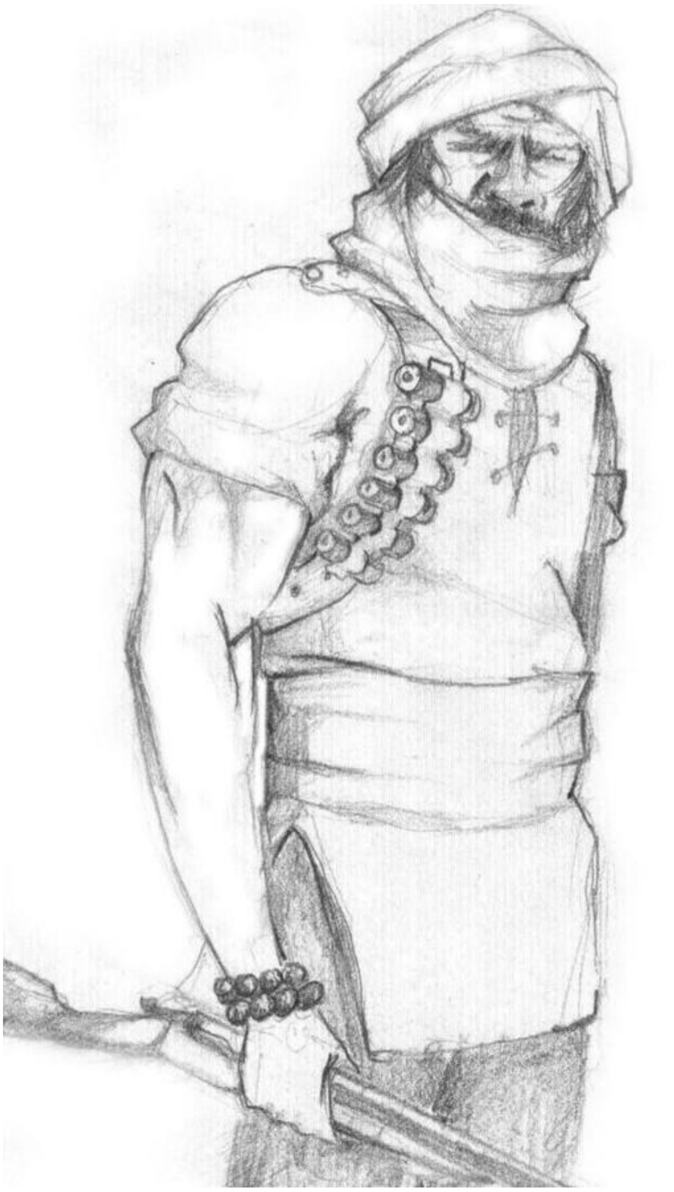

তাঁর সহযোগীদের মধ্যে বলবান আর বিশ্বস্ত ছিল মেঘা, কৃষ্ণসর্দার, সন্ন্যাসী, নলদা। এদের এক একজন এক এক বিষয়ে পারদর্শী ছিল। যেমন ধরো নলদা-- সে দীর্ঘসময় জলের তলায় ডুব দিয়ে থাকতে পারতো।

দলের প্রায় সব বলবান সদস্যই সর্বদা সশস্ত্র হয়ে প্রস্তুত থাকতো ,যেন কোথাও কোনও অত্যাচারের কথা জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে পৌঁছে যেতে পারে, অত্যাচারীর হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে। দলের সদস্যদের উপর তাঁর কঠোর আদেশ ছিল, কেউ যেন কখনও শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ আর গোমাতার প্রতি কোনও অত্যাচার না করে। তাদের স্পর্শও না করে। সে নির্দেশ সারা জীবন সকলে পালন করেছিল। বিশ্বনাথ লুন্ঠিত অর্থ বিতরণ ছাড়াও দুঃখী ,নিঃস্ব মানুষদের সারা বছরের কষ্টের জীবনে একটু আনন্দের ছোঁয়া দিতে প্রতি বছর বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গাপূজার আয়োজন করতেন। এই উপলক্ষে সাধারণ মানুষদের খাওয়াতেন, নিজে হাতে বৃদ্ধ,পঙ্গু,শিশু, আর দুর্গত মানুষজনকে নগদ টাকা ,আর বস্ত্র বিতরণ করতেন। একবার কালীপূজায় গরিব মানুষদের খাওয়ানো আর সাহায্য দেবার জন্য টাকার অভাব হ'ল। এমন সময় তাঁর গুপ্তচরের মুখে খবর পেলেন যে,কালনার গদিতে সেইদিন পাশের গ্রামের বৈদ্যপুরের নন্দীরা দশ হাজার টাকা জমা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জনাকয়েক সঙ্গী নিয়ে নৌকায় কালনায় পৌঁছে গেলেন। প্রথমে গেলেন স্থানীয় দারোগার কাছে,দারোগাকে ধরে নিয়ে গদিতে হাজির হয়ে দারোগার সামনে সেই গদি লুট করে টাকা নিয়ে ফিরে গিয়ে দরিদ্র নারায়ণের সেবা সম্পন্ন করলেন। দারোগাকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেন যে, দারোগার উপস্থিতিতে তাঁরই সহযোগিতায় এই গদি লুট করা হয়েছে একটি ভালো কাজের জন্য। ফলে তাঁর অনুষ্ঠানের সময় কোনও গোলযোগ উপস্থিত হয়নি, মানুষজন শান্তিতে খেয়েদেয়ে আনন্দ করে গেছে আর তাঁর কীর্তিও প্রকাশ হয়নি।

এইসময় শুধু নীলকর সাহেবরা চাষীদের অত্যাচার করত তা নয়, নদীয়া শান্তিপুরের তাঁতীদের অবস্থাও ছিল করুণ। তাঁদের নিজেদের তাঁতে বোনা উৎকৃষ্ট কাপড় ইংরেজ ব্যবসায়ী কুঠিয়ালরা জোর করে অতি অল্প দামে নিয়ে নিত ,আর সেগুলি নিজেদের দেশে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করতো। মূলধনের অভাবে তাঁতীরা নিঃসম্বল হয়ে কাজ বন্ধ করলে তাদের বাধ্য করতো দাদন নিয়ে তাঁত বুনতে, ফলে তাঁতীরা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে অভাব আর দারিদ্র্যের শিকার হতে লাগল। দেনার দায়ে তাদের জমিও চলে যেতে লাগল কুঠিয়াল আর জমিদারদের হাতে। শান্তিপুরের তাঁত প্রায় ধ্বংস হতে চললো দেখে আর তাঁতীতের দুর্দশা দেখে তিনি অত্যাচারী ইংরেজ সাহেবদের উপর প্রতিশোধ নিতে শুরু

করলেন। বিশ্বনাথ পরপর কয়েকটি কুঠি লুট করলেন,আর সেই লুটের অর্থ অসহায় তাঁতীদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। কুঠির অত্যাচারী বাঙালি কর্মচারীদের ধরে এনে শাস্তি দিলেন। এই ঘটনার ফলে কুঠির মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হল।

এরপর নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে নদীয়া জেলার চাষিদের বাঁচাবার জন্য নিজস্ব উপায়ে, নিজের দলবল নিয়ে চেষ্টা শুরু করলেন।এর আগে বিভিন্ন জায়গার কুঠিয়ালদের আক্রমণ আর কুঠির সঞ্চয় লুন্ঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর কার্যকলাপ। এবার ঠিক করলেন নীলকর সাহেবদের জব্দ করতে হবে,কারণ নীলকরদের অত্যাচার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল।

সেই সময় নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ইলিয়টের বাংলোর পাশেই ছিল অত্যাচারী নীলকর সাহেব স্যামুয়েল ফেডির কুঠি। ফেডি সাহেব তাঁর এক পাইকের সাহায্যে বিশ্বনাথের দলের একজনকে ধরে পুলিশের হাতে দিয়েছিলেন। দলের সদস্যকে ছাড়াতে না পেরে , সেই পাইকের খোঁজ করে জানতে পারলেন পাইক নিরাপদে আছে ফেডির কুঠিবাড়িতে। সেটা ১৮০৭/১৮০৮ সালের ঘটনা।এক রাতে সেই পাইকের খোঁজে বিশ্বনাথ ফেডির কুঠি আক্রমণ করলেন ও লুট করলেন। ফেডির কয়েকজন কর্মী নিহত হল। মিসেস ফেডি পুকুরের জলে নেমে কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জীবন বাঁচালেন। বিশ্বনাথ মিসেস ফেডির যাতে কোন ক্ষতি না হয় তাঁর ব্যবস্থা করলেন। বিশ্বনাথের মুসলমান অনুচর মেঘা ফেডিকে বন্দি করে নিয়ে এল বাগ্‌দেবীর খাল ব'লে এক খালের পাশের জঙ্গলে । সেখানে ফেডির বিচার হবে। দলের সবাই একমত ,ফেডিকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হোক।

ফেডি প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন। বিশ্বনাথ অযথা নরহত্যা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ফেডির পরিবারের কথা চিন্তা করে দয়া করে, দলের সকলের অমতেও ফেডির প্রাণরক্ষা করলেন। ফেডি প্রতিজ্ঞা করলেন যে এই ঘটনার কথা কোথাও প্রকাশ করবেন না। ফেডির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সবাই সন্দেহ প্রকাশ করলেও ফেডি ছাড়া পেলেন এবং সেখান থেকে বেরিয়েই জেলা শাসক ইলিয়টের কাছে বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন ও বিশ্বাসঘাতকতা করে বিশ্বনাথকে ধরিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়েই বিশ্বনাথ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে উঠে পড়ে লাগলেন। নদীয়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়,যে বিশ্বনাথ ১৮০৮ খ্রিঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর শেষ রাতে ফেডির কুঠি আক্রমণ করেন। বন্দুকের শব্দে মিঃ ফেডিরা জেগে দেখেন তাঁদের বাংলো ডাকাতেরা ঘিরে ফেলেছে। প্রবল প্রতিরোধের মধ্যেও সদলে বাংলোর মধ্যে ঢুকে পরলেন বিশ্বনাথ , বন্দি করলেন ফেডিকে। ফেডির সঙ্গী মিঃ লেডিয়ার্ডকে বল্লমের আঘাতে আহত করে তারা ফেডির যে পাইক তাদের দলের একজনকে ধরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে বের করে দিতে বললেন ও ফেডিকে দিয়ে কোষাগার খুলিয়ে টাকাপয়সা লুট করলেন। প্রায় সাতশো টাকা আর কিছু অস্ত্রশস্ত্র লুট করে নিয়ে ভোরের আলো ফুটতেই আহত ফেডিদের ফেলে চলে গেলেন।

শান্তিপুরের কুঠি আর ফেডির কুঠি লুট হওয়ার পরে আতঙ্কে অস্থির হয়ে,ভীত সন্ত্রস্ত্র শাসকেরা বিশ্বনাথ আর তাঁর দলবলকে গ্রেপ্তার করে তাঁর দলকে ভেঙে দেবার নানা ফন্দি করতে লাগলো। বাংলা সরকার ব্ল্যাকওয়ার নামে এক ইংরেজ সেনাপতির নেতৃত্বে একটি ইংরেজ সৈন্যদল আর কিছু দেশীয় সেপাই পাঠালেন নদীয়ায়। তাঁরা গুপ্তচর লাগালেন বিশ্বনাথের খোঁজে। এইসময় একদিন এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে তাঁর কিছু সহচর বন্দি হলেন ইংরেজ সেনার হাতে। তাদের মধ্যে ছিল অপুত্রক বিশ্বনাথের পালিত পুত্র বৈদ্যনাথও। সে পুলিশের চাপে,আর পুরস্কারের লোভে বিশ্বনাথের গোপন আস্তানার খবর বলে দেয় পুলিশকে।

সেই খবরের সুত্রে পুলিশবাহিনী নদীয়া জেলার কুনিয়ার নিকটের এক জঙ্গলে বিশ্বনাথ আর তাঁর অনুচরদের অবরুদ্ধ ক'রে তাদের ধরে ফেলে। সাহসী বিশ্বনাথ দলের সদস্যদের বাঁচাবার জন্য তাঁর

দলের সব কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে তাদের মুক্তি দেবার আবেদন করলেন। অনুচরদের নিজ নিজ আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে বিশ্বনাথ জেলাশাসকের কাছে আত্মসমর্পন করলেন। তবে ফেডির সামনে হাজির হয়ে ফেডিকে তিরস্কার করে বললেন, 'সাহেব তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এক জঘন্য অপরাধ করেছ। কিন্তু আমি কোনদিন কোন অন্যায়ের পোষকতা করিনি। আমি আজ পর্যন্ত যা করেছি,তা অগণিত অত্যাচারিত মানুষের কল্যানের জন্যই করেছি।এই কল্যাণকর কাজের জন্য যে কোনও শাস্তি আমি সহাস্যে মাথা পেতে নেব'। (তাঁর এইরূপ সততার কথা জানা গেছে শ্রী বিমলেন্দু কয়ালের লেখা 'বিশে ডাকাত' প্রবন্ধ থেকে।)

বলাবাহুল্য, বিশ্বনাথ আর তাঁর বারোজন সঙ্গীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। বাঁশবেড়িয়া কুঠির দক্ষিণে গঙ্গার তীরে, নদীয়া জেলার ঠকবগের খালের ধারের মাঠে,প্রকাশ্যে বটগাছের ডালে তাদের ফাঁসি দেওয়া হ'ল। তাতেও তৃপ্ত হয়নি ইংরেজরা। তাঁদের মৃতদেহ লোহার খাঁচায় পুরে বটগাছের ডালে কয়েকদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, সব প্রতিবাদি মানুষের কণ্ঠরোধ করার জন্য। শোনা যায় পুত্রশোকে পাগল বিশ্বনাথের মা সৎকারের জন্য ছেলের কঙ্কালটি ভিক্ষা চেয়েছিলেন। সুসভ্য ইংরেজ সরকার মায়ের সেই আকুল আবেদন গ্রাহ্য করে মৃতের প্রতি সম্মান দেখানোর সাহসটুকুও করেনি।

সেদিন সারা বাংলার দরিদ্র আর উপকৃত অসহায় মানুষেরা তাদের ভরসার মানুষ বিশ্বনাথের জন্য শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছিল।কিন্তু প্রকাশ করতে পারেনি,উৎপীড়নের ভয়ে। এইভাবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল বাংলার 'প্রথম নীলকর বিরোধী শহীদ' বিশ্বনাথ সর্দারের জীবন- যাঁকে সবাই জানতো কুখ্যাত 'বিশে ডাকাত' বলে ।

সিনেমা হল

# সামার ডেজ উইথ কু

মহাশ্বেতা

জাপানি অ্যানিমেশনের ছবি বলতেই প্রথম যে নামটা সবার মাথায় আসে, সেটা হল হায়াও মিয়াজাকি। তাঁর বানানো 'মাই নেইবার টোটোরো', 'স্পিরিটেড আওয়ে' অথবা 'হাউলস মুভিং কাসেল' –এদের কোন তুলনা নেই। যেমন বিচিত্র তাদের রঙ, তেমন সুন্দর ও মানবিক তাদের গল্প। একই সঙ্গে বিনোদনও কোন দিক থেকে কম নয়। কিন্তু অ্যানিমেটেড ছবির এই ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু তিনি একা নন। আরও অনেকে রয়েছেন যাদের তৈরি ছবি জাপানের বাইরে খুব বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। এরকমই একটি ছবি হল 'সামার ডেজ উইথ কু'।

ভারতীয় টেলিভিশনে বেশ কয়েক বছর আগে এই ছবিটি দেখানো হয়েছিল। তখনই কিছু অংশ দেখেছিলাম। পুরোটা দেখার ধৈর্য হয়নি। কিন্তু মনে ছিল গল্পটির আপাত সারল্য ও অ্যানিমেশনের জোরের জন্য। এতদিন পর আবার দেখে ভীষণ ভাল লাগল। এটি একটি কাপ্পার গল্প। কাপ্পা জানো তো? জাপানি এক ধরণের ভূত। ব্যাং ও কচ্ছপ মিশিয়ে দিয়ে যদি দুই পায়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা কাপ্পার মত দেখতে হবে। এরা উভচর। খুব ভাল সাঁতরায়। আর মাথায় তাদের একটা বাটি। যাতে জল থাকলে এরা ভাল থাকে। যাই হোক, এই কাপ্পাটার নাম কু। কয়েকশো বছর আগে একটা বিরাট ভূমিকম্পে মাটির তলায় ফসিল হয়ে আটকে ছিল সে। অনেকদিন পর একটা ছোট্ট ছেলে তাকে নদীর পাড়ে আবিষ্কার করে। তারপর বাড়ি নিয়ে এসে জলে ফেলে দিতেই আবার সে চাঙ্গা! উঠে বসে, হাঁটে চলে, কথা বলে। প্রথমে বাড়ির লোক ঘাবড়ে গেলেও পরে তাদের সাথে ভাব হয়ে যায় কু- এর। সবাই তাকে বাড়ির ছেলে হিসেবেই মেনে নেয়। কিন্তু সব চেয়ে বেশি বন্ধুত্ব তার হয় বাড়ির পোষা কুকুর ওসান- এর সঙ্গে।

প্রায় শ- খানেক বছর পর মাটির তলা থেকে বেরিয়ে চারিদিক দেখে তো অবাক কু। কোথায় তার পুরোন সেই জলাভূমি যেখানে এক সময় তার বাবার সাথে থাকত সে? চারিদিকে এখন শুধু ইঁট ও কংক্রিটের জঙ্গল। খুব দুঃখ হয় তার। কিন্তু তাতেই তার কষ্টের শেষ নয়। আস্তে আস্তে যখন তার ব্যাপারে জানাজানি হয়ে যায়, চারিদিক থেকে মিডিয়া, খবর কাগজের লোকেরা ছেঁকে ধরে তাদের বাড়িটাকে। চাপ আসতে থাকে বাবার কর্মক্ষেত্র থেকে- তাদের পোষা কাপ্পাটাকে টিভিতে দেখানো হোক, তাকে করে তোলা হোক বাণিজ্যের একটা উপকরণ। মানুষের অপরিসীম লোভের সম্মুখীন হয় সে। বাঁচার ইচ্ছা চলে যায় তার। পালিয়ে গিয়ে কোনরকমে উঠে পড়ে একটা অসম্পূর্ণ লোহার টাওয়ারে। যখন সে মরে যাওয়ার কথা ভাবছে, তখনি হঠাৎ আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে যায় অদ্ভুত এক কালো মেঘ আর শুরু হয় বৃষ্টি। তার মধ্যে দিয়ে

উড়ে আসে এক অদ্ভুত, আশ্চর্য ড্রাগন। প্রকৃতিই যেন এই ড্রাগনের রূপ নিয়ে দেখা দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চায় এই কাপ্পা শিশুটিকে। দৃশ্যটি দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছিল।

কিন্তু এতেই শেষ নয়। এরপর কু নামের কাপ্পাটির ও তার আশ্রয়দাতা পরিবারের কী হয় তা জানতে এই ছবিটা দেখে ফেল। খুব ভাল লাগবে। পরিবেশ সচেতনতার বার্তা যে এত সুন্দরভাবে দেওয়া যায়, তা এই ছবিটি না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। বড় মরমী ছবিটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলে খুব আনন্দ হয়। তোমরা দেখে জানিও জয়ঢাককে কীরকম লাগল।

কিছু তথ্যঃ

নামঃ Summer Days with Coo ( জাপানিতে- Kappa no ku to natsu yasumi)

পরিচালনাঃ কেইচি হারা

সালঃ ২০০৭

রেটিং- কয়েকটা জায়গা বাবা মায়ের সাথে দেখলেই ভাল

পূর্বপ্রকাশিতের পর

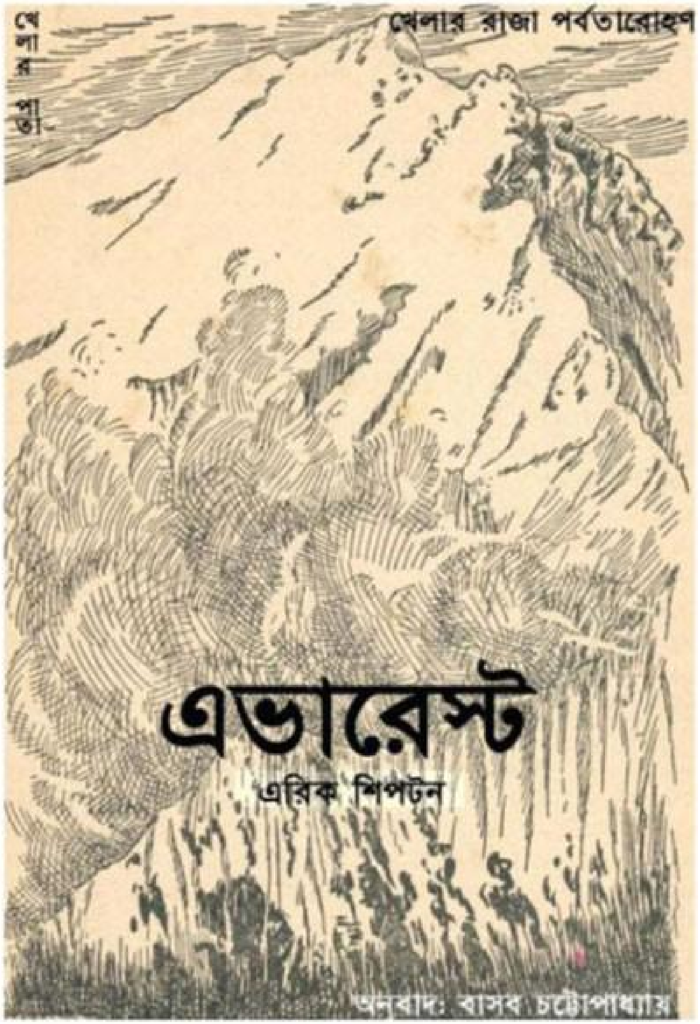


পাহাড়ের দুটি পৃষ্ঠতলের একটি অপরটি থেকে চার ফুট উঁচু। এখানেই পঞ্চম শিবির স্থাপন করা হল। দুটি তলেই অনেকখানি জায়গা থাকায় অভিযাত্রীরা অনায়াসেই দুটি তাঁবু ফেললেন। ষোলো পাউন্ড ওজনের এই তাঁবুগুলির এক একটির উচ্চতা 4 ফুট, দৈর্ঘ্যে 6’6’’, প্রস্থে 4 ফুট।

সেই রাত্রি এবং পরবর্তী অধিকাংশ দিন তুষারঝড়ের কবলে পড়ে অভিযাত্রীদের অগ্রগতি সম্ভব হল না। এমনকী অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় নেমে আসাও সম্ভব হল না। সুক্ষ বরফের কণা তাঁবুর পাতলা আচ্ছাদন ভেদ করে খোলা স্লিপিং ব্যাগের ভিতরেও প্রবেশ করতে থাকল। গিরিশিরার শীর্ষে তখন আমরা প্রবল ঝড়ের সম্মুখীন। ধারাবাহিক বাতাসের গর্জন আর আঘাতে তাঁবু ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। দলের একজন তাঁবুর একপ্রান্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও তাঁবুটি ভেঙে যাবার উপক্রম হল।

বাইরে স্মাইথ আপ্রাণ লড়াই করে এই অবস্থার সাথে যুঝতে চাইলেন। তাঁবুর ভিতরে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে অতবড় তাঁবু ধরে রাখাতে আমিও দিশেহারা। স্মাইথ কয়েক মিনিটের জন্য তাঁবুর বাইরে যেতেই তার হাত এবং পায়ের আঙুলে রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হল। তাঁবুতে ফিরতেই স্মাইথের অসাড় আঙুলগুলিতে সাড় আনতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকলাম।

২৪ তারিখের সন্ধ্যায় সেই ঝোড়ো হাওয়া বন্ধ হল। স্তব্ধ শান্ততা বিরাজ করছে তখন চারদিকে। আমরা তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে তাকালাম। মেঘের দল আমাদের সঙ্গ ছেড়ে বেশ কিছুটা নীচে। আমাদের থেকে শীর্ষের দূরত্ব ক্রমশ কমতে থাকল। স্মাইথ এবং আমি আলোচনা করলাম পঞ্চম শিবির থেকে শীর্ষারোহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক হবে না। আবার অতিউচ্চতার কারণে বিলম্বে অগ্রসর হওয়া আমাদের অভিযানের সাফল্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এই মুহূর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত কী হবে তা মুলতুবি রাখলাম; আমাদের উচিত এখনই বার্নি, বউস্টার্ড এবং মালবাহকদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে ষষ্ঠ শিবির স্থাপন করা এবং নিজেদের মানসিক, শারীরিক

অবস্থা বুঝে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া। আমরা অনুভব করলাম যে পরামর্শ আমরা নিজেদের মধ্যে করেছি তা সর্বৈব হতাশাজনক প্রস্তাবের নিদর্শন।

কিন্তু পরের দিন ভোরে আমরা অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিতেই পুনরায় প্রবল ঝড় শুরু হল। প্রকৃতির কাছে আমরা কতটা অসহায়, তাঁবুর বাইরে দাঁড়াতেই তুষার ঝড়ের দাপটে তা টের পেলাম। অনন্যোপায় হয়ে বাকিরা তখন পঞ্চম শিবিরে তিন রাত কাটিয়ে ফেলেছেন। তুষারঝড়ে শেরপারা অকল্পনীয় ক্লান্তিতে বিধ্বস্ত এবং তাদের কেউ কেউ তুষারক্ষতে (Frostbite) ক্ষতবিক্ষত। আদৌ এই আবহাওয়া কবে শান্ত হবে, এই ব্যাপারে অভিযাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। পঞ্চম শিবিরে মালবাহকদের আরও একটা দিন থাকতে বলতে আমরা যথেষ্ট দ্বিধায় পড়লাম; যেখানে আমরাই এই শিবিরে রাত কাটানো নিরাপদ মনে করছি না। এই তীক্ষ্ণ ঝোড়ো বাতাসের কামড়ে প্রতি মুহূর্তে শক্তিক্ষয় করতে থাকলাম। এবং আমরা কেউই পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সুস্থ ছিলাম না।

সেই মুহূর্তে নর্থ কলে তুষারপাত শুরু হল। তুষারধ্বসে নিমজ্জিত হয়ে চতুর্থ শিবির তখন বিপজ্জনক। ঐ দিনই, ২৬ শে মে তাঁবু এবং যাবতীয় অভিযানের সাজসরঞ্জাম কলের চূড়ায় স্থানান্তরিত করে অভিযাত্রী রাটলেজ, গ্রিনি, ক্রুফর্ড এবং ব্রুকলব্যাঙ্কদের তত্ত্বাবধানে অবসন্ন মালবাহকদের তৃতীয় শিবিরে নামিয়ে আনা হল। এদের মধ্যে কেউ কেউ শারীরিকভাবে এতই দুর্বল যে প্রতি পদক্ষেপ অভিযাত্রীদের সহযোগিতা ব্যতিত অবরোহণ প্রায় অসম্ভব।

মালবাহকদের সাথে সংযোগ রক্ষা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন বার্নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে বার্নি খুবই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। বার্নির তখন সুস্থ সবল অনেকজন মালবাহক প্রয়োজন। যাঁদের সহযোগিতায় ষষ্ঠ শিবির স্থাপনের জন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে। শেরপাদের মধ্যে আংতাকে এবং কিপা সাহসিকতা এবং আনুগত্যের চরম উদাহরণ রাখলেন। উচ্চতর শিবিরে যেতে সম্মত হয়ে অভিযাত্রীদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। সত্যই আমাদের শেরপাদের মধ্যে বাস্তবে যা প্রত্যাশিত ছিল না, তাই করে দেখালেন ঐ অসীম সাহসী দুই শেরপা। মালবাহক এবং আমাদের কাছেও ছিল যা দৃষ্টান্তমূলক অনুপ্রেরণা।

২৮ তারিখ ৮জন মালবাহকসহ বার্নি, লংল্যান্ড, ওয়েগার এবং ওয়েন হ্যারিস পঞ্চম শিবিরের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আমি এবং স্মাইথ ২৯ তারিখ তাঁদের অনুসরণ করলাম। ঐ মুহূর্তে হাওয়ার বেগ তুলনায় কম ছিল। পাঁচ ঘন্টা আরোহণের পর আমরা পঞ্চম শিবিরে পৌঁছলাম। সেদিনের পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খ সফল হওয়ায় আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। সামনের দিনে পঞ্চম শিবির থেকে শীর্ষারোহণ পর্যন্ত অভিযাত্রীদের যাতে মালবাহক সংক্রান্ত কোনও সমস্যায় না পড়তে হয় –এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ অপ্রাপণীয় প্রশংসার কাজের জন্য বার্নিকে সদাসতর্ক থাকতে হল।

ক্রমশ

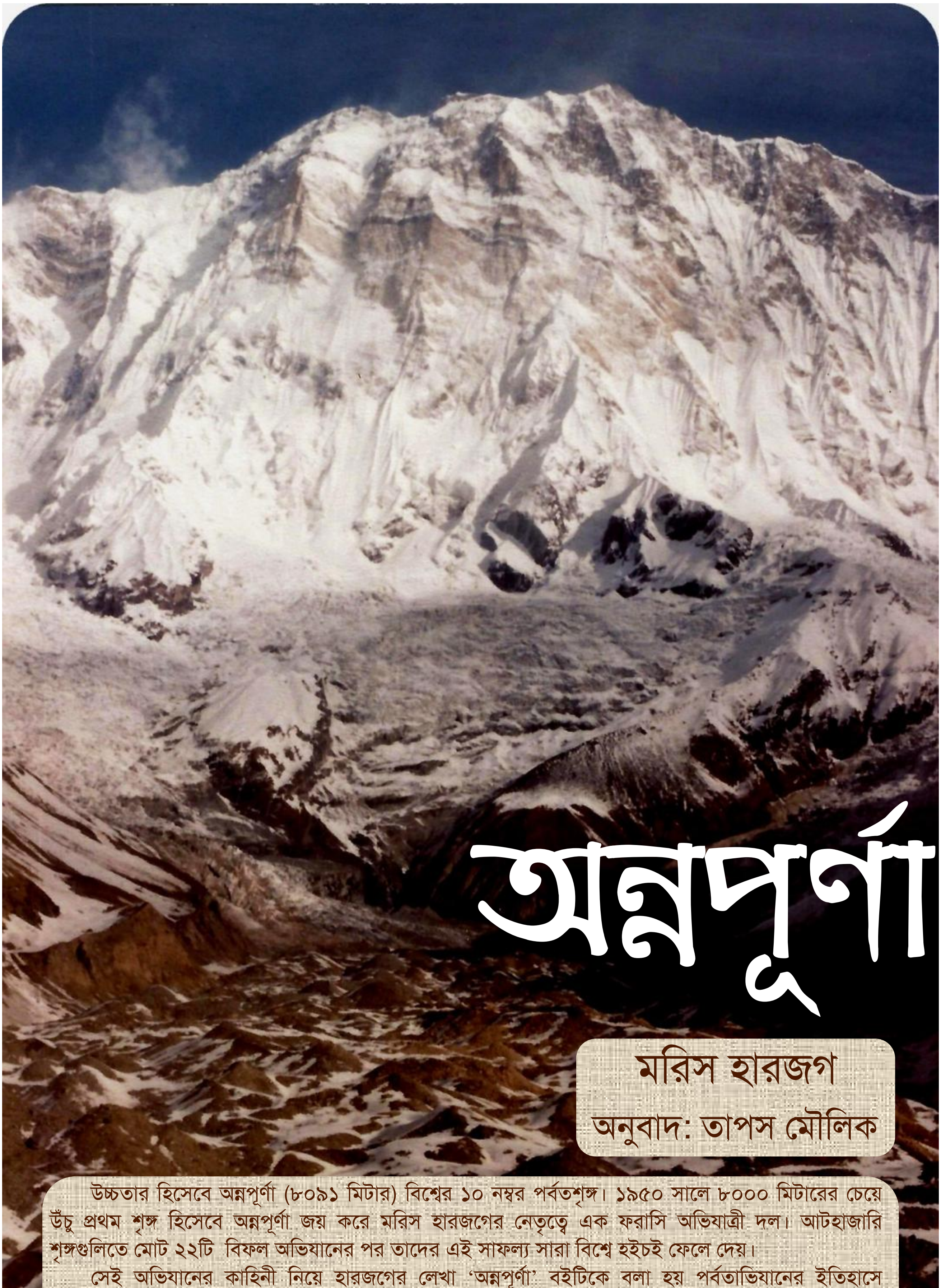

# অন্নপূর্ণা

মরিস হারজগ

অনুবাদ: তাপস মৌলিক

উচ্চতার হিসেবে অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) বিশ্বের ১০ নম্বর পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৫০ সালে ৮০০০ মিটারের চেয়ে উঁচু প্রথম শৃঙ্গ হিসেবে অন্নপূর্ণা জয় করে মরিস হারজগের নেতৃত্বে এক ফরাসি অভিযাত্রী দল। আটহাজারি শৃঙ্গগুলিতে মোট ২২টি বিফল অভিযানের পর তাদের এই সাফল্য সারা বিশ্বে হইচই ফেলে দেয়।

সেই অভিযানের কাহিনী নিয়ে হারজগের লেখা ‘অন্নপূর্ণা’ বইটিকে বলা হয় পর্বতাভিযানের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী বই। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বিশ্বসেরা ১০০টি অভিযান কাহিনীর মধ্যে ‘অন্নপূর্ণা’- কে ছ’নম্বরে স্থান দিয়েছে। পৃথিবীর ৪০টি ভাষায় অনুবাদ হওয়া বইটি বিক্রি হয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি কপি।

‘জয়ঢাক’- এর পাতায় ধারাবাহিকভাবে চলছে সেই রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। এবার দ্বিতীয় পর্ব।

শীর্ষচিত্রঃ অন্নপূর্ণা দক্ষিণগাত্র, ফোটোঃ তাপস মৌলিক

দুই দলে ভাগ হয়ে আমরা তানসিং ছাড়লাম। ল্যাচেনাল আর টেরের 'অ্যাডভান্স পার্টি' একদিন আগে রওনা হল। পরদিন রওনা হয়েছি, দুপুর নাগাদ দেখি উল্টোদিক থেকে একটা জংলিমতো লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে অবাক হয়ে দেখি টেরে। খালি গা, পরনে শুধু একটা হাফপ্যান্ট, একগাল দাড়ির সাথে ন্যাড়ামাথা, মুখচোখ ঘামে জবজব করছে। প্রচণ্ড রেগে আছে মনে হল, এত জোরে আইসঅ্যাক্সটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে আসছিল যে সবাই সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দিল। ব্যাপারটা কী? কোনও বিপদ- আপদ হল নাকি? ল্যাচেনালের জন্য হঠাৎ খুব চিন্তা হল। টেরেকে বললাম, "কী হল? ল্যাচেনাল কোথায়?"

"ল্যাচেনাল ঠিকই আছে। কুলিরা স্ট্রাইক করেছে।"

"সে কী! মালপত্রের কী অবস্থা?"

"পাহারা দিচ্ছে ল্যাচেনাল। সে সব নিয়ে চিন্তা নেই, কুলিরা কোনও ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না। ওদের আরও পয়সা চাই, ওদের . . ভগবান জানে আর কী কী চাই, কথাবার্তা তো একবিন্দু বুঝি না ছাই! ওয়েগার কাছে রাস্তার ধারে সব বসে পড়েছে। এক পা- ও যাবে না বলছে আর। মালপত্র সব নামিয়ে দিয়েছে। এ তো রীতিমতো বিশ্বাসঘাতকতা, ব্ল্যাকমেল!"

"এ সব জি বি'র ব্যাপার। ও গিয়ে সামলাবে।"

"জি বি? সে কিছু করতে পারবে বলে তো মনে হয় না।"

"দেখা যাক না। কুলিদের ওপর ওর কর্তৃত্ব কতটা সেটা তো বোঝা যাবে।"

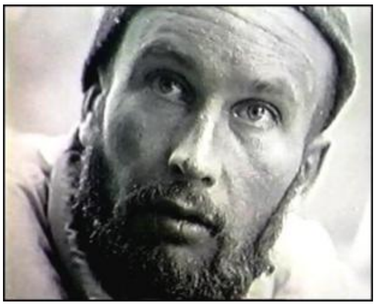

লায়োনেল টেরে

সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিলাম আমরা। শেষ বিকেলে ধর্মঘটী কুলিদের দেখা পেলাম। সদা হাসিখুশি ল্যাচেনাল দেখলাম খুব বিমর্ষভাবে বসে আছে। জি বিকে দেখে কুলিরা একসাথে জড়ো হয়ে তুমুল চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে তাদের দাবিদাওয়া জানাতে আরম্ভ করল। আমরা আরাম করে ছায়ায় বসে খাবারদাবার বার করলাম, যেন বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নি। যত আমাদের চিন্তিত দেখবে তত ওদের দাবিদাওয়া বাড়বে। তাই সচেতনভাবে অনেকটা সময় নিয়ে জুতো- টুতো খুলে পা ছড়িয়ে বসলাম।

তারপর জি বি'র খেল দেখলাম। প্রায় আধঘণ্টা ধরে কথার তোড়ে যেভাবে জি বি কুলিদের ভাসিয়ে দিল তা জীবনে ভুলব না। ও কী বলছে সেটা যদিও আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। প্রথমে খুব শান্তভাবে শুরু করে ধীরে ধীরে ওর গলা চড়তে লাগল, তারপর হঠাৎ একেবারে ঘূর্ণিঝড়। শেষ বিকেলের সেই প্রাগৈতিহাসিক গিরিখাত তার কণ্ঠস্বর দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত করতে লাগল। কুলিদের সোচ্চার দাবিদাওয়া ম্যাজিকের মতো আবেদন নিবেদনে পরিণত হল। নাঃ, জি বি'র কর্তৃত্ব নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। হঠাৎ একজন কুলি কিছু একটা বলল, গালিগালাজ গোছের কিছু হবে, আর আমরা অবাক হয়ে দেখলাম জি বি তৎক্ষণাৎ তার ওপর চড়াও হয়ে মেরেধরে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। কাজ হল। একে একে কুলিরা তাদের বোঝা তুলে নিয়ে সামনে রওনা হল।

১৬ই এপ্রিল, রোববার, বাগলুং পৌঁছলাম। উচ্চতর উপত্যকায় পৌঁছনোর পথে বাগলুং এ রাস্তায় শেষ গ্রাম। তুকুচা আর তিন- চার দিনের পথ। কিন্তু এই দিনচারেকের রাস্তাই সবচেয়ে কঠিন, কারণ প্রায় ২০০০ ফিট থেকে আমাদের উঠতে হবে ৮০০০ ফিট উচ্চতায়।

পরদিন সকালে নোয়েলের চিৎকারে ঘুম ভাঙল, "আরে দেখো দেখো, ধৌলাগিরি।"

ধৌলাগিরি? সত্যি! হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই গায়ে জড়িয়ে সবাই হুড়মুড় করে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। কেউ কেউ তো স্লিপিং ব্যাগ শুদ্ধ স্যাক রেসের মত লম্ফ দিতে দিতে বেরোল।

দেখি সূর্যের আলোয় স্ফটিকের মতো ঝকমক করছে এক অভাবনীয় উচ্চতার বরফের পিরামিড, তার চূড়াটা আমাদের থেকে ২৩০০০ ফিটেরও বেশি উঁচুতে, ভোরের আলো আর কুয়াশায় তার অপার্থিব নীলাভ দক্ষিণগাত্র আমাদের সামনে। আমরা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। ধৌলাগিরি নিয়ে আমরা প্রচুর আলোচনা করেছি, প্রচুর কথাবার্তা বলেছি, কিন্তু বাস্তবে যখন তার সামনে দাঁড়ালাম তখন আমাদের কারও মুখে আর কোনও কথা সরল না। তারপর . . সমস্ত আবেগ আর নান্দনিক প্রতিক্রিয়া ছাপিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের মনে পড়ল, আমরা কী করতে এখানে এসেছি! আর সেই দৈত্যাকৃতি বস্তুটিকে আমরা পর্বতাভিযাত্রীর দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম।

"পূর্বদিকের গিরিশিরাটা শুধু একবার দেখো, ডানদিকে।"

"হুম, দেখেছি, ওটা নিয়ে ভেবে কোনও লাভ নেই।"

দৃশ্যটা যে অসাধারণ তাতে কারও সন্দেহ নেই, কিন্তু পর্বতাভিযাত্রীর চোখে দেখলে এই দক্ষিণগাত্রের দিক থেকে চূড়ায় ওঠার কোনও সম্ভাবনাই নেই। সবাই বেশ গম্ভীর হয়ে গেলাম। ঠিকমত না জেনেশুনে এ কোন অভিযানে আমরা বেরিয়ে পড়েছি! আইজ্যাক বলল, "সব ঠিকঠাক চললে দু'দিনের মধ্যে তোমাদের অন্নপূর্ণা দেখিয়ে দেব।"

ধৌলাগিরি ছবিঃ উইকিপিডিয়া

এরপর কয়েকটা বিশাল প্রাচীন বটগাছের ছায়ায় বসে সারাদিন ধরে চলল কুলিদের মাইনে দেবার পালা। প্রত্যেক কুলি পেল ছ'টাকা আর এক প্যাকেট করে 'রেড স্টার' সিগারেট। হিন্দু রীতি অনুযায়ী করজোড়ে নমস্কার করে তারা টাকা নিল আর জি বি রাণার লিস্টে নামসই করল। নামসই মানে অবশ্য টিপসই; এদের কারও অক্ষরজ্ঞান নেই। লম্বা লিস্টের এক একটা নাম দেখিয়ে এদের বলা হয়, 'এই দ্যাখো তোমার নাম', আর তারপর তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কালিতে চুবিয়ে সেখানে চেপে ধরা হয়। লিস্ট যত লম্বা হয়, নিচে এক এক করে নতুন কাগজ জোড়া হতে থাকে। সব যখন শেষ হল, লিস্টটা তখন চার গজ লম্বা।

কুলিদের মধ্যে মালপত্র ভাগাভাগি করে দেওয়ার সময় টেরে প্রত্যেকের হাতের বাইসেপ, পায়ের গুলি আর বুকের ছাতি টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখল, ঠিক যেমন ওর ফার্মহাউসে করত। শেরপারা টেরের নাম দিয়েছে 'ভীম'। সে নিজে সবসময় সবচেয়ে ভারী বোঝাটা নিত, অনায়াসে, আর কুলিদের সম্ভ্রম আদায় করে নিত। মাল ওজন করার সময় কুলিরা দাঁড়িপাল্লার কাঁটায় প্রায় নাক

ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এরপর একে একে তারা এগিয়ে এল, নিজের নিজের বোঝা পরখ করে যত না দেখল অন্যদেরগুলো দেখল তার চেয়ে বেশি, তারপর বাঁশ আর দড়িদড়া দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা বইবার জন্য খাঁচা বানিয়ে ফেলল। মাল পিঠে নেওয়ার জন্য ওরা বোঝার দড়িটাকে কপালে ব্যান্ডের মত ঘুরিয়ে ঘাড়ের জোরটাকে ব্যবহার করে, আমাদের মত কাঁধের জোর নয়। এভাবেই আমাদের ছ'টন মালপত্র আর সরঞ্জাম ১২০ মাইল পার্বত্য পথ পাড়ি দিয়েছে।

অবশেষে তুকুচার দিকে রওনা দিলাম। আমাদের সামনে কালী গণ্ডকি নদীর তীর ধরে যতদূর চোখ যায়, কুলিরা লাইন দিয়ে চলেছে। দুপুর নাগাদ মায়ান্দি খোলা বলে একটি বেশ বড় নদীর ধারে এসে হাজির হলাম যেটা কালী গণ্ডকিতে এসে মিশেছে। আইজ্যাক খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, "ব্যাপারটা কীরকম হল? মায়ান্দি খোলা তো দেখছি প্রায় কালী গন্ডকির মতোই বড়। এ নদীর উৎস যদি শুধু ধৌলাগিরির দক্ষিণগাত্র ধোয়া জল হয়, তবে তো এটা একটা ছোট্ট ধারার মতো হওয়ার কথা।"

বাস্তবিক, ম্যাপ অনুযায়ী আমাদের হবু বেসক্যাম্প তুকুচা থেকে ধৌলাগিরির রাস্তা একটা উপত্যকা বরাবর তেমন বাধাবিঘ্ন ছাড়াই সোজা পাহাড়টার উত্তরগাত্রে উঠে গেছে। কিন্তু সেই উপত্যকাটি যদি তুকুচার দিকে না নেমে পশ্চিমদিকে নামে? মায়ান্দি খোলায় এত জল দেখে তো এখন তাই সন্দেহ হচ্ছে! সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তুকুচা আর ধৌলাগিরির উত্তরগাত্রের মাঝে একটা গিরিশিরা আছে, যেটা ম্যাপে দেখানো নেই। আর তা যদি সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে সেটা হবে তুকুচা থেকে আমাদের ধৌলাগিরি শৃঙ্গে আরোহণের পরিকল্পনায় একটা বড়সড় বাধা। "ঠিকই বলেছ," আমায় মানতে হল, "বর্ষার আগে মায়ান্দি খোলায় এত জল তো থাকার কথা নয়!"

"মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি," আইজ্যাক বলল, "দক্ষিণগাত্রের পাশাপাশি পুরো উত্তর আর পশ্চিমগাত্র ধোয়া জলও এই নদী দিয়েই নামছে।"

"ম্যাপে তো সেরকম বলছে না!"

"ম্যাপটা ভুল আছে, কোনও সন্দেহ নেই।"

আইজ্যাকের কথায় যুক্তি আছে বটে। তবে প্রথমেই ম্যাপকে সন্দেহ করার আগে আরও নিশ্চিত কোনও প্রমাণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। সে প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম, এক মাস পর।

পরদিন, এপ্রিলের ২০ তারিখ, দানা বলে একটা জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় অন্নপূর্ণা পর্বতমালার ছোটখাটো শৃঙ্গ ও গিরিশিরাগুলি নজরে এল। "কই, তোমার অন্নপূর্ণা কোথায়?", আইজ্যাককে মনে করিয়ে দিলাম। অন্নপূর্ণা দেখতে পেলাম না, তবে আমাদের ঠিক উল্টোদিকে, নদীর ওপারে, মিরিস্তি খোলা নদীর গভীর সর্পিল উপত্যকা ধীরে ধীরে চোখের সামনে উন্মুক্ত হল। আমাদের ম্যাপে এই মিরিস্তি খোলার গিরিখাত বরাবর তিলিচো পাস অবধি একটা পরিষ্কার রাস্তা দেখানো আছে, আর তিলিচো পাস থেকে একটা ছোট গিরিশিরা সোজা অন্নপূর্ণার শৃঙ্গে উঠে গেছে।

শ্যাজ বলল, "এই মিরিস্তি উপত্যকাটা দেখে তো খুব সহজসরল মনে হচ্ছে না।"

"ম্যাপে তো এর মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা দেখানো আছে!"

নোয়েল গেছিল স্থানীয় কিছু শিকারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। ফিরে এসে বিমর্ষবদনে জানাল, "তিলিচো পাসের নামই কেউ শোনে নি। ওই ঘোড়ার ডিমের ম্যাপের কথা ছাড়ো।"

রেবুফত বলল, "অতটা আশা করাই তো অন্যায়! ১৯০০০ ফিট উচ্চতায় একটা পাস, যেখানে যাবার সুন্দর রাস্তা আছে, আর সেখান থেকে হাতের নাগালে একটা ২৬০০০ ফিট উঁচু পর্বতশৃঙ্গ! আমরা কি গুলবাগিচায় বেড়াতে এসেছি?" পরে যখন এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, তখন জেনেছিলাম যে মিরিস্তি নদীর ভয়ঙ্কর গিরিখাত ধরে যাওয়াটা একটা অসম্ভব ব্যাপার, আর বিখ্যাত তিলিচো পাস ম্যাপে যেখানে দেখানো আছে সেখানে নয়।

আমরা যে বেশ উচ্চতায় উঠে এসেছি সেটা দলের সবার ভারী পদক্ষেপ আর ধীরগতি দেখে মালুম হচ্ছে। খরস্রোতা কালী বা কৃষ্ণা গণ্ডকি নদীকে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে; মাঝে মাঝেই চুনাপাথরের পাহাড়গুলি থেকে তীব্রবেগে নেমে আসা ঝর্নারা পথের ওপর দিয়ে হুড়মুড় করে নিচে কালী গণ্ডকির দিকে নেমে যাচ্ছে। ঘাসায় পৌঁছে বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। স্বাভাবিক, কেননা আমরা প্রায় ৬৫০০ ফিট উচ্চতায় উঠে এসেছি। তুকুচা আরও ১৬০০ ফিট উঁচুতে। কলাগাছ বা ধান চাষ এই উচ্চতায় আর নেই, সামান্য কিছু বার্লির চাষ চোখে পড়ে। আরও কিছুটা এগিয়ে ধৌলাগিরির বরফনীল ওপরের ঢাল নজরে এল। পাহাড়ের দক্ষিণপূর্ব গিরিশিরাটা সোজা আমাদের দিকে নেমে এসেছে, ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ। অত্যন্ত দীর্ঘ ও বিপদসংকুল রাস্তা হলেও চূড়ায় ওঠার সম্ভাব্য পথ হিসেবে এই গিরিশিরাটা আমাদের মনে তবু কিছু আশার সঞ্চার করল। দৈত্যাকৃতি পর্বতটা আমাদের মাথার প্রায় চার মাইল ওপরে উঠে মেঘ আর আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে, ঘাড় উঁচিয়ে দেখতে দেখতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। তার প্রস্তরগাত্র গাঢ় বাদামী, বরফ ঘন নীল, সব মিলিয়ে একেবারে চোখধাঁধানো ব্যাপার।

একবার দেখেই শৃঙ্গারোহণের সম্ভাব্য পথ বার করার চেষ্টাটা একটু বাড়াবাড়ি বটে, কিন্তু আমাদের মনের খুশিটা গোপন করতে পারলাম না। তুষাররাজ্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে এত ভাল লাগছে! আরও ভাল লাগছে এই ভেবে যে অবশেষে অভিযানের আসল লক্ষ্যের দিকে আমরা মন দিতে পারব। আমারও ভাল লাগছে, কেননা এতদিন আমার ভূমিকা ছিল নিছক একজন ম্যানেজারের মত, সেটা ছেড়ে এবার সত্যি সত্যি একটা পর্বতাভিযানের নেতার ভূমিকায় কাজ করতে পারব।

লেটে বলে জায়গাটায় পৌঁছে অদ্ভুতভাবে আমাদের দেশের পাহাড়ের কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক সেরকম পাইন বন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গ্রানাইট পাথর, সবুজ মসে ঢাকা। তখনও জানি না এই অসাধারণ সুন্দর জায়গাটি দু'মাস পরে আমার অসহনীয় যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে থাকবে।

কালী গণ্ডকি নদীর গিরিখাত ছবিঃ তাপস মৌলিক

এরপর আমরা হঠাৎ একটি বিস্তীর্ণ পাথুরে সমতলে এসে উপস্থিত হলাম। শতসহস্র বছর ধরে বয়ে চলা কালী গণ্ডকির পরিবর্তনশীল ধারা এই বিশাল ও গভীর গিরিখাতের জন্ম দিয়েছে। কালী গণ্ডকির উৎস তিব্বতে। হিমালয় ভেদ করে সমতলের গাঙ্গেয় উপত্যকায় নেমে আসার পথে নদীটি

পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাত সৃষ্টি করেছে, যার গভীরতম অংশ ১৮০০০ ফিটেরও বেশি গভীর। সে গিরিখাতের একপাশে ধৌলাগিরি, অন্যপাশে অন্নপূর্ণা, দুই শৃঙ্গেরই উচ্চতা ২৬০০০ ফিটের ওপর। এখানে যে কালী গণ্ডকি শিরা-উপশিরার জালিকা রচনা করে দু'তিন মাইল চওড়া সমতল গিরিখাতের বিস্তারে রাজকীয় ভাবে বয়ে চলেছে, তাই কিছুটা নিচে গিয়ে একত্রিত হয়ে এক সঙ্কীর্ণ গিরিখাত ধরে প্রচণ্ড বেগে কানফাটানো শব্দে ঝাঁপ দিয়েছে।

তিব্বতের দিক থেকে ধেয়ে আসা প্রবল ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া আমাদের মুখচোখে ধাক্কা মারল। ফানেলের মত এই গিরিখাতের পথে সারাবছর হারিকেনের বেগে প্রচণ্ড হাওয়া চলে, যার ফলে কোনও গাছপালা ঝোপঝাড় জন্মাতেই পারে না। হাওয়ার ঘূর্ণিবেগে এখানে ওখানে ধুলোর কুণ্ডলী উঠছে, দু'পাশের পাথুরে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে হাওয়া হা হা হা হা করে ছুটে আসছে। হাওয়া থেকে বাঁচতে আগাপাশতলা মুড়ি দেওয়া আইজ্যাক আমার কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলল, "এর চেয়ে কারাকোরাম ভাল ছিল।" খালি পায়ে চলা কুলিরা অনেকেই দু'জন দু'জন করে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলল। বাকিরা নিরাপত্তার জন্য ছোট ছোট দলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চলল। সবারই ভীষণ তাড়া, যত তাড়াতাড়ি তুকুচা পৌঁছনো যায় আর কি!

আং থারকেকে দেখে মনে হল সে যেন বহুদিন পর বাড়ি ফিরছে। আং থারকে বৌদ্ধ, খুব ধার্মিক মানুষ। দূর থেকে সে বৌদ্ধ গ্রাম লারজুং দেখতে পেয়েছে। গ্রামের বাড়িগুলোর মাথায় খাটানো বৌদ্ধদের পবিত্র পতাকা হাওয়ায় উড়ছে। নানা রঙের এই পতাকাগুলির তিব্বতী নাম লুংদার, এতে বৌদ্ধদের মন্ত্র লেখা থাকে। গ্রামে ঢোকার রাস্তা, বৌদ্ধ মঠ, বাড়ির ছাদ – এমনি সমস্ত জায়গায় এরা লুংদার উড়িয়ে দেয়। এদের বিশ্বাস হাওয়ায় ভর করে লুংদারে লেখা ওই পবিত্র শান্তির মন্ত্র সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

দূরে, কিছুটা ওপরে, সেই পাথুরে মরুভূমির অপর প্রান্তে, একটা ধূসর গ্রামের ছবি দেখা গেল, রোদের তাতে গরম হয়ে ওঠা হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে। বাড়িগুলোর মাথা থেকে ওড়ানো শয়ে শয়ে পতাকায় গ্রামটাকে দুর্গনগরীর মত লাগছে। আং থারকে বলল, "বড়া সাহিব, তুকুচা।" আমরা দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললাম। তুকুচায় ঢোকার আগে দাম্বুশ খোলা বলে একটি স্রোতস্বিনী নদী পেরোতে হল, যার কথা পরে আরও বলতে হবে।

অবশেষে তুকুচা! যা আশা করেছিলাম তার থেকে তুকুচায় লোক অনেক কম। গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নোংরা, পোঁটাগড়ানো বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল আমাদের ঘিরে ফেলল, আর আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও নড়াচড়া অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে জরিপ করতে করতে চলল। গ্রামের মাঝামাঝি একটা বারোয়ারি জলের জায়গা, কাছাকাছি কোনও ঝর্না থেকে বাঁশের নলে করে সেখানে জলের সরবরাহ নিয়ে আসা হয়েছে; বাচ্চারা খেলছে, মহিলারা বাসন মাজছে, কাপড় কাচছে, চায়ের জন্য জল সংগ্রহ করছে। বৃদ্ধ পুরুষমানুষেরা নিজের নিজের বাড়ির দরজায় হাঁটু মুড়ে বসে রইল, আর খুব সন্দেহের চোখে গ্রামের রাস্তা দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে দেখল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা গ্রাম পেরিয়ে একটা খোলা জায়গায় উপস্থিত হলাম। পাশে একটা বৌদ্ধ মঠ, চারপাশে গোলাপি রঙের দেওয়াল, চূড়া থেকে অনেক লুংদার বাতাসে পতপত করে উড়ছে।

মাঠটা যে আমাদের খুব পছন্দ হল তা বলতে পারি না। মাঠের পাশেই একটা খাড়া পাথুরে দেওয়াল ওপরে উঠে গেছে, বিশেষ করে সেটার জন্যই জায়গাটা কেমন চাপা চাপা। উপায় নেই, তাঁবু খাটানোর উপযুক্ত এটাই নাকি একমাত্র জায়গা এখানে।

আমাদের পদযাত্রা বা ট্রেকিং পর্ব শেষ হল। আজ ২১শে এপ্রিল, তার মানে দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রায় সম্পূর্ণ নেপাল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে আমাদের সময় লাগল মাত্র দু'সপ্তাহের মত।

# ৩

# গুপ্ত উপত্যকা

বেস ক্যাম্প বসানোর কাজ শুরু হল। তাঁবু খাটানো, প্যাকিং খোলা, লিস্ট করা, সরঞ্জাম আর খাবারদাবার আলাদা করে গুছিয়ে রাখা। পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টায় কার কী দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হল। সবাই যার যার কাজে হই হই করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাম্প এলাকায় তুমুল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। আইজ্যাক তার ক্যামেরা আর ফিল্মের ভাণ্ডার নিয়ে পড়ল, অডট ডুবে গেল ওষুধপত্তর আর তুলো- ব্যান্ডেজের স্তূপের মধ্যে। শেরপারা তাঁবু খাটালো, কিচেন টেন্ট লাগালো আর সাহেবদের মালপত্র গোছানোয় সাহায্য করতে লাগল।

পরদিন, বেসক্যাম্পে আমাদের প্রথম সকালটা, হিমালয় অসাধারণ আবহাওয়া উপহার দিল। চারদিকে সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে তুষারশৃঙ্গের দল। পশ্চিমে ধৌলাগিরি পর্বতপুঞ্জ আর পুবে অন্নপূর্ণা পর্বতপুঞ্জকে মাঝখান দিয়ে চিরে বয়ে চলেছে গভীর গণ্ডকি উপত্যকা। উপত্যকার গভীরে জমে থাকা কুয়াশা দু'পাশের দুর্গম বরফাবৃত পর্বতগাত্রগুলিকে আরও রাজকীয় করে তুলেছে। পুবদিকে অন্নপূর্ণার সামনে অসাধারণ সুন্দর নীলগিরি পর্বতমালা তুকুচা আর অন্নপূর্ণার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য খাড়া পাঁচিলের মতো আমাদের মাথার ওপর প্রায় ১৫০০০ ফিট উঠে গেছে। তুকুচা থেকে অন্নপূর্ণা পর্বতমালায় পৌঁছতে গেলে এই নীলগিরিকে এড়িয়ে এর দক্ষিণে নিচে মিরিস্তি খোলা ধরে বা উত্তর দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। উত্তর দিকে আকাশ আরও পরিষ্কার, ঘন নীল। আর সেদিকে, মানে তিব্বতের দিকে, যতদূর চোখ যায় দেখে মনে হল সবুজ একেবারেই কম।

তুকুচা সরু সরু গলির গোলকধাঁধায় ভরা একটা জায়গা। মাঝে একটা উঠোন রেখে চারপাশে ঘর তোলা এর বাড়িগুলো ছোট ছোট দুর্গের মত। এগুলো প্রায় সবই সরাইখানা, মুক্তিনাথের পথে চলা পুণ্যার্থীদের রাতের আশ্রয়। গ্রামের পাঁচশো অধিবাসীর অধিকাংশই বৌদ্ধ। সেটা বোঝা যায় মূল রাস্তায় পঞ্চাশ গজ লম্বা একটা দেওয়াল দেখে, যার গায়ে সারি সারি জপযন্ত্র বসানো। জপযন্ত্রগুলির গায়ে পবিত্র বৌদ্ধ মন্ত্র খোদাই করা। যাওয়া আসার পথে আমাদের শেরপারা প্রত্যেকে একবার করে জপযন্ত্রগুলিকে ঘুরিয়ে যাবেই। একটা জপযন্ত্র কেউ একবার ঘোরালো তো যন্ত্রে খোদাই মন্ত্রগুলো নাকি তার একবার পড়া হয়ে গেল; লম্বা লম্বা দাঁতভাঙা প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণের চেয়ে অনেক সুবিধের সন্দেহ নেই।

তুকুচা    ছবিঃ মার্সেল আইজ্যাক

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মজা দেখার জন্য ক্যাম্পের চারদিকে বেশ একটা ভিড় জমে গেল। সামনে কচিকাঁচার দল, তাদের পেছনে কলকল করে কথা বলে চলা মহিলারা। দেখে মনে হল তিব্বতী কোনও যাযাবর গোষ্ঠীর লোকজন। মেয়েদের সবার পরনে অ্যাপ্রনের মতো দেখতে রংচঙে পোশাক। হাসিখুশি মোঙ্গলয়েড ধরনের মুখ,

এরা দু'গালে পাউডার লাগানোর মতো করে শুকনো গোবরের গুঁড়ো লাগিয়ে সাজে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, আত্মবিশ্বাসী এই মেয়েদের খিলখিল হাসির আর বিরাম নেই। ভিড় আরেকটু জমার পর হঠাৎ তারা নাচ শুরু করে দিল। শুভ্র তুষারাবৃত পর্বতমালার প্রেক্ষাপটে রঙিন প্রজাপতির মত তাদের সেই সুনিয়ন্ত্রিত নাচের বিষয়বস্তু, যতটুকু বুঝলাম, সেই চিরন্তন দুঃখসুখ আর জীবন- মৃত্যুর যুগলবন্দী। সে নাচে সভ্যতার মেকি পালিশ পড়েনি, তার সৌন্দর্য আদিম, তার ছন্দ পাহাড়ি ঝর্নার মত। নাচ দেখেই কোনও জাতির প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

হঠাৎ করে তারা সবাই থেমে গেল। এক তিব্বতী মহিলা ভিড়ের মাঝখানে একটা তামার থালা রাখল। তারপর নর্তকীরা একবার আমাদের দিকে চায়, একবার সেই থালার দিকে। অগত্যা অত্যন্ত সম্ভ্রান্তভাবে বড়া সাহিব সেই থালায় কিছু রৌপ্যমুদ্রা নিক্ষেপ করলেন। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তৎক্ষণাৎ মেয়েরা আবার নাচতে শুরু করল। এবার আরও উদ্দামভাবে। কিছুক্ষণ পর আবার তারা হঠাৎ করে থেমে গেল। বড়া সাহিব আবার তাঁর বদান্যতা প্রদর্শন করে বাধিত হলেন।

তুকুচা পৌঁছনোর আগে অবধি আমরা সবাই মনের কোণে একটা গোপন আশা সযত্নে লালন করে এসেছি যে এখান থেকে নিশ্চয়ই একটা সহজ ও নিরাপদ গিরিশিরা পেয়ে যাব যেটা ধরে সোজা ধৌলাগিরি কিংবা অন্নপূর্ণার চূড়ায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। বাগলুং থেকে দেখা ধৌলাগিরির দক্ষিণপূর্ব গিরিশিরার দৃশ্য সেই আশায় কিছুটা ইন্ধন যুগিয়েছিল, তবে আমরা কেউই নিশ্চিত ছিলাম না। এছাড়াও আছে উত্তর গিরিশিরা। সেটা যদিও পুরোটাই বরফে ঢাকা, ধৌলাগিরির আকৃতি দেখে মনে হয় গিরিশিরাটা খুব খাড়াই হবে না। ওই পথেও একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। এখান থেকে রওনা দিয়ে মাঝে কয়েকটা ক্যাম্প লাগাতে হবে, ব্যাস, তারপরেই চূড়া। আর অন্নপূর্ণা তো তিলিচো পাস থেকে একেবারেই নাগালে, তাই পর্বতারোহীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ওটা আমাদের কাছে খুব একটা আকর্ষণীয় মনে হয় নি।

পরদিন কোজি আং থারকের সঙ্গে ধৌলাগিরির দিকে রেকি (reconnaissance) করতে বেরোল। তুকুচার কাছে ১৩০০০ ফিট উঁচু একটা ভিউ পয়েন্ট আছে। সেখান থেকে চারদিক খুব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া উচিত। এগারোটার সময় কোজিকে রেডিওয় ধরলাম।

"কোজি বলছি, এইমাত্র ভিউ পয়েন্টে পৌঁছলাম। অসাধারণ দৃশ্য। ধৌলাগিরিকে সম্রাটের মত লাগছে। তবে দক্ষিণপূর্ব গিরিশিরা একটা ভয়ংকর ব্যাপার, চূড়ায় ওঠার পক্ষে অসম্ভব দীর্ঘ পথ, মাঝে অসংখ্য আইস টাওয়ার, তাঁবু ফেলার তেমন জায়গা নেই।"

"আর উত্তর গিরিশিরা?"

"পুরো বরফে ঢাকা। প্রচণ্ড খাড়াই। খুব কঠিন রাস্তা, সবচেয়ে বড় বাধা মাঝপথে। আরেকটা ব্যাপার, রিজে উঠব কী ভাবে? ম্যাপ দেখে মনে হয় দক্ষিণপূর্ব আর উত্তর গিরিশিরার মাঝে পূর্ব হিমবাহটা ওই দুই গিরিশিরায় ওঠার স্বাভাবিক রাস্তা, কিন্তু এখান থেকে যা দেখছি, হিমবাহটা অসম্ভব ভাঙাচোরা। খুব বিপজ্জনক।"

"পাহাড়ের উত্তরদিকের ঢালটা দেখতে পাচ্ছো?"

"অত্যন্ত বিপজ্জনক। খাড়া বরফের দেওয়াল। ওর গোড়ায় একটা মোটামুটি সোজা ঢাল আছে, যেখান থেকে উত্তরপশ্চিম গিরিশিরায় ওঠা সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু, এখান থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে না।"

"নীলগিরি দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?"

"একেবারে খাড়া উঠে গেছে। এদিক থেকে কোনও সম্ভাবনাই নেই।"

কোজির এই প্রথম সার্ভে খুব একটা আশা জাগাতে পারল না। সন্ধেবেলা চা খেতে খেতে ওর আঁকা স্কেচগুলো নিয়ে আলোচনায় বসলাম আমরা। "ধৌলাগিরির মাথায় যে পিরামিডের মত চূড়াটা, যে করে হোক ওটার নিচে আমাদের পৌঁছতে হবে," রেবুফত বলল। এ বিষয়ে কারও মনে কোনও দ্বিমত দেখলাম না, কিন্তু ওখানে পৌঁছব কী করে সেই নিয়েই তো যত গোলমাল! ওই ভাঙাচোরা বিপজ্জনক পূর্ব হিমবাহের পথেই এগোব? নাকি, তুকুচা শৃঙ্গের উত্তরদিক দিয়ে ঘুরে ধৌলাগিরির উত্তর গিরিশিরাকে এড়িয়ে তার উত্তর হিমবাহ উপত্যকা ধরে এগোনোর চেষ্টা করব?

"সব দিকেই প্রথমে আমাদের অনুসন্ধান চালাতে হবে," বললাম আমি, "আর তার জন্য কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে এগোতে হবে। দু'জন দু'জন করে দল করা যাক।"

শ্যাজ বলল, "অন্নপূর্ণার দিকটাও একবার দেখা উচিত। ম্যাপ যে বলছে প্রায় ২০০০০ ফিটে একটা পাস, আর সেখান থেকে সোজা চূড়ায় ..."

"ঠিক, ধৌলাগিরিটা বাজে, আমিও অন্নপূর্ণার দলে," বলল কোজি।

"বেশ, কালই বেরোনো যাক। ল্যাচেনাল আর রেবুফত ধৌলাগিরির পূর্ব হিমবাহের দিকটা অনুসন্ধান করে দেখো। অডট আর শ্যাজ দুটো ঘোড়া নিয়ে নাও, লেটে অবধি ফিরে গিয়ে সেখান থেকে ওপরে উঠে দেখো তিলিচো পাস বা অন্নপূর্ণার দেখা পাও কিনা। আমি আর আইজ্যাক দাম্বুশ খোলা বরাবর যতটা পারি এগিয়ে যাই, সম্ভবত ধৌলাগিরির উত্তর দিকটা দেখতে পাব।"

"আর আমি?", কোজি প্রচণ্ড হতাশ হয়ে বলল।

"তুমি ক্যাম্পে বিশ্রাম নাও। চিন্তার কিছু নেই, সবার জন্যই প্রচুর কাজ অপেক্ষা করছে। আজ ২৩শে এপ্রিল। বর্ষা নামবে জুনের প্রথমদিকে। হাতে যথেষ্ট সময় আছে। টেরে, তুমিও তাড়াতাড়ি ফিট হয়ে ওঠার চেষ্টা করো।"

**বেসক্যাম্পে মরিস হারজগ ছবিঃ মার্সেল আইজ্যাক**

"আর একদম হালকা খাবার খাবে এখন," ডাক্তার অডট যোগ করল। টেরে বেচারার পেট খারাপ। একটু কমেছে, তাও খুবই দুর্বল।

"আর আমি কি বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষব?", নোয়েল বলল।

"নো স্যার, আপনি তুকুচার হোমরাচোমরা মোড়ল- মুখিয়াদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করুন, ভাবসাব জমান। আর কোজির সঙ্গে মিলে বেসক্যাম্পটাকে গুছিয়ে ফেলুন।"

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

# ওয়ান টু থ্রি ক্লিক

শম্পা গুহমজুমদার

পুজোতে অনেক ফটো তুলেছ তো? তার মানে আউটডোর শুটিং বা স্ট্রিট ফটোগ্রাফি করে ফেলেছ কিন্তু। ছবিগুলো কম্পিউটারে যত্ন করে ডাউনলোড করে রাখো। এবার তো আবার জোরকদমে পড়াশোনা চালু হল? মা তো আর একদম বাড়ির বাইরে বেরোতে দিচ্ছে না নিশ্চয়ই? চলো আজ ঘরে বসেই অন্য রকম কিছু করা যাক। আজ আমরা ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফি করব।

চমকে উঠলে তো? ঘরে বসে ওয়াইল্ডলাইফ  ফটোগ্রাফি? এও কি সম্ভব? বাড়িতে যদি কারো ফটোগ্রাফির নেশা থাকে তবে একটু ভালো ক্যামেরা আর টেলিফটো বা জুম লেন্স থাকলেও থাকতে পারে, আর নেশাটা যদি একটু বেশি হয় তাহলে ট্রাইপডও পাওয়া যেতে পারে। কারণ ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফিতে ট্রাইপড চাইই চাই। যারা এইসব কাজের জিনিস পাবে তাদের আমি বলব কি ভাবে এই ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করবে।

তবে সবার কাছে তো এসব থাকবে না! ধরে নিলাম তোমাদের কাছে একদম সাধারণ ক্যামেরাই আছে। অতো যন্ত্রপাতি কিছু নেই। তাহলে কী করবে? প্রথমে বলি ঘরের মধ্যে বসে ওয়াইল্ডলাইফ ফটোগ্রাফি কী করে সম্ভব। একতলা দোতলা  বা আরও উঁচুতলায় যারা থাকো, প্রতি বাড়িতে একটা বারান্দা থাকে। অনেক সময়ই কাচের জানালার বাড়িতে  গ্রিল দিয়ে

বাড়ানো থাকে। বাড়ির পাশে গাছপালা থাকলে তো কথাই নেই। বারান্দাতে দুচারটে গাছ থাকলেও ভালো হয়। সব বাড়িতে পুরানো প্লাস্টিকের বালতি বা ছোট গামলা থাকে, মিষ্টির হাঁড়ি হলে খুব ভালো হয়। একটাতে জল আর একটাতে চাল,গম, ছোলা এই ধরণের খাবার পাশাপাশি রাখতে হবে। কাক চড়াই, শালিক পায়রা সব বাড়ির বারান্দাতেই আসে।

আশেপাশে একটু গাছপালা থাকলে কাঠবেড়ালি বা অন্য দুচার রকম পাখিও আসতে

পারে। এরা কিন্তু সবাই ওয়াইল্ডলাইফ এর আওতাতেই পড়ে।

এইবার বলি ফটো কীভাবে তুলবে। তোমাকে কিন্তু কাচের পাল্লা বা পরদার আড়ালে থাকতে হবে। বারান্দার গ্রিলে ঝুলন্ত পটের মধ্যেও খাবার রাখা যায়। হাত যাতে না কাঁপে তাই ক্যামেরাটা একটা কাঠের বা পিচবোর্ডের বাক্সের ওপরে রাখতে হবে। যতটা পারো কাছে কিন্তু বেজায় গোপন করে লুকিয়ে ক্যামেরা রাখতে হবে। কারণ তোমার উপস্থিতি টের পেলে কোন পাখি আর আসবে না। সব থেকে ভালো হয় কাচের পাল্লার আড়ালে ক্যামেরা রাখলে। পর্দা টেনে একটু ফাঁক করে সেখানে ক্যামেরার লেন্সটা বার করে রাখতে পারলে ভালো হয়। ক্যামেরাতে চোখ রেখে তোমায় বসতে হবে মাটিতে।

এবার কত রকম কান্ডটাই না ঘটবে। ধরে নিলাম ছাতারেরাই প্রথম এল। ওরা নিজেদের মধ্যে খাবার নিয়ে মারামারি ঝগড়া কতকিছু শুরু করবে। তোমাকে কিন্তু খুবই সচেতন থাকতে হবে। মুহূর্তগুলো ধরার জন্য খুব তাড়াতাড়ি শাটার টিপতে হবে।

প্রথম কদিন সঠিক মুহূর্তগুলো ধরতে পারবে না। কিন্তু ক'দিন পর্যবেক্ষণ করলেই পাখিদের চরিত্র বুঝতে পারবে। ওদের অ্যাকশনগুলোর একটা ধারাবাহিকতা থাকে। অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় ওরা এবার কী করতে চলেছে। তাই সঠিক মুহূর্তে ক্লিক করা যাবে।

যারা টেলিফোটো বা জুম লেন্স ক্যামেরা পাবে তারা এই ক্ষেত্রে ট্রাইপডে ক্যামেরা রেখে শাটার স্পিড প্রায়রিটিতে ফোকাস করবে। এটা একটু জটিল ব্যাপার, যাঁর ক্যামেরা তাঁকেই সাহায্য করতে বলতে হবে। দামি ও জটিল যন্ত্রগুলো ধরবার আগে বড়দের থেকে তাঁকে চালাবার গোড়ার কায়দাগুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন।

কারো বাড়িতে ছাত থাকলে জল আর খাবার রেখে একটা আড়ালে বসতে হবে, ক্যামেরা কোনও টুল বা বাক্সের ওপর রাখতে হবে। মধ্য বা উত্তর কোলকাতার মতন ইঁটকাঠের জঙ্গলে যারা থাকো হতাশ হবার কিছু নেই। পুরানো বাড়িগুলোর ফাঁকেফোকোরে

পায়রাদের অবাধ বিচরণ। একটু খেয়াল রাখলেই এদের কান্ডকারখানা নিয়েই ডকুমেন্টারি বানিয়ে ফেলতে পারবে।

মোবাইলফোনের ক্যামেরাতেও এইসব ছবি তুলতে পারো। সে ক্ষেত্রে অবশ্য টুল বা ট্রাইপড নয়, ক্যামেরা হাতে ধরেই তুলতে হবে। যাতে হাত কেঁপে না যায় সেটা খুব খেয়াল রাখতে হবে।

যাদের বাড়িতে লেন্স চেঞ্জিং ক্যামেরা ও ট্রাইপড আছে, তারা বড়দের সাহায্য নিয়ে জেনে নেবে ক্যামেরা কী মোডে ব্যবহার করবে। সাধারণত টেলিফোটো লেন্স থাকলে ছবি ভালো হবে। কারণ সাবজেক্ট যখন পাখি তখন অনেক দূরে বসে ক্লিক করতে হবে। ট্রাইপড হালকা হলে ভারী কিছু ব্যাগ ট্রাইপডের নীচের হুকে টানাতে হবে।

সঙ্গের ফটোগুলোতে আমরা কাঠবেড়ালি আর অন্য পাখিদের যে ছবি তুলেছি সবই কিন্তু কাচের পাল্লার মধ্যে দিয়ে। আমাদের বাড়ির চারদিকে হরেকরকম গাছপালা। খোলা বারান্দাতে দুটো মাটির পাত্রে জল খাবার রেখেছি। সারাদিনে কত রকম যে মজা দেখি। কিছু ফটো  তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম।

এদের কান্ডকারখানা দেখতে দেখতে প্রাণীজগতের প্রতি একটা আলাদা  আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এখন পাখিদের সম্বন্ধে একটু আধটু পড়াশুনাও আরম্ভ করেছি ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফির ব্যাপারেও চর্চা শুরু করেছি। তোমাদেরও দেখবে ভালো লেগে যাবে...... সময়টা কিছু করার নেই তখন টিভি দেখে না কাটিয়ে একটু অন্য ভাবেও কাটানো যেতে পারে । এই ভাবেই কেউ হয়ত তোমরা বড় হয়ে নাম করা ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার হয়ে উঠবে। ছুটির দিনে মল- এ না গিয়ে  চিড়িয়াখানাতে ছবি তোলা যেতে পারে।

পরের সংখ্যায় চলো আমরা ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল ফোন বা সাধারণ ক্যামেরা নিয়ে যাই শহর ছেড়ে সেই  বন্ধুদের বাড়িতে যাদের বাড়ির কাছাকাছি মাঠঘাট পুকুর আছে। সেইখানে ওয়াইল্ড লাইফের ছবি তোলবার গল্প হবে পরের সংখ্যায়।

# পুতুলনাচের সাতকাহণ

*দাঁত ফোকলা নাতি থেকে দন্তহীন দাদু- পুতুলনাচের নাম শুনলেই সব্বাই আনন্দে আটখানা হয়। এসো তবে সেই পুতুলনাচের গল্প শোনা যাক।গল্প বলছেন সমকালের এক সেরা পুতুলনাট্য গবেষক,চিত্রী ও ছড়াকার* ***শুভ জোয়ারদার*** *মশাই। পৃথিবীতে কত জাতের পুতুল, বাংলাতেই বা তার কোনটা কোনটা কোথায় প্রচলিত, পুতুল কেন নাচে, ক'দিন ধরে নাচছে, কেমন করে কোন জাতের পুতুল তৈরি হয়—এমন হাজারো প্রশ্নের নিখুঁত জবাবে কলমে, ছড়াতে, ছবিতে তোমাদের জন্য জয়ঢাকের পাতায় নিয়মিত হাজির থাকবেন তিনি। এই সংখ্যা থেকে জয়ঢাকের পাতায় পুতুলনাচের গল্প শুরু হয়ে গেল।*

সকালেই রামপদ এসে জুটেছে আমার বারুইপুরের ওয়ার্কশপ কাম আস্তানাতে। রামপদ একজন পেশাগত লোকশিল্পী। হাটে- মাঠে- ঘাটে পুতুলনাচ দেখানোই তার জীবিকা। আর এক সপ্তাহ পরেই ও পুতুলনাচের পশরা নিয়ে উড়ে যাবে ইংল্যান্ড, সেখানকার একটা মুখোশনাচ ইশকুলের আমন্ত্রণে। আমার পরিকল্পনা হল তার এই পুতুলসহ বিদেশ যাওয়ার খবরটা ছোট্ট একটা ভিডিও সাক্ষাতকার সহ ইউটিউব আর ফেসবুকে পোস্ট করে দেব।

আমার সঙ্গে কথা বলতেবলতেই দুটো হাতে ঠিক দস্তানার মতো দুটো পুতুল পুরে নিয়ে সি- সার্পের সুরেলা কণ্ঠে গান ধরল রামপদ----

“আষাঢ়ের মেঘ করেছে, মাটিতে ঢল নেমেছে
টেঁপির মা লাঙল নিয়ে মাঠে তুমি চলো না!”

মুখে গাওয়া গানের সঙ্গে সঙ্গে কব্জিতে গলানো ছোট ছোট হাতপুতুল দুটোর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে কোমর দুলিয়ে সে কি অসাধারণ নাচ! রামপদর গলা শুনেই দুদ্দাড় করে হাজির দুই ভাইবোন—তকাই আর ছুট্‌কি। এরা আমার প্রতিবেশী দেবেনবাবুর নাতিনাতনি। যথাক্রমে পঞ্চম আর অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। ওদের চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম সক্কালবেলায় এমন বাম্পার একটা ব্যাপার দেখে ওরা খুশিতে ডগোমগো। আমার নাতি ভুজুং যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। সে যত্ন করে ইন্টারভিউ আর নাচের ভিডিও ডকুমেন্টেশন করছিল। সে তার সরঞ্জামপত্র গুছিয়ে নিয়ে ভেতরে যেতেই রামপদও তার ঝোলার মধ্যে পুতুল ভরে যাওয়ার জন্য তৈরি।

আমি প্রয়োজনীয় কিছু কথাবার্তা সেরে সদর অবধি ওকে এগিয়ে দিয়ে পেছন ঘুরতেই দেখি তকাই আর ছুটকি তখনো বসে আছে। আমায় বললো, “দাদু, তুমি তো পুতুল বানাও। কতো মানুষজনকে শেখাও। আজ আমাদের ছুটি; এসব নিয়ে একটু বলো না, প্লিজ।”

আমি বলি, “সে তো অনেক কথা। পুতুলদের জাত- ঘরানা, ইতিহাস- ভূগোল নিয়ে নানানরকম ব্যাপার স্যাপার আছে। সে সব কি আর একদিনে ঝপ্ করে বলা যাবে? না হজম হবে তোদের?” যাই হোক, তকাই আর ছুটকির আগ্রহে শুরু করলাম। যা ওদের বলছি, সেটাই হুবহু তুলে ধরছি জয়ঢাকের পাতায়, তোমাদের জন্য।

আজ বলব বাংলার সনাতন দস্তানাপুতুল বা ‘বেণে পুতুল’ নিয়ে অল্প দু’চার কথা। দেখো, পুতুল যখন আমাদের ঘরবাড়ির আলমারি, শো- কেস বা কুলুঙ্গি- তাকে থাকে, তখন তারা নিতান্তই ঘর সাজাবার উপকরণ অথবা ছোটদের খেলনা মাত্র। আর যেই মানুষের বুদ্ধিতে হাতের কৌশলে নাচে- গানে- সংলাপে অঙ্গভঙ্গি করে ওমনি সে ‘নাচের- পুতুল’। পুতুল নাচের শুরু এদেশে তা প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। ইতিহাসের গভীরতায় ঢুকব যথাকালে,

এখন শোনো বাংলার পুতুলনাচের নানানকিসিম, ঘরাণার কথা। নিচের তত্ত্ব- তালিকার ক্রমানুসারে ওদের বানানোর, নাচানোর কৌশল, শিল্পীদের রুটিরুজির সুবিধা- অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দরকারী তথ্যতলাশ দেব।

**সনাতন পুতুলনাচ**

| **দস্তানা/বেণে (gloves)** | সুতো/তার টানা(**Marionette**) | দন্ড/ডাং(**Rod**) |
|---|---|---|
| পূর্ব মেদিনীপুর(পদ্মতামালি) | নদীয়া(মুড়াগাছা) | ( দক্ষিণ ২৪ পরগনা) |

দুই ভাইবোনের মধ্যে ছুটকিই বড়ো। বললে, “বাকি কথা পরে হবে। তুমি আগে এই রামপদ কাকু যে পুতুল নাচালো তাদের কথা বলো।”

“তাই তো বলছি—” বলে আমি আবার শুরু করি-

“ভারতে আরো একটি ঘরাণার পুতুল দেখতে পাওয়া যায়। এরা হল ছায়া পুতুল বা **Shadow puppet**। তবে বাংলাতে এরা তেমন বলার মতো জায়গায় আসেনি। এরা আদতে প্রচলিত দক্ষিণ ভারতে।”

যাক, দস্তানা বা বেণে পুতুলের গল্প কথায় আসি। আমি বইয়ের তাক থেকে একটা মানচিত্র টেনে সামনে বিছোলাম। জেলা অনুযায়ী নানা রঙে রঙিন অংশগুলো দেখিয়ে বলি, “এই দেখো, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ- পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রের ধার ঘেঁসা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। এখানে নরঘাট সেতুর কাছে আছে আমাদের রামপদর পদ্মতামালি গ্রাম। এই অঞ্চলের গ্রামগুলিতে একদা থাকতেন বেশ কয়েকশো ঘর বেণে পুতুল শিল্পী। যতদূর জানা গেছে বর্তমানে মাত্র গোটা তিরিশ এই ধরণের পরম্পরার বেণে পুতুল শিল্পী কোনোমতে বেঁচেবর্তে আছেন।”

ছুটকি বললো, “আচ্ছা এই ঘরাণার পুতুলকে বেণেপুতুল বলে কেন?”

আমি বলি, “বেণে শব্দের মানে হল বণিক, যারা বাণিজ্য করে। এই ধরণের পুতুল নিয়ে শিল্পীরা মোটামুটি বাণিজ্য করে। তাই এরা সম্ভবত ‘বেণে’- পুতুল নামে পরিচিত।”

তকাই বললে, “দাদু ওদের নাচ নিয়ে এবার বলো না!”

আমি বললাম, “আরে নাচবে তো হাত, পা, আর মাথা কোমর দিয়ে। কেমন করে সেগুলো তৈরি হবে শোন আগে। পুতুলের মাথাটা হয় পোড়ামাটির। হাত দুটো হয় কাঠের, অনেকটা নলের মতো। এর মধ্যে শিল্পী নিজের দুটি আর তার মাথার মধ্যে একটি আঙুল ঢুকিয়ে পুতুলদের

নাচায়, মুখে কখনো গায় গান, কখনো বা মজার সংলাপ বলে হাসিয়ে কুটিপাটি করে উঠোনে জড়ো হওয়া গেরস্থবাড়ির বউঝি আর কচিকাঁচাদের। আজও মেদিনীপুরের গ্রাম্যমেলায়, উঠোনে বা ঠাকুরদালানে ঘরোয়া দর্শকদের সামনে উবু হয়ে বসে, ঠিক তোমরা যেমন দেখলে, সেই ভাবেই পুতুলনাচায় রামপদরা। নাচ দেখিয়ে সামান্য ক'টা টাকা পায়। কখনো

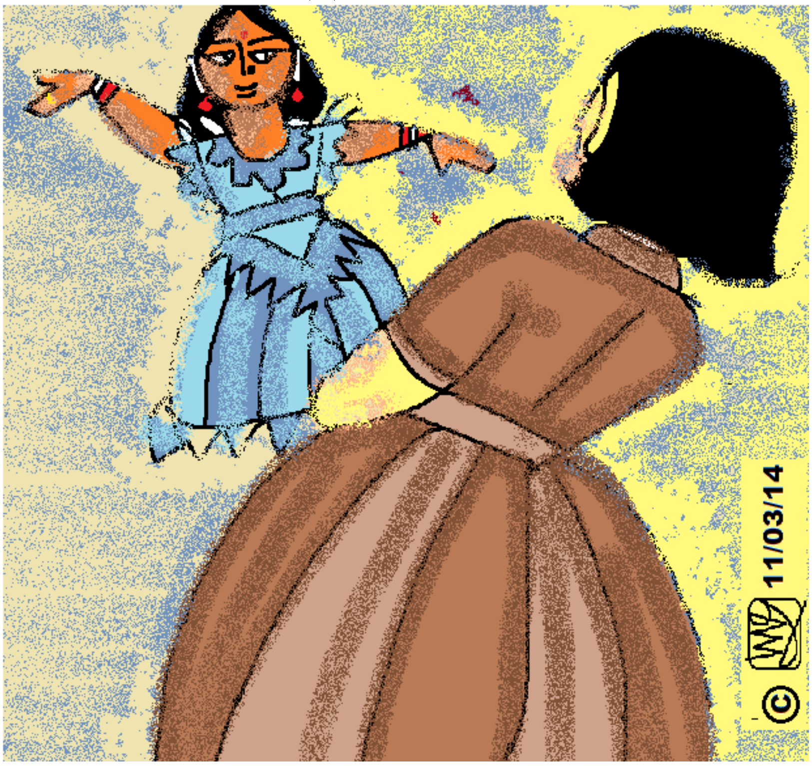


কখনো চাল বা রান্নার জন্য সবজিও দেওয়া হয় এদের পারিশ্রমিক হিসেবে। 'মাধুকরী'র মতো গৃহস্থের দোরে দোরে অনেকটা দান প্রত্যাশায় শিল্পচর্চার মাধ্যমে এরা দিন গুজরান করেন। অধিকাংশ দর্শক হলেন নারী আর শিশুরা। বিষয় হিসাবে বাছা হয় পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত বা মূলত নারীচরিত্র আশ্রয়ী কোনো লোককাহিনী। আঙ্গিকে তো বটেই, বিষয় নির্বাচনেও সংলগ্ন বা প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার 'সখিকুন্দাই'—এর সঙ্গে এদের আশ্চর্য মিল।

"নাচাকোঁদা শব্দ থেকেই 'সখিকুন্দাই' নামটা যে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ভাবেই বেণেপুতুল শিল্পীরা দিন প্রতি ৩০ থেকে ৫০টাকা সংগ্রহ করে। অনেক সময় গ্রাম বাংলার সামাজিক দুঃখকষ্ট নিয়ে গান বেঁধেও পুতুল নাচান এরা। সুরের আদলে থাকে প্রধানত লোকসংগীত, কখনো কখনো জনপ্রিয় সিনেমার গানের সুর। রামপদর মুখে এখুনি যে গানটা শুনলাম, তার সুরটা কিন্তু পঞ্চাশের দশকের সুপারহিট 'আজ কি রাত পিয়া দিল না তোড়ো, আজকি রাত পিয়া মান লো'---- একটা হিন্দি গানের সুর। রামপদ তখনো জন্মায় নি। কাজেই, এটা নিশ্চয় তার বাবা প্রয়াত আশুতোষ ঘড়াই—এর থেকেই পাওয়া। হাতের কাছে পাওয়া সব গ্রাম্য উপকরণের পুতুল বানিয়ে, শুধুমাত্র একটা ঢোল অথবা ডুগডুগি, নিজের গলায় গান আর সহজাত বংশ পরম্পরার শিল্পপটুত্বে ভরসা করে এই গ্রামীণ তফশিলী সম্প্রদায়ের লোকেরা পুরনো কাল থেকে আমজনতার মনোরঞ্জন করে আসছেন। অনেক সাপুড়ে বেদেরাও এই পুতুলনাচ দেখিয়ে থাকে। মেদিনীপুরের একটি অঞ্চলে একে 'খেঁদির নাচ' বলে।"

এতক্ষণে তকাই ফুট কাটে, "এত মজার জিনিসটা হারিয়ে যেতে বসেছে কেন দাদু?" আমি বলি, "শুধু বেণেপুতুল নয়রে, সব ধরনের পরম্পরার পুতুলনাচই ইদানীং প্রায় হাসপাতালের আইসিইউতে। কারণ হল অর্থনীতি, কারণ হল, সাধারণ মানুষের এর প্রতি আগ্রহ হারানো। আগ্রহ হারানোর কারণ? সারা পৃথিবীর কালচার এখন ঘেঁটে এক হয়ে গেছে। আমেরিকার নিউজার্সিতে এখন যে গান, যে সিনেমা চলছে, ঠিক সেটাই চলছে তোদের

বারুইপুরের ফুলতলাতে। দুদিন আগে আর পরে। আর এত সস্তায় ঐ রকম চকচকে কালচার, মানে শহরের সন্দেশ ফেলে কেউ কি আর গ্রাম্য গুড়—বাতাসা খাবে?

"শিল্পীরা একে তো আয়—উপায়হীন তাছাড়া সকলেই প্রায় ভূমিহীন। ফলে তারা গ্রাম ছেড়ে অনেকেই অন্য রুটিরুজিতে পেশা নিয়ে শহরে চলে আসছে। এই রামপদর কথাই ধর। দুচারবার বিদেশে আমন্ত্রিত আর্ন্তজাতিক মানের শিল্পীরও কোন দাম নেই। ফলে কলকাতায় এসে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়নের চাকরি নিতে হয়েছে। দুর্ভাগ্য সেই দেশের, যে দেশের বিশ্বখ্যাত শিল্পীকে পেটের তাগিদে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হয়ে সুখী হতে হয়।"

পরিবেশ থমথমে। তকাই আর ছুটকি মাথা নীচু করে বসে। হঠাৎ তকাই মুখ তুলে বলে, "এবার কর্মশিক্ষার পরীক্ষায় বানাব বেণে পুতুল। দাদু তুমি আমায় শিখিয়ে দেবে তো?"

দুপুর বারোটার  নব্বই ডিগ্রি রোদে দীর্ঘ জারুলগাছের ছায়াটা লাগছে লিলিপুটের মতো। আজ এই অবধি। পরের কিস্তিতে অন্য গল্প বলব তোমাদের।

**কিছু পরম্পরার বেণেপুতুল শিল্পীদের পরিচয়**

১. রামপদ ঘোড়ুই ৩৬ বোসপুকুর হাতিশূড় কলোনি কোলকাতা—৭০০০৪২।

২. বসন্ত ঘোড়ুই, পদ্মতামালী পোঃডুমুদাড়ি, পূর্ব মেদিনীপুর।

৩. শান্তিপদ ঘোড়ুই , পদ্মতামালী পোঃডুমুদাড়ি, পূর্ব মেদিনীপুর।

৪. অজয় ঘোড়ুই, পদ্মতামালী পোঃডুমুদাড়ি, পূর্ব মেদিনীপুর।

৫. গনেশ ঘোড়ুই, ফুলবাড়ি ব্রজলালচক পূর্ব মেদিনীপুর।

৬. বিষ্ণুপদ ঘোড়ুই ফুলবাড়ি ব্রজলালচক পূর্ব মেদিনীপুর।

৭. যোগমায়া পুতুল থিয়েটার প্রযত্নেঃ শক্তিপদ প্রামাণিক, পোঃ নরঘাট পূর্ব মেদিনীপুর।

বেণেপুতুল নাচে মগ্ন শিল্পী রামপদ ঘোড়ুই

**ক্রমশ**